রহস্যের পাঁচ ঠিকানা

শেখর বসু

গ্রন্থতীর্থ
৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট
কলকাতা-৭০০০৭৩

RAHASYER PANCH THIKANA
A fiction by
Sekhar Basu

ISBN 81-7332-107-1

প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী

গ্রন্থতীর্থ, ৬৫/৩এ, কলেজস্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭৩ থেকে এস. বি. নায়ক কর্তৃক
প্রকাশিত এবং ডটলাইন প্রিন্ট অ্যান্ড প্রসেস, ১১৪এন, ডাঃ এস. সি.
ব্যানার্জী রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০ থেকে মুদ্রিত।

শান্তা-পঙ্কজ
সংহিতা-অশোক
জয়তী-সুমিত

রহস্যানুরাগী তিন দম্পতিকে

আনন্দবাজার পত্রিকার
রবিবাসরীয় বিভাগে
ধারাবাহিক প্রকাশ

এই লেখকের উল্লেখযোগ্য কয়েকটি বই

পরম্পরা
মাঝখান থেকে
অন্যরকম
অপরাধী চিহ্ন রাখেনি
লঘু পাপে
ত্রিমুখী প্রেম
মায়ানগরের রাত
ভালোবাসা
সাহিত্য প্রতিচ্ছায়া
নেতাজীর সহধর্মিণী
শ্রেষ্ঠ বিদেশী গল্প

এক

'কালিদাস ইচ্ছে করলেই খুব বড় মাপের একজন গোয়েন্দা হতে পারতেন।'

কৌশিকের কথায় কেমন যেন ঘাবড়ে গিয়ে মুখার্জিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কালিদাস মানে আপনি কোন্ কালিদাসের কথা বলছেন?'

'শুধু কালিদাস বললে গোটা পৃথিবীতে একজন কালিদাসকেই বোঝায়—মহাকবি কালিদাস।'

'অ্যাঁ! ওঁর মধ্যে আবার গোয়েন্দার লক্ষণ আপনি কোথায় দেখলেন! আমি যদ্দূর জানি, উনি তো শুধু কাব্যটাব্য করতেন। বিরহী যক্ষ তো ওঁরই লেখা, না?'

তারিফ করার গলায় কৌশিক বলল, 'বাহ্! আপনি তো দেখছি বেশ খোঁজ-খবরটবর রাখেন। তবে ওঁর ওই কাব্যটার নাম বিরহী যক্ষ নয়, মেঘদূত। যাকগে, এবার আপনি একটু ভেবে বলুন তো—কেন আমি বলছি কালিদাসের মধ্যে মস্ত গোয়েন্দা হওয়ার এলিমেন্ট ছিল।'

কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই ধরনের প্রশ্নের মুখে পড়লে সবচেয়ে সহজ উত্তরটি চটপট দিয়ে দিতেন মুখার্জিবাবু। বলতেন—ঠিক ধরতে পারছি না, আপনি বলুন তো। এখন আর ওই উত্তরটা কৌশিক দিতে দেয় না। বলে—দায়িত্ব এড়াবার চেষ্টা করবেন না মুখার্জিবাবু। আমি শখের গোয়েন্দা, আপনি আমার সহকারী। প্রতিটি ব্যাপারেই মাথা ঘামাতে হবে আপনাকে। আমি তো গল্প-উপন্যাসের গোয়েন্দা নই। হলে সব ব্যাপারে একাই একশো হতাম।

কিন্তু মুখার্জিবাবু মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন, পঁচিশ বছরের দুর্দান্ত মগজওয়ালা কৌশিক সব ব্যাপারে একাই একশো। বাকি মানুষটার কাজ হল শুধু গোয়েন্দার ছোট্ট অফিসঘরটি খোলা আর বন্ধ করা। গোয়েন্দার অনুপস্থিতিতে টেলিফোন ধরা। কাউকে কোনও খবর দেওয়ার থাকলে সেটা দেওয়া। অবসর সময়ে দু-তিনটে ব্যক্তিগত কাজও করে দিতে হয়। যেমন টেলিফোন বা ইলেকট্রিকের বিল দেওয়া। বছর-দেড়েক ধরে এই কাজই উনি করেছেন। তবে ওঁর কাজের বোনাস ছিল—তদন্ত শেষ হওয়ার পরে কৌশিকের কাছ থেকে গোয়েন্দাগিরির গল্প শোনা।

গোয়েন্দা-গল্পে এত আগ্রহ দেখে কৌশিকই হালে মুখার্জিবাবুকে ওর অ্যাসিস্ট্যান্ট করে নিয়েছে। দায়িত্বপূর্ণ এত বড় একটা পদ পেয়ে মুখার্জিবাবু তো খুব খুশি। কিন্তু কিছু-কিছু ব্যাপারে ওঁর বেশ সংশয় ছিল। কৌশিক একফুঁয়ে সেই সব সংশয় উড়িয়ে দিয়ে বলেছিল : আপনার বয়েস একান্ন তো কী হয়েছে? কোন আইনে লেখা আছে যে, পঁচিশ

বছরের গোয়েন্দার সহকারীর বয়েস একান্ন হওয়া চলবে না? আপনি সুস্থ-সবল, পড়াশুনো করা মানুষ। যথেষ্ট বুদ্ধি ধরেন। আর আপনার মস্ত বড় একটা প্লাস পয়েন্ট হল—বয়েস বাড়ার সুবাদে আপনি এই পৃথিবীর অনেক-কিছু দেখে ফেলেছেন। আপনার এই অভিজ্ঞতাটা আমার খুব কাজে লাগবে। নতুন পোস্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাসে দুশো টাকা করে আপনার মাইনে বাড়িয়ে দিলাম আমি। চাকরির আর একটা শর্ত হল, প্রতি রোববার সকাল নটায় মুন হোটেলে এসে আমরা একটা হাই-ব্রেকফাস্ট নিতে নিতে গোটা সপ্তাহের কাজকর্মগুলো ঠিকঠাক করে নেব।

আজ রোববারের সকাল। ঘড়িতে এখন নটা দশ। লম্বা এক প্রস্ত ব্রেক-ফাস্টের অর্ডার দেওয়া হয়ে গিয়েছে। যে-কোনও মুহূর্তে ওগুলো টেবিলে এসে হাজির হবে। খাবারের অর্ডার দেওয়ার পরেই কৌশিক মহাকবি কালিদাসের গোয়েন্দা-এলিমেন্টের কথা তুলেছিল। তারপর শক্ত প্রশ্নটা মুখার্জিবাবুর দিকে ঠেলে দিয়ে চুপ করে গেছে।

মুন হোটেল নামেই হোটেল, আদতে ছোট্ট একটা রেস্টুরেন্ট। তবে খুব সাজানো-গোছানো। মালিকের রুচির প্রশংসা করতেই হবে। প্রতিটি টেবিলে পাশাপাশি দুটি আরামপ্রদ চেয়ার। মস্ত দরজার পাশে দরজার মাপেই দুটো কাচের জানলা বসানো। খেতে-খেতে জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখা যায়। এ পাড়ায় অফিসই বেশি, ছুটির দিন তাই রাস্তাঘাট বেশ ফাঁকা-ফাঁকা থাকে। রোববার গোয়েন্দার অফিস একবেলা খোলা—তাও মোটে দু-ঘন্টার জন্যে। সকাল দশটা থেকে বারোটা। এ-দিন অবশ্য ক্লায়েন্টও বিশেষ থাকে না। সাধারণত একটু কাজ আর অনেকটা গল্পেই রোববারের সকালগুলো কেটে যায়।

মুখার্জিবাবু গম্ভীর মুখ করে কাচের জানলার দিকে চেয়ে বসে আছেন। যে কেউ দেখলে ভাববে উনি গভীর ভাবে কিছু ভাবছেন। কিন্তু শুধু উনি জানেন, ওঁর মগজ একদম ফাঁকা। কালিদাস সম্পর্কে কিচ্ছু ভাবা ওঁর পক্ষে সম্ভবই নয়। কালিদাসের কিচ্ছু উনি পড়ে নি। যেটুকু যা শুনেছেন তা একেবারেই ভাসা-ভাসা। এই বিদ্যেয় কৌশিকের মতো গোয়েন্দার কাছে মুখ খুলতে যাওয়া বোকামি। কিন্তু উনি ভাবার ভান করে যাচ্ছিলেন, কারণ কৌশিক 'জানি না' কথাটা শুনতে পছন্দ করে না একেবারেই।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে কৌশিক সামান্য অসহিষ্ণু হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী, কিছু ধরতে পারলেন?'

সময় কিছুটা কেটে গিয়েছে, এবার 'না' বলা যেতে পারে। মুখার্জিবাবু মাথাটা একবার চুলকে নিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা ঠিক—আপনি একটু ধরতাই দিন তো—।'

কৌশিক এবার হেসে ফেলে বলল, 'ধরতাই মানে তো পুরোটা বলে দেওয়া। তাই না?'

লাজুক মুখে মুখার্জিবাবু বললেন, 'বলে দিলে আমার খাটুনি কমবে। পরে ব্যাপারটা নিয়ে আমি খুব ভাল ভাবে ভাবনাচিন্তা করব।'

কৌশিক হাসতে হাসতে বলল, 'বেশ, তবে তাই হোক।'

বলার পরেই ব্রেকফাস্ট এসে গেল। চিকেন আর টম্যাটোর টুকরো মেশানো ডাবল ডিমের ওমলেট। সঙ্গে চিজ স্যাণ্ডুইচ।

খেতে খেতে কথা শুরু করল আবার গোয়েন্দা। 'আমার কাছে কালিদাসের গ্রন্থাবলি আছে, দেব আপনাকে। সংস্কৃত শ্লোকের পাশাপাশি বাংলা অর্থ—কোনও অসুবিধে হবে না আপনার। অন্ততপক্ষে রঘুবংশটা পড়ে নিন। কাব্য হিসেবে পড়তে চান, পড়ুন। ফ্যান্টাস্টিক! তবে আমি আপনাকে পড়তে বলছি গোয়েন্দাগিরির বুদ্ধি পাকানোর জন্যে।'

মুখার্জিবাবু একা মানুষ। বিয়ে-থা করেননি। বাড়িতে হাত পুড়িয়ে রেঁধে খান বলে বাইরের ভালমন্দ খাবারে ওঁর রুচি একটু বেশি। কিন্তু এ কী কথা! গরম ওমলেটের ছোট্ট একটা টুকরো চট করে গলা দিয়ে নামিয়ে দেওয়ার পরে কৌশিকের কথায় আপত্তি তুললেন উনি, 'কালিদাস পড়ে গোয়েন্দাগিরি শেখা—এমন কথা তো জীবনেও শুনিনি। এই যে লালবাজারে এত দুঁদে গোয়েন্দা আছে, এরা কি ট্রেনিং-পিরিয়ডে কালিদাস পড়েছিল?'

মানুষটির কথা বলার ভঙ্গিতে একটুকরো মজার হাসি ছড়িয়ে পড়েছিল কৌশিকের মুখে। ও বলল, 'সব ডিটেকটিভ তো এক রাস্তা ধরে চলে না। আমার পথটা হয়তো একেবারেই আলাদা। আমি যেটার ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিতে চাই, তার কিছুটা দেখছি কালিদাসেও আছে। রঘুবংশ পড়ার সময় ওই দিকটায় নজর পড়ায় আমি তো তাজ্জব!'

আধখানা ওমলেট আর এক পিস স্যাণ্ডুইচ এর মধ্যেই সাবাড় করে ফেলেছেন মুখার্জিবাবু। মুখেচোখে বেশ একটা পরিতৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠেছে। উনি বললেন, 'ব্যাপারটা কী—বেশ একটু খুলে বলুন তো।'

বলার জন্যে তৈরিই ছিল কৌশিক। 'বেশ, খুলেই বলছি। রঘুবংশ হল রঘুবংশের কাহিনী। ইক্ষ্বাকু বংশের মস্ত বড় রাজা দিলীপ। দিলীপের ছেলের নাম রঘু। রঘুর ছেলে অজ। যুবক অজ দারুণ হ্যাণ্ডসাম হয়ে উঠেছিল। সেই সময় একদিন বিদর্ভরাজ ভোজ রঘুকে বললেন—আমার বোন ইন্দুমতীর স্বয়ংবর হচ্ছে, আপনি অজকে ওখানে পাঠিয়ে দিন না। রঘু বললেন, ঠিক আছে, পাঠাব। যথাসময়ে ইন্দুমতীর স্বয়ংবর সভায় হাজির হয়ে গেল অজ। এই স্বয়ংবর সভার বর্ণনা আছে রঘুবংশের ষষ্ঠ সর্গে, মানে সিক্স্থ চ্যাপ্টারে। ওই চ্যাপ্টারটা আমি পাঁচবার পড়েছি।'

'কী আছে ওখানে?'

'আমি যে-পথে এগোতে চাইছি সেই পথের হদিস।'

গরম ওমলেটের টুকরোটা গালের এ পাশ থেকে ও পাশে ঠেলে দিয়ে মুখার্জিবাবু কেমন যেন ঘাবড়ে-যাওয়া গলায় ওঁর তরুণ মালিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনিও কি ওই ভাবে বিয়ে করার কথা ভাবছেন?'

হা-হা করে হেসে উঠে জবাব দিল কৌশিক, 'বিয়ে করার ওই সব থ্রিল পাব কোথায় আজকের দিনে। পেলে না হয় বিয়ে করার কথা ভাবা যেত। যা বলছিলাম—কালিদাস সত্যিই

মহাকবি, ইন্দুমতীর ওই স্বয়ংবর সভার যা একটা বর্ণনা দিয়েছেন না, সাঙ্ঘাতিক। দেশের বিরাট-বিরাট রাজারা সভা আলো করে বসে আছে। রাজাদের যেমন দাপট তেমন রূপ। মণিমাণিক্যে গা মোড়া। মুখে হাসি, কিন্তু বুক ঢিবঢিব করছে। ইন্দুমতী মালা দেবে কার গলায়? একটু বাদে পরমাসুন্দরী ইন্দুমতী ঢুকল স্বয়ংবর সভায়। হাতে মালা। ব্যস, অমনি রাজারা ইন্দুমতীকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা জুড়ে দিল।'

'কী ভাবে?'

'সেটাই তো আসল। কোনও রাজা দু-আঙুলে পদ্মের ডাঁটি ধরে হাতের পদ্মফুলটি ঘোরাতে শুরু করে দিল। কেউ খুব কায়দা করে গলার মহামূল্যবান হারটি দেখিয়ে দিল। অর্থাৎ এ সবই তোমার জন্যে সুন্দরী। আমার গলায় মালা দাও—আমি তোমাকে বিলাস-বৈভবে ডুবিয়ে রাখব। আমাকে বিয়ে করো—আমি তোমকে ঐশ্বর্যের চূড়ায় বসিয়ে রাখব। এই রকম সব ইঙ্গিত। মুখে কোনও কথা নেই, অথচ ইঙ্গিতে যা বোঝাবার সবই বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ইন্দুমতীও ইঙ্গিতে যা বলার তা বলে দিচ্ছিল। একটা হল—রাজার সামনে এসে ভাবশূন্য প্রণাম করা। অর্থাৎ মাপ করবেন। ইন্দুমতীর সঙ্গে ছিল দ্বারপালিকা সুনন্দা-কুমারী। সুনন্দাকুমারী এক-এক রাজার কাছে নিয়ে যাচ্ছিল ইন্দুমতীকে, তারপর সেই রাজার শৌর্য-বীর্য মানে বায়োডেটা বলে যাচ্ছিল গড়গড় করে। সব শোনার পরে ইন্দুমতীর একটা শুকনো প্রণাম। ব্যস, বাতিল সেই রাজার মুখ কালো। সব রাজাকে এইভাবে খারিজ করার পরে ইন্দুমতী গিয়ে দাঁড়াল কন্দর্পকান্তি অজের কাছে। অজের একটু ভয়-ভয় করছিল—রাজকুমারী যদি ওকেও অপছন্দ করে! কিন্তু এবার ব্যাপারটা একেবারে অন্য রকম হল। ইন্দুমতী ঈষৎ সঙ্কোচে প্রসন্ন নয়নে এমন ভাবে তাকাল যে সঙ্গে সঙ্গে তার মনের গোপন কথা অজ এবং সুনন্দা টের পেয়ে গেল। ইন্দুমতী হাতের মালা পরিয়ে দিল অজের গলায়। কী, কী বুঝলেন মুখার্জিবাবু?'

মুখার্জিবাবুর সামনের দুটি প্লেটই খালি। শেষ স্যাণ্ডুইচটা ওঁর হাতের মধ্যে। বেশ তারিফ করার গলায় বললেন, 'বেশ চমৎকার স্বয়ংবর সভা, কালিদাস লিখেছেনও বেড়ে। কিন্তু এর মধ্যে গোয়েন্দাগিরির কী পেলেন? আর ওই যে বলেছিলেন—আপনি যেটার ওপর জোর দিতে চান, কালিদাসে তার হদিস আছে—সেটাই বা কী?'

প্রশ্নের উত্তরে কৌশিক একবার কাঁধ ঝাঁকাল, তারপর হঠাৎই খুব মনোযোগ দিয়ে ওমলেট আর স্যাণ্ডুইচ খেতে শুরু করে দিল। খাবার শেষ হওয়ার পরে জল খেল, তারপর দু কাপ কফির অর্ডার দিয়ে মুখার্জিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আমি কি আপনাকে বলিনি যে, শরীরের ভাষা সবচেয়ে বড় ভাষা?'

'কী আশ্চর্য, কেন বলবেন না, বহু দিন বলেছেন।'

'মুখের ভাষায় মনের ভাব গোপন করা যায়, শরীরের ভাষায় যায় না। বলিনি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, কেন বলবেন না?'

'শরীরের ভাষা ঠিক-ঠিক পড়তে পারলে অপরাধী ধরার কাজ অনেক সহজ হয়ে পড়ে। বলেছি?'

'বলেছেন।'

'কালিদাস তো স্বয়ংম্বর সভায় শরীরের এই ভাষার সাহায্যেই অনেক কিছু বলে দিয়েছেন। রাজাদের পদ্মফুল দেখানো, হার দেখানো, ইন্দুমতীর ভাবশূন্য প্রণাম, তারপর ওই চোখের ভাষাতেই অজকে মনের কথা জানিয়ে দেওয়া—। আপনি এই ব্যাপারটা ধরতে পারেননি?'

লাজুক মুখে উত্তর দিলেন মুখার্জিবাবু—'একেবারে যে পারিনি, তা নয়। তবে আপনাকে সত্যি কথাটাই বলি—সামনে ভাল খাবার-দাবার থাকলে অন্য কোনও বিষয়ে আমার মনঃসংযোগ করাটা একটু কঠিন হয়ে পড়ে। আচ্ছা, এই কালিদাস তো একটু-আধটু গোয়েন্দাগিরিও করতে পারত।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠে কৌশিক বলল, 'কালিদাসের ভক্তরা আপনার কথা শুনতে পেলে ঠিক আপনাকে পেটাতে আসবে।'

'কেন-কেন, গোয়েন্দাগিরি করা কি খারাপ?'

'কালিদাসের মতো একজন মহাকবির কাছে কবিতা লেখা ছাড়া আর সব কিছুই খারাপ।'

'আচ্ছা, কালিদাসের আমলে দেশে চুরি-ডাকাতি কেমন হত?'

'কী করে বলব! আসলে কালিদাস কোন্ আমলের লোক সেটাই তো পরিষ্কার করে জানা যায় না।'

'কেন, ইতিহাসে তো পড়েছি কালিদাস বিক্রমাদিত্যের সভাকবি ছিলেন, বিখ্যাত সেই নবরত্নের একজন।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ' এই মতটিই সবচেয়ে চালু, তবে এ ব্যাপারে সব পণ্ডিত একমত হননি। তাছাড়া বিক্রমাদিত্য উপাধিটি এক রাজা নন, অনেকেই নিয়েছিলেন। আপনি যে বিক্রমাদিত্যের কথা বলছেন, তিনি হলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত। এঁরই নাকি সভাকবি ছিলেন কালিদাস। হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তখন দেশে সুশাসন। গোটা রাজ্য উন্নতির চুড়োয় উঠেছিল। দেশ যত উন্নত হবে, দেশের শিল্প-সাহিত্যের তত বেশি উন্নতি হবে। সেদিক থেকে কালিদাস এই সময়েরই কবি হওয়া স্বাভাবিক। যত দূর মনে পড়ছে, এই রাজার রাজত্বকাল ছিল ৩৮০ সাল নাগাদ। আর একটা মত হল—যিনি বিক্রমসংবৎ চালু করেন, কালিদাস তাঁর আমলের। সেই হিসেবে কালিদাসের সময় বলতে বোঝায় খ্রিস্টজন্মের গোটা-পঞ্চাশ বছর আগে। এদিকে, এলাহাবাদের কাছে একটা পদক পাওয়া গেছে। তাতে যে ছবিটি আছে তার সঙ্গে কালিদাসের অভিজ্ঞানশকুন্তলম নাটকের প্রথম দৃশ্যের খুব মিল। পদকটি সুঙ্গবংশের রাজত্বকালের। রাজত্বকাল ছিল খ্রিস্টজন্মের পৌনে দুশো বছর আগে। এই হিসেবে কালিদাস ওই সময়ের কবি। আবার মালবিকাগ্নিমিত্রের ভরতবাক্য পড়ে কেউ-কেউ মনে করেন, কবি

ছিলেন রাজা অগ্নিমিত্রের সমসাময়িক। এই রাজার রাজত্বকাল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দী। তার মানে কালিদাস সেই সময়ের লোক। আবার রঘুবংশ দেখুন। বইটির ফোর্থ চ্যাপ্টারে রঘুর হুন বিজয়ের একটা বর্ণনা আছে। পণ্ডিতদের একটা দল বলেন, বইয়ের ওই রঘু আসলে হল স্কন্দগুপ্ত। স্কন্দগুপ্ত হুনদের মেরে তাড়িয়েছিল। এটা হচ্ছে তারই ছবি। এটা সত্যি হলে ধরতে হয় কালিদাস ওই সময়ের কিছু পরের কবি। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বকাল সাড়ে চারশো খ্রিস্টাব্দের কাছাকাছি। কেউ-কেউ আবার বলেন, কালিদাস কুমারসম্ভব লিখেছেন গুপ্তরাজ কুমারগুপ্তের জন্মবৃত্তান্ত নিয়ে। আরও কিছু-কিছু মত আছে। সব বলার দরকার নেই। আমরা মোটামুটি এটা বলতে পারি—যিশুখ্রিস্ট জন্মাবার আগে একশো বছর, এদিকে জন্মের পরে পাঁচশো বছর—এই ছশো বছরের যে কোনও এক সময় মহাকবি কালিদাস ভারতবর্ষে জন্মেছিলেন।'

কফি এসে গিয়েছিল। কফির কাপে সশব্দে একটা চুমুক দিয়ে মুখার্জিবাবু বললেন, 'বলেন কী, ছশো বছর কি চাট্টিখানি সময়! অথচ সেই সময়ের কোনও রাজা-মহারাজার মাথায় এল না যে, কালিদাসের জন্মসময়টা ঠিক করে লিখে বা খোদাই করে যাওয়া দরকার। এটা ওঁদের কেউ করে গেলে আজ আমাদের এত ধাঁধার মধ্যে পড়তে হত না।'

'ঠিক।' সায় দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কফিতে লম্বা করে একটা চুমুক দিল কৌশিক।

শীতের শেষ। কিন্তু শীত যাই-যাই করেও যাচ্ছে না। এক-আধ দিন হঠাৎ আবার জাঁকিয়ে ঠাণ্ডা পড়ে। আজকের সকালটা যেমন। মাঝেমধ্যে দমকা হিমেল হাওয়া রেস্টুরেন্টের খোলা দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ছিল। বাইরে হাল্কা হলুদ রোদ, চারদিকে বেশ একটা তাজা ভাব। অন্যান্য দিন এই সময় রেস্টুরেন্টের লাগোয়া ফুটপাথে বেশ ভিড় থাকে, হকাররাও ডালা সাজিয়ে হাঁকডাক শুরু করে দেয়। আজ সে সব নেই। অফিস-পাড়ার এই ফাঁকা ফুটপাথের দিকে তাকালেই বোঝা যায় আজ ছুটির দিন।

রেস্টুরেন্টের জানলার সোজাসুজি ফুটপাথের এক প্রান্তে একটা টেলিফোন বুথ। বুথের প্রায় তিনভাগ কাচে মোড়া। মাঝে-মাঝে দু-একজন এসে ফোন করে যাচ্ছিল ওই বুথ থেকে। ওই দিকে তাকিয়ে কেমন যেন নিজের মনে কথা বলার ভঙ্গিতে কৌশিক বলে উঠল, 'মানুষের শরীরের ভাষার কাছে মুখের ভাষা দাঁড়াতে পারে না। শরীরের ভাষা যে ঠিক-ঠিক বুঝতে পারে তার কাছে বোধহয় কারও পক্ষেই কিছু লুকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আমাদের দেশে দেখবেন রূপকথার চরিত্রদের অনেকে জন্তুজানোয়ারের ভাষা বুঝতে পারে। মুনিঋষিদের সবাই ছিলেন অন্তর্যামী। কেন জানি না, আমার বারবার মনে হয় এই ব্যাপার-গুলোর অন্য একটা অর্থ আছে। প্রাচীন কালে কিছু মানুষ লোকচরিত্র আর পশুদের আচার-ব্যবহার স্টাডি করে নিখুঁত জ্ঞান অর্জন করেছিল। শরীরের ভাষা আয়ত্ত করেছিল দারুণভাবে। শরীরের লক্ষণ দেখে ঠিকঠাক বলে দিতে পারত—কে কী চায়। তাই দেখে সাধারণ লোক অবাক হয়ে ভাবত—মানুষটা নির্ঘাত অন্তর্যামী। ওদিকে আবার পশুদের ভাষাও জানে।

মুখার্জিবাবু, আমি আমার গোয়েন্দাগিরিতে সবচেয়ে বেশি জোর দিতে চাই শরীরের এই ভাষার ওপর। অপরাধ জগতের কঠিন সব সমস্যার সমাধানে এই ভাষাজ্ঞানটাই হবে আমার প্রধান চাবি।'

কৌশিকের কথা মনোযোগী ছাত্রের মতো শুনছিলেন মুখার্জিবাবু। ও থামতেই প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, এই শরীরের ভাষাটাসা—এগুলো কি সবাই শিখতে পারে?'

'কেন পারবে না। তবে ধৈর্য ধরতে হবে। অজানা ভাষা শিখতে গেলে সবাইকেই খাটতে হয়। শরীরের ভাষাও সেই রকম। এর একটা আলাদা ব্যাকরণ আছে।'

'কী রকম? একটু শুনি।'

এদিক-ওদিক দু-চারবার তাকাবার পরে কৌশিক বলল, 'বেশ, সামনের ওই লোকটাকে দেখুন। ওই যে—যে-লোকটা টেলিফোন বুথে ঢুকল এইমাত্র।'

কাচ দিয়ে ঘেরা বুথটা এখান থেকে মাত্র পনেরো-বিশ হাত দূরে। ভেতরের সব কিছু দেখা যাচ্ছিল পরিষ্কার। 'চেষ্টা করে দেখুন তো ওই লোকটার ভঙ্গিটঙ্গি দেখে কিছু বোঝা যায় কি না।'

কৌশিকের কথামতো ভদ্রলোককে কয়েক মুহূর্ত খুঁটিয়ে দেখলেন মুখার্জিবাবু, তারপর হতাশ গলায় বললেন, 'না, আর পাঁচজনের সঙ্গে একে আলাদা করার মতো কিছুই তো দেখতে পাচ্ছি না।'

কৌশিক চাপা গলায় বলল, 'বেশ, আমি চেষ্টা করছি। ভদ্রলোক বোধহয় বান্ধবী কিংবা প্রেমিকাকে ফোন করছে।'

'কী করে বুঝলেন? ভদ্রলোকের বয়েস কম বলে?'

'ওর বয়েস কম—এটা একটা পয়েন্ট। কিন্তু ওর বয়েসের দিকে তাকিয়ে কথাটা বলিনি আমি। টেলিফোনটা নিয়ে কী ভাবে ঝুঁকে পড়েছে দেখুন। রিসিভারে আলতো করে হাত বোলাতে-বোলাতে কথা বলছে। মাঝেমধ্যে ঘুরে গিয়ে আর একটা হাত দিয়ে মুখ আড়াল করার চেষ্টা করছে। প্রেমিক-প্রেমিকা মাত্রই আড়াল পেতে চায়। ওই ভঙ্গিটা হল আড়াল পাওয়ার গোপন ইচ্ছে।'

টেলিফোন সেরে ইয়াংম্যান শিস দিতে-দিতে চলে গেল।

মুখার্জিবাবু চোখেমুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বললেন, 'আপনি মনে হয় ঠিকই বলেছেন—এ ছোকরা প্রেমিক না হয়ে যায় না। ঠিক আছে, আপনার থিয়োরি মেনে পরের জনকে আমি বোঝার চেষ্টা করব, দেখি কদ্দূর পারি!'

একটু পরেই মাঝবয়সী এক ভদ্রলোক ফোন করার জন্যে বুথে ঢুকলেন, কিন্তু কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পরে বেরিয়ে এলেন। তাই দেখে মুখার্জিবাবু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'যাব্ বাবা!'

কথাটার কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না কৌশিকের মধ্যে। ভদ্রলোক বুথ থেকে বেরিয়ে কয়েক পা হেঁটেই থমকে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কৌশিক স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল মানুষটির দিকে।

ভদ্রলোক আবার একবার টেলিফোন-বুথে ঢুকলেন। একটু ইতস্তত করে রিসিভার হাতে নিলেন, কিন্তু ডায়াল করলেন না। কিছুক্ষণ ওই ভাবে থেকে বুথ থেকে বেরিয়ে এসে লম্বা পায়ে হাঁটতে শুরু করলেন। কিন্তু কিছুটা যাওয়ার পরেই থমকে দাঁড়ালেন আবার।

মুখার্জিবাবু মজার গলায় বললেন, 'ভদ্রলোকের মাথায় ছিট আছে নির্ঘাত।'

কৌশিক এবারও ওঁর কথার জবাবে কিছু বলল না। ইঙ্গিতে বিল আনতে বলল ওয়েটারকে।

বিল রেডিই ছিল, ওয়েটার সেটা নিয়ে এল সঙ্গে-সঙ্গে। বিলের দিকে না তাকিয়ে পকেট থেকে একটা একশো টাকার নোট বার করে প্লেটের ওপর রাখল কৌশিক। ওর চোখ ওই ভদ্রলোকের দিকে।

একটু বাদে ভদ্রলোক আবার ঢুকলেন টেলিফোন-বুথে। তারপর রিসিভার টেনে নিয়ে ডায়াল করলেন। তারপর ওটা নামিয়ে রাখলেন। একটু পরে একই ভঙ্গিতে আরও দু-তিনবার।

মুখার্জিবাবু বললেন, 'লাইন এনগেজ্ড।'

ওয়েটার ফিরতি টাকাপয়সা নিয়ে এসেছিল প্লেটে। একটা পাঁচ টাকার নোট রেখে বাকিগুলো প্রায় মুঠো করে তুলে নিয়ে মুখার্জিবাবুকে 'আসুন' বলেই কৌশিক বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়।

ওরা বেরোবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওই ভদ্রলোকও বেরিয়ে এসেছিলেন টেলিফোন-বুথ থেকে। কৌশিক কাছে গিয়ে ভদ্রলোকের দিকে নিজের একটা ভিজিটিং-কার্ড এগিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার মনে হয়, আমি আপনাকে কিছুটা সাহায্য করতে পারব।'

ভদ্রলোক রীতিমত চমকে গিয়েছিলেন। তারপর ভিজিটিং-কার্ডটা হাতে নিয়ে বিড়বিড় করে বললেন, 'প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর। আপনি?'

কৌশিক একদিকে মাথা নাড়ল।

ভদ্রলোক সন্দিগ্ধ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?'

'চিনি না তো। তবে মনে হল আপনি খুব বিপদে পড়েছেন।'

'কী ভাবে বুঝলেন?'

'শরীরের ভাষা পড়ে।'

'কিসের ভাষা?'

একচিলতে হাসি ফুটে উঠেছিল কৌশিকের মুখে। ও বলল, 'আমার অফিস খুব কাছেই, চলুন না, ওখানে বসে কথা বলা যাবে।'

ভদ্রলোক ইতস্তত করে বললেন, 'বেশ চলুন।'

দুই

অফিসপাড়ায় ছোট্ট একখানা অফিসঘর। ফ্লোর-স্পেস খুবই কম। তবে এই ঘাটতিটুকু মেটাবার জন্যেই বুঝি ওপরে দেয়ালজোড়া লকার আর বইয়ের র‍্যাক। ঘরের দু-প্রান্তে দুটো টেবিল, কয়েকটা চেয়ার। গোয়েন্দার টেবিলে গোটাতিনেক কভার-ফাইল, একটা ডায়েরি আর একটা টেলিফোন। মুখোমুখি চেয়ারে কৌশিক আর বিপদগ্রস্ত মানুষটি। মুখার্জিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কী খাবেন? চা না কফি?'

ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে বললেন, 'চা।'

সুইংডোর ঠেলে চা আনতে চলে গেলেন মুখার্জিবাবু।

কৌশিক ভদ্রলোককে আড়চোখে খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে বলল, 'আপনার নামটা কী জানতে পারি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, আমার নাম সুনন্দ তরফদার।'

'সুনন্দবাবু, কাল রাত্তিরে আপনার বোধহয় একেবারেই ঘুম হয়নি।'

ম্লান হেসে উত্তর দিলেন ভদ্রলোক, 'না।'

'আপনি কি খুব বড় ধরনের একটা বিপদের আশঙ্কা করছেন?'

প্রশ্ন শুনে সুনন্দবাবু একটু যেন চমকে উঠলেন, তারপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কৌশিককে একবার দেখে নিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন, 'এটাও কি ধরলেন আপনার ওই কী যে বলে—শরীরের ভাষা পড়ে?'

সামান্য একটু লজ্জা পাওয়ার ভঙ্গি করে কৌশিক জবাব দিল, 'হ্যাঁ, তা একরকম বলতে পারেন।'

সুনন্দবাবু কী যেন বলতে গিয়েও বললেন না, তারপর হঠাৎই ভেঙে-পড়া মানুষের গলায় বলে উঠলেন, 'আপনি ঠিকই আন্দাজ করেছেন। আমি খুব ভয় পাচ্ছি। মনে হচ্ছে খবু বড় ধরনের একটা বিপদের মধ্যে পড়ে যাব আমি।'

সোজা হয়ে বসল কৌশিক, তারপর সোজা চোখে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন এমন মনে হচ্ছে আপনার?'

'মনে হওয়ার তো অনেক কারণ।'

'এসব কথা কি কাউকে জানিয়েছেন?'

'না।'

টেবিলের একধারে একটা জেম্‌স ক্লিপ পড়ে ছিল, সেটা হাতে তুলে নিয়ে কৌশিক বলল, 'আজ বোধহয় বলার কথা ভেবেছিলেন।'

একটু যেন অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন সুনন্দবাবু, 'কাকে?'

'আপনার খুব চেনা একজনকে, যাঁকে আপনি খুব মান্যগণ্য করেন। এই তো কিছুক্ষণ আগেই তাঁকে ফোন করার জন্য টেলিফোন বুথে ঢুকেছিলেন। তাই না?'

কৌশিকের কথায় ভদ্রলোক কিছুটা বুঝি সন্দিগ্ধ আর সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছিলেন। 'আপনি কী করে জানলেন?'

একটু হেসে জবাব দিল কৌশিক, 'আন্দাজে।'

মুখার্জিবাবু চা নিয়ে ফিরে এসেছিলেন। কেটলির চা কাপে ঢেলে দুজনের দিকে এগিয়ে দিয়ে নিজেও আধকাপ নিলেন।

ভদ্রলোক চায়ের কাপ টেনে নিয়ে ছোট্ট একটু চুমক দিলেন, তারপর রুমাল দিয়ে চোখমুখ মুছে নিয়ে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি আপনার নামের সঙ্গে পরিচিত, তবে জানতাম না যে আপনার বয়েস এত কম। বয়েসটা অবশ্য কোনও ব্যাপার নয়। সেবার সেই পুরনো বাড়ির নীচে পাওয়া কঙ্কালটা থেকে আপনি যে ভাবে রহস্যের সমাধান করেছিলেন—ওহ্ দারুণ!'

কৌশিক লজ্জা পেয়ে ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বলেছিল, 'ওসব কথা এখন থাক—।'

ভদ্রলোক হঠাৎ থেমে যাওয়ার জন্যে কথা শুরু করেননি, কৌশিককে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'খবরের কাগজে ওই কেস-হিস্ট্রিটা বেরিয়েছিল কয়েক দফায়—আমি পুরোটা পড়েছিলাম। হাইলি ইন্টারেস্টিং। তখন থেকেই আপনার ওপর আমার বেশ একটা ইয়ে—। তবে আপনার পরের কেসগুলো সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না। এটা শুধু জানি —বেশ কয়েকটা বড় অপরাধীকে পাকড়াও করেছেন আপনি। আপনার সঙ্গে ঘটনাচক্রে আলাপ হয়ে গেল, এটা আমার কপাল। আপনাকে সব বলছি—আপনার সাহায্য আমার খুব দরকার।'

চায়ের কাপে আর একটা চুমুক দিয়ে মুখার্জির দিকে তাকালেন সুনন্দ তরফদার। সঙ্গে সঙ্গে কৌশিক বলল, 'ও, এঁর সঙ্গে আপনার আলাপ হয়নি। ইনি সনাতন মুখার্জি—আমার সহকারী, গাইড—কী নয়! মুখার্জিবাবুর সামনে আপনি আপনার সব কথাই বলতে পারেন অনায়াসে।'

সুনন্দবাবু হঠাৎ হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দশটা বাজতে পাঁচ। আপনার ঘড়িতে ক'টা বাজে বলুন তো?'

'আপনার ঘড়ি ঠিক আছে, দশটা বাজতে পাঁচ।'

দুদিক মাথা নাড়াতে নাড়তে ভদ্রলোক বললেন, 'তার মানে দশ মিনিট আগে উনি বেরিয়ে গেছেন। পৌনে দশটায় ওঁর বেরোবার কথা ছিল, বেরিয়ে গেছেন নিশ্চয়ই—! উনি তো প্রতিটি ব্যাপারে অসম্ভব পাংচুয়াল।'

'কার কথা বলছেন আপনি?'

'আমাদের ফার্মের মালিক মিস্টার মৈত্রের কথা। একটা ওয়েলফেয়ার সোসায়েটির চ্যারিটেবল ডিসপেনসারি ওপেন করার জন্যে আজ সকালে ওঁর বাটানগর যাওয়ার কথা—একটু আগে ওঁকেই আমি ফোন করতে গিয়েছিলাম।'

'ফোন করে বলতে চেয়েছিলেন আপনি ওঁর সঙ্গী হবেন। যাতায়াতে অনেকটা সময়। এই সময়ের মধ্যে আপনার কিছু গোপন কথাবার্তা ওঁকে বলার ইচ্ছে ছিল—। তাই তো?'

অবাক হয়ে সুনন্দবাবু বললেন, 'এগ্‌জ্যাক্টলি। কিন্তু কী করে আপনি ধরলেন?'

হালকা একটা হাসি ফুটে উঠেছিল কৌশিকের মুখে। 'কিন্তু ওঁকে এখন এসব কথা বলা ঠিক হবে কি না এই নিয়ে আপনি খুব সংশয়ের মধ্যে পড়ে গিয়েছেন। তাই না?'

'ঠিক তাই। মিলনের হাবভাব ইদানীং আমার একেবারেই ভাল ঠেকছে না। কয়েকটা ব্যাপার তো রীতিমত সন্দেহজনক। মিস্টার মৈত্রকে ও বড় রকমের কোনও বিপদের মধ্যে ঠেলে দিতে পারে। আমি ওর ব্যাপারে মিস্টার মৈত্রকে একটু সতর্ক করে দিতে চেয়েছিলাম।'

'মিলন কে?'

'আমার একজন সহকর্মী।'

'সাবধান কোথায় করতে চেয়েছিলেন—বাটানগর যাতায়াতের পথে?'

'হ্যাঁ।'

'করলেন না কেন?'

'আসলে, দাখিল করার মতো কোনও প্রমাণ আমার হাতে আসেনি এখনও। ওদিকে আমার ভয় হচ্ছে, প্রমাণ পাওয়ার আগেই যদি মিস্টার মৈত্রের মস্ত কোনও ক্ষতি হয়ে যায়!'

'কী ধরনের ক্ষতি?'

'ক্ষতি মানে সব দিক থেকেই ক্ষতি।'

টেলিফোনের রিসিভারের ওপর দুটো আঙুল ঘষতে ঘষতে কৌশিক বলল, 'পুরো ব্যাপারটা ভেঙে বলুন। না বললে আমি আপনাকে সাহায্য করব কী ভাবে?'

একটু যেন বিব্রত হওয়ার ভাব ফুটে উঠেছিল সুনন্দবাবুর মুখে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'সব কিছুই বলছি। আমি, কী বলব,—একটু-আধটু ভাগ্যে বিশ্বাস করে থাকি। আমার মনে হয় আপনার সঙ্গে এ ভাবে যোগাযোগ হয়ে যাওয়াটা আমার পক্ষে ভাল, মিস্টার মৈত্রের পক্ষেও ভাল।'

'মিস্টার মৈত্রের পুরো নামটা কী?'

'অলোক মৈত্র। ওঁর ফার্মের নাম টনব্যাক্সি। মূল ব্যবসা হল মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট সাপ্লাই করা। দ্বিতীয় ব্যবসা হর্টিকালচারের। পুরনো ব্যবসা।'

'মিস্টার মৈত্রের বয়েস কত এখন?'

'সত্তর, তবে অত্যন্ত কর্মঠ। আমাদের দ্বিগুণ পরিশ্রম করেন। নিজের বলতে এক ভাগ্নি, বছরখানেক হল বিয়ে দিয়ে দিয়েছেন। ওঁর বিধবা বোন, মানে ওই ভাগ্নির মা এখন কাশীতে।'

'বিয়েথা করেননি অলোকবাবু?'

'করেছিলেন, তবে স্ত্রী মারা যান বিয়ের তিন বছরের মধ্যেই। বাচ্চাটাচ্চা হয়নি। আর বিয়েও করেননি। পরে এক বছরের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে ওঁর বোন বিধবা হন। ওদের উনি নিজের বাড়িতে এনে রেখেছিলেন। ভাগ্নির বিয়ের পরে বোন চলে গেছেন কাশীতে। শুনেছি বাকি জীবনটা উনি ওখানেই কাটাতে চান।'

'টনব্যাক্সিতে আপনি কদ্দিন আছেন?'

'তা প্রায় বছর-পনেরো হয়ে গেল।'

'আপনি ওখানে মানে, ফার্মের কোন্ দিকটা আপনাকে দেখাশোনা করতে হয়?'

'আমি ম্যানেজার। তবে ছোট কোম্পানি তো, সব দিকেই কমবেশি নজর রাখতে হয়।'

'মিলন—যাঁর কথা একটু আগে বলছিলেন, তিনি কী করেন?'

'মিলন মাইতি, অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার। এস্টেট ডিপার্টমেন্টের চার্জে আছে।'

'উনিও কি অনেক দিন ধরে আছেন আপনাদের কোম্পানিতে?'

'না-না, বছর-তিনেক মাত্র। প্রথম দিকে ভেজা বেড়াল ছিল, এখন ওর স্বভাবটা টের পাচ্ছি। লোকের কান ভারী করতে এক নম্বরের ওস্তাদ।'

'আপনার কি মনে হয় ও মিস্টার মৈত্রের কাছে আপনার বিরুদ্ধে কিছু লাগিয়েছে।'

'নির্ঘাত লাগিয়েছে। তবে একটা কথা আপনাকে বলছি—আমার নামে লাগালে আমার কিছু এসে যায় না। নিজের কাছে সাচ্চা থাকলেই হল। আমার মনে হয়, ও এমন কোনও খেলা খেলছে যাতে মিস্টার মৈত্রের ক্ষতি হবে, কোম্পানির ক্ষতি হবে।'

কৌশিকের কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়েছিল। 'কেন আপনার এ রকম মনে হচ্ছে?'

'আমি দুদিন ওকে চৌরঙ্গি এলাকায় ডক্টর মৈত্রের সঙ্গে দেখেছি।'

'ডক্টর মৈত্র কে?'

'আরে উনিই তো যত নষ্টের গোড়া। উনি অ্যাদ্দিন বাদে কবর থেকে উঠে না এলে কোনও ঝঞ্ঝাট-ঝামেলা হত না।'

কৌশিকের কপালে ভাঁজগুলো আর একবার ফুটে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছিল। একটু হেসে বলল, 'সুনন্দবাবু, আমি তো একেবারেই বাইরের লোক। পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার করে না বললে কিছুই বুঝতে পারব না। ডক্টর মৈত্র কে? এতকাল বাদে কবর থেকে উঠে এলেন মানে কোত্থেকে উঠে এলেন?'

বিব্রত মুখে একটু হাসার চেষ্টা করে সুনন্দবাবু বললেন, 'আসলে ব্যাপারটা এখন এমন পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে, এ-নিয়ে কিছু ভাবতে গেলেই আমি উত্তেজিত হয়ে পড়ি—। ডক্টর মৈত্র হলেন আমাদের অলোকবাবুর ছোট ভাই। আজ থেকে বছর-পঁচিশ আগে লণ্ডনে গিয়ে সেট্‌ল করেছিলেন। দেশের কারও সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক রাখেননি। অ্যাদ্দিনের মধ্যে একবারও দেশে আসেননি। অলোকবাবু জানতেনই না, তাঁর ভাইটি বেঁচে আছে না

মরে গেছে। কিন্তু এতকাল বাদে উনি যেই না গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশনটা নিয়েছেন অমনি মাটি ফুঁড়ে হাজির হয়েছে ভাইটি। আমার কী মনে হয় জানেন? লোকটি আসলে ইম্‌পস্‌টার, জাল ডক্টর মৈত্র।'

'কেন এ-কথা বলছেন? অলোকবাবু কি এ-ধরনের কোনও ইঙ্গিত দিয়েছেন?'

'না-না, উনি অত্যন্ত বুদ্ধিমান মানুষ, পেটের কথা পেটেই রেখে দিতে পারেন। নার্ভও খুব শক্ত। তবে এটা টের পাচ্ছি, উনি মাঝেমধ্যে বেশ ডিসটার্বড্‌ ফিল করছেন।'

কৌশিক পকেট থেকে কলম বার করল, তারপর ওটা আবার পকেটেই রেখে দিয়ে বলল, 'জাল ভাই কি না সেটা ধরে ফেলা কঠিন নয়, যদিও মধ্যিখানে পঁচিশটা বছর কেটে গেছে। আর সত্যি-সত্যি যদি আসল ভাই হয়, তাহলে তো ডিসটার্বড্‌ হওয়ার কিছু নেই। সব সময় সব আত্মীয়কে আমরা পছন্দ করতে পারি না, কিন্তু তাতে কী এসে যায়। একটু বেশি মাত্রায় ফর্মাল হয়ে অ্যাভয়েড করলেই মিটে যায় সব।'

'না-না, আর একটা ব্যাপার আছে—।'

'আপনার কথাটা খেয়াল আছে আমার। আপনি বলেছেন, অলোকবাবু গুরুত্বপূর্ণ ডিসিশনটা নেওয়ার পরেই এই ডক্টর মৈত্র হাজির হয়েছে। আপনার আশঙ্কা, ডক্টর মৈত্রকে দেখে অলোকবাবু এই সিদ্ধান্তটি বাতিল করতে পারেন।'

'ঠিক বলেছেন আপনি।'

'এবার বলুন সিদ্ধান্তটি কী নিয়ে?'

সুনন্দবাবু পকেট থেকে রুমাল বার করে ঘাড়-গলা-মুখ ভাল করে মুছে নিয়ে বললেন, 'আমাদের এই অলোক মৈত্র ঋষিতুল্য মানুষ। তার মানে উনি যে ব্যবসা সম্পর্কে উদাসীন, তা নয়। ব্যবসার ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ এবং ব্যবসা খুব ভাল বোঝেন। আমাদের টনব্যাক্সির টার্নওভার খুব ভাল। উনি অনায়াসে এক্সপ্যানশনে যেতে পারতেন, যাননি। ডাইভার্সিফিকেশনে যেতে পারতেন, যাননি। উনি কী বলেন জানেন, বলেন—ব্যবসা তত বড়ই করেছি যত বড় করলে অন্যদিকে তাকাবার একটু অবকাশ থাকে। মাঝেমধ্যে অন্য দিকে তাকিয়ে নিজের মতো করে নিশ্বাস ফেলতে না পারলে মানুষ যন্ত্র হয়ে যাবে। আমি যন্ত্র হতে চাই না। টনব্যাক্সির কেউ যন্ত্র হয়ে বেঁচে থাকুক—এটাও চাই না। ইদানীং উনি প্রায়ই বলতেন, কর্মচারীরা চাকরি থেকে রিটায়ার করে বাকি জীবনটা আরামে কাটায়; মালিকরা কী পাপ করেছে যে, সে সুযোগটা পাবে না! আমিও রিটায়ার করব। আমি চাই অন্য মালিকরা এবার কোম্পানি দেখুক।'

'উনি কি ওঁর বিষয়আশয়, ব্যবসাপত্তর ভাগবাটোয়ারা করার কথা ভাবছিলেন?'

'ঠিক তাই।'

'তা, এটা তো স্বাভাবিক। বয়েস হয়ে গেলে বিষয়ী মানুষরা বিষয় বিলিব্যবস্থার কথা ভেবে থাকেন।'

'উনি আর একটু বেশি ভেবেছিলেন। বলেছিলেন, সব কিছুর দানপত্র তৈরি করে সংসার থেকে ছুটি নিয়ে বাকি জীবনটা পাহাড়ে-পর্বতে কাটাবেন।'

'দানপত্র তৈরি করেছিলেন?'

'শুনেছি করেছিলেন, শুধু সই-সাবুদ বাকি ছিল! হয়েও যেত, হল না কেবল ওঁর ওই সো-কল্‌ড ভাইয়ের জন্যে।'

'অলোকবাবু কি ওঁর ভাইকে নিয়ে কিছু বলেছেন আপনাদের?'

'না, পরিষ্কার করে কিছু বলেননি। তবে ওঁর ভাইয়ের ব্যাপারে উনি যে আনহ্যাপি—এটা পরিষ্কার বোঝা যায়।'

'আচ্ছা। অলোকবাবুর ব্যবসাটা কি পৈতৃক না নিজের?'

'নিজের। একেবারে নিজের। উনি তো যাকে বলে—সেল্‌ফ-মেড ম্যান।'

'কিন্তু যে-কোনও একটা ব্যবসা চালু করতে গেলে টাকা লাগে, তা সে যত কমই হোক না কেন। সেই টাকাটা কিংবা সেই টাকার কিছু অংশ-উনি যদি বাবার কাছ থেকে পেয়ে থাকেন। তাই যদি হয়, তাহলে হয়তো ওঁর ব্যবসায় একটা অংশ ওঁর ভাই দাবি করতে পারে। না কি...।'

সুনন্দবাবুর কপালের দু-একটা ভাঁজ বোধহয় গালে গড়িয়ে এসে পড়েছিল। গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি যত দূর জানি, ব্যবসার ব্যাপারে উনি কারও কাছে হাত পাতেননি। কিছুকাল বড় চাকরি করেছিলেন, সেই টাকা; তারপর বিভিন্ন ফিনানসিয়াল ইনস্টিটিউশনের কাছ থেকে ধার নেওয়া। মোদ্দা কথা, সৎ ব্যবসায়ীরা ব্যবসা বাড়াবার জন্যে যে পথে যান, উনি সেই পথেই গিয়েছেন। অফিস অ্যাকাউন্টসের ব্যাপারটা তো আমি অনেকখানি জানি।'

'ভাইয়ের সঙ্গে অলোকবাবুর সম্পর্ক কেমন?'

'বোঝার উপায় নেই। ডক্টর মৈত্র দু-তিনবার অফিসে এসেছেন। বেশিক্ষণ থাকেননি, তবে উনি চলে যাওয়ার পরে অলোকবাবুকে কেমন যেন ইরিটেটেড দেখেছি। হালে কে বা কারা টেলিফোনে ওঁকে দু-তিনবার শাসিয়েছেও।'

'কী বলে শাসিয়েছে?'

'সে সব উনি কিছু বলেননি, তবে অপারেটরকে বলে দিয়েছেন—ভালভাবে জিজ্ঞাসাবাদ না করে অচেনা লোকের টেলিফোন ওঁকে যেন না দেওয়া হয়। উটকো টেলিফোনে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয় জানি, কিন্তু একই ধরনের টেলিফোন বারবার এলে? টেলিফোনে তো আমাকেও শাসানো হয়েছে।'

'আপনাকে কী বলেছে?'

'বলেছে, চাকরি ছেড়ে না দিলে আমি ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ব।'

'অলোকবাবুকে জানিয়েছেন?'

'না, ভেবেছিলাম আজকে জানাব।'

কৌশিক কোনও কথা না বলে দেওয়ালের ক্যালেণ্ডারের দি.ক চেয়ে ছিল। তবে ওর চোখের দিকে তাকলে যে কেউই বোধহয় বুঝতে পারত, ওর মন ক্যালেণ্ডারে নয়; অন্য কোথাও—।

কয়েক মুহূর্ত একই ভাবে থাকার পরে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'অলোকবাবু তো দানপত্র তৈরি করেছিলেন—বিষয়-ব্যবসা উনি কাকে কাকে দিতে চেয়েছিলেন—জানেন কিছু?'

'সঠিক জানি না, তবে যত দূর শুনেছি—দানপত্রে বড় একটা শেয়ার ছিল ওঁর ভাগ্নির। একটা অংশ ছিল ছোট বোনের। ব্যবসা চালাবার জন্যে একটা ট্রাস্টি বোর্ড বা ওই গোছের একটা কমিটি তৈরির কথাও লেখা হয়েছিল—।'

'দানপত্রে আর কারও নাম ছিল?'

'না, তেমন তো শুনিনি।'

কৌশিক একটু ইতস্তত করে বলল, 'অনেকে বিপদে পড়ে গোয়েন্দার কাছে আসে, সেটাই দস্তুর। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে ব্যাপারটা একেবারে উলটো ধরনের হয়েছে। আমি গোয়েন্দা হয়ে নিজেই এসেছি আপনার কাছে—তাও আবার কিছু না জেনে। এখন দেখছি সত্যিই আপনি কিছুটা বিপদের মধ্যে পড়েছেন। এবার আমার প্রশ্ন হল, সত্যিই কি আপনি আমার সাহায্য চান?'

একটু যেন ব্যাকুল হয়ে জবাব দিলেন সুনন্দবাবু, 'আলবত চাই। ঘটনাচক্রে আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এ সুযোগ আমি ছাড়তে চাই না কিছুতেই। আমার বারবার মনে হচ্ছে, বিরাট একটা বিপদের মুখে এসে পড়েছি আমি। আপনি তদন্ত শুরু করুন। আমার সাধ্য কম, আপনার পুরো ফিজ হয়তো দিতে পারব না—তবে যতটা পারি সম্মানদক্ষিণা—। আপনি কাজ শুরু করে দিন, প্লিজ—।'

গম্ভীর গলায় কৌশিক বলল, 'ঠিক আছে তদন্তের ভার আমি নিলাম। আপনি আপনার নাম-ঠিকানা—অফিস ও বাড়ির, কনট্যাক্ট ফোন নাম্বার; আপনাদের কোম্পানির মালিক অলোকবাবুর বাড়ির ঠিকানা—সব এই ডায়েরিটায় লিখে দিন।'

সুনন্দবাবু গোটা, গোটা করে করে সব লিখে দিলেন ডায়েরির পাতায়। ওই পাতাটায় একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'অলোকবাবুর সকালের রুটিন সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে আপনার? মানে অফিস যাওয়ার আগে উনি কী করেন না করেন।'

'সব জানি না, তবে এটা জানি, উনি খুব আর্লিরাইজার। ভোরে ওঠার পরে বাড়ির পাশের পার্কে ঘন্টাখানেক বেড়ান।'

'সন্ধে-রাত্তিরে ক্লাব ভিজিটের অভ্যেস আছে?'

'না, একেবারেই নয়। উনি খুব সাত্ত্বিক প্রকৃতিব, যেখানেই যান না কেন, কাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়েন। সিগারেট, মদ ছোঁন না। আগে টেনিস খেলতেন, বয়েস বেড়ে যাওয়ায় ছেড়ে দিয়েছেন এখন।'

'ঠিক আছে, আজ তাহলে এই পর্যন্তই থাক—। আমি আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব। আর, তেমন কোনও ডেভেলপমেন্ট থাকলে আপনি আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। আমার কার্ড তো আপনার কাছে আছে। আছে না?'

বুকপকেটে হাত দিয়ে সুনন্দবাবু বললেন, 'হ্যাঁ আছে। আজ তাহলে আমি চলি, নমস্কার।'

ভদ্রলোক সোজা বেরিয়ে গিয়ে বাঁ দিকের রাস্তাটা ধরতেই মুখার্জিবাবু চোখ বড়-বড় করে বললেন, 'তাজ্জব ব্যাপার! আপনি কী করে বুঝলেন যে, এই মানুষটা বিপদে পড়েছে।'

'স্রেফ আন্দাজে।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ সে তো জানিই—আপনার সব কিছু আন্দাজে। আন্দাজে চোর-ডাকাত-খুনি ধরেন। এই আন্দাজটা সম্পর্কে শুনি একটু।'

কৌশিক এবার একটু বিব্রত হল। 'না-না, এটা নেহাতই আন্দাজ। ভদ্রলোক বুথে ঢুকেছিলেন ফোন করার জন্যে। কিন্তু কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকার পরে বেরিয়ে এসেছিলেন। তার মানে যাকে ফোন করতে গিয়েছিলেন তাকে ফোন করা ঠিক হবে কি না—এই নিয়ে ওঁর মধ্যে একটা সংশয় তৈরি হয়েছিল। সংশয়টা বেশ বেয়াড়া ধরনের, কারণ বুথ থেকে বেরিয়ে কিছুটা যাওয়ার পরে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন আবার। মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ।'

'তারপর আবার বুথে ঢুকলেন, রিসিভার হাতে নিলেন কিন্তু ডায়াল করলেন না। কয়েক মুহূর্ত ওই ভাবে থাকার পরে বেরিয়ে এলেন আবার। আপনি তাই দেখে বলেছিলেন. ভদ্রলোকের মাথায় ছিট আছে নির্ঘাত।'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ।'

'একটু বাদে আবার ঢুকলেন বুথে। পর-পর দু-তিনবার ডায়াল করলেন—।'

'কিন্তু লাইন পেলেন না।'

'লাইন পাবেন কী করে? পাঁচটা ডিজিট ঘোরালে কেউ লাইন পায় না।'

'তাই নাকি! আপনি শুনেছিলেন?'

'ঠিক শুনব বলে শুনিনি, তবে ব্যাপারটা নজরে পড়ে গিয়েছিল।'

মুখার্জিবাবুর চোখ আর একটু বোধহয় বড় হয়ে উঠেছিল, উনি কী যেন বলতে গিয়ে কিছুই বলতে পারলেন না।

কৌশিক বলল, 'বুঝতে পারলাম ভদ্রলোক সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারেননি। ফোন করা ঠিক হবে কি না তখনও ভেবে যাচ্ছেন।'

'কিন্তু ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন এটা কী করে বুঝলেন?'

'চোখমুখ দেখে। রাত্তিরে না ঘুমিয়ে দুশ্চিন্তা করেছেন—এটা ওঁর চোখমুখ একটু খুঁটিয়ে দেখলে যে কেউ বুঝতে পারত। তারপর টেলিফোন করতে এসে ওইরকম দোনামনা

করা—। বুঝলাম বিপদের চেহারাটা পরিষ্কার নয়। সঙ্কট আর সংশয় দুটোই আছে একসঙ্গে।'

মুখার্জিবাবুর বড় চোখ এবার ছোট হল। ছোট এবং ধারালো। জেরা করার ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু আপনি কী করে বুঝলেন যে সুনন্দবাবু যাকে ফোন করতে গিয়েছিলেন সেই মানুষটি ওঁর খুব চেনাজানা এবং তাকে উনি খুব মান্যগণ্য করেন?'

'যিনি খুব চেনাজানা তাঁর ফোন-নাম্বারটা মনে থাকা স্বাভাবিক। সুনন্দবাবু টকাটক টেলিফোনের ডায়াল ঘুরিয়ে গেছেন, অথচ ফোন-নাম্বার লেখা কোনও কাগজপত্তর ওঁর হাতে ছিল না। আর মান্যগণ্য করার কথা বলছেন, খুব মান্যগণ্য না করলে কেউ কি একটা টেলিফোন করতে এসে অত দোনামনা করে?'

মুখার্জিবাবু আর একবার বাহবা জানাতে যাচ্ছিলেন গোয়েন্দাকে, কিন্তু তার আগেই গোয়েন্দা একটু চিন্তিত মুখে বলল, 'সুনন্দবাবু কিছু-কিছু কথা গোপন করে গেলেন আমার কাছে। কেন? কেন করলেন এটা?'

'গোপন! কী করে বুঝলেন?'

'শেষের দিকে যখন কথা বলছিলেন তখন বুকের ওপর দুটো হাত আড়াআড়ি করে রেখেছিলেন। কিছু গোপন করার সময় বা অতিরিক্ত ডিফেন্স নেওয়ার সময় আমাদের হাতের ভঙ্গি বেশির ভাগ সময় ওইরকম হয়ে ওঠে।'

কথাটায় একটু বুঝি খটকা লেগেছিল মুখার্জিবাবুর। উনি খুব মৃদু গলায় বললেন, 'তাই?'

কৌশিক সামান্য হেসে বলল, 'শরীরের ভাষা নিয়ে যাঁরা চর্চা করে থাকেন, তাঁরা তো এইরকমই বলে থাকেন। সুনন্দবাবুর হাত দুটো যখন খোলা ছিল, শরীরের দুপাশে স্বাভাবিক ভাবে ঝুলছিল, তখন উনি সত্যি কথাই বলছিলেন। খোলা হাত যখন তালু-ওলটানো অবস্থায় সামান্য ওপর দিয়ে উঠে আসে তখন বুঝতে হবে মানুষটি অকপটে তার মনের কথা বলছে। অল্পবয়সীদের মধ্যে এই ভঙ্গিটি খুব বেশি দেখতে পাবেন যখন তারা মিথ্যে কথা বলে। লক্ষ করে দেখবেন, বেশির ভাগ সময় তাদের হাত পেছনদিকে লুকনো থাকে। সামনে থাকলে হাতদুটো ঢুকে যায় পকেটের মধ্যে। ওদিকে আবার স্যুটপরা লোকরা খুব খুশি হলে কোটের দুটো বোতাম খুলে দেয়।'

মুখার্জিবাবুর সব সংশয় এখনও বুঝি দূর হয়নি। কয়েক মুহূর্ত থমকে থাকার পরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু এতসব আবিষ্কার করল কে?'

'কে আবার করবে—মানুষ। মানুষের শরীরের ভাষা মানুষরাই পড়তে শিখেছে। ডারউইন বলছেন, পশুদের মধ্যেও এই ধরনের স্বভাব দেখা যায়। চারপেয়ে কোনও প্রাণী যখন হিংস্র কোনও জন্তুর কাছে চার পা তুলে গড়াগড়ি খায়, তখন সেই হিংস্র জন্তুটি তাকে আক্রমণ করে না।'

'বলেন কী? এরকম হয়?'

'হয় বলেই তো ডারউইন এ-কথা বলেছেন । হালের এক সাইকোলজিস্ট আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে মারাত্মক একটা পরীক্ষা করেছেন। একটা বুনো নেকড়ের সামনে তিনি চিত হয়ে শুয়ে হাত-পা ওপরে তুলে গড়াগড়ি খেয়েছেন।'

'নেকড়েটা কামড়ায়নি?'

'না, শুধু গলায় দাঁত ঠেকিয়েছিল। তবে কামড়াবার জন্যে নয়, আদর করার জন্যে।'

মুখার্জিবাবু দু'হাত সামান্য ওপরে তুলে মুঠো খুলে তালু ছড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'শরীরের এইসব ভাষা তো গোয়েন্দাগিরিতে লাগার কথা জন্মেও শুনিনি। শুনুন, একটা কথা আপনাকে বলি, ভাষাটাষা যতখুশি আপনি ব্যবহার করুন আপত্তি নেই; কিন্তু তদন্তে বেরোলে ছোট পিস্তলটা সঙ্গে নিতে ভুলবেন না।'

গোয়েন্দা রহস্যপূর্ণ ভঙ্গিতে একটু হেসে নিয়ে বলল, 'আপনার হাতের ভঙ্গি দেখে পরিষ্কার বুঝতে পারলাম—এ পরামর্শটা সত্যিই আপনি আমাকে আপনার মন থেকে দিয়েছেন।'

তিন

সবে আলো ফুটেছে আকাশে। বাতাসে অল্প শীত। গায়ে হাতকাটা একটা সোয়েটার বা পাতলা একটা চাদর থাকলে এই শীতটা বেশ উপভোগ করা যায়। ভোরের আলো ফুটলে সবচেয়ে বেশি খুশি হয় বুঝি পাখিরা। প্রতিটি গাছের মাথায় কিচিরমিচির। কিছু-কিছু পাখি তীরের মতো ছিটকে যাচ্ছিল আকাশে। ভোরের চমৎকার এই দৃশ্যটি কৌশিক কিন্তু দেখেও দেখছিল না। ওর ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল একটা পার্কের পাশে।

ট্যাক্সি ছেড়ে চারদিকটা বুঝি একবার জরিপ করে নিল গোয়েন্দা, তারপর লম্বা পায়ে ঢুকে পড়ল পার্কের মধ্যে। মাঝারি মাপের পার্ক। ধারে একফালি রাস্তা, এই রাস্তাটিই গোল হয়ে ঘুরে গেছে চারদিকে। দেখলেই বোঝা যায় এ পার্কটার তেমন কোনও যত্নআত্তি হয় না। খোলা মাঠে ঘাস বেড়ে উঠেছে নিজের খেয়ালে। গাছগুলোর বেশ বয়েস হয়েছে, ইচ্ছেমতো ডালপালা ছড়িয়ে সব গাছ উঠে গেছে আকাশে। পার্কের চারদিকে এককালে রেলিং ছিল, সরু পথের ধারে মাঝেমধ্যে কাঠের বেঞ্চি পাতা ছিল। সে সবের কিছু চিহ্ন পড়ে আছে এখন, বাদবাকি হাওয়া।

স্বাস্থ্যান্বেষী কিছু লোকজন জুটে গিয়েছিল পার্কে। কেউ ছুটছে, কেউ হাঁটছে, কেউ বা যোগাসন করছে। সুন্দরভাবে বেঁচে থাকতে গেলে যে সুন্দর স্বাস্থ্য দরকার—এই তথ্যটি এদের প্রত্যেকেই নিশ্চয় খুব ভালভাবে জানে। কৌশিক পার্কে চক্কর দিতে লাগল, কিন্তু ওর চোখ ঘুরছিল এই সব মানুষের ওপর। বিশেষ একজনকে ধরার জন্যেই কাকভোরে এখানে ও হানা দিয়েছে।

পার্কে একটা চক্কর শেষ হওয়ার মুখে কৌশিক যাঁর খোঁজে এসেছিল, পেয়ে গেল তাঁকে। ওই তো ভদ্রলোক। পাতলা, লম্বা চেহারা। দেখে বোঝার উপায় নেই যে ওঁর বয়েস সত্তর—বাহাত্তর। একটু ঝুঁকে পড়ে পেছনে হাত রেখে ভদ্রলোক হাঁটছিলেন। খুব খুঁটিয়ে ওঁকে দেখতে লাগল কৌশিক। ভদ্রলোকের কাছে কৌশিক একেবারেই অচেনা, সুতরাং খুঁটিয়ে দেখার কাজে অসুবিধে নেই। পার্কে মানুষজনের সংখ্যা খুব একটা কম নয়, ওদের মধ্যে মিশে গিয়ে কৌশিক এই ভদ্রলোকের আগাপাশতলা প্রায় মুখস্থ করে ফেলল। কখনও সামনে, কখনও পেছনে, কখনও বা পাশে। ভোরের লালচে আলো গাঢ় হলুদ হয়ে উঠছিল আস্তে আস্তে।

পার্কে তিন নম্বর চক্কর শেষ করার মুখে কৌশিক হঠাৎ সামনের দিক থেকে এগিয়ে এসে ভদ্রলোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে পড়ে বলল, 'এক্সকিউজ মি, আপনি কি মিস্টার অলোক মৈত্র?'

প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে ভদ্রলোক কৌশিকের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার দেখে নিলেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু আপনাকে তো ঠিক—।'

লাজুক মুখে কৌশিক বলল, 'না-না, আমাকে আপনার চেনার কথা নয়—। এই সংখ্যায় ইণ্ডিয়া নাউ তে আপনাকে নিয়ে একটা লেখা বেরিয়েছে—ওটা আমার খুব ভাল লেগেছে। লেখার সঙ্গে ছবি বেরিয়েছে আপনার, ওটা দেখেই চিনে ফেললাম আপনাকে। আপনার নামের সঙ্গে আমি অবশ্য অনেকদিন ধরেই পরিচিত।'

ভদ্রলোকের গম্ভীর মুখে খুব চাপা একটা ঝকঝকে ভাব এক মুহূর্তের জন্যে ফুটে উঠেই মিলিয়ে গিয়েছিল। 'আপনি কি হর্টিকালচারে ইন্টারেস্টেড?'

'ইনটারেস্টেড বলতে যা বোঝায় তা ঠিক নই, তবে ওই ব্যাপারে আপনার বক্তব্য আমার কাছে খুব কনভিনসিং ঠেকেছে।'

'কীরকম?'

'ওই যে আপনি বলেছেন, আমাদের হর্টিকালচার প্রোডিউসের ওপর জোর দেওয়া দরকার। দরকার আরও বেশি প্যাকেজিং হাউসের। তারপর ওই যে বলেছেন, এয়ারপোর্টে ট্রানজিট কুলিং ফেসিলিটিজ আরও বাড়ানো দরকার—। এগুলো করলে দেশের উন্নতি হবে, বিদেশি মুদ্রার রোজগার বাড়বে, ইত্যাদি ইত্যাদি।'

খুশি হওয়া এবং তারিফ করার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল মৈত্রের চোখেমুখে। উনি ভ্রূ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করেন আপনি?'

'তেমন কিছু না, এই একটুআধটু—।'

'একটুআধটু কী?'

'গোয়েন্দাগিরি।'

'মৈত্রের চোখমুখ চকচকে হয়ে উঠেছিল। 'বাহ্! এটা কি আপনি পেশা হিসেবে নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, পেশাই বলতে পারেন একরকম।'

মৈত্রের গলার স্বর এখন আগের তুলনায় সহজ হয়ে উঠেছিল। সহজ ভঙ্গিতেই বললেন, 'আনকমন পেশা। তবে আমাদের দেশেও কেউ-কেউ এখন এই পেশাতে আসছেন। ভাল। তা ছাড়া এই পেশায় তো আবার সত্য প্রতিষ্ঠার একটা ব্যাপার আছে। অপরাধী ধরা মানে তো সমাজের কল্যাণ। তা, এ জন্যে তো আপনাদের খুব মাথা খাটাতে হয়, না?'

লাজুক মুখে আপত্তি তোলার গলায় কৌশিক বলল, 'মাথা তো সবাইকেই খাটাতে হয়—এক-এক ব্যাপারে এক-একজন মাথা খাটায়।'

'না-না, আমি সে কথা বলছি না। আপনাদের সব কিছু দেখার একটা বাড়তি চোখ থাকে। যেটা আমাদের চোখ এড়িয়ে যায় সেটা আপনারা ঠিক দেখে ফেলেন।'

'সেটা কিন্তু কোনও অলৌকিক ব্যাপার নয়। বাড়তি কিছু দেখা বা বোঝার জন্যে গোয়েন্দাদের কিছু-কিছু বিষয় চর্চা করতে হয়। তার ফলে কাউকে একবার চোখের দেখা দেখেই একজন গোয়েন্দা অনেক কিছু আঁচ করে ফেলতে পারে।'

কথাটা শুনে মৃদু একটা ঝিলিক খেয়ে গিয়েছিল মৈত্রের চোখে। 'বেশ, আমাকে তো দেখলেন। দেখে কিছু আঁচ করতে পারছেন কি?'

'কিছুটা মনে হয় পেরেছি।'

'কীরকম?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে গোয়েন্দা বলল, 'আজ আপনার বেড়াতে একেবারেই ভাল লাগছে না। নেহাতই অভ্যাসবশে এসেছেন। মাথার মধ্যে একগাদা দুর্ভাবনা। রাত্রে মনে হয় ভালভাবে ঘুমোতেও পারেননি। কী ভাবে কী করা যায় ভাবতে ভাবতে মাঝরাত্তিরে কিছু লেখালেখিও করেছিলেন। কিন্তু ওই যে, যাকে বলে অঙ্ক না মেলা—সেই দশা হয়েছে আপনার। দুশ্চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার পথ খুঁজে পাচ্ছেন না।'

মৈত্র অবাক চোখে গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অদ্ভুত ব্যাপার! সব দেখছি অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়ে দিয়েছেন! আপনি গোয়েন্দা না জ্যোতিষী?'

লাজুক মুখে গোয়েন্দা বলল, 'আজ্ঞে গোয়েন্দাই—নিখাদ গোয়েন্দা।'

আশেপাশে কেউ কোথাও ছিল না, তবু গোয়েন্দাকে সরু ওই পথের ধারে টেনে এনে মৈত্র জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করে মেলালেন বলুন তো? অবশ্য সিক্রেট বলার ব্যাপারে আপনার যদি কোনও আপত্তি না থাকে।'

'না-না, আপত্তির কিছু নেই, আমি যেটুকু যা বলেছি তা প্রধানত আপনার শরীরের ভাষা পড়ে।'

'শরীরের ভাষা!'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই। আমি তখন থেকে দেখছি আপনি একটু ঝুঁকে পড়ে হাঁটছেন। মাথা নীচের দিকে ঝোঁকানো। হাতদুটো পেছনে, একটা হাতের মুঠোয় আর একটা হাত। হাঁটার গতি অস্বাভাবিক রকমের ধীর। মাঝেমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়ে পায়ের সামনের ইঁটের টুকরোয়

শট মারছিলেন। মানুষ যখন খুব দুর্ভাবনার মধ্যে থাকে তখন শরীরে ওই বিশেষ ধরনের ভঙ্গি বা প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।'

'আর কিছু?'

'আপনি সোজা পথে খুব একটা হাঁটতে পারছিলেন না, প্রায়ই বাঁকা পথে মাঠের মধ্যে নেমে যাচ্ছিলেন। সেটা দেখে মনে হচ্ছিল আপনার সমস্যাটা বেশ ঘোরালো।'

অলোক মৈত্রের কপালে কয়েকটা রেখা ফুটে উঠেছিল। কপালের ওই চামড়ার টানে খাড়া নাক বোধহয় আর একটু খাড়া হয়ে উঠেছিল। একটু যেন কেটে-কেটে বললেন, 'জটিল সমস্যায় পড়া মানুষের শরীরের ভাষাটা জানা গেল, পরে মিলিয়ে দেখব কতটা খাটে। আচ্ছা, কেউ যদি অত্যন্ত সফল এবং সমস্যাহীন হয়—তার শরীরের ভাষাটা কেমন হবে? নাকি সাফল্যের কোনও ভাষা নেই?'

'কেন থাকবে না, নিশ্চয়ই আছে। একজন পরিতৃপ্ত, সফল ও কেউকেটা গোছের মানুষের চলার ভঙ্গি অনেকটা মুসোলিনির মতো। মুসোলিনি মুখ সামান্য ওপরের দিকে তুলে, হাতদুটোয় বেশ জোরালো দুলুনি এনে হাঁটত। পায়ের মধ্যে সামান্য আড়ষ্ট ভাব, তবে পা ফেলত কেমন যেন হিসেব কষে আর বেশ দাপটের সঙ্গে। হাঁটার ভঙ্গির মধ্যে লোকের সমীহ আদায় করার চেষ্টা থাকত।'

মৈত্রের কপালের ওই ভাঁজগুলো আর নেই। উনি বললেন, 'বেশ। কিন্তু আমি যে ওই অনেক রাত্তির পর্যন্ত হিসেবনিকেশ করেছি, সেটা আপনি কী করে ধরলেন?'

'খুব সহজে। আপনার ডান হাতের মাঝের আঙুলে ফাউন্টেন পেনের কালির দাগ ধরেছে। আপনি যথেষ্ট ধনী, আপনি ফাটা কলম ব্যবহার করবেন—এটা ভাবা যায়না। তা হলে কালি লাগল কী করে? নিশ্চয়ই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলেন। আপনি পোশাকআশাকে যথেষ্ট টিপটপ। ওই কালির দাগটা আপনার চোখ এড়িয়ে যাওয়ার কথা নয়। এড়ানো সম্ভব যদি লেখালেখির কাজ মাঝরাত্তির বা শেষরাত্তিরে হয়ে থাকে। পেনের নিবের কালি আঙুলে লাগল কী করে? হয়তো এমনই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন যে—।'

ওকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে অলোক মৈত্র বললেন, 'আমার বাড়ি পার্কের পাশে। আপনার যদি আপত্তি না থাকে, চলুন না চা খেতে-খেতে একটু গল্প করা যাক—।'

'না-না, আপত্তির কী আছে, চলুন।'

পার্কের ঠিক পাশের রাস্তার মুখেই অলোকবাবুর বাড়ি। সাবেক ধাঁচের বিশাল বাড়ি। গেট ঠেলে ভেতরে ঢোকার পরে বেশ খানিকটা খোলা জায়গা। একধারে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে লাল মারুতি আর সাদা অ্যাম্বাসাডর। এ পাশে একটা ডালিমগাছ, গাছে বেশ কয়েকটা ডালিম ধরে আছে। সামনের সাদা বাড়িটার ধাঁচ পুরনো হলে কী হবে, বেশ ঝকঝকে-তকতকে। চারদিক বেশ তারিফ করার ভঙ্গিতে দেখে নেওয়ার পরে কৌশিক বলল, 'আপনারা এখানকার খুব পুরনো বাসিন্দা, না?'

হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন অলোকবাবু, 'এবার অঙ্ক মিলল না গোয়েন্দা। আমি এখানে মাত্র পনেরো বছর হল এসেছি, তবে বাড়িটার বয়েস একশো বছর।'

বিশাল বসার ঘরটা কিন্তু একেবারে আধুনিক কেতায় সাজানো। দেওয়ালে তিনটি আসল যামিনী রায়, তবে সবার ওপরে একজন সৌম্যদর্শন গুরুদেবের ছবি।

বসার একটু বাদেই ডাক পড়েছিল খাবার ঘরে। কিন্তু ও-ঘরে ঢুকে খাবার-টেবিলটা দেখে আঁতকে উঠেছিল কৌশিক। 'এ কী! এ তো দেখছি খাবারের পাহাড়!'

সত্যিই পাহাড়। টেবিলে মস্ত-মস্ত কাচের প্লেটভর্তি একগাদা মিষ্টি। মধ্যিখানে রাখা একটা বাহারি ঝুড়িতে একগাদা আপেল, কলা আর আঙুর। একটু পরে খাবার এল কড়াইশুঁটির গরম কচুরি আর আলুরদম। মুখোমুখি দুটি চেয়ারে বসেছে অলোকবাবু আর কৌশিক। অলোকবাবু বললেন, 'নিন, শুরু করুন।'

একটুকরো কচুরি ভেঙে মুখে ফেলে কৌশিক বলল, 'বাহ্! দারুণ তো!'

অতিথি খুশি হলে গৃহস্বামীও খুশি হন। অলোকবাবু বললেন, 'খান, নিশ্চিন্তে খান, সব বাড়ির তৈরি।'

মোটাসোটা, ধুতি-ফতুয়া পরা যে মানুষটি খাবার পরিবেশন করছিল রাঁধুনি। জোর করে খাওয়ানোর ব্যাপারে মালিকের চাইতে তার উৎসাহ কিছু কম ছিল না। একগাদা খেতে হল কৌশিককে। অলোকবাবুর নিজের খাওয়া বলতে কিন্তু একটামাত্র কচুরি আর আলুরদমের ছোট্ট একটা আলু। ব্রেকফাস্ট শেষ হলে ওরা কফি হাতে ওদিকের সোফায় এসে বসল।

কফিতে একটা চুমুক দিয়ে উদাসীন ভঙ্গিতে অলোকবাবু বললেন, 'লালাবাবুর কথা মনে আছে আপনার?'

'কোন্ লালাবাবু?'

'সেই যে বিখ্যাত সেই লালাবাবু—। বিশাল ধনী লালাবাবু এক সন্ধেয় পাল্কি চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ তাঁর কানে এল—একটি বাচ্চা মেয়ে তার বাবাকে ঘুম থেকে তুলে দেওয়ার জন্যে চেঁচিয়ে বলছে, বাবা ওঠো, বেলা যায়। সন্ধের মুখে ওই বেলা যায় কথাটা কানে যেতেই চমকে উঠেছিলেন লালাবাবু। তাঁর মনে হয়েছিল—সত্যিই তো, তাঁরও তো বেলা যাওয়ার সময় হয়েছে। অথচ ঈশ্বরের ভজনা না করে বৃথা কাজে সময় নষ্ট করছেন! ব্যস, এ কথা মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি পাল্কিওয়ালাদের বললেন-পাল্কি নামাও। পাল্কি নামানোর পরে তিনিও নেমে পড়লেন। তারপর গায়ের সব দামি পোশাক-আশাক খুলে রেখে সংসারত্যাগ করলেন সেই মুহূর্তেই। কী বিরাট ত্যাগ বলুন তো? তা, ব্যাপারটা কী জানেন, লালাবাবু আজকের দিনে জন্মালে ঠিক এ-ভাবে সংসার ছাড়তে পারতেন না।'

'কেন?'

'কেননা এখন বিষয়আশয় মানেই নানা বেয়াড়া ধরনের ফাঁস। বিলিব্যবস্থা ঠিকমতো না করে নড়ার উপায় নেই। এই যে আমি পালাতে চেয়েছিলাম, পারলাম কই!'

'পালাতে ! কোথায় পালাতে চেয়েছিলেন আপনি?'

একটু বিষণ্ণ হাসি হেসে অলোকবাবু বললেন, 'সংসার থেকে। লালাবাবুর মতো গভীর অধ্যাত্মবোধ থেকে সংসার ত্যাগ নয়, যাকে বলে রিটায়ার করা। সারা জীবন ধরে সংসারের জোয়াল কাঁধে করে ঘুরেছি। এবার ইচ্ছে ছিল জোয়ালটা নামিয়ে রেখে বরাবরের জন্যে সরে পড়া। সরে পড়ার আগে একটিমাত্র কাজ ছিল—ব্যবসাপত্তর, বিষয়আশয় বিলিব্যবস্থা করা। কাগজপত্র সব তৈরি হয়ে গিয়েছিল, শুধু সইটইগুলো বাকি, এমন সময়——।'

'এমন সময় কী?'

'এমন সময় এমন কিছু-কিছু ঘটনা ঘটল যাতে সইসাবুদগুলো পিছিয়ে গেল।'

কৌশিকের মুখের মধ্যে একটা প্রশ্ন এসে গিয়েছিল, কিন্তু ও কিছু বলল না।

অলোকবাবু মুখ থেকে চশমাটা খুললেন। চশমায় এককুচিও ধুলো ছিল না, কিন্তু উনি পকেট থেকে একটা ভাঁজ-করা সাদা রুমাল বার করে ঘষে ঘষে কাচদুটো পরিষ্কার করতে শুরু করে দিলেন। ওঁর কপালে, ভুরুর পাশে, গালে বেশ কয়েকটা সুরু-সরু দাগ। মনে মনে কোথাও বুঝি উনি চলে গিয়েছিলেন, হঠাৎই সেখান থেকে ফিরে এসে সতর্ক চোখে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার কিছু সাহায্যের দরকার হতে পারে আমার। সব কিছু হঠাৎই কেমন যেন গোলমেলে হয়ে উঠছে। এই মুহূর্তে অবশ্য সব কথা আপনাকে আমি বলব না। কিছু-কিছু বলব। বিপদটা কী, সাহায্য ঠিক কী ধরনের হওয়া দরকার—সেসব উপস্থিত আপনাকে আন্দাজ করে নিতে হবে।'

অলোকবাবুর কথা শুনতে শুনতে কৌশিকের চৌকো চোয়াল একটু শক্ত হয়ে উঠেছিল। ও বলল, 'ঠিক আছে, আপনি আপনার মতো করেই বলুন।'

অলোকবাবু চশমাটা পরে নিয়েছিলেন, তারপর বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গিতে বললেন, 'আমার বিষয়আশয়, সম্পত্তি বলতে একটা চালু ব্যবসা, তিনটে বাড়ি, গোটাকয়েক গাড়ি আর কিছু ব্যাঙ্ক ব্যালান্স। সব কিছু যোগ করলে সম্পত্তির পরিমাণ খুব একটা বিরাপ দাঁড়ায় না। আমি একা মানুষ। নিজের বলতে এক বিধবা বোন, ভাগ্নি, ভাগনি-জামাই। এক ছোট ভাই আছে, পঁচিশ বছর বিদেশে; ওখানেই সেটেল্‌ড। আমাদের সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক রাখেনি। আমার ব্যবসায় কোনও ঝঞ্ঝাট নেই। দু-একজন আছে যারা খুবই বিশ্বস্ত। ওদের ওপর চাপিয়ে দিয়ে আমি যদি সরে যাই, ওরা দিব্যি ব্যবসাপত্তর চালিয়ে নিয়ে যেতে পারবে। আমি যখন সব কিছু বিলিব্যবস্থা করবার কথা ভাবছিলাম তখন এই ছিল অবস্থা। তা, এই অবস্থাটাকে আপনার কি জটিল বলে মনে হয়?'

'না, একেবারেই নয়।'

'আমারও তো তাই মনে হয়েছিল। আমি আমার ব্যবসার শেয়ারের খুব ছোট দুটো অংশ রেখেছিলাম আমার আর আমার কাশীবাসিনী বিধবা বোনের জন্যে। খাওয়া-পরা আর

বৃদ্ধবয়সের রোগের চিকিৎসার সংস্থানের জন্য। আমাদের মৃত্যুর পরে ওই শেয়ার চলে যাবে আমার ভাগ্নির কাছে। ভাগ্নিই ছিল সবচেয়ে বড় শেয়ারের অংশীদার। আমার কোম্পানির অতি-বিশ্বস্ত এক কর্মচারীকে কিছু শেয়ার দেওয়ার কথা ভেবেছিলাম। কিছু শেয়ার ধরা ছিল একটা সেবা প্রতিষ্ঠানের জন্য। ব্যবসা চালাবার জন্যে একটা ট্রাস্টির কথাও ভেবেছিলাম। কাগজপত্র সেই ভাবেই তৈরি করা হয়েছিল। কাজ বলতে শুধু সইটই করা—। এমন সময় বিদেশ থেকে আমার ছোটভাই এসে হাজির হল।'

'পঁচিশ বছর বাদে?'

'হ্যাঁ, পঁচিশ বছর। দীর্ঘ সময়, তবে সময়টাই বড় কথা নয়; ও এই সময়টা আমাদের সঙ্গে কোনওরকম সম্পর্ক রাখেনি। খবর পেয়েছিলাম, ওয়েওয়ার্ড গোছের হয়ে গেছে। প্রাপ্তবয়স্ক কেউ নিজের ইচ্ছেয় বখে যেতে চাইলে তো কারও কিছু করার থাকে না। আমরা অবশ্য গোড়ার দিকে হাল ছাড়িনি, তবে কোনও কাজ হয়নি তাতে। এতকাল বাদে হঠাৎ ওকে এখানে দেখে আমি তো চমকে উঠেছিলাম। খুব আনন্দও হয়েছিল, রক্তের সম্পর্ক বলে কথা। ও জন্মাবার কয়েক বছর বাদে বাবা-মা মারা যান। সুতরাং নিছক দাদা হিসেবে নয়, তাকে বড় করে তোলার জন্যে আমাকে অনেক বড় ভূমিকা নিতে হয়েছিল। সেই ভাই— অ্যাদ্দিন বাদে, তার ওপর ওর আবার কোনও খবরাখবর ছিল না, সুতরাং বুঝতেই পারছেন—।'

'আপনার ছোট ভাই কি বিদেশের পাট একেবারে তুলে দিয়ে বরাবরের জন্যে দেশে ফিরে এলেন?'

'না, একেবারেই নয়। তবে এখন থেকে প্রায়ই ওকে দেশে আসতে হবে। আসলে আমাদের দেশে ব্যবসাবাণিজ্যে এই যে লিবারেলাইজেশান পলিসিটা নেওয়া হয়েছে, তার সুবিধে নিচ্ছে ও। হালে ব্যবসায় নেমেছে বিদেশে। এখন সেই ব্যবসা দেশেও করতে চাইছে। দেশ-বিদেশ জুড়ে ব্যবসা। প্রচুর টাকাপয়সা প্রয়োজন। একা পেরে উঠবে না। জয়েন্ট ভেঞ্চারে আমাকে জড়াতে চেয়েছিল। আমি এক কথায় নাকচ করে দিয়েছি। বলেছি, এই ব্যবসা থেকে সরে যেতে চাইছি, নতুন ব্যবসায় জড়াবার কোনও প্রশ্নই ওঠে না।'

'আপনি যে আর আপনার ব্যবসার কাজকর্ম দেখবেন না, আপনার ভাইকে জানিয়েছেন?'

'হ্যাঁ, সবই জানিয়েছি।'

'কী বলল শুনে?'

'অবাক হয়ে গেল। বিশ্বাসই করতে চাইছিল না। আসলে এমন ঘটনা তো বড় একটা ঘটে না। ওকেও একটা শেয়ার দিতে চাই, কিন্তু মনে হয়, ও তাতে খুশি নয়—।'

'কেন?'

'খুশি না হওয়ার অনেক কারণ। প্রথম কারণ, ওর শেয়ারটা সবচেয়ে বড় শেয়ার হচ্ছে না। ওর অনেক ওপরে আছে আমাদের ভাগ্নি। দ্বিতীয়ত, কোনও কর্মচারীকে আমি ব্যবসার

কোনও অংশ দিই—এটা ও চায় না। ও থাকতে ব্যবসার দেখাশোনা ট্রাস্টি করবে, এতেও ওর আপত্তি।'

'আচ্ছা, আপনার ব্যবসা, বিষয়ের ওপর আপনার ভাইয়ের কি কোনও রাইট নেই? আমি উত্তরাধিকারের কথা বলছি।'

'না, একেবারেই নেই। আমার বাবা আমাদের জন্যে কিছুই রেখে যাননি। আমি যা-কিছু করেছি, পুরোটাই আমার নিজের উপার্জন থেকে।'

একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে কৌশিক বলল, 'একটা প্রশ্ন করব?'

'করতে পারেন, কিন্তু আপনার সব প্রশ্নের উত্তর আমি এখন দেব না।'

'বেশ। প্রশ্নটা হল, আপনার ভাইয়ের ওপর কি আপনার আস্থা আছে?'

অলোকবাবু চোখ থেকে চশমা খুললেন আবার, তারপর হাতের উলটো পিঠ দিয়ে দু-চোখ কচলে নিয়ে বললেন, 'না, খুব একটা নেই। ওর সম্পর্কে এমন কিছু-কিছু রিপোর্ট পেয়েছি যেগুলো ভাল নয়। তারপর কয়েকদিন আগে একটা উড়ো চিঠি পেয়েছি, যাতে বলা হয়েছে ও নাকি কী সব চোরাচালানের সঙ্গে জড়িত। এটা আমি অবশ্য একেবারেই বিশ্বাস করি না।'

'উড়ো চিঠি? চিঠিটা আছে কাছাকাছি।'

'হ্যাঁ, এই তো এখানেই আছে।' আলোকবাবু হাত বাড়িয়ে বুককেসের নীচের ড্রয়ার খুলে একটা খাম এগিয়ে দিলেন কৌশিকের দিকে।

গম্ভীর মুখে খাম খুলে চিঠিটা পড়ল কৌশিক, তারপর বলল, 'চিঠিটা কি আমি দু-একদিন রাখতে পারি আমার কাছে?'

'হ্যাঁ, স্বচ্ছন্দে। আমি যখন এ-ব্যাপারে আপনার কিছু সাহায্য নেব ঠিক করেছি তখন আপনার কিছু কথা তো আমাকে শুনতেই হবে।'

'আর একটা কথা, আপনার কোম্পানির একজন কর্মচারীকে আপনি কিছু শেয়ার দিতে চেয়েছিলেন, তিনি কি আপনাদের ওখানে অনেকদিন ধরে আছেন?'

'এ ব্যাপারে এখন কিছু বলব না আপনাকে।'

মৃদু হাসল কৌশিক। 'আমার কাজ তো গোয়েন্দার কাজ। আমাকে আপনি তদন্তের ভার দিচ্ছেন—অথচ সব কিছু খুলে বলবেন না; তাহলে আমি কাজ চালাব কী করে?'

কৌশিকের হাসির জবাবে অলোকবাবুও হাসলেন, তারপর হাসতে হাসতে বললেন, 'সময় হলেই জানাব। যতক্ষণ না জানাচ্ছি ততক্ষণ আপনি ওই শরীরের ভাষার সাহায্যে আপনার লাইন অব অ্যাকশন ঠিক করে নিন।' কথাটা শেষ করেই ঘড়ির দিকে তাকালেন অলোকবাবু।

সহজ ইঙ্গিতের অর্থ খুব সহজেই ধরতে পারল গোয়েন্দা। বলল, 'এবার উঠি তা হলে। আপনিও তো বেরোবেন এবার। আপনার একটা কার্ড দিন, কিছু জানার দরকার হলে

ফোনটোন করব। আর দেখা করার একটা জায়গার কথা তো জানাই রইল। তেমন কোনও দরকার পড়লে ভোরবেলায় পার্কে চলে আসব আবার।'

আগের হাসির রেশটা এখনও অলোকবাবুর ঠোঁটে লেগে আছে। বললেন, 'কলকাতায় থাকলে পার্কে দেখা হতে পারে। না থাকলে নয়। এখন তো মাসের বেশির ভাগ দিন আমাকে কলকাতার বাইরে থাকতে হচ্ছে।'

অলোকবাবু গোলাপি রঙের সুন্দর একটা কৌটো থেকে একটা ভিজিটিং কার্ড বার করে কৌশিকের হাতে দিলেন। কার্ডে একবার চোখ বুলিয়ে কার্ডটা পকেটে রেখে দিল গোয়েন্দা।

'ঠিক আছে, চলি তাহলে।' বিদায় নিয়ে সাজানো-গোছানো বাড়িটা থেকে বেরিয়ে এল কৌশিক। ডালিমগাছে দুটো বুলবুলি আর একটা কাঠবেড়ালি। সকালের রোদ ইতিমধ্যে আর একটু ঝকঝকে হয়ে উঠেছে।

গেট খুলে রাস্তায় বেরিয়ে এল গোয়েন্দা। একটুখানি হাঁটিতে না হাঁটতেই ওর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলল, কেউ একজন পিছু নিয়েছে ওর। ঠিক তাই, পেছন ফিরতেই দেখল কালো চশমা-পরা একটা লোক। লোকটা হঠাৎই হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিয়ে পাশের গলির মধ্যে ঢুকে গেল।

চার

কৌশিক বেশ কয়েকদিন বারণ করেছে, কিন্তু মুখার্জিবাবু শোনেননি; প্রতিবারই গাঁইগুঁই করে বলছেন : আপনি এত ছোটখাটো ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবেন না তো! আপনারা মাথা দামি মাথা, শুধু বড়-বড় বিষয় নিয়ে ভাববেন। তা ছাড়া ধূপধুনো জিনিসটা খুব ভালো। ভাল না হলে আমাদের শাস্তরে ঘরে ঘরে এ সব জ্বালাবার বিধান দিত না। এ ঘরটা নামকরা একজন ডিটেকটিভের চেম্বার। ধূপ জ্বালালেই দোকান-দোকান হয়ে যাবে কেন! ধূপের গন্ধে মনে বেশ একটা পবিত্র ভাব জন্মায়। পবিত্র ভাব জন্মালেই দেখবেন কাজে চট করে আপনার মন বসে গেছে। আর, আপনার মন বসার মানেই হল, যে-কোনও রহস্যের জট পটাপট খুলে যাওয়া।

এই ধরনের বক্তৃতার জবাবে কৌশিক শেষের দিকে আর কিছু বলত না। সুতরাং প্রতিদিন চেম্বার খুলেই মুখার্জিবাবু মস্ত বড় একটা ধূপ জ্বালাতেন, তারপর পুরনো ক্যালেণ্ডারের এক দেবীর সামনে সেটা দুবার নাচিয়ে বিড়বিড় করে প্রার্থনা সেরে নিতেন।

কৌশিক চেম্বারে আসার আধ-ঘণ্টাটাক আগে মুখার্জিবাবু আসেন। আজ কৌশিক যখন ওর চেম্বারে এসে ঢুকল তখন মোটাসোটা ধূপকাঠিটা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। বাতাস ভারী ধূপের গন্ধে। পকেট থেকে রুমাল বার করে মুখচোখ মুছে নিজের চেয়ারে গিয়ে বসল কৌশিক। অন্যান্য দিন ও ঘরে ঢুকেই দু-চারটে কথা বলে মুখার্জিবাবুর সঙ্গে, কিন্তু আজ আর কিছু বলল না। চেয়ারটাকে একটু তেরছা করে নিয়ে পায়ের ওপর পা তুলে বসে থাকল চুপ করে।

কৌশিককে কিছুক্ষণ খুঁটিয়ে দেখে নেওয়ার পরে মুখার্জিবাবু বললেন, 'রাত্তিরে একেবারেই ঘুম হয়নি তো? হবেই বা কী করে—মাথার মধ্যে তো এখন নতুন একটা রহস্য সমাধানের চিন্তা এসে ঢুকেছে। তবে মানুষের শরীর তো—ঘুমিয়ে পড়েছিলেন ভোরের দিকে। সেই ঘুম ভেঙেছে সকাল নটায়। তখন লাফালাফি, ছোটাছুটি করে চেম্বারে। তাই না?'

কৌশিক চোখেমুখে বেশ একটা অবাক ভাব ফুটিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আপনি এ সব জানলেন কী করে?'

খুশিতে ঝলমল করে উঠেছিল মুখার্জিবাবুর গোটা মুখটা। বাহাদুরির সুর গলায় ফুটিয়ে বললেন, 'হু-হুঁব্-বাবা, আমি গোয়েন্দার সহকারী, গোয়েন্দাগিরি তো আমাকেও অল্পবিস্তর জানতে হবে। শরীরের ভাষা আমিও কিছুটা পড়তে শিখে গিয়েছি।'

চোখ বড়-বড় করে কৌশিক বলল, 'অবাক কাণ্ড। শরীরের ভাষা এক ধরনের বিজ্ঞান বলতে পারেন। এটা তো চর্চার বিষয়। আপনি এত তাড়াতাড়ি কী করে শিখে ফেললেন?'

চোখ চকচক করছিল মুখার্জিবাবুর, গোঁফ থাকলে উনি নির্ঘাত গোঁফে তা দিতেন। সফল মানুষের হাসি হেসে বললেন, 'আপনার চোখমুখের চেহারা, বসার ভঙ্গি, হাতের মুদ্রা—এসব রীতিমত স্টাডি করতে হয়েছে আমাকে। রেস্টুরেন্টে সেই যে প্রথম-পাঠ দিয়েছিলেন, তারপর থেকে টানা স্টাডি করে যাচ্ছি। যাক, সাধনায় তা হলে সিদ্ধি আসতে শুরু করেছে কিছুটা—কী?'

কৌশিক মৃদু হেসে ঘাড় কাত করল একপ্যাশে, আর ঠিক সেই সময়ই ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন সুনন্দবাবু। ভদ্রলোকের চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, ছোটখাটো একটা ঝড় বয়ে গেছে ওঁর ওপর দিয়ে।

ওঁর দিকে তাকাতেই ভদ্রলোক গড়গড় করে বলতে শুরু করলেন— 'আর বলবেন না, আমি ঠিক এই ধরনের একটা ভয়ই পাচ্ছিলাম। কাল বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল। ফিরে দেখি আমার ঘরদুটো লণ্ডভণ্ড হয়ে আছে। আলমারি খোলা। জামাকাপড়, দরকারি জিনিসপত্র মেঝেয় ছড়ানো। চোর ঢুকেছিল। বোধহয় ব্যালকনি দিয়ে। সকাল হতেই থানায় ছুটেছিলাম। কমপ্লেন লজ করলাম। পুলিস কেস লিখল—এ কেস অব বার্গলারি। কিন্তু আমার তো মনে হয় না, এটা নিছক একটা চুরির কেস।'

'কী, কী চুরি গেছে আপনার, হিসেব মিলিয়েছেন?' সামনের চেয়ারটায় বসার জন্যে ইঙ্গিত করে প্রশ্নটা করল কৌশিক।

চেয়ারে বসে পড়লেন সুনন্দবাবু। ওঁর কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ পড়েছিল। বললেন, 'চুরি নিশ্চয়ই কিছু গেছে। সব হিসেব তো আর এক্ষুনি-এক্ষুনি মেলানো সম্ভব নয়। তবে আরও অনেক-কিছু যেতে পারত। এই যেমন আলমারির ড্রয়ারে একটা খুব দামি রিস্টওয়াচ ছিল—। সেটা যেমন ছিল ঠিক তেমনি আছে। আমি আংটিটাংটি পরি না—ওই রিস্টওয়াচের পাশে দুটো সোনার আংটি ছিল—সে দুটোও চুরি যায়নি। একটা কভার-ফাইলের মধ্যে আমার

কিছু শেয়ার, মিউচুয়াল ফাণ্ডের কাগজপত্তর ছিল—। সে ফাইল খোলা হয়েছিল, কিন্তু ভেতরের কাগজপত্তর কিচ্ছু খোয়া যায়নি। অথচ..... কিছুই আমার মাথায় ঢুকছে না।'

'কেন, আমার তো মনে হয় ব্যাপারটা আপনি ঠিকই ধরেছেন।'

কৌশিকের এই ধরনের একটা খাপছাড়া কথা শুনে ভদ্রলোকের মুখ থমথমে হয়ে উঠেছিল। একটা ঢোক গিলে বললেন, 'মানে!'

'মানে তো আপনার কাছে পরিষ্কার। এই যে আপনি বলছিলেন না—এটা নিছক কোনও চুরির ঘটনা নয়, ঠিক তাই। চুরির ব্যাপার হলে আপনার আংটি, ঘড়ি—অন্যান্য দামি জিনিসপত্তর চুরি যেত।'

আর একটা ঢোক গিললেন সুনন্দবাবু। 'ঠিক। কিন্তু চোর তা হলে আমার ফ্ল্যাটে ওইভাবে হানা দিয়েছিল কেন?'

'হানা দিয়েছিল এমন কিছুর আশায় যা আপনার কাছে নেই। কিংবা আছে, কিন্তু সেটা চুরির ভয়ে ওই ফ্ল্যাটে রাখেননি।'

মুহূর্তের মধ্যে দু-তিন রকমের রং খেলে গিয়েছিল ভদ্রলোকের মুখে। 'কী বলছেন আপনি! ওইরকম কোনও জিনিসপত্র নেই আমার কাছে।'

কৌশিক হাত উলটে বলল, 'তা হলে এমনও হতে পারে, চোর হয়তো ভুল-খবর পেয়েছে। তবে এটা ঠিক, চোর আপনার চলাফেরা, গতিবিধির ওপর নজর রাখছে পুরো মাত্রায়। কাল আপনার বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল, আর ঠিক কালকেই হানা দিয়েছে আপনার বাড়িতে।'

সঙ্গে সঙ্গে সায় দিয়ে উঠলেন ভদ্রলোক, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ ঠিক বলেছেন, এটা কিন্তু আমার মাথাতেও এসেছে। কাল দেরি হল, আর ঠিক কালকেই—।'

কাগজ কাটার প্লাস্টিকের ছুরিটা হাতে তুলে নিয়ে কৌশিক বলল, 'কাল রাত্তিরে কি দূরে কোথাও নেমন্তন্ন-টেমন্তন্ন ছিল আপনার?'

রুমাল দিয়ে ঘাড়-গলা মুছে নিয়ে একটু বিব্রত মুখে সুনন্দবাবু বললেন, 'না-না, নেমন্তন্ন ছিল না, তবে ওই ধরনেরই একটা ব্যাপার ঘটেছিল——। অদ্ভুত ধরনের ঘটনা বলা যায়। অদ্ভুত ধরনের অভিজ্ঞতা। আজকাল প্রোডাক্ট লঞ্চিং, ক্যাম্পেন ইত্যাদি নিয়ে এত সব ব্যাপার বেরিয়েছে—অদ্ভুত, আবার কিছুটা মজারও। কাল অফিস থেকে বেরোতে বেরোতে সামান্য দেরি হয়ে গিয়েছিল। কাজের চাপ ছিল, ওদিকে আবার বিকেল থেকেই বিচ্ছিরি বৃষ্টি নেমেছিল। আপনাদের এখানে হয়নি?'

কৌশিক মাথা কাত করল একপাশে।

সুনন্দবাবু আগের কথার খেই ধরলেন আবার। 'অফিস থেকে বেরিয়েছি সাড়ে-সাতটা নাগাদ, তখনও টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। টেম্পারেচার ধপ্ করে পড়ে গিয়েছিল অনেকটা। বৃষ্টি, তার ওপর আবার ঠাণ্ডা হাওয়া ছেড়েছিল বেশ!'

'আপনি একা ছিলেন?'

'না, সঙ্গে মিলন ছিল। আমাদের অপিসের মিলনের কথা—আপনাকে একটু-আধটু বলেছি বোধহয়?'

'হ্যাঁ।'

'তা এগোচ্ছিলাম বাস স্টপের দিকে। রাস্তাঘাট প্রায় ফাঁকা হয়ে গিয়েছে। এমন সময় পানের দোকানের শেড থেকে একটা লোক বেরিয়ে এসে বলল—এক্সকিউজ মি—। আমি প্রথমে লোকটাকে পিম্প্ ভেবেছিলাম। আমাদের ওখানে সন্ধের পরে এই সব লোকের উৎপাত এখন খুব বেড়ে গেছে। লোকটাকে ভাগিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম, তার আগেই ও বলল—আমি অমুক কোম্পানির রিপ্রেজেনটেটিভ, আমরা একটা প্রোডাক্ট লঞ্চ করছি, এ ব্যাপারে আপনারা যদি একটু হেল্প করেন। কেউ ওভাবে সাহায্য চাইলে বুঝলেন কিনা—। তা, জিজ্ঞেস করলাম, কী ধরনের হেল্প? লোকটা তখন বলল, একটা কোম্পানি একটা হাই কোয়ালিটি লিকার বাজারে ছাড়তে যাচ্ছে শিগ্‌গির, তা সেই ব্যাপারে ওরা এখন কনজিউমারদের ওপিনিয়ন কালেক্ট করছে। আমি ইতস্তত করছিলাম, তখন মিলনই ইনিশিয়েটিভ নিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথায়? লোকটা বলল, এই তো তিনখানা বাড়ি পরেই। ড্রিঙ্কস্ দেওয়ার পরে আমরা ডিনারও খাওয়াব। মিলন তখন আমাকে একটু টিপে দিয়ে লোকটাকে বলল, বেশ চলুন।'

'গেলেন?'

'হ্যাঁ। তিনখানা বাড়ি পরে পাঁচ নম্বর বাড়ি, ওই বাড়িটা বিভিন্ন পার্টির জন্য ভাড়া দেওয়া হয়। অচেনা, উটকো বাড়িতে ঢোকাতে চাইলে রাজি হতাম না কিছুতেই। তার ওপর—।'

ভদ্রলোকের মুখে একটু যেন লজ্জার ছাপ। 'বৃষ্টি. ঠাণ্ডা—ভাবলাম ওই আবহাওয়ায় দু-তিনটে পাত্তর স্টিমুল্যান্ট হিসেবে খারাপ হবে না।'

'আপনি কি রেগুলারলি অ্যালকোহল খান?'

'না, নিয়মিত নয়; তবে মাঝেমধ্যে খাই।'

'বেশ, তারপর?'

'লোকটা পাঁচ নম্বর বাড়ির তিন তলায় নিয়ে গেল আমাদের। বেশ বড় একটা হলঘর, অনেক চেয়ার-টেবিল পাতা; তবে লোকজন বিশেষ নেই। তিনটে টেবিলে তিনজন ড্রিঙ্ক করছিল, তাদের মুখোমুখি বসে তিনজন লম্বা খাতায় কী সব যেন লিখছিল। ওই লোকটা আমাদের দুজনকে দুটো টেবিলে বসাল।'

'তারপর?'

'প্রথমদিকে মন্দ লাগছিল না, তারপরেই বেশ বিরক্তিকর হয়ে উঠেছিল গোটা ব্যাপারটা। নিজেকে কেমন যেন গিনিপিগ বলে মনে হচ্ছিল।'

'গিনিপিগ! কেন?'

'তা নয়তো কী। ড্রিংক্‌সের কোয়ালিটি বিচার করার পদ্ধতিটা তো অদ্ভুত। আমাদের বেশ আপ্যায়ন করে বসানো হল, ড্রিংক্‌স দেওয়া হল; তার পরেই দুটো লোক লম্বা দুটো খাতা নিয়ে বসল আমাদের সামনের চেয়ার দুটোয়। প্রথমে নামধাম, কী করি না করি ইত্যাদি লিখে নিল খাতায়। তারপর শুরু হয়ে গেল গিনিপিগের ওপর পরীক্ষানিরীক্ষা। ডিংক্‌সে একটা করে চুমুক দিচ্ছি, আর খেতে কেমন তা নিয়ে একগাদা খুঁটিনাটি প্রশ্ন। দু-তিন রকমের ড্রিংক্‌স। জিব যাতে নিখুঁতভাবে স্বাদ বুঝতে পারে তার জন্যে মাঝেমধ্যে ক্রিমক্র্যাকার বিস্কুট খাওয়াচ্ছিল। একটা সময় এমন বিরক্ত বোধ করছিলাম যে, ইচ্ছে করছিল সব কিছু ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে উঠে পড়ি, কিন্তু—।'

'কিন্তু কী?'

'হঠাৎ লক্ষ করলাম—রাগ-বিরক্তি কেমন যেন ঝিমিয়ে পড়েছে। একটু ঝিমঝিম, ঘুম -ঘুম ভাব। ঠিক তক্ষুনি মিলন বলল—ওকে উঠতে হবে, ছেলের জন্যে ওষুধ কেনার কথা, ভুলে মেরে দিয়েছে একদম। কাছেই একটা ওষুধের দোকান আছে, সেখানে যদি পেয়ে যায়—ফিরে আসবে আবার।'

'ফিরে এসেছিল আপনার বন্ধু?'

'না।'

সুনন্দবাবুর সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনে কপালে কয়েকটা ভাঁজ পড়েছিল কৌশিকের। 'আপনি ওখানে কতক্ষণ ছিলেন?'

'ঠিক খেয়াল নেই। দু-তিন ঘণ্টা হতে পারে, ফিরতে-ফিরতে বেশ রাত্তির হয়ে গিয়েছিল। অথচ ড্রিংক্‌স যে খুব একটা-বেশি নিয়েছি—তা নয়। আমার মনে হয়, ড্রিংক্‌সের মধ্যে ঘুমের ওষুধ টষুধমেশানো ছিল।'

'তার মানে আপনি বলতে চাইছেন, আপনাকে আটকে রাখার জন্যেই ওখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?'

'এগ্‌জ্যাক্টলি।'

'উদ্দেশ্য— আপনাকে ওখানে আটকে রেখে আপনার বাড়িতে চুরি করা।'

'ঠিক তাই।'

'এই ষড়যন্ত্রে আপনি আপনার বন্ধু মিলনকে সন্দেহ করছেন, তাই তো?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে সুনন্দবাবু বললেন, 'দেখুন, হাতে স্পষ্ট কোনও প্রমাণ নেই, তবে এই ছেলেটির গতিবিধি ইদানীং আমার একেবারেই ভাল ঠেকছে না।'

'কীরকম?'

'সে অনেক কথা, পরে বলব আপনাকে। এস্টেট ডিপার্টমেন্টের দায়িত্ব ওর ওপর। টের পাচ্ছি, নানা ধরনের গোলমাল করছে। নজর রাখছি, শিগ্‌গিরই হাতেনাতে ধরব একদিন।

ইদানীং আবার একটা মেয়ের সঙ্গেও খুব ভিড়েছে। মেয়েটি হালে স্টেশনারি গুড্‌সের সাপ্লায়ার হিসেবে ঢুকেছে আমাদের ওখানে। আমার কাছেই এসেছিল প্রথমে। লেখাপড়া জানা মেয়ে, স্মার্ট, দারুণ সুন্দরী। যে-কোনও জায়গায় একটা ভাল চাকরি পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু মাথায় খেয়াল চেপেছে—স্বাধীন ব্যবসা করবে। আমিই ওকে পাঠিয়েছিলাম মিলনের কাছে। কী ব্যবসা করছে জানি না। মিলন প্রতিবারই ওর গাদা-গাদা আইটেম রিজেক্ট করে।'

'রিজেক্ট করে! প্রতিবারই? তা হলে মিলন আর কী ফেভার দেখাচ্ছে! মেয়েটি আপনাদের অফিসে কী সাপ্লাই করে?'

'স্টেশনারি আইটেম। রাইটিং প্যাড, পিন, জেম্‌স্ ক্লিপ, কলম, স্টেপলার, রুলার—এই সব।'

কৌশিকের কপালে কয়েকটা রেখা ফুটে উঠেছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলল, 'বিভিন্ন অফিসের এস্টেট ডিপার্টমেন্টের বিরুদ্ধে একটা চালু অভিযোগ হল—পয়সা খেয়ে সাবস্ট্যাণ্ডার্ড জিনিস কেনে। রিজেকশন তো হয় না। ওই মেয়েটির সঙ্গে আপনাদের মিলনের সম্পর্ক খুব ভাল হলে মালপত্তর খারাপ বলে ফেরত দিত না। আমার তো উলটোটাই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে, ওই মেয়েটির সঙ্গে মিলনের সম্পর্ক ভাল নয়।'

'ভাল যদি নাই হবে তা হলে প্রতি শনিবার ওরা একসঙ্গে অফিস থেকে বেরোত না।'

কথাটার উত্তরে কৌশিক মুচকি হাসল।

হাসির অর্থটা বুঝে নিয়ে সুনন্দবাবু বললেন, 'অফিসের বাইরে ওর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথা নেই। তবে ওর কাজকর্ম নিয়ে বেশ কিছু অভিযোগ কানে এসেছে। সেগুলো তো খতিয়ে দেখতেই হবে।'

ভদ্রলোক আরও কী-সব বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু তার আগেই ওর দিকে নোটবুক এগিয়ে দিয়ে কৌশিক বলল, 'কাল সন্ধেয় যেখানে ড্রিংক্‌স নিয়েছিলেন, সেখানকার পুরো ঠিকানাটা এখানে লিখে দিন তো।'

ভদ্রলোক লিখে দিলেন।

'বেশ, এবার চলুন আপনার ফ্ল্যাটটা একবার দেখে আসি—নাকি এখন আপনি অফিসে যাবেন?'

'অফিসকে জানিয়ে দিয়েছি, পরে যাব। চলুন।'

'আপনার সঙ্গে গাড়ি আছে?'

'আছে।'

'বেশ, চলুন তা হলে।'

লকার খুলে ছোট একটা ব্যাগ বার করে নিয়োছল কৌশিক। একটু দূরে সুনন্দবাবুর নীল মারুতি, কিন্তু গাড়িতে ওঠার আগে 'এক মিনিট' বলে লম্বা পায়ে চেম্বারে ফিরে এল ও। গেস্টহাউসের ঠিকানা লেখা নোট-বইয়ের পাতাটা ছিঁড়ে মুখার্জিবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে

বললেন, 'আপনি যেন একটা ম্যারেজ পার্টির জন্যে হল্ ভাড়া করতে এসেছেন—এই সব বলে পাঁচ নম্বর বাড়ির ব্যাপারটা একটু জেনে আসুন তো। কাল সন্ধেয় লিকার লঞ্চিংয়ের ব্যাপারে কারা হল্ ভাড়া নিয়েছিল তাদের ঠিকানাটাও কায়দা করে জোগাড় করে নেবেন। আমি ঘন্টাদুয়েকের মধ্যে ফিরছি।'

মুখার্জিবাবু সায় দিতেই আবার লম্বা পায়ে ফিরে গিয়ে নীল মারুতিতে উঠে পড়ল কৌশিক।

অফিসের গাড়ি, গাড়ি ছুটতে শুরু করল সুনন্দবাবুর দক্ষিণ কলকাতার ফ্ল্যাটের দিকে।

রাস্তা ফাঁকা, গাড়ি বেশ জোরেই ছুটে চলেছিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পরে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'আপনার এই ফ্ল্যাটে আপনি কি এখন একাই আছেন?'

'শুধু এখন নয়, ধরতে গেলে সারা বছরই একা। মা মাঝেমধ্যে এসে থাকেন। মা থাকেন দক্ষিণেশ্বরে।'

'আপনি বিয়ে করেননি।'

'না।'

'করবেন না?'

'ঠিক করিনি, করতেও পারি কোনও একদিন। আগে মা খুব তাড়া দিত, এখন দেয় না। আমিও দেখছি দেরি যখন হয়েই গেছে—আর একটু হলেই বা ক্ষতি কী?'

'আপনার বাবা?'

'বছর-পাঁচেক হল মারা গেছেন।'

'মা ছাড়া আর কে আছেন?'

'আমার এক ছোট ভাই, ব্যাঙ্গালোরে থাকে।'

'আপনার সঙ্গে দেখছি অলোকবাবুর কিছুটা মিল আছে। বাই দি ওয়ে, অলোকবাবুর সেই হিমালয়ে চলে যাওয়ার পরিকল্পনাটা কি এখনও বহাল আছে?'

'হয়তো আছে।'

'কিন্তু তার আগে তো উনি ওঁর ব্যবসাপত্তর, বিষয়আশয় বিলিব্যবস্থা করতে চান—।'

'শুনেছি নতুন কাগজপত্তর সব তৈরি হয়ে গেছে।'

'কৌশিক এবার ঘুরে বসে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি তো অলোকবাবুর খুব কাছের মানুষ, বিশ্বস্ত। ভাগাভাগি কী ভাবে হয়েছে, কে কী পেল—কাগজপত্রগুলো কি আপনি দেখেছেন? কিংবা শুনেছেন কিছু?'

প্রশ্নটা শুনে ভদ্রলোক একটু যেন আহত হলেন। 'কিছুদিন আগে পর্যন্ত মিস্টার মৈত্র প্রতিটি গোপন ব্যাপারে আমার সঙ্গে পরামর্শ করতেন একবার। এখন আর তা করেন না। কারণ কান ভারী করার লোক এসে গেছে।'

'আপনি কি আপনার অফিসের মিলনের কথা বলছেন?'

'তাছাড়া আবার কে, গোটা অফিসে ওটাই তো হল সবচেয়ে বড় ভিলেন।'

গাড়ি একবারের জন্যেও ট্রাফিক জ্যামে পড়েনি, তার ওপর ড্রাইভারের হাতও খুব ভাল; সুতরাং বেশ অল্পসময়ের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গিয়েছিল সুনন্দবাবুর ফ্ল্যাটে। নতুন একটা পাঁচতলা বাড়ির দোতলায় ফ্ল্যাট। গোয়েন্দা সতর্ক চোখে চারদিক দেখতে দেখতে ফ্ল্যাটে ঢুকল। 'আপনার দরজার তালা তো দেখছি ঠিকই আছে।'

'তালা ভাঙেনি, আমার মনে হয়—।'

'ব্যালকনি দিয়ে ঘরে ঢুকেছে?'

'হ্যাঁ, তা ছাড়া আর তো কোনও ঢোকার রাস্তা নেই।'

ঘরের মধ্যে জিনিসপত্র ছড়ানো-ছেটানো। সে সব একবার দেখে নিয়ে কৌশিক ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াল। খোলা ব্যালকনি। গ্রিল নেই।

'এপাশের দরজাটা কি বন্ধ ছিল?'

'না। ইন ফ্যাক্ট কখনওই বন্ধ করি না। এদিকে চুরিটুরি তো তেমন হয় না। তাছাড়া আমাদের বাড়ির একজন কেয়ারটেকার আছে, ধরতে গেলে সব সময় বাড়িতেই থাকে।

ব্যালকনি থেকে ঝুঁকে পড়ে নীচের দিকে তাকাল গোয়েন্দা। ব্যালকনিতে ওঠার কোনও সহজ পথ নেই। এখান থেকে রেনওয়াটার পাইপটাও বেশ দূরে। পাইপ বেয়ে উঠে এখানে আসা অসম্ভব। ব্যালকনির রেলিয়েংর ওপর ধুলোর একটা হালকা আস্তরণ। কোথাও বিচিত্র সব ছাপ ফুটে আছে, ব্যাগ থেকে আতস কাঁচ বার করে সেই ছাপগুলো ভালভাবে পরীক্ষা করল গোয়েন্দা। তারপর ঘরের ছড়ানোছেটানো জিনিসগুলো দেখতে দেখতে বলল, 'আপনি কিছু-কিছু জিনিসপত্র আবার তুলে ফেলেছেন, তাই না?'

'হ্যাঁ, মানে দামি জিনিসগুলো আবার আলমারিতে তুলে ফেলেছি। পরে মনে হয়েছিল, কোন কিছুতে হাত না দিয়েই আপনাদের খবর দেওয়া উচিত ছিল—। আসলে ব্যাপারটা এমনই শকিং— কী-কী চুরি গিয়েছে সেটাই দেখতে গিয়েছিলাম আগে।'

'সেটাই তো স্বাভাবিক।'

'ওই দেখতে গিয়েই দামি জিনিসপত্রগুলো আবার আলমারিতে ঢুকিয়ে তালা দিয়েছি। আলমারিটা কি খুলব?'

'না-না, তার দরকার নেই।'

হাতের ব্যাগ থেকে ছোট্ট একটা ক্যামেরা বার করল গোয়েন্দা, তারপর বিভিন্ন কোণে দাঁড়িয়ে ঘরের বেশ কয়েকটা ছবি তুলল। ছবি তোলার পরে পড়ার টেবিলটার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'বাহ্! আপনি তো দেখছি নানা বিষয়ের বইপত্র পড়েন।'

লাজুক মুখে উত্তর দিলেন সুনন্দবাবু, 'একটা সময় একটু-আধটু পড়তাম। এখন আর তেমন সময় পাই না। পড়ার টেবিলটা কী রকম নোংরার পাহাড় হয়ে আছে দেখছেন তো—ধুলোয় ভর্তি।'

কথার উত্তর না দিয়ে কৌশিক এ-বই সে-বই টেনে নিয়ে দেখতে লাগল। হঠাৎ বলল, 'এক গ্লাস জল খাওয়াবেন?'

'আনছি' বলে ভদ্রলোক ভেতরের ঘরে ঢুকলেন, আর ঠিক তক্ষুনি রাইটিং প্যাডে লেখা কাটাকুটি করা একটা চিঠি ছিঁড়ে নিয়ে পকেটে পুরে ফেলল কৌশিক।

একটু পরেই জল নিয়ে ফিরে এলেন ভদ্রলোক। জল খেয়ে কৌশিক বলল, 'আমার কাজ উপস্থিত মিটে গেছে, চলুন এবার যাওয়া যাক।'

নীল মারুতিতে গিয়ে বসল দুজন। সুনন্দবাবু বললেন, 'আপনাকে আপনার চেম্বারে নামিয়ে দিয়ে অফিসে যাব আমি।'

কৌশিক কথাটার কোনও উত্তর দিল না। বাইরের দিকে তাকিয়ে কী যেন ভাবছিল।

একটু বাদে সামান্য ইতস্তত করে সুনন্দবাবু বললেন, 'দেখলেন তো সব, আপনার ফাইণ্ডিংসে কী, মানে কিছু আন্দাজ করতে পারলেন?'

জবাবে গোয়েন্দা বলল, 'কী বুঝলাম পরে জানাব আপনাকে। তবে সাবধান থাকবেন, চোর আপনার বাড়িতে হানা দিতে পারে আবার।'

'সে কী!' কেমন যেন আঁতকে উঠলেন ভদ্রলোক।

কিছুক্ষণ পরে কৌশিক বলল, 'পুলিশ ইনকুয়ারিতে এলে সব কিছু দেখিয়ে দেবেন, তবে আমি এসেছিলাম—এই কথাটা আর বলবেন না।'

ফেরার পথেও রাস্তা ফাঁকা ছিল, ঠিক সময়ে অফিসপাড়ায় পৌঁছে গেল কৌশিক। সুনন্দবাবু বললেন, 'আমি এখন আর নামছি না, পরে যোগাযাগ করব আপনার সঙ্গে।'

'ঠিক আছে।' দ্রুত পায়ে চেম্বারের দিকে হাঁটতে শুরু করে দিল কৌশিক।

চেম্বারে ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে ঠিক পাখার নীচে দাঁড়িয়েছিলেন মুখার্জিবাবু। একটু অবাক হয়ে ওঁর দিকে তাকিয়ে কৌশিক বলল, 'আপনি সেই পাঁচ নম্বর বাড়িতে খোঁজখবর নিতে যাননি?'

'গিয়েছিলাম। সব কাজ সেরে এই মাত্র ফিরেছি।'

হাতের ব্যাগটা লকারের মধ্যে ঢুকিয়ে রাখতে রাখতে গোয়েন্দা জিজ্ঞেসা করল, 'কী খবর পেলেন?'

জবাবে চোখদুটো কপালের দিকে ঠেলে দিয়ে মুখার্জিবাবু বললেন, 'সাংঘাতিক।'

'সাংঘাতিক! কী রকম?'

রুমাল দিয়ে চোখ-মুখ-ঘাড়ের ঘাম মুছতে মুছতে মুখার্জিবাবু বললেন, 'ওই পাঁচ নম্বর বাড়ির তিন তলায় একটা গেস্টহাউস আছে, মস্ত বড় একটা হলঘরও আছে—ঠিক; কিন্তু গত পনেরো দিনের মধ্যে ওই গেস্টহাউসে বা হলঘরে কোনও পার্টি আসেনি।'

মুখার্জিবাবু আশা করেছিলেন, এত বড় একটা খবর শুনে কৌশিক রীতিমত চমকে উঠবে, কিন্তু তেমন কোন চিহ্ন গোয়েন্দার শরীরের কোথাও ফুটে উঠল না। ও শুধু একটু কপাল কুঁচকে তাকিয়েছিল।

মুখার্জিবাবু বললেন, 'আমার ইনভেস্টিগেশনে কোনও খুঁত ছিল না। আমি মস্ত এক বড়লোকের সেক্রেটারি সেজে খোঁজখবর নিতে গিয়েছিলাম। প্রথমে কেয়ারটেকার আমাকে ভাগিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। বলেছিল, কোন রেফারেন্স ছাড়া এখানে ঘর ভাড়া দেওয়া হয় না। কিন্তু আমি যখন জানিয়ে দিলাম, হল পছন্দ হলে টাকাটা আমাদের কাছে কোন সমস্যা নয়। এমনকী যা ভাড়া তার দ্বিগুণ দিতেও আমরা রাজি—তখন ছবিটা পালটে গেল। বললাম, এই লোকালিটির মধ্যেই আমরা পার্টি থ্রো করতে চাই, সেই জন্যেই—। পৃথিবীতে টাকার বশ সবাই, বাড়তি টাকার লোভে লোকটা নরম হয়ে যা-যা জানতে চাই সব জানিয়ে দিল হুড়হুড় করে। বললাম, হল ভাড়া নেওয়ার জন্যে রেফারেন্স দেওয়ার দরকার হলে তারও অসুবিধে হবে না, এই তো কিছুদিন আগে আমাদের জানাশোনা এক ভদ্রলোক পার্টি দিয়েছিলেন এখানে। ভদ্রলোকের নামটা ঠিক মনে করতে পারছি না, আপনাদের রেজিস্টারটা একবার নিয়ে আসুন না—। রেজিস্টার আনলে দেখে নিলাম—সত্যি, গত পনেরো দিনের মধ্যে কোনও পার্টি ওই গেস্টহাউসের রুম বা হল ভাড়া নেয়নি।'

এত কায়দা করে সব কিছু খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে মুখার্জিবাবু বোধহয় বেশ কিছু তারিফ আশা করেছিলেন। কিন্তু গোয়েন্দা কিছুই বলল না। ওর কপালের ভাঁজের সংখ্যা একটু বুঝি বেড়ে গিয়েছিল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে মুখার্জিবাবু বললেন, 'সুনন্দবাবু যখন এই লিকার-লঞ্চিং পার্টির গল্প ফেঁদেছিল—তখনই সত্যি কথা বলতে কী, ওকে আমার বেশ সন্দেহ হয়েছিল।'

'কেন?'

'শরীরের ভাষা যে সামান্য শিখেছে সেই ধরে ফেলত ওকে।'

একটু অবাক হয়ে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'কী রকম?'

'আপনি খেয়াল করেননি, ওই গল্পটা করার সময় লোকটা দু-তিনবার পকেটে হাত দিয়েছিল। আপনিই তো বলেছেন, কিছু বলার সময় পকেটে হাত ..কালে বুঝে নিতে হবে সে কথা লুকোচ্ছে বা বানাচ্ছে।'

'সেই সময় পকেটে হাত ঢুকিয়ে রেখেছিলেন নাকি সুনন্দবাবু?'

একটু ইতস্তত করে জবাব দিলেন মুখার্জিবাবু, 'না, হাত ঢোকানো বলতে যা বোঝায় তা ঠিক নয়। তবে আমার পরিষ্কার মনে আছে এই গল্পটা ফাঁদার সময় লোকটা একবার কাগজ, একবার কলম আর একবার চাবির রিং বার করেছিল—।'

সন্দেহ করার কারণ শুনে খুব আবছা একটা হাসির রেখা ফুটেছিল গোয়েন্দার ঠোঁটে, আর ঠিক তক্ষুনি টেলিফোন বেজে উঠল।

ওপাশে অলোক মৈত্রের থমথমে গলা। অলোকবাবু বললেন, 'আপনি এখন একবার আমার বাড়িতে চলে আসতে পারবেন? খুব জরুরি দরকার।'

জবাবে কৌশিক জানাল, 'আসছি। মনে হয় মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যেই পৌঁছে যাব।'

পাঁচ

বাড়ির কাজের লোক বেশ আপ্যায়ন করে কৌশিককে বসার ঘরে বসাল। ও বসার মিনিটখানেক পরে অলোকবাবু ঢুকলেন। অলোকবাবুর পরনে স্যুট। ওঁকে দেখেই কৌশিক উঠে দাঁড়িয়েছিল। ইঙ্গিতে ওকে বসতে বলে অলোকবাবুও বসলেন, তারপর সামান্য লজ্জিত মুখে বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি আবার আপনাকে বিব্রত করার জন্যে খুব খারাপ লাগছে। কিন্তু ব্যাপারটা এমনই যে—। আমার একটা বোর্ড-মিটিং আছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই বেরোব, তার আগে আপনার সঙ্গে কয়েকটা কথা সেরে নিতে চাই।'

'বলুন।'

'আমি আপনার প্রোফেশনাল হেল্প চাই। আপনার যা ফিজ তাই আপনি নেবেন। কোনও ব্যাপারে বাড়তি টাকাপয়সার দরকার হলে নেবেন— যখন ইচ্ছে, অ্যাডভান্সও নিতে পারেন। টাকাপয়সাটা কখনওই কোনও সমস্যা হবে না। আমি যা চাই তা হল আপনার সার্ভিস।'

রহস্যপূর্ণ একটুকরো হাসি ফুটে উঠেছিল গোয়েন্দার ঠোঁটে। 'কিন্তু আপনি তো আপনার সমস্যা আন্দাজ করে নিতে বলেছেন আমাকে। সে ভাবে এগোতে গেলে তো সার্ভিস পেতে অকারণে আপনার কিছুটা দেরি হয়ে যাবে।

'না, এখন আর আপনাকে ধাঁধার মধ্যে রাখব না। স্পেসিফিক কাজ দেব। তদন্তের কাজও আপনাকে সেরে ফেলতে হবে—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'এত তাড়া দিচ্ছেন কেন? কোনও বিশেষ কারণ আছে কি?'

'আছে। আমার মন বলছে চটপট কোনও জোরালো ব্যবস্থা না নিলে বিচ্ছিরি কোনও ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

'আপনার মন বলছে?'

'হ্যাঁ, আমার মন বলছে। আপনারা ইয়াং ম্যান, এসব মানেন কি না জানি না। তবে আমি মানি। প্রিমোনিশনে বিশ্বাসী। খারাপ ঘটনা ঘটার আগেই টের পেয়ে যাই আমি, আমার মন বলে দেয়। দুঃস্বপ্ন দেখি।'

একটু ইতস্তত করে গোয়েন্দা বলল, 'কিন্তু কী একটা বিশেষ কাজের কথা বলছিলেন যেন—।'

'বিশেষ কাজটি হল পঁচিশ বছর বিদেশে-থাকা আমার ছোটভাইটি সম্পর্কে খবরাখবর জোগাড় করে আপনি আমাকে জানাবেন। আমি ওর সম্পর্কে উড়ো খবর কিছু পেয়েছি—সেগুলো যাচাই করে নিতে চাই।'

'উড়ো চিঠি তো পেয়েছেন, সেটা তো আমার কাছেই আছে। আর কী খবর?'

'ভুতুড়ে টেলিফোন কল পেলাম—এই তো ঘন্টাখানেক আগে। আমার প্রবাসী ভাইটি নাকি আমার ভাগ্নিজামাইকে ব্যবসায় নামাবার তাল করছে। এটা শুনেই আমি ঘাবড়ে গিয়েছি।'

কেন?'

অলোকবাবু একটু ঘুরে বসে বললেন, 'আমার ভাগ্নি নিশা আমার মেয়ের মতো। কাকে তুমি সব চাইতে বেশি ভালবাসো? কেউ আমাকে এ প্রশ্ন করলে আমি সঙ্গে-সঙ্গে নিশার কথা বলব। এটা এত সহজে বলতে পারছি—তার কারণ, আমার নিজের লোক, কাছের লোকের সংখ্যা খুবই কম। আমার বিষয়আশয়, ব্যবসার সবচেয়ে বড় অংশটা নিশাকেই দেওয়ার ইচ্ছে। ওর বর, মানে আমার ভাগ্নিজামাইয়ের নাম কিশোর—কিশোর চৌধুরী। পুরনো কলকাতার বিরাট বড়লোক ওরা, কিন্তু ওদের তালপুকুরে এখন ঘটি পর্যন্ত ডোবে না। এই কিশোরটি আবার চিরকিশোর। বয়স যতই বাড়ুক না কেন, ছেলেমানুষই রয়ে গেল। ওর পূর্বপুরুষরা পায়রা উড়িয়ে, বেড়ালের বিয়ে দিয়ে লাখ-লাখ টাকা উড়িয়েছে। আমাদের এই কিশোরবাবাজির ট্যাঁক ফাঁকা, কিন্তু কিছু-কিছু বিদ্‌ঘুটে শখ-সাধ রয়ে গেছে। না-না, তার মধ্যে আপত্তিকর কিছু নেই—সবই উদ্ভট খেয়াল। ওর যৎসামান্য জমানো টাকা আর পুরো সময় ওই সব খেয়াল মেটাতেই বুঝি চলে যায়।'

'কিশোরবাবু কোনও কাজটাজ—।'

'না। অতীতে দু-তিনটে চাকরি করেছে, কিন্তু কোনও চাকরিতেই ছ-মাসের বেশি টিঁকতে পারেনি।'

'কেন?'

'কেন আবার! একসময় কলকাতার লোকজন যাদের বিশাল বড়লোক বলে এক-ডাকে চিনত, সেই পরিবারের কারও পক্ষে কি পরের গোলামি করা পোষায়! আমাদের চিরকিশোরটি তো এখনও মনে মনে পুরনো কলকাতার সেই বাবুসমাজে বাস করে। ওর মতে সেই সময় কলকাতায় অনেক ভাল জিনিস ছিল যেগুলো এখন লোপ পেয়েছে বা পেতে বসেছে।'

'কী সেগুলো?'

'সেই যে তর্জাটর্জা ছিল না—তর্জা, কবিগান, সঙ—এই সব। এর মধ্যেই নাকি বাঙালির আসল বাঙালিত্ব ছিল, আর এখন চলছে নকলনবিশির যুগ। পুরনো দিনের ওইসব সঙটঙের মস্ত বড় প্রেমোটার হল কিশোর।'

একটু হেসে কৌশিক বলল, 'খাওয়া-পরার দুশ্চিন্তা না থাকলে কিছু শখ-সাধ নিয়ে সময় কাটানো তো খারাপ নয়—বিশেষ করে শখটখগুলো যখন নির্দোষ।'

'আচ্ছা, আপনিই বলুন না—এই মানুষের পক্ষে কি ব্যবসা করা সম্ভব?'

'আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে সম্ভব নয়। আগে কখনও ব্যবসা-ট্যবসার মধ্যে গিয়েছিলেন উনি?'

'না, কখনওই নয়। ব্যবসা করার এলিমেন্ট থাকলে আমিই তো ওকে একটা ওপেনিং দিতে পারতাম!'

'তা হলে তো মিটেই গেল। আপনার ভাই ব্যবসার প্রস্তাব দিলে কিশোরবাবু রাজি হবেন না।'

'না, হবে। তার কারণ এই ব্যবসার মধ্যে পুরনো কলকাতা আছে।'

'পুরনো কলকাতা! কী রকম?'

প্রশ্নের উত্তরে অলোকবাবু একবার হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, টাইয়ের নট ঠিক করলেন, তারপর বললেন, 'আমার ভাইয়ের ব্যাকগ্রাউণ্ডটা আপনাকে ছোট করে বলে দিই-ঠিক। বেঠিক অবশ্য জানি না, আমি যতটুকু যা জেনেছি—আমার ভাই নানা ধরনের ব্যবসা করে, তার মধ্যে একটা হল মদের। এখানে বিলিতি লিকার সাপ্লাই করবে নাকি এজেন্ট হিসেবে। এখানকার স্থানীয় একটার ডিস্টিলারির সঙ্গে কোলাবরেশনেও বুঝি নেমেছে। এসব ব্যবসা নিয়ে আমার কোনও মাথাব্যথা নেই। লাভের অঙ্ক যত বড় করেই দেখানো হোক না কেন কিশোর এসব ব্যবসায় আসবে না। কিন্তু যে ব্যবসায় পুরনো কলকাতা আছে সেখানে ওর সাধ্য থাক আর নাই থাক—এক কথায় রাজি হয়ে যাবে নির্ঘাত।'

'পুরনো কলকাতার ব্যবসা—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না তো!'

'বলছি আপনাকে। একটা সময় কলকাতাকে এ সিটি অব প্যালেসেস বলা হত। সেই কলকাতা মানে নাইনটিস্থ সেঞ্চুরির কলকাতা, ব্রিটিশ কলকাতা। ব্রিটিশরা এখানে অন্য কোনও শহরকে নয়, কলকাতাকেই রাজধানী বানিয়েছিল প্রথমে। কলকাতায় কম প্রাসাদ, কম অট্টালিকা বানানো হয়নি। তখনকার ধনী লোকদের বাড়ি, বাগানগুলোও ছিল বিশুদ্ধ ওয়ার্ক অব আর্ট। জানেন তো সবই। কিন্তু তারপর?'

'সেদিনের সেই প্রাসাদনগরীর অবস্থা এখন জীর্ণ। দেড়শো-দুশো বছরের পুরনো সব বাড়ির অনেকগুলোই ভেঙেচুরে গেছে। অথচ সে-সব বাড়ির স্থাপত্যের কোনও তুলনা হয় না। আমার ভাইয়ের একটি উদ্যোগ পুরনো ওই সব বাড়ি এক্সপার্টদের দিয়ে সারানো। সারাবার মধ্যে ভাঙা মূর্তি, নষ্ট হওয়া পুরনো পেন্টিংও নাকি আছে।'

কৌশিকের চোখেমুখে মৃদু উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল। খুশি-খুশি গলায় বলল, 'এ তো দারুণ ব্যাপার! এ কাজে মনে হয় সবারই এগিয়ে আসা উচিত।'

'সত্যি হলে তো সত্যিই দারুণ ব্যাপার। কিন্তু যদি সত্যি না হয়?'

'কেন? তেমন কোনও লক্ষণ দেখেছেন নাকি?'

'লক্ষণ খোঁজার সময় বা আগ্রহ কোনওটাই আমার নেই। আমার একমাত্র দুশ্চিন্তা কিশোরকে ও এর মধ্যে জড়াবার চেষ্টা করছে বলে। কিশোর অত্যন্ত ভালমানুষ, সাদামাটা, কোনও মারপ্যাঁচ নেই। আমার ভাইটি যদি উলটোপালটা বুঝিয়ে ওকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দেয়!'

'কিন্তু শুধুমাত্র অনুমানের ওপর নির্ভর করে—।'

অনুমানের ওপর আমাদের সবাইকেই কমবেশি নির্ভর করতে হয়। ঘটনা ঘটার জন্যে অপেক্ষা করাটা সব সময় বুদ্ধিমানের কাজ নয়। উড়ো চিঠি উড়ো খবরে আমি কখনও খুব একটা গুরুত্ব দিই না—কিন্তু এখন দিচ্ছি। কারণটা তো আপনি জানেন।'

'কোন কারণের কথা বলছেন?'

'আপনাকে তো আমি বলেছি—আমি বিষয়আশয় সংসার থেকে মুক্তি নিয়ে বাকি জীবনটা পাহাড়ে কাটাব। আমার সিদ্ধান্তে কোনও নড়চড় হবে না। এখন আমার একমাত্র কাজ হল সব কিছু চটপট বিলিব্যবস্থা করে দেওয়া। আমি আগে একটা ডিড করেছিলাম। অবস্থাটা পালটে যাওয়ায় সেটা পালটে আর একটা করেছি। সব কিছু ঠিকঠাক আছে কি না দেখার জন্যে আমার ছেলেবেলার এক অ্যাডভোকেট বন্ধুকে দিয়েছি। আগেরটা আমার কাছেই আছে, কিন্তু ছিঁড়তে গিয়েও ছিঁড়িনি। আমার ভাইয়ের কাণ্ডকারখানা আমাকে দুর্ভাবনায় ফেলেছে। এখন মনে হচ্ছে আরও একটা ডিড হয়তো বানাতে হবে।'

'আপনার ভাইকে কিছু না দেওয়ার কথা ভাবছেন বুঝি?'

'ডিসিশন নিইনি এখনও; তবে উড়ো খবরগুলো সত্যি হলে কিছুই দেব না ওকে। খারাপ পথে ঢালার জন্যে সারা জীবন মাথার ঘাম পায়ে ফেলে টাকাপয়সা রোজগার করিনি আমি। আমার ভাইয়ের সম্পর্কে শোনা খবরগুলো কতটা সত্যিমিথ্যে—সেগুলো সঠিকভাবে আমাকে জানানোই এখন আপনার একমাত্র কাজ।'

অলোকবাবু আর একবার ঘড়ির দিকে তাকালেন।

গোয়েন্দা বলল, 'ঠিক আছে, আপনার ভাই এবং ভাগ্নিজামাইয়ের পুরো নামঠিকানাগুলো আমাকে দিন।'

কোটের ভেতর-পকেট থেকে দুটো কার্ড বার করলেন অলোকবাবু। 'এ দুটো আপনাকে দেব বলেই সঙ্গে রেখে দিয়েছি। আমার ছোট ভাইয়ের নাম জ্যোতি মৈত্র। কিশোরের নাম তো আগেই বলেছি। কাল সন্ধেয় কিশোরের কাছে জ্যোতির নাকি যাবার কথা। ভাল কথা, দি ইণ্ডিয়ার হেরিটেজের এই সংখ্যায় জ্যোতিকে নিয়ে একটা রাইট-আপ বেরিয়েছে, দেখে নিতে পারেন। ওর ব্যাকগ্রাউণ্ড জানতে চাইছিলেন তো, লেখাটায় হয়তো বাড়তি-কিছু খবর আছে। ঠিক আছে আজ এই পর্যন্ত থাক——। আমাকে এবার বোর্ড-মিটিংয়ের জন্যে উঠতে হবে। আপনি এখন কোন্‌দিকে যাবেন?'

'আপনি তো অফিসে যাচ্ছেন, আমি যাব ঠিক উলটো দিকে।'

বাগানের গেটের কাছে অলোক মৈত্রের গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। ওরা ওদিকে এগোতেই উর্দি-পরা শোফার এগিয়ে এসে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াল। গাড়িতে ওঠার মুখে অলোকবাবু বললেন, 'তা হলে চলি এখন। পরে দেখা হবে।'

দুজনের সামান্য একটু হাত নাড়ানাড়ির মধ্যেই দামি গাড়িটা হুশ্‌ করে ছুটে গেল বাঁদিকের বড় রাস্তায়। কৌশিক হাঁটতে শুরু করল ডানদিকের চওড়া ফুটপাথ ধরে।

মাথার ওপর ফুলভর্তি গাছের ডাল। ফুটপাথে জাফরি-কাটা ছায়া। গোয়েন্দার মাথার মধ্যেও আলো-ছায়ার নক্‌শা দুলছিল। টের পাচ্ছিল পুরো ব্যাপারটাই বিচ্ছিরিভাবে জট পাকিয়ে গেছে। আরও পাকাবে। জট ছাড়াবার জন্যে প্রথমে যা হাতে আসা দরকার তা হল সুতোর খোলা মুখ। সেই মুখটা গেল কোথায়?

চিন্তান্বিত গোয়েন্দা নিজের কণ্ঠায় থুতনি প্রায় ডুবিয়ে রেখে হাঁটছিল। আরও কিছুটা হাঁটার পরে একটা ট্যাক্সি পেয়ে গেল। তারপর সেটা নিয়ে চলে এল ওর চেম্বারে।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে মুখার্জিবাবু ওর দিকে তাকাতেই মাথা সামান্য দোলাতে দোলাতে গোয়েন্দা বলল, 'কেসটা বেশ ঘোরালো। মনে হয় আরও ঘোরালো হয়ে উঠবে।'

চোখ ধারালো করে মুখার্জিবাবু জিজ্ঞেস করলেন 'এই অলোক মৈত্র লোকটা বোধহয় খুব একটা সুবিধের নয়। কী মনে হচ্ছে আপনার?'

রহস্যপূর্ণ একটা হাসি ফুটে উঠেছিল গোয়েন্দার মুখে। 'কে সুবিধের আর কে অসুবিধের—তা নিয়ে আগে থেকে জোর দিয়ে কিছু ভেবে নিলে কাজের ক্ষতি হতে পারে—বিশেষ করে আমাদের পেশায়।'

নিজের চেয়ারটায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বসে পড়েছিল কৌশিক। একটু বাদে মুখ খুলল আবার। 'এ কেসটায় আপনার সাহায্য একটু বেশি করেই দরকার হবে আমার।'

গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজের দায়িত্ব পেলে কাজের মানুষরা খুশি হয়। গোয়েন্দার কথার জবাবে একগাল হেসে মুখার্জিবাবু বললেন 'অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস স্যার। কী করতে হবে শুধু বলুন।'

'আপনাকে ছদ্মবেশ ধরতে হবে।'

আর এক দফা খুশি হয়ে মুখার্জিবাবু প্রশ্ন করলেন, 'কিসের ছদ্মবেশ?'

'সেই ছদ্মবেশ যে ছদ্মবেশ ধরলে আপনাকে কিছুতেই চেনা যাবে না। তবে পাগলের ছদ্মবেশ ধরবেন না। পাগলের ছদ্মবেশে সব জায়গায় যাওয়া যায় না।'

'পাগল! খামোখা পাগল সাজতে যাব কেন? এখন বলুন কী কাজ করতে হবে?'

'আজ বিকেল থেকেই কাজ শুরু হয়ে যাচ্ছে আপনার। বিকেলে সুনন্দ তরফদার অফিস থেকে বেরুবার পরেই আপনি ওর পিছু নেবেন। কোথায় যায়, কী করে, কার সঙ্গে কথা বলে, সম্ভব হলে সেই কথাগুলো শোনার চেষ্টা করা—এই হবে আপনার কাজ। কালকেও সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ওকে শ্যাডো করবেন।'

উত্তেজিত হয়ে মুখার্জিবাবু বললেন, 'আমি তো তখনই আপনাকে বলছিলাম—লোকটা খুব গোলমেলে ধরনের।'

কথাটার জবাবে 'হ্যাঁ-না'র মধ্যে গেল না গোয়েন্দা, শুধু নিচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী ধরনের ছদ্মবেশ নিচ্ছেন?'

'সে আমার ভাবা হয়ে গেছে। আপনি আধঘণ্টা বসুন, আমি অ্যান্টিরুম থেকে একেবারে অন্য মানুষ হয়ে বেরিয়ে আসছি।'

মৃদু হেসে গোয়েন্দা বলল, 'আপনার ছদ্মবেশ দেখার খুব ইচ্ছে ছিল, কিন্তু হাতে একদম সময় নেই। আমাকে এক্ষুনি বেরিয়ে পড়তে হবে। আপনি আপনার কাজটা ভালভাবে করুন। কাল হয়তো আপনার সঙ্গে আর দেখা হবে না। পরশু সকালে চেম্বারে আসছি।'

চেম্বার থেকে বেরিয়ে চৌরঙ্গির বড় একটা নিউজস্ট্যাণ্ডে হাজির হল কৌশিক। দেশবিদেশের নানা পত্রপত্রিকায় বইয়ের দোকানটা ভর্তি। মেয়েদের ম্যাগাজিনের সংখ্যাই বেশি। নানা ধরনের সুখাদ্যের রেসিপি আর ছবিওয়ালা পত্রিকার সংখ্যাও কম নয়। কিন্তু না, এখানে ওই পত্রিকাটা নেই। দোকানদার বলল, পার্ক স্ট্রিটে একবার খোঁজ নিতে পারেন। তবে পার্ক স্ট্রিটেও নয়, দি ইণ্ডিয়ান হেরিটেজ পাওয়া গেল ফ্রি স্কুল স্ট্রিটের একটা দোকানে। পত্রিকার শেষ সংখ্যাটা কিনে নিয়ে সন্ধে সাড়ে-সাতটা নাগাদ বাড়ি ফিরে এসেছিল কৌশিক।

সারা দিনে কম ধকল যায়নি গোয়েন্দার, তবে ওর ক্লান্তি দূর করার উপায়টি অব্যর্থ। যত রাতই হোক না কেন, ফিরে এসে লম্বা একটা শাওয়ার বাথ নেয়। তারপর পনেরো মিনিটের যোগব্যায়াম। এই দুটো কাজ সারলেই ওর সারা শরীর আবার টগবগে হয়ে ওঠে।

তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরলে তাড়াতাড়িই রাতের খাবার খেয়ে নেয় কৌশিক। আজ ব্যায়ামের পরে সামান্য বিশ্রাম, তারপর খাবার খেয়ে ঢুকে পড়েছিল ওর স্টাডিতে।

স্টাডির চারটে দেওয়াল বইপত্তরে ঢেকে আছে। কাজের চাপ যতই হোক না কেন, রাত্তিরে কিছুক্ষণ ও বইটই পড়বেই। অঙ্ক ছাড়া সব বিষয়েই ওর আগ্রহ আছে। সর্বভুক পাঠক। কিন্তু আজ পড়াশুনো শুরু করার আগে একটা জরুরি কাজ সেরে নিতে হবে। জরুরি কাজ বলতে দুটো চিঠি পরীক্ষা করা। একটা উড়ো চিঠি—চিঠিটায় নামধাম—সম্বোধন কিছু নেই, প্রাপককে শুধু ডক্টর মৈত্রের আপত্তিকর কাণ্ডকারখানার বিরুদ্ধে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। অন্য চিঠিটা সুনন্দবাবুর টেবিল থেকে হাতানো। তাতে একজনকে সাবধান হতে বলা হয়েছে। নাম এবং প্রথম দিকের লাইন কুচিকুচি করে কেটে দেওয়া। শেষের লাইনটাও কাটা হত। হয়নি, তার কারণ হয়তো সেই সময় কোনও টেলিফোন কল বা অতিথি এসে পড়েছিল। পরে বুঝি ওই চিঠিটার কথা মনে ছিল না চিঠি, লিখিয়ের। হাতের লেখাটা যে সুনন্দবাবুর—সে ব্যাপারে গোয়েন্দা নিশ্চিত। পাঁচ নম্বর বাড়ির ঠিকানা-লেখা কাগজটা মুখার্জিবাবুর কাছ থেকে নিয়ে এসেছে ও। দুটি চিঠি পাশাপাশি ধরলে বোঝা যায় যে, দুটি হাতের লেখাই একজনের। কিন্তু কে এই মানুষটি যাকে এ-ভাবে চিঠি লিখে সাবধান করার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল! এমনও হতে পারে, চিঠি না লিখে সুনন্দবাবু নিজেই গিয়েছিলেন ওই মানুষটিকে সাবধান করে দিতে। চিঠির এই প্রাপকের কি অলোক মৈত্রের সমস্যা তৈরির পেছনে কোনও হাত আছে? কিংবা, সুনন্দবাবু যে বিপদের আশঙ্কা করছেন তার মূলে কি চিঠির এই অচেনা লোকটাই?

আতসকাচের নীচে চিঠি দুটো ধরে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বহুক্ষণ ধরে অনেক কিছু পরীক্ষা চালাল গোয়েন্দা, তারপর ওর ফাইণ্ডিংস কোড ল্যাঙ্গুয়েজে লিখে নিল ডায়েরিতে।

হাতের কাজ শেষ হওয়ার পরে আড়ামোড়া ভেঙে ঘড়ি দেখল—সাড়ে-নটা বাজে। এবার বইপত্তর ওলটানো দরকার। আজ আবার এর সঙ্গে কিছু কাজও মিশে আছে। টেবিলের ওপর থেকে দি ইণ্ডিয়ান হেরিটেজ পত্রিকাটা তুলে নিল ও। পত্রিকার প্রচ্ছদে মহাবলীপুরমের

ছবি। ছবিটা বাজে ছাপা হয়েছে। পত্রিকাটির চেহারাও অত্যন্ত সাধারণ। হাতে নিলেই বোঝা যায়, ম্যাগাজিনের গ্রাহকসংখ্যা বেশ কম। এই বিষয়ে যাদের ঝোঁক আছে তারাই শুধু পড়ে, অন্য কেউ বোধহয় উলটেও দেখে না।

সূচি থেকে ডক্টর জ্যোতি মৈত্রের সাক্ষাৎকারের পাতাটা বার করে নিল কৌশিক। বেশ বড়সড় সাক্ষাৎকার। ডক্টর মৈত্রের ছবিও ছাপা হয়েছে। মানুষটি সুদর্শন। খাড়া নাক, চৌকো চোয়াল, পাতলা বাঁকানো ঠোঁট। চেহারায় সাফল্য এবং আত্মবিশ্বাসের ছাপ আছে পুরোমাত্রায়। সাক্ষাৎকারের মাথায় বড় টাইপের হেডিংয়ে লেখা আছে ঃ বিড টু কনজার্ভ আরকিটেকচারাল লিগ্যাসি।

সাক্ষাৎকারটা বারদুয়েক পড়ে ফেলল কৌশিক। চমৎকার লেখা। ডক্টর মৈত্রের উদ্দেশ্য মহৎ। সত্যিই যদি ওসব করা যায়—দারুণ একটা কাজ হবে। কলকাতায় বেশ কিছু দুর্দান্ত চেহারার পুরনো বাড়ি আছে। নিও-গথিক স্ট্রাকচারের এমন অসাধারণ কাজের নমুনা গোটা পৃথিবীতেই বেশ কম। তবে ব্রিটিশরাজের গোড়ার দিকে বানানো বাড়িগুলোর দশা এখন খুবই খারাপ। ভেঙেচুরে পড়েছে। রক্ষণাবেক্ষণের কোনও পাট নেই। ডক্টর মৈত্র চান, সরকার এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে এগিয়ে আসুক স্থাপত্যের উত্তরাধিকার রক্ষার কাজে। কমিটি তৈরি করা হোক, নতুন আইন তৈরি করা হোক; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন ওয়ার্কশপ, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করে গৌরবময় উত্তরাধিকার সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করা হোক।

বাহ্! কাজটা তো সত্যিই ভাল। ডক্টর মৈত্রের এই উদ্যোগকে মনে মনে তারিফও করল কৌশিক। পত্রিকার সাক্ষাৎকারী এক জায়গায় ডক্টর মৈত্রের কাছে জানতে চেয়েছেন : 'কলকাতার পুরনো বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে আপনার উৎসাহ কী ভাবে এল প্রথমে?' প্রশ্নের উত্তরটি একটু মজা করেই দিয়েছেন ডক্টর মৈত্র। তিনি বলেছেন : 'এ ব্যাপারে আমার নজর যায় একটি ভেনাস মূর্তির কোমরে গরুর দড়ি বাঁধা দেখে। শুধুমাত্র কলকাতার বিভিন্ন এলাকার ছবি নিয়ে চমৎকার একটি অ্যালবাম বার করেছেন ভারতবর্ষের বিখ্যাত এক ফোটোগ্রাফার। সেই অ্যালবামটি আমার হাতে এসেছিল ক্যালিফোর্নিয়ায়। পুরনো কলকাতার বেশ কিছু জীর্ণ বাড়ির ছবি আছে ওখানে। তখনকার মস্ত এক ধনীর বাগানবাড়ি খাটাল হিসেবে ভাড়া দেওয়া হয়েছে এখন। সেই খাটালে গরুর খুঁটি হয়েছে মার্বেল পাথরের তৈরি ভেনাসের মূর্তি। ছবিটা দেখে আমার এতই মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল যে, তখনই ঠিক করে ফেলি, পুরনো কলকাতার পুরনো বাড়িগুলোকে আসল চেহারায় ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে আমার সাধ্যমতো সব রকমের উদ্যোগই আমি নেব। এ বিষয়ে অবশ্য সবার আগে আনতে হবে জনসাধারণের সচেতনতা।'

অলোকবাবুর দেওয়া ভিজিটিং কার্ড দুটো ব্যাগ থেকে বার করল কৌশিক। একটা কার্ড কিশোর চৌধুরীর, অন্যটা ডক্টর মৈত্রের। ঘড়ির দিকে তাকাল—রাত দশটা। মনে মনে কিছু কথা সাজিয়ে নিয়ে ও টেলিফোন করল ডক্টর মৈত্রের বাড়িতে। ডক্টর মৈত্রই ধরলেন।

গোয়েন্দা প্রথমে অত্যন্ত বিনীতভাবে ক্ষমা চাইল এত রাতে ফোন করার জন্যে। তারপর বলল, 'দি ইণ্ডিয়ান হেরিটেজে আপনার সাক্ষাৎকারটা আমার এতই ভাল লেগেছে যে— ভাবলাম, এত বড় একটা কাজ করার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ জানানো আমার কর্তব্য।'

কথাটা শুনে ওদিকের কঠিন আর ঠাণ্ডা গলাটা আশ্চর্য রকমের মোলায়েম হয়ে উঠেছিল। কিন্তু মানুষটি বিচক্ষণ, প্রশংসার উত্তরে ধন্যবাদ জানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি আমার টেলিফোন নাম্বার পেলেন কী ভাবে?'

উত্তরটা ভাবাই ছিল কৌশিকের। বলল, 'পত্রিকার অফিসে ফোন করে আপনার নাম্বারটা জোগাড় করেছি।'

বিশ্বাসযোগ্য জবাব। ডক্টর মৈত্র স্বাভাবিক গলায় বললেন, 'অ'। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে আরও অনেক প্রশংসা করার পরে কৌশিক জানাল, 'আমি অত্যন্ত সামান্য মানুষ, তবে এ-ব্যাপারে আপনার কাজে লাগার কোনও সুযোগ পেলে খুশি হব—।'

গলায় অভ্যর্থনার সুর ফুটিয়ে ডক্টর মৈত্র বললেন, 'কাজের লোকই তো আমরা সবার আগে চাই। আপনি এলে আমাদের খুব ভাল লাগবে। কবে আসবেন বলুন?'

'কাল সন্ধেয় গেলে কি আপনার অসুবিধে হবে?'

'কাল সন্ধে! কাল সন্ধেয় এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে। ঠিক আছে, আপান ওখানেই চলে আসুন। ওখানে আমাদের আলোচনার বিষয়ও এটাই। আপনি শোভাবাজারের কিশোর চৌধুরীর নাম শুনেছেন বোধহয়—।'

ভালমানুষের গলায় জবাব দিল কৌশিক, 'না, মানে—।' ডক্টর মৈত্র বললেন, 'ঠিক আছে, ওর ঠিকানাটা বলছি, লিখে নিন। কাল সন্ধেয় ওখানেই যাচ্ছি আমি। শোভাবাজারে পৌঁছে গেলে ও-বাড়ি খুঁজে পেতে আপানার এক মিনিটও লাগবে না।'

ঠিকানা লেখার ভান করল গোয়েন্দা। ওর এক হাতে টেলিফোনের রিসিভার, অন্য হাতে কিশোর চৌধুরীর নাম-ঠিকানা লেখা ভিজিটিং কার্ড।

ছয়

দুপুর পৌনে-একটা। বেলগাছিয়ার টনব্যাক্সি কোম্পানির সামনের রাস্তায় কেমন যেন একটা ঝিম-ধরা দুপুর পড়ে ছিল। রাস্তার দু'ধারে বেশ বড় কয়েকটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। আকাশে টুকরো-টুকরো কালো মেঘ। তার ফলে মাঝেমধ্যেই মেঘ ও রোদ্দুরের খেলা চলছিল।

টনব্যাক্সির ঠিক উল্টো দিকে টিনের ছাউনি-দেওয়া তিনটে দোকান। একটা পান-সিগারেটের, একটা চায়ের, আর একটা ভুজাওয়ালার। তার পাশে চাকাওয়ালা একটা ঠেলা-গাড়িতে জামাকাপড় ইস্ত্রি করছে ধোপা। দোকানগুলোর সামনে, ভেতরে কয়েকজন খদ্দের। ওধারের সিমেন্টের বেঞ্চিতে দু'জন বসে আছে। একজন ভবঘুরে গোছের। আর একজন মাথায় টুপি গুঁফো মারোয়াড়ি। লোকটির কপালের ফোঁটা আর হাতের পেটমোটা কাপড়ের ব্যাগটা দেখলেই বোঝা যায় কারবারি লোক। হয়তো টনব্যাক্সির কোনও অফসরের জন্যে অপেক্ষা

করছে। ওদিকে রাস্তার ধারে গাছের ছায়ায় দুটো ট্যাক্সি। একজন ড্রাইভার সিটে হেলান দিয়ে হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। আকাশের অনেক উঁচুতে চক্র কাটছে তিনটে চিল।

ঠিক একটার সময় টনব্যাক্সির গেট ঠেলে কেতাদুরস্ত এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে সামান্য দূরের একটা শেডে দাঁড়ানো কয়েকটা গাড়ির দিকে হাত তুললেন। সঙ্গে সঙ্গে সিমেন্টের বেঞ্চিতে বসা মরোয়াড়ি ভদ্রলোক চঞ্চল হয়ে উঠে পড়ে ওপাশের ওই ট্যাক্সির দিকে পা চালালেন চটপট।

একটু পরের দৃশ্যটি হল এইরকম। টনব্যাক্সির কেতাদুরস্ত মানুষটিকে তুলে নিয়ে বেশ জোরে ছুটে চলেছে একটা অ্যাম্বাসাডর। সামান্য ব্যবধানে গাড়ির পেছনে একটা ট্যাক্সি। ট্যাক্সির যাত্রী ওই মারোয়াড়ি। ভদ্রলোক বেশ সতর্ক ভঙ্গিতে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে বললেন, 'উও গাড়িকে পিছে-পিছে চলিয়ে, মগর জ্যাদা নজ্‌দিগ্‌ মত্‌ যা না।'

ওদিকের রাস্তায় গাড়ি, ট্যাক্সির সংখ্যা বিশেষ ছিল না, এদিকের দুটি যানের সংখ্যাই বেশি। মারোয়াড়ি ভদ্রলোক ড্রাইভারের সিটের পিছনে হাত রেখে সামনের ওই অ্যাম্বাসাডারটার ওপর চোখ রেখেছিলেন, মাঝেমধ্যে নির্দেশ দিচ্ছিলেন, 'ঔর থোড়া আগে চলিয়ে।' কখনও বলছিলেন—'হাঁ-হাঁ, ব্যস্‌—ব্যস্‌।'

অ্যাম্বাসাডার একসময় আড়িয়াদহ এলাকার দোতলা একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে পেছনের ট্যাক্সি গিয়ে দাঁড়াল একটু দূরে।

অ্যাম্বাসাডারের যাত্রী গাড়ি থেকে নামলেন না। বারদুয়েক হর্ন বাজতেই দোতলা বাড়ির একতলা থেকে বছর কুড়ি-বাইশের এক যুবক বেরিয়ে এল, হাতে একটা স্যুটকেস। ছেলেটির পেছনে বিধবা এক ভদ্রমহিলা। ডিকিতে স্যুটকেস রেখে গাড়িতে এসে বসল ছেলেটি। ভদ্রমহিলার দিকে যাত্রী-দুজন হাত নাড়ার মধ্যেই গাড়ি উলটো দিখে মুখ ঘোরাল, তারপর যে পথে এসেছিল সেই পথেই ছুটতে শুরু করল আবার। গাড়ির পেছনে আগের সেই ট্যাক্সিটা। পিছনের সিটের মারোয়াড়ি ভদ্রলোকের চোখ প্রায় স্থির হয়ে ছিল অ্যাম্বাসাডরের ওপর।

পথে দুবার ট্রাফিক সিগ্‌ন্যালে, আর একবার ছোট একটা জ্যামে—এ ছাড়া আর কোথাও দাঁড়াতে হয়নি ওই দুটো গাড়িকে। দুটো গাড়িই শেষে হাওড়া স্টেশনের প্লাটফর্মের সামনের রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

সামান্য আগে-পরে, সামান্য ব্যবধানে, দু-গাড়ির তিন যাত্রীই নেমে পড়ল।

টনব্যাক্সির কেতাদুরস্ত ওই মানুষটির পাশে হাতে স্যুটকেস-ঝোলানো ছেলেটি। একটু পেছনে মারোয়াড়ি ভদ্রলোক। যাত্রীদের বেশ বড় একটা দল চলেছিল ওদিকের একটা ট্রেনের দিকে।

ট্রেন যাতায়াতের বিস্তারিত খবর ওই তো মাথার ওপরে বোর্ডে লেখা। মারোয়াড়ি

ভদ্রলোক জানতে পারলেন ওই দুজন যাত্রীর পিছু-পিছু যে ট্রেনটার কাছাকাছি তিনি পৌঁছে গেছেন সেটার নাম করমণ্ডল এক্সপ্রেস। ছাড়বে আর মাত্র মিনিট-পনেরো বাদেই।

তিন নম্বর কোচের গায়ে সাঁটা রিজার্ভেশন চার্টে চোখ বুলিয়ে হাতে-স্যুটকেস যুবকটি সঙ্গের মাঝবয়সী কেতাদুরস্ত মানুষটিকে হাত-মুখ নেড়ে যা বলল তার মধ্যে কোনও জটিলতা নেই। মোটাসোটা এক যাত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে এদিকেই চোখ রেখেছিলেন মারোয়াড়িটি। উনি বুঝলেন, ছেলেটি বলছে—রির্জাভেশন চার্টে নাম আছে, সুতরাং কোনও সমস্যা নেই।

এ ট্রেনটির বেশ সুনাম আছে। দৌড় হাওড়া থেকে মাদ্রাজ পর্যন্ত। মধ্যে মাত্র কয়েকটি স্টপ।

মারোয়াড়ি ভদ্রলোক একটু বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। হাতের পেটমোটা ব্যাগ নামিয়ে রেখে রুমাল দিয়ে চোখমুখ, ঘাড়-গলার ঘাম মুছলেন। কয়েকটি মাত্র মুহূর্ত, তার মধ্যেই কেতাদুরস্ত মানুষটি ছেলেটির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ভিড়ের মধ্যে মিশে গিয়েছিলেন।

চোখমুখ মুছে মারোয়াড়িটি এদিকে তাকাতেই দেখেন দুজনের জায়গায় একজন। কোথায় গেল বাকি মানুষটা? মিনারেল ওয়াটার কিংবা বিস্কুটের প্যাকেট কিনতে? নাকি কোনও ম্যাগাজিনের খোঁজে?

ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি। প্ল্যাটফর্মের ভিড় খুব বেড়ে গেছে। ট্রেনের কাছাকাছি মানুষজনের যে দু-তিনটে সারি আছে, তাদের মধ্যে বেশ কিছু মানুষ উঠে পড়বে ট্রেনে, বাকিরা হাত নাড়বে প্ল্যাটফর্ম থেকে। কত লোক, কিন্তু এদের মধ্যে সেই মানুষটি কোথায়? এখনও তো ফিরলেন না। ট্রেন ছেড়ে দেবে এক্ষুনি। মারোয়াড়ি ভদ্রলোক বেশ চঞ্চল হয়ে চারদিকে তাকাচ্ছিলেন। ট্রেনের দরজার পাশেই হাতে স্যুটকেস-ঝোলানো ছেলেটি।

একটু পরে বাঁশি বাজল ট্রেনের, সবুজ পতাকা উড়ল; তার পরেই মৃদু একটা ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করল ট্রেন।

ওই মারোয়াড়ি ভদ্রলোকের জন্যে সবচেয়ে বড় চমকটা বুঝি অপেক্ষা করছিল এতক্ষণ। উনি অবাক হয়ে দেখলেন স্যুটকেস-হাতে ছেলেটি ট্রেনের সঙ্গে কয়েক পা হাঁটার পরে হঠাৎই সরে এল এদিকে, ট্রেনে উঠল না। ট্রেনের গতি বাড়ছিল আস্তে আস্তে। কয়েক মুহূর্ত বাদে গোটা ট্রেনটাই সবার চোখের আড়ালে চলে গেল। এই ট্রেনেরই যাত্রী ওই ছেলেটি স্যুটকেস প্লাটফর্মে নামিয়ে রেখে বেশ নিশ্চিন্ত ভঙ্গিতে একটা সিগারেট ধরাল।

যারা প্রিয়জনদের ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিল তাদের ভিড় এবার হালকা হতে লাগল আস্তে আস্তে। একটু বাদে ওই ছেলেটিও পিছু নিল ওই দলের। এক হাতে স্যুটকেস, অন্য হাতে সিগারেট। মাঝেমধ্যে স্যুটকেসটা ও দুলকি চালে নাড়াচ্ছিল।

প্ল্যাটফর্ম থেকে বেরিয়ে এসে ট্যাক্সির লাইনে দাঁড়িয়েছিল ছেলেটি। লাইন খুব একটা লম্বা নয়। ও ট্যাক্সি পাওয়ার ঠিক পরের ট্যাক্সিটা পেলেন ওই মারোয়াড়ি। দুটো ট্যাক্সি সামান্য দূরত্ব বজায় রেখে একই পথে ছুটে চলেছিল।

মিনিট-পঁয়ত্রিশ ছোটার পরে প্রথম ট্যাক্সিটা একটা নির্জন পার্কের পাশ দিয়ে নিরিবিলি এলাকার একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। পেছনের ট্যাক্সি দাঁড়াল একটু দূরে। প্রথম ট্যাক্সির যাত্রী ভাড়া মেটাল। মেটাতেই ট্যাক্সিটা মুখ ঘুরিয়ে ছুট লাগিয়েছিল আগের পথে।

সামান্য দূরের দ্বিতীয় ট্যাক্সিতে বসে বসেই ওই মারোয়াড়ি ভদ্রলোক ভাড়া মেটালেন, তারপর ট্যাক্সি থেকে নামলেন। ট্যাক্সি একটু এগিয়ে অন্য যাত্রীর আশায় একটা গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াল। এ রাস্তায় লোকজন খুবই কম, ভদ্রলোক সামান্য হেঁটে গিয়ে দাঁড়ালেন ওই ট্যাক্সির আড়ালেই। এখান দিয়ে বাস যায় কি না কে জানে, তবে রাস্তার ধারে যে ভাবে দাঁড়িয়েছেন—তাতে মনে হবে উনি বুঝি বাসের জন্যেই অপেক্ষা করছেন।

দুপুর শেষ হয়ে বিকেল শুরু হয়েছে। প্রথম বিকেল। আকাশের রোদ ম্লান হয়ে গেছে। তবে একদম হাওয়া নেই। চারদিকে বেশ কিছু গাছপালা, কিন্তু কোনও গাছের মগডালের পাতাও নড়ছে না।

হঠাৎই উলটোদিকের বাড়ি থেকে পরমাসুন্দরী একটি মেয়ে বেরিয়ে এসে হনহন করে রাস্তা পেরোলো। এদিকে এলে দেখা গেল মেয়ে নয়, বউ। সিঁথিতে অল্প সিঁদুর, তার একটা রেখা আবার কপালেও নেমে এসেছে। বয়েস বেশ কম, বোধহয় সবে বিয়ে হয়েছে। ও সোজা এগিয়ে গেল স্যুটকেস হাতে ওই ছেলেটির কাছে। তারপর দু-একটা কথা বলেই ওরা জোর পায়ে হেঁটে এসে ট্যাক্সিটায় উঠে পড়ল। ট্যাক্সি ছুটতেই মারোয়াড়ি ভদ্রলোক ব্যাকুল হয়ে চারদিকে তাকালেন। না, আর কোনও ট্যাক্সি নেই এখানে। ওদিকে ঠিক সেই মুহূর্তেই ওপাশের গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে একটা মোটর-সাইকেল ছুটে গেল ওই ট্যাক্সির দিকে। মারোয়াড়িটির মনে হল, মোটর-সাইকেলটা ওই ট্যাক্সির পিছু নিয়েছে। একটু বাদে দুটি যানই মিলিয়ে গেল পথের বাঁকে।

মারোয়াড়ি ভদ্রলোক নিষ্কর্মা লোকের মতো কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন চুপচাপ, তারপর রাস্তা পেরিয়ে ওদিকে গেলেন। যে বাড়ি থেকে অল্পবয়েসী ওই বউটি বেরিয়েছিল সেই বাড়ির ঠিকানা লেখা ছিল গেটের একধারে লাগানো পাথরের ফলকে। পকেট থেকে ছোট একটা নোটবুক বার করে ওই নাম-ঠিকানা দ্রুত টুকে নিয়ে সামনের দিকে লম্বা পায়ে হাঁটা দিলেন উনি।

এই শহরের আকাশ থেকে সকাল-বিকেল-সন্ধে এক নিয়মেই নামে, কিন্তু আকাশের নীচের এই বাড়িগুলোর ভেতরের ছবি আলাদা—আলাদা ধরনের; একটার সঙ্গে আর একটার মিল খুঁজে পাওয়া যায় না তেমন।

একটা রেস্টুরেন্টে ঢুকে মনের আনন্দে চপ—কাটলেট আর চা খেয়ে মারোয়াড়ি ভদ্রলোক যখন একটা বাসে উঠলেন তখন কলকাতায় বেশ গাঢ় একটা সন্ধ্যা নেমে গেছে।

ওদিকে শোভাবাজারের বিশাল এক অট্টালিকার দোতলার মস্ত এক মিটিংরুমে চারজন বসে আছেন। এ-ঘরে যিনি প্রথম আসবেন তাঁকে চোখ ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে ঘরের চারদিক বেশ কিছুক্ষণ ধরে দেখতে হবেই। ঘরের মধ্যে এক-দেড়শো বছরের কলকাতা ধরা আছে নিখুঁত

ভাবে। অসামান্য কারুকার্য-করা মেহগনির আসবাবপত্র। দেওয়ালে কলকাতার প্রথম যুগের সাহেব-পেন্টারদের আঁকা মস্ত-মস্ত ছবি। মাথার ওপর বনেদি বাড়ির বাহারি ঝাড়লণ্ঠন। ঝাড়লণ্ঠনের মধ্যে অবশ্য লুকনো আছে হালের বৈদ্যুতিক আলো। দেওয়ালের দু-কোনায় কালো রঙের দুটো তেপায়া টেবিলের ওপর আছে এ-বাড়ির প্রাচীন দুই রায়বাহাদুরের মানপত্র। একটা শোকেসে পুরনো দিনের নানা শো-পিস।

দরকারি একটা কথা সেরে নেওয়ার পরে ডক্টর জ্যোতি মৈত্র পাশের চেয়ারে বসা সুদর্শন যুবকটিকে বললেন, 'এঁদের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দিই। ইনি আমার ইয়াং ফ্রেণ্ড কৌশিক। আর ইনি কিশোর চৌধুরী, এ বাড়ির মালিক। ইনি মিস্টার চৌধুরীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু দিব্য মল্লিক।' তিনজনে নমস্কার বিনিময় করলেন।

ডক্টর মৈত্র হাসতে হাসতে কৌশিককে বললেন, 'আমরা সবাই মোটামুটি এক পথের পথিক। আমরা চাই পুরনো কলকাতার ভাল-ভাল সব জিনিস—তা বাড়ি হোক, মূর্তি হোক, ছবি হোক—যেগুলো এখনও টিকে আছে, সেগুলো ঠিকমতো বেঁচে থাকুক। যা ভেঙেছে বা নষ্ট হয়েছে, তা এক্সপার্টদের দিয়ে সারিয়ে তুলতে হবে। এগুলোর সঙ্গে সঙ্গে পুরনো বাংলা মানে সেই প্রাচীন গৌড়ের আর্কিটেকচারের সংস্কার করাও আমাদের কাজের মধ্যে পড়ে। তবে এ কাজ তো বিশাল। দু-পাঁচজন দু-পাঁচ বছরে সেরে ফেলতে পারবে না। গাভমেণ্ট, ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে একসঙ্গে। জনসাধারণকে সচেতন করতে হবে। প্রতিটি লেভেলে অ্যাওয়ারনেস বাড়িয়ে তুলতে হবে। আমি নিজের কথা বলছি। পঁচিশ বছর একটানা বিদেশে ছিলাম। আমাদের মতো সাধারণ মানুষ ও-দেশে গেলে যা হয় তাই হয়েছিল। ফানমেকিংয়ে মজে গিয়েছিলাম। কিন্তু শেষের দিকে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম ভীষণ। আর একটা জিনিস তৈরি হয়েছিল, যাকে বলে শেকড়হীন হওয়ার কষ্ট। নিজের দেশের মাটি কত হাজার মাইল দূরে পড়ে আছে, আর আমি কি না—। ঠিক এই সময় স্বামী বিবেকানন্দের একটা বই আমার হাতে এসে পড়েছিল। সেই যে বিখ্যাত সেই বক্তৃতা, যেখানে বিবেকানন্দ বলেছেন : হে ভারত-সন্তানগণ, আমি তোমাদের কয়েকটা কাজের কথা বলতে এসেছি। ভারতভূমির পূর্ব গৌরব স্মরণ করিয়ে দিয়ে আমি তোমাদের প্রকৃত কাজের পথে ডাকছি। লোক বলে, পূর্ব গৌরব স্মরণে মনের অবনতি হয়, কাজের কাজ কিছু হয় না। আসল কাজ হল ভবিষ্যতের দিকে চোখ রেখে কাজ করা। সত্যি কথা। কিন্তু এটাও তো ঠিক, অতীতের গর্ভেই ভবিষ্যতের জন্ম। প্রথমে জানতে হবে আমরা কী, কোন্ রক্ত আমাদের শরীরে বইছে। নতুন ভারত গড়তে হলে অতীত মহত্ত্বের চেতনা থাকা দরকার। বিবেকানন্দের এই কথাগুলো আমার জীবনে তখন যে কী মন্ত্রের মতো কাজ করেছিল—কী বলব! সেই সময় আমি সানফ্রান্সিসকোয়। এন্টারটেনমেন্টের দুটো রাস্তা আঁকড়ে ধরেছিলাম। এক হচ্ছে পাব্ ক্রলিং, দুই হচ্ছে সেক্স-শপ ট্রিপ্স। ওই ভাবে আরও কিছুদিন চললে হয় পঙ্গু হতাম, নয় মরতাম। ওই সময় আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিল বিবেকানন্দের ওই লেখাটি।

ঠিক করলাম নিজের গৌরবময় ঐতিহ্যকে জানব, নিজেকে চিনব ; আর ভবিষ্যতের জন্যে বড় কিছু করার চেষ্টা করব।'

হঠাৎই ডক্টর মৈত্র কথা থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এটা আমার কাছে এমনই একটা বিষয় যে, এ নিয়ে কিছু বলতে গেলে আমি একটু ইমোশনাল হয়ে পড়ি।'

কিশোর চৌধুরী সমর্থনের গলায় বললেন, 'যে কোনও ভাল কাজেই মানুষ একটু আবেগপ্রবণ হয়, বিশেষ করে সে কাজে যদি তার মনের সায় থাকে। আপনি কত বড় কাজ করতে যাচ্ছেন, আর তাতে একটু উত্তেজনা থাকবে না! আমাদের বাড়ির নাটমন্দির, ঠাকুরদালান একদিন দেখাব আপনাকে। এখন পায়রা আর চামচিকের বাসা হয়েছে, কিন্তু ওখানে দাঁড়ালে আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে। মনে হয়, পূর্বপুরুষদের পায়ের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। চোখের সামনে সব কিছু ভেঙেচুরে পড়ছে, অথচ সত্যি কথা বলতে কী, সারাবার সঙ্গতি নেই।'

অভয় দেওয়ার গলায় ডক্টর মৈত্র বললেন, 'ও নিয়ে আপনি আর দুর্ভাবনা করবেন না, আমরা কলকাতার পুরনো সব বিল্ডিং সারাবার যে স্কিম নেব তার মধ্যে এটাও থাকবে।'

দিব্য মল্লিকের গায়ে কাজকরা-পাঞ্জাবি, পরনে সরু পাজামা। পানের রসে ঠোঁট লাল। মৃদু হেসে অসম্ভব ফর্সা মানুষটি বললেন, 'শুধু পুরনো বাড়িটাড়ি সারালেই দায় মিটছে না, আমাদের পুরনো সংস্কৃতিকেও ফিরিয়ে আনতে হবে সেই সঙ্গে।'

কৌশিক আলোচনার মধ্যে বেশ ডুবে গিয়েছিল। জিজ্ঞেস করল, 'পুরনো সংস্কৃতি মানে আপনি কিসের কথা বলছেন?'

'সব। তর্জা, কবিগান, সঙের মেলা—সব। এর মধ্যে ভালমন্দ বলে কিছু নেই, নির্বিচারে সব কিছু ফিরিয়ে আনতে হবে। এমনকী গালাগালির ভাষা পর্যন্ত।'

'গালাগালির ভাষা?'

'হ্যাঁ গালাগালও। বাঙালির সংস্কৃতি গোল্লায় যেতে বসেছে। সব কিছু ফিরিয়ে এনে আর একবার ঝাঁপ দিতে না পারলে কিছুই রক্ষা করা যাবে না। সেই আমলে কোনও মহিলা যখন চটে গিয়ে বলে উঠতেন—অলপ্পেয়ে ড্যাকরা মিন্‌সে—। কিংবা কোনও পুরুষ যখন হুংকার ছাড়তেন—তবে রে কড়ে রাঁড়ি। আহা! কী ফোর্সফুল ভাষা ছিল তখন! ভাষা তো সংস্কৃতির অঙ্গ। তাই না?'

দিব্য মল্লিক ডক্টর মৈত্রের দিকে তাকিয়ে সায় চেয়েছিলেন, কিন্তু উনি কিছু বললেন না। একটু দমে যাওয়ার পরে দিব্য মুখ খুললেন আবার। 'সে আমলে বড় মানুষরা বেড়ালের বিয়েতে লাখ লাখ টাকা খরচ করত—এটা নিশ্চয়ই বাড়াবাড়ি। তবে ব্যাপারটা কিন্তু বেশ ছিল। আপনি যাই বলুন আর তাই বলুন, এই সব রীতিনীতিও কিন্তু বাঙালির ঐতিহ্যের সঙ্গে মিশে গেছে। আর, ঐতিহ্যের সঙ্গে তো সংস্কৃতির ষোলো আনা যোগ।'

ডক্টর মৈত্র মৃদু হেসে বললেন, 'ঠিক আছে, বেড়ালের বিয়ে দেওয়ার কথা পরে ভাবব

আমরা। উপস্থিত আমাদের প্রধান কাজ হল, কলকাতার গর্ব করার মতো পুরনো বাড়িঘরগুলো আবার আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা। সামান্য ভাঙাচোরা প্রাচীন মূর্তি আর নষ্ট-হওয়া পেন্টিংগুলো রেস্টোর করার কাজও চালাতে হবে সেই সঙ্গে। কৌশিকের সঙ্গে কথা হয়েছে আমার। ইয়াং ম্যান, এন্টারপ্রাইজিং—উনিও এ-ব্যাপারে সাহায্য করবেন আমাদের, বিশেষ করে ছোটাছুটির কাজ আছে যেখানে।'

কৌশিক সঙ্গে সঙ্গে সায় দিল ডক্টর মৈত্রের কথায়।

ডক্টর মৈত্র বহু দূরের দিকে চেয়ে থাকার ভঙ্গি করে বললেন, 'ব্যাপারটা কী জানেন—ইংরেজদের কাছে যেমন লণ্ডন, ফরাসিদের কাছে যেমন প্যারিস, রুশদের কাছে যেমন পিটার্সবুর্গ, আইরিশদের কাছে যেমন ডাবলিন, তেমনি বাঙালিদের কাছে কলকাতা। এই কলকাতাকে তার সমস্ত অতীত গৌরব নিয়ে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।'

ডক্টর মৈত্রের কথায় একসঙ্গে মাথা নাড়ল ঘরের বাকি তিনজন।

কিশোর চৌধুরীর চেহারা ভারী সুন্দর। পাতলা, ছিপছিপে। গায়ের রং ফর্সার দিকে। কালো, কোঁকড়ানো চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। ভাসা-ভাসা চোখ। গায়ে ফিতে-বাঁধা পাঞ্জাবি। কেন জানে না, কৌশিকের বারবার মনে হচ্ছিল, মানুষটা যে-কোনও মুহূর্তে পকেট থেকে ছোট্ট একটা বাঁশের বাঁশি বার করে ফুঁ দেবে। বয়েস ত্রিশ-বত্রিশ। বন্ধু দিব্য মল্লিকের বয়েসও ওইরকম। গলার সরু সোনার চেনে হাত বোলাতে বোলাতে কিশোর বোধহয় কলকাতাবাসী বাঙালির পবিত্র কর্তব্যের কথা ভাবছিল।

পুরনো দিনের জিনিসপত্তরে সাজানো বসার ঘরে ডক্টর মৈত্রের কথায় বেশ একটা ভাবগম্ভীর পরিবেশ তৈরি হয়েছিল বোধহয়। কিশোর চৌধুরী কেমন যেন নিজের খেয়ালে বলতে শুরু করলেন, 'আমাদের এ-বাড়িটা তৈরি হয়েছে আজ থেকে দেড়শো বছর আগে। বাগান-টাগান নিয়ে তেরো বিঘের ওপর বাড়ি। শুনেছি, আমার ঠাকুর্দার আমলে এ-বাড়িতে ভারা বাঁধা থাকত সারা বছর। কেন জানেন? একদল খুব ভাল কারিগর, রাজমিস্ত্রী পাওয়া গিয়েছিল তখন। এ বাড়ির বাইরে দিকে যে সব কারুকাজ আছে সেসবের বেশির ভাগ তাদেরই করা। তা, চৌধুরীকর্তা ঠিক করেছিলেন, ওদের হাতছাড়া করা চলবে না। পাকা আর্টিস্টের কাজ, যথেষ্ট সময় না দিলে উঁচু দরের কাজ তারা কীভাবে করবে! শুনেছি, এ বাড়িতে তারা একটানা সাত বছর কাজ করে গিয়েছিল। আমাদের বাড়ির নক্‌শা বানিয়েছেন তখনকার একজন বিখ্যাত ইংরেজ আর্কিটেক্ট। নাম ব্ল্যানফোর্ড। শুনেছি তাঁকে অ্যাসিস্ট করেছিলেন সে আমলের বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার হরিজীবন মিটার। ব্ল্যানফোর্ডের একটা বাড়তি খ্যাতি ছিল চোরাকুঠুরি বানাবার ব্যাপারে। আসলে সে আমলের বড় মানুষরা নাকি ধনরত্ন রাখার জন্যে বাড়িতেই একটা চোরাকুঠুরি বানাতেন। তবে আমার ঠাকুর্দার ওই ঘরে কিছুই থাকত না বোধহয়। যা ছিল তার সবই তিনি স্থাপত্য, ভাস্কর্য

আর পেন্টিংয়ের পেছনে খরচা করে বসলেন। ভালই করেছিলেন। টাকা জমিয়ে আর বিষয় বাড়িয়ে হতটা কী! আমার একটাই আফসোস, যখন দেখি মহামূল্যবান এই সব জিনিস বাঁচিয়ে রাখতে পারছি না।'

আর একবার অভয় দিলেন ডক্টর মৈত্র। 'বললাম তো, এ নিয়ে আর ভাববেন না। এ সব রক্ষা করার দায়িত্ব এখন আমাদের সবার।'

কথাবার্তা একই খাতে আরও কিছুক্ষণ গড়াবার পরে ডক্টর মৈত্র বললেন, 'আমি এ-ব্যাপারে একটা প্রজেক্ট রিপোর্ট তৈরি করাচ্ছি, এটা অবশ্য ফার্স্ট ফেজ। রিপোর্ট তৈরি হয়ে গেলে কয়েকজন ইণ্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আর গাভ্মেন্টের সঙ্গে কথা বলব এ নিয়ে।'

অন্য একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে বলে উঠে পড়লেন ডক্টর মৈত্র। কৌশিকও বিদায় নিল। কিশোর চৌধুরী খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে কৌশিককে বললেন, 'আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল আপনার সঙ্গে। খুব ভাল লাগল। যখন খুশি চলে আসবেন, কোনও সঙ্কোচ করবেন না। আমাদের ভাল-লাগা দেখছি একই ধরনের। পরাধীন ভারতে জন্মালে দেশোদ্ধার করতাম, এখনকার কাজটা হল কলকাতা উদ্ধার।'

দিব্য মল্লিক হাসতে হাসতে বললেন, 'যাত্রাটাত্রা করার অভ্যেস আছে? অবিশ্যি না এলেও কিছু এসে যায় না—চেহারা সুন্দর, শিখিয়ে-পড়িয়ে নেব। তবে এ যাত্রা শহুরে যাত্রা নয়, একেবারে প্রাচীন গ্রাম্য যাত্রা। সেই যে, যে যাত্রায় রামচন্দ্র দড়ি মেপে আসর বানিয়ে অভিনয় করতে উঠত—সেই যাত্রা। এই যাত্রার দল নিয়ে আমি দেশ-বিদেশে শো করে দেখিয়ে দেব—আসল যাত্রার দল কাকে বলে।'

হাসির মধ্যে আর এক দফা বিদায়-পর্ব।

রাস্তায় বেরিয়ে নিজের গাড়ির সামনে গিয়ে ডক্টর মৈত্র বললেন, 'আপনাকে কোথায় নামাব বলুন।'

এড়াবার জন্যে কৌশিক বলল, 'না-না, তার দরকার হবে না। আমার এদিকে একটু দরকার আছে। আপনি আসুন। আমি পরে আপনার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করব।'

অমায়িক ভঙ্গিতে হেসে ডক্টর মৈত্র জবাব দিলেন, 'নিশ্চয়ই করবেন। আমাদের এরিয়া অব ইন্টারেস্ট এক, যোগাযোগ তো রাখতেই হবে।'

কৌশিক হঠাৎ বলল, 'ও ভাল কথা, আপনি তো ইউ কে-র বাসিন্দা—। আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু এ মাসের শেষে লণ্ডনে যাচ্ছে, আপনি কি ওর থাকার ব্যাপারে— মানে শস্তায় কোনও ভাল অ্যাকোমোডেশন—।'

কৌশিকের কথা থামিয়ে ডক্টর মৈত্র বলে উঠলেন, 'ওখানে—থাকাটা কোন ব্যাপারই নয়, লণ্ডনের বেকার স্ট্রিটে আমার একটা অ্যাপার্টমেণ্ট আছে, আপনার বন্ধু অনায়াসে ওখানে থাকতে পারেন। আমি কেয়ারটেকারকে ফোন করে বলে দেব।'

'ঠিকানাটা?'

'এক্ষুনি লিখে দিচ্ছি।'

রাস্তার আলোর একটা ফালি এসে পড়েছিল ওখানে। পকেট থেকে কাগজ কলম বার করে ওই সামান্য আলোতেই ঠিকানাটা লিখে ফেললেন ডক্টর মৈত্র। তারপর কাগজটা কৌশিকের দিকে বাড়িয়ে ধরার পরেই কেমন চমকে গিয়ে বললেন, 'না, এটা তো এখন দেওয়া যাবে না। আমার এক বন্ধু পিটারের তো ওই সময় বার্মিহাম থেকে লণ্ডনে এসে আমার অ্যাপার্টমেন্টে ওঠার কথা। যাকগে, থাকাটা কোনও প্রবলেম হবে না। আমি আর একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারব। পজিশনটা জেনে নিয়ে শিগ্‌গিরই জানাচ্ছি।'

ডক্টর মৈত্র চলে গেলেন। আর চলে যেতেই গোয়েন্দা পকেটে থেকে নোটবই বার করে বেকার স্ট্রিটের ঠিকানাটা লিখে ফেলল। রাস্তার আলোয় তেমন জোর না থাকার জন্যেই বোধহয় ডক্টর মৈত্র বড় বড় হরফে ঠিকানাটা লিখেছিলেন। পাশে দাঁড়িয়ে গোয়েন্দা ঠিকানাটা দেখেছিল। ওর মাথা খুব সাফ, একটা ঠিকানা মনে রাখা ওর কাছে কোন সমস্যাই নয়।

সাত

গতকাল কী নিখুঁত ভাবে এক মারোয়াড়ি ভদ্রলোক ছায়ার মতো অনুসরণ করেছিল দুজনকে, তার বিস্তারিত বিবরণ দিলেন মুখার্জিবাবু। গোয়েন্দা খুব মনোযোগের সঙ্গে সব কিছু শুনল। শুনতে-শুনতে এবং শোনার পরেও বিস্তর প্রশ্ন করল তার প্রবীণ সহযোগীকে। দু-বাড়ির দুই ঠিকানার দিকে তাকাল বারবার। এই দুই ঠিকানার একটি থেকে বেরিয়েছিল ওই ছেলেটি, আর একটি থেকে ওই মেয়েটি। মুখার্জিবাবু লক্ষ করে দেখেছেন, সব কিছু শোনার সময় কৌশিকের মুখচোখের ভাবভঙ্গি পালটেছে বেশ কয়েকবার। চোখের তারায় ঝিলিক খেলা ও কপালে ভাঁজ ফোটার সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না।

কাহিনী শোনানো এবং প্রশ্নোত্তরে ঘন্টাদেড়েক কেটে যাওয়ার পরে মুখার্জিবাবু একটু ছটফটে গলায় বলে উঠলেন, 'কাল যা জব্বর একটা মারোয়াড়ির ছদ্মবেশ ধরেছিলাম না, আপনি দেখলেও চট করে আমাকে চিনতে পারতেন কি না সন্দেহ।'

মৃদু একটা হাসি ফুটে উঠেছিল গোয়েন্দার মখে। 'সুনন্দ তরফদার চিনতে পারেনি তো?'

'না-না, কোনও প্রশ্নই ওঠে না। ও অবশ্য দু-চারবার আমার দিকে তাকিয়েছিল, কিন্তু তা ঠিক তাকাব বলে তাকানো নয়। ওই যে পথ চলার সময় চারদিকে আমরা যে ভাবে তাকাই না, অনেকটা সেই রকম দৃষ্টি—।'

'কথাবার্তা আর কিছু শুনতে পাননি?'

'না, যা শুনেছি তা ওইটুকুই। কথা শুনে বুঝলাম এঁড়েদার ওই ছেলেটি সুনন্দর ছোট ভাই। ছেলেটা কিন্তু আজব। ইচ্ছে করে ট্রেনে উঠল না। হয়তো ম্যাড্রাস যাওয়ার কথা ছিল। দাদা ট্রেন ছাড়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলে এই কাণ্ডটা কিন্তু করতে পারত না।'

'পারত, তবে একটু ধকল বাড়ত ছোট ভাইয়ের। পরের স্টেশনে নেমে পড়ত। কর-মণ্ডলে হাওড়ার পরের স্টপ বোধহয় খড়্গপুর। ওখানে নেমে লোকাল ট্রেন ধরে ফিরে আসত।'

'তা অবিশ্যি। তবে ওই সুন্দরী বউটা বোধহয় সেজেগুজে ওর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। ছোকরা যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে এল।'

মেয়েটির প্রসঙ্গ উঠতেই গোয়েন্দার কপালে আবার একটা ভাঁজ পড়ল। মুখার্জিবাবুর দেওয়া ঠিকানা-লেখা কাগজে দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, ওই মেয়েটির গালে কী আছে? তিল না আঁচিল?'

'মেয়েটি না, বউটি। তিল না আঁচিল? এ তো দেখছি আপনি আমাকে ধাঁধায় ফেলে দিলেন।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে গোয়েন্দা বলল, 'আপনি যে দূরত্ব থেকে দেখেছেন তাতে মনে হয়, তিল নয় আঁচিলই।'

অপ্রস্তুত মুখে জবাব দিলেন মুখার্জিবাবু, 'তা হতে পারে।'

'আচ্ছা, এবার বলুন, আঁচিলটা বাঁ গালে না ডান গালে?'

'মহা মুশকিলে ফেললেন দেখছি। এই নিয়ে প্রশ্ন করবেন আগে থেকে জানলে তো—। আচ্ছা, আঁচিল ডান গালে না বাঁ গালে—এটা জানতে চাইছেন কেন?'

'পরিষ্কার একটা আইডেন্টিফিকেশন মার্ক জানার জন্যে। ওই যেমন বললেন না, এঁড়েদার ওই ছেলেটির দাঁতের ওপরের পাটির সামনের দিকে একটা গজদন্ত আছে।'

মাথা চুলকে মুখার্জিবাবু বললেন, 'আমি বউটিকে কাছ থেকে যখন প্রথম দেখলাম তখন ও রাস্তা পেরিয়ে এদিকে এসেছিল, মানে বাঁদিকে। তার মানে আঁচিল আছে—। না-না, ট্যাক্সিতে ওঠার সময় তো ডানদিক থেকে উঠল, তা হলে কি ডানদিকে?'

কৌশিক মৃদু হেসে বলল, 'ঠিক আছে, আন্দাজে কিছু বলার দরকার নেই। সব মিলিয়ে আপনার কাল্লকের কাজ কিন্তু অসাধারণ হয়েছে।'

গোয়েন্দার প্রশংসায় মুখার্জিবাবুকে বেশ খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল। লাজুক হেসে বললেন, 'আসলে ভাল ছদ্মবেশ ধরতে পারলে গোয়েন্দাগিরিতে বেশ একটা উৎসাহ এসে যায়। ওই মেক-আপই তখন বুঝি প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দেয়—একটা বড় কাজ করার জন্যে তুমি যা নও, তাই সেজেছ।'

বেশ তারিফ করার গলায় কৌশিক বলল, 'বাহ্। ভাল বলেছেন তো। ভেক না ধরলে ভিখে মেলে না—এই কথাটার আর একটা মানে পাওয়া গেল আপনার কথা শুনে। কিন্তু একা-একা মারোয়াড়ির জব্বর মেক-আপ আপনি ধরলেন কী ভাবে?'

এবার আগের চাইতেও ঢের বেশি লাজুক দেখাল মুখার্জিবাবুকে। 'আর বলবেন না, পেট চালাবার জন্যে সারা জীবনে তো কম ধান্দা করলাম না। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ—সব করেছি। তা, এই ধান্দাটায় একটু মনের সায় ছিল; আসলে প্রথম যৌবনের পথের সঙ্গে মিল ছিল তো।'

কৌশিক একটু হেসে জিজ্ঞেস করল, 'এত লজ্জা পাচ্ছেন কেন? অভিনয়-টভিনয় করতেন নাকি?'

একগাল হেসে মুখার্জিবাবু বললেন, 'ঠিক ধরেছেন, তবে সে সব ছিল গাঁয়ের দিকের যাত্রাপালার অভিনয়। সেই সুবাদে একটু মেক-আপ করার কাজ শিখেছিলাম। পরে একটু ঘষামাজা করার ফলে এই বিদ্যেটাই কাজে লেগে গিয়েছিল। আমি একটা নট্ট কোম্পানিতে বছরদুয়েক মেক-আপ ম্যানের কাজ করেছিলাম।'

গোয়েন্দা রীতিমত বাহবা দেওয়ার গলায় বলে উঠল, 'বাহ্! আপনার এই বিদ্যেটা তো আমাদের পেশায় খুব কাজে লেগে যাবে। তা, নট্ট কোম্পানিতে আপনি অভিনয় করতেন না?'

মুখার্জিবাবু জিভ কেটে বললেন, 'কী যে বলেন, অ্যাক্টিং করা কি সোজা জিনিস! এ তো আর গাঁয়ের পালা নয়—। ওই নট্ট কোম্পানিতে বেশ কয়েকজন বড়-বড় অ্যাক্টর-অ্যাকট্রেস ছিলেন। তা সেবার হয়েছে কী—।'

বেশ জমিয়ে গল্প বলার শুরুতেই টেলিফোন বেজে উঠল। ফোন ধরল গোয়েন্দা। ওপাশ থেকে কে কী বলতেই গোয়েন্দা ছিটকে সোজা হয়ে বসে বলল, 'কখন?'

লম্বা জবাব আসছিল ওদিক থেকে। কৌশিক মাঝেমধ্যে হুঁ-হ্যাঁ করছিল। ছোটখাটো প্রশ্নও। যেমন, 'কোথায়?' 'কোন্ থানার আণ্ডারে?' 'আপনি কী-ভাবে খবর পেলেন?' শেষে বলল, 'আপনি আসছেন? বেশ, আমি আছি।'

প্রশ্ন যত ছোট, উত্তর তত বড়। প্রশ্নের বাইরেও বহু কথা বলেছে টেলিফোনের ও-পাশের মানুষটি।

কথাবার্তার শেষে রিসিভার নামিয়ে রাখল গোয়েন্দা। ওকে অসম্ভব গম্ভীর দেখাচ্ছিল।

মুখার্জিবাবুর মুখে একগাদা প্রশ্ন ভিড় করে এসেছিল। কিন্তু উনি কিছু বলতে সাহস পাচ্ছিলেন না।

একটু বাদে গোয়েন্দা বলল, 'সুনন্দবাবুর জুনিয়র কোলিগ মিলন, মিলন মাইতির কথা মনে আছে আপনার?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, কেন মনে থাকবে না; সুনন্দ তরফদার যার ওপর খুব খাপ্পা—সেই মিলন তো। ভদ্দরলোকের ধারণা, মিলন ওর নামে মালিকের কাছে লাগায়। তাই না?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ওই মিলন কাল রাত্তিরে খুন হয়েছে।'

'অ্যাঁ! বলেন কী!' মুখার্জিবাবু চেয়ার থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন।

'হ্যাঁ, পরিষ্কার খুন। পিস্তলের নল মাথায় ঠেকিয়ে গুলি করা হয়েছে।'

'কিন্তু কেন? কারণ কিছু জানতে পারলেন? কে ফোন করেছিল আপনাকে?'

'কারণ এখনও কিছু জানা যায়নি। আমাকে ফোন করেছিলো সুনন্দ তরফদার।'

কথাটা শুনে আর একবার প্রায় আঁতকে উঠেছিলো মুখার্জিবাবু। 'সুনন্দ তরফদার, কিন্তু উনি জানলেন কী করে?'

জবাব দেওয়ার আগে আবার একটা টেলিফোন কল। রিসিভার তোলার আগে নিজের মনে কথা বলার ভঙ্গিতে কৌশিক বলেছিল, 'নির্ঘাত অলোক মৈত্র।' ঠিক তাই।

কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালিয়ে ফোন নামিয়ে রাখার পরে গোয়েন্দা বলল, 'মিস্টার মৈত্রকে বলতে পারলাম না, কোন সোর্স থেকে খবরটা আমি একটু আগেই পেয়ে গিয়েছি। আসলে মালিক এবং কর্মচারী দুজনেই আমার ক্লায়েন্ট। কিন্তু এদের দুজনের কেউই সেটা জানেন না।'

কথাটা বলার পরেই গোয়েন্দা ওর ডায়েরির পাতা ওলটাতে শুরু করে দিয়েছিল। একটু বাদে মুখার্জিবাবু বিড়বিড় করে বললেন, 'মানুষটাকে দেখিনি, তবে শুনেছি অল্প বয়েস। অল্প বয়েসের যে-কোনও মৃত্যুই খুব দুঃখের।'

মিনিট-পনেরোর মধ্যে ওখানে সুনন্দ তরফদার এসে হাজির হলেন। ভদ্রলোক পোশাক-আশাকে অত্যন্ত পরিপাটি, কিন্তু মুখের দিকে চাইলে মনে হবে কে যেন ওঁর মুখে এক বোতল কালি ঢেলে দিয়েছে।

সুনন্দ তরফদার কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এক মিনিটের জন্যে যদি বাইরে আসেন।'

সঙ্গে সঙ্গে কৌশিক চেয়ার ছেড়ে উঠে বাইরে গেল ওঁর সঙ্গে।

মুখার্জিবাবুর খুব খারাপ লাগল ব্যাপারটা। কৌশিক সেদিন আগ বাড়িয়ে বলেছিল—এর সামনে আপনি সব কথাই বলতে পারেন, ইনি আমার সহকারী। কিন্তু লোকটা সেদিনের সেই কথাটাকে একেবারেই গুরুত্ব দিল না আজ। মনে মনে সুনন্দ তরফদারের ওপর আর একবার চটে গেলেন মুখার্জিবাবু।

একটু পরে গোয়েন্দা ফিরে এল একা। সুনন্দ তরফদার চলে গেছেন। গোয়েন্দা বলল, 'ঘটনাটা ঘটেছে বারাসতের কাছে। কোম্পানির গাড়িতে যাচ্ছিল। গাড়ির ড্রাইভার পালিয়েছে। গাড়ি সিজ করা হয়েছে। মিলন মাইতির বডি পাঠানো হয়েছে পোস্ট-মর্টেমের জন্যে। আমি পুলিশের কাছ থেকে ঘুরে আসি একবার। যদি কোনও টেলিফোন-কল আসে, মেসেজ রাখবেন।'

মুখার্জিবাবু মাথা একপাশে কাত করতেই বেরিয়ে গেল গোয়েন্দা।

ফিরল দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পরে। চোখেমুখে বিস্তর ঘোরাঘুরির ছাপ। মুখার্জিবাবু বললেন, 'আপনি পাখার তলায় বসুন, ঘামটা শুকোন। চট করে একটু কফি নিয়ে আসি।'

'ফোনটোন কিছু এসেছিল?'

'এসেছিল কয়েকটা। কোনওটাই তেমন জরুরি নয়। সব নোট করে রেখেছি।' ছোট একটা ফ্লাস্ক নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন মুখার্জিবাবু।

একটু পরেই ফিরে এলেন কফি নিয়ে। গোয়েন্দার দিকে এক কাপ এগিয়ে দিয়ে নিজেও নিলেন কিছুটা।

গম্ভীর মুখে কফিতে চুমুক দিচ্ছিল গোয়েন্দা। মুখার্জিবাবু কিছুক্ষণ ওই গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বোঝার চেষ্টা করে বললেন, 'কিছু খাওয়াদাওয়া করার সময় পেয়েছেন, নাকি—।'

সামনের দিকে মাথা সামান্য ঝুঁকিয়ে গোয়েন্দা জানিয়ে দিল—হ্যাঁ, ও পার্ট তার মিটে গেছে। প্রবীণ সহকারীটি বিস্তর উত্তেজনা, কৌতূহল আর একগাদা প্রশ্ন নিয়ে তখন থেকে বসে আছেন। কিন্তু কোনও প্রশ্ন করার ভরসা পাচ্ছিলেন না। গোয়েন্দার ধরনধারণের সঙ্গে মানুষটি খুব ভাল ভাবেই পরিচিত। উনি জানেন, রহস্য সমাধানের জন্যে কৌশিকের মাথায় এখন নানা রকমের যোগ-বিয়োগ গুণ-ভাগ চলছে। এই সময় বিরক্ত করা ঠিক হবে না। সময় হলে আপনা থেকেই মুখ খুলবে।

ধীরে ধীরে কফি শেষ করার পরে সেই সময়টা এল। গোয়েন্দা বলল, 'পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট এখনও পাওয়া যায়নি, তবে পুলিশের অনুমান, কাল রাত্তির আটটা নাগাদ বারাসতের কাছে মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করে মারা হয়েছে মিলন মাইতিকে।'

'মিলন মাইতি কি ওই দিকেই থাকে?'

'না-না, ওদের কোম্পানি টনব্যাক্সি ওদিকের কয়েকটা হেল্‌থ সেন্টার, নার্সিং হোমে মেডিক্যাল ইকুপমেণ্ট সাপ্লাই করে। সাপ্লাই করার অন্য লোক আছে। তবে মিলন মাইতি মাঝেমধ্যে যেত পার্টিদের সঙ্গে যোগযোগ করার জন্যে । কালকেও ওই কাজেই যাচ্ছিল।'

'সঙ্গে আর কেউ ছিল?'

সেটা এখনও জানা যায়নি। গাড়ি চালাচ্ছিল ড্রাইভার, ড্রাইভার পালিয়েছে । ড্রাইভারের পালাবার কারণ বোঝা যাচ্ছে না। খুন কিন্তু গাড়িতে হয়নি। হয়েছে একটা ফাঁকা মাঠে একটা পোড়ো মন্দিরের পাশে। গাড়ি দাঁড় করানো ছিল বড় রাস্তার ওপর। খুনের জায়গাটা ছিল ওই গাড়ি থেকে কম করে পঞ্চাশ গজ দূরে। ড্রাইভার হয় ভয় পেয়ে পালিয়েছে, কিংবা খুনি ওকে তাড়িয়েছে। এমনও হতে পারে, ওই লোকটাও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত—।'

'লোকটা কি কোম্পানির ড্রাইভার নয়?'

'গাড়ি বাইরের মালিকের। কোম্পানিতে ভাড়া খাটে গাড়ি। ড্রাইভার নাকি নতুন।'

'গাড়ির মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়নি?'

'মালিক দেশে গেছে। ফেরার কথা কাল-পরশুর মধ্যেই।'

'অলোক মৈত্রের সঙ্গে দেখা হয়েছে আপনার?'

'হয়েছে। ভদ্রলোক খুব আপসেট হয়ে গেছেন। মিলনকে উনি খুবই পছন্দ করতেন। আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন : পুলিশ ইনকুয়ারি করছে, করুক। কিন্তু পাশাপাশি আপনি আপনার তদন্তের কাজও চালিয়ে যান।'

'সুনন্দ তরফদার কী বলছে?'

'ও ভদ্রলোকও খুব ভেঙে পড়েছেন।'

'ভেঙে পড়েছে! এই না মিলন মাইতিকে দু চক্ষে দেখতে পারত না।'

'দেখতে তো অনেকে অনেককে পারে না কিন্তু একটা জলজ্যান্ত লোকের খুন হয়ে যাওয়া কি তারা মেনে নিতে পারে? আসলে—।'

মুখার্জিবাবু গোয়েন্দাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনি তো আমাকে আপনার সহকারী করে নিয়েছেন, সুতরাং আমি যদি ওই ব্যাপারে আমার দু-চারটে অনুমানের কথা জানাই—।'

একটু যেন বিব্রত হয়ে গোয়েন্দা বলল, 'কী আশ্চর্য! নিশ্চয়ই জানাবেন। আমাকে পরামর্শ দেওয়া তো আপনার কাজের মধ্যেই পড়ে।'

গম্ভীর মুখে মুখ খুললেন মুখার্জিবাবু। 'বেশ, বলছি তা হলে। আপনার মুখেই শুনেছি, অলোক মৈত্র ওঁর ব্যবসা যাঁদের মধ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে দিতে চান, তাঁদের মধ্যে ওঁর অফিসের একজন কর্মচারীও আছেন। তাই তো?'

'হ্যাঁ, সেই রকমই তো শুনেছি।'

'আমরা জেনেছি, অলোক মৈত্র দুজনকে খুব পছন্দ করেন। একজন সুনন্দ তরফদার, আর একজন মিলন মাইতি।'

'বেশ—।'

'এই দুজনের একজন যদি সরে যায়, আর একজনের ভাগ পাওয়ার কোনও অসুবিধে থাকে না।'

'বেশ, বলুন।'

'সুনন্দ তরফদার মিলনকে একেবারে সহ্য করতে পারত না। সহ্য করতে না পারার সবচেয়ে বড় কারণ হল ওই লোকটির ওপর ইদানীং মালিকের আস্থা বেশ বেড়ে উঠেছিল। তাই না?'

'হ্যাঁ। সুনন্দবাবুর কথাবার্তা শুনে সেই রকমই তো মনে হয়েছিল।'

'আপনাকে আর নতুন করে কী বলব, বিষয় মানেই বিষ—। তা, এমনও তো হতে পারে—অত বড় ব্যবসার একটা অংশ পাওয়ার লোভে সুনন্দ তরফদার ওর পথের কাঁটা একেবারে সরিয়ে দেওয়ার জন্যেই—।'

রীতিমত তারিফ করার গলায় গোয়েন্দা বলল, 'বাহ্! আপনি তো দেখছি ব্যাপারটা নিয়ে দারুণ ভেবেছেন। কিন্তু টনব্যাক্সি নেহাত ছোট কোম্পানি নয়। ওখানে মালিকের সবচেয়ে পছন্দের লোক হয়তো অন্য কেউ।'

'কিন্তু এই সুনন্দ লোকটা যে সুবিধের নয়, তার প্রমাণ তো আমরা পেয়ে গিয়েছি।'

'কীরকম?'

'কীরকম বলছেন, ও যে লিকার লঞ্চিংয়ের গপ্পোটা শুনিয়েছিল, সেটা তো পুরো মিথ্যে।'

'এমনও তো হতে পারে, পাঁচ নম্বর বাড়ির গেস্টহাউসের ওই কেয়ারটেকার আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছে।'

'কী লাভ মিথ্যে বলে?'

'বড় ধরনের কোনও লাভ থাকতে পারে, সেটার কথা আমরা এখনও টের পাইনি।'

মুখার্জিবাবুর মুখে একটু বুঝি অসহিষ্ণুতার ছাপ ফুটে উঠেছিল। 'হ্যাঁ, আপনাদের যা

কাজ তাতে শুধু টের পেলেই চলবে না, প্রমাণসমেত টের পাওয়াতে হবে। আপনার কি মনে হয় না, সুনন্দ তরফদারদের ওপর এখন থেকে আমাদের ঢের বেশি নজর রাখা দরকার?'

'নিশ্চয়ই। আপনার সঙ্গে আমি পুরোপুরি একমত।'

কথাটা বলার পরে ঘাড়ের দু'পাশে দুটো হাত রেখে চেয়ারে মাথা উলটে দিল গোয়েন্দা। এটা ওর বিশ্রাম নেওয়ার একটা ভঙ্গি। কিছুক্ষণ ওই ভাবে বিশ্রাম নেওয়ার পরে গোয়েন্দা বলল, 'ওই গাড়ির ডিকিতে কিছু জরুরি মেডিক্যাল ইকুইপমেণ্ট ছিল। আর্জেন্ট অর্ডার। অলোকবাবু বলছিলেন, ওগুলো বিকেল চারটের মধ্যে পার্টির কাছে পৌঁছে দেওয়ার কথা ছিল। হয়নি।'

'কেন, কোম্পানি থেকে কি গাড়ি বেরোতে দেরি হয়ে গিয়েছিল?'

'না, গাড়ি বেরিয়েছে দুপুর দুটোয়। সুনন্দবাবু দেখেছেন। মিলন মাইতির সঙ্গে ছিল স্টেশনারি গুডসের সাপ্লায়ার সেই মেয়েটি। আর ছিল কিছু রিজেকটেড স্টেশনারি গুড্‌স।'

'সে কী! গাড়িতে তা হলে তো আরও একজন ছিল।'

'মেয়েটির নাকি পথে নেমে যাওয়ার কথা। বাতিল করা মালপত্তর হোলসেলারকে ফেরত দিতে যাওয়ার জন্যে মিলনের কাছে লিফ্‌ট চেয়েছিল।'

'এ সব খবর সুনন্দ তরফদার কোত্থেকে পেয়েছে?'

'এস্টেট ডিপার্টমেন্টের একজন কর্মচারীর কাছ থেকে।'

'ওই মালপত্তর যখন গাড়িতে ছিল, তখন ধরে নেওয়া যায়, ওই মেয়েটি ঘটনা ঘটার সময়ও মিলনের সঙ্গে ছিল।'

'কিন্তু বেশ কিছু বাতিল করা স্টেশনারি গুড্‌স তোলা হয়েছিল গাড়িতে, পাওয়া গেছে সামান্যই। মালপত্তর বলতে ছিল খানকতক রাইটিং প্যাড আর কয়েকটা পিন-কুশন। আমার মনে হয় মেয়েটিকে নিয়ে মিলন মাইতি কিছুটা ঘোরাফেরা করেছে গাড়িতে করে, তারপর হোলসেলারের কাছে ওকে নামিয়ে দিয়ে মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট সাপ্লাই করতে গিয়েছিল বারাসতের পথে। দেরি হয়ে গিয়েছিল বলে বোধহয় তাড়াহুড়োতে নামাবার সময় ওই সামান্য কিছু স্টেশনারি গুড্‌স্ পড়ে ছিল গাড়িতে। গাড়ির ভেতরে যা-যা ছিল পুলিশ সব কিছু তুলে এনে জমা করেছে থানায়।'

'গাড়িতে আর কী ছিল?'

'থাকা বলতে ওই মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট, স্টেশনারি গুড্‌স আর ড্যাশ-বোর্ডের কিছু জিনিসপত্র। ছোট্ট একটা মূর্তিও ছিল, ওই ধরনের মূর্তি কোথায় যেন আমি দেখেছি! একটা পিন-কুশনের নীচের কেসটায় যেখানে জেম্‌সক্লিপটিপ থাকে সেখানে সাদা কিছুটা পাউডার পড়ে ছিল। ওটা একটা ল্যাবে পরীক্ষা করতে দিয়ে এসেছি।'

'এ তো গেল রুটিন চেক-আপ। কোথাও খটকা লাগার মতো কিছু দেখলেন? কিংবা তেমন কিছু শুনলেন কি?'

'যা দেখেছি তা তো বললামই। যা শুনেছি তার মধ্যে একটা বিষয়ে বেশ খটকা লেগেছে।'

'কী সেটা?'

'টনব্যাক্সিতে যে মেয়েটি স্টেশনারি গুড্স সাপ্লাই করে, তার কথা তো সুনন্দবাবুর কাছে আগেই শুনেছি, আজও আবার শুনলাম। মেয়েটিকে দারুণ দেখতে। লম্বা, ফর্সা, তার ওপর আবার খুব লেখাপড়া জানা—।'

মুখার্জিবাবু দু-হাত উলটে বললেন, 'এদের দেখেই তো বোকা লোকদের মাথা ঘুরে যায়। যা করার নয়, তাই করে বসে তখন।'

আপত্তি করার ভঙ্গিতে কৌশিক জানাল, 'শুধু-শুধু সুন্দরী মেয়েদের দোষ দিচ্ছেন কেন? সুন্দরী হওয়া তো দোষের নয়। বরং বেশি সুন্দরী হলে মেয়েদের বিপদে পড়ার ঝুঁকি আরও বেড়ে যায়। বাজে লোক পিছু নেয়।'

কথাটা বোধহয় মুখার্জিবাবুর খুব একটা পছন্দ হল না। বললেন, 'ঠিক আছে। কিন্তু ওই যে খটকা লাগার কথা বলছিলেন—সেটা কী?'

'সুনন্দবাবু বলছিলেন মেয়েটির চোখমুখ বেশ কাটা-কাটা, আর--।'

'আর কী?'

'মেয়েটির গালে একটা আঁচিল আছে।'

উত্তর শুনে চমকে উঠে মুখার্জিবাবু বললেন, 'অ্যাঁ! বলেন কী? আঁচিলটা কোন্ গালে?'

খুব শান্ত গলায় জবাব দিল গোয়েন্দা, 'জিজ্ঞেস করিনি।'

আট

সকাল ন'টা বাজে। বেতের চেয়ারে বসে দ্বিতীয় দফা চা খাচ্ছিল কৌশিক। চা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খবরের কাগজ পড়ছিল। খবরের কাগজের পাতায় বড় খবরের চাইতে ছোট খবরের দিকে ওর নজর যায় বেশি করে। ছোট মাপের খবরগুলো গুরুত্বের দিক দিয়ে ছোট হয় না সব সময়। এই যেমন ওড়িশার তেরো বছর বয়েসের ওই মেয়েটির খবর। মেয়েটি গিয়েছিল পুকুরে স্নান করতে। অপরাধীরা ওকে তুলে নিয়ে গিয়ে পালা করে ধর্ষণ করে, তারপর খুন করে ফেলে দেয় ঝোপের মধ্যে। এসব খবর পড়লে প্রথমেই মন খারাপ হয়ে যায় গোয়েন্দার। মানুষের ভেতরের হিংস্র পশুটা প্রায়ই এই ভাবে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে কুকর্ম করে। আর, অপরাধ ঢাকার কী সহজ সমাধান! মেয়েটি যাতে ওর অত্যাচারের কথা কাউকে না জানাতে পারে তার সবচেয়ে সোজা রাস্তা হল—ওকে খুন করে ফেলা। চায়ের বাকিটুকু আর খেতে ইচ্ছে করল না গোয়েন্দার। এবার উঠে পড়ে স্নান করতে যেতে হবে। চেম্বারে যাওয়ার সময় হয়ে এসেছে। কিন্তু ওঠার মুখে ফোন এল। কিশোর চৌধুরীর ফোন।

আচমকা কিশোরের ফোন পেয়ে কৌশিক বেশ অবাকই হয়েছিল। কুশল বিনিময়ের পরে কিশোর বলল, কাল সন্ধেয় আমাদের বাড়িতে চলে আসুন না, ডক্টর মৈত্রও আসছেন। ওই ব্যাপারে কথা হবে। জবাবে কৌশিক বলেছিল, বেয়াড়া কাজে আটকে না গেলে অবশ্যই যাব।

একটু বাদে আর একটা ফোন। এবারের ফোন এসেছে টি. এম. মেননের সেক্রেটারি নিটা জৈনের কাছ থেকে। নিটা জানাল, এই একটু আগে ওদের অফিসে লণ্ডন থেকে একটা ফ্যাক্স এসেছে ওর নামে। ফার্মের মালিক মেননের নির্দেশ আছে, ফ্যাক্স আসামাত্র প্রাপককে যেন সে-খবর জানানো হয়। নিটা জিজ্ঞেস করেছিল, ফ্যাক্সটা কী ভাবে ওর কাছে পাঠাবে। সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছে গোয়েন্দা : আপনি রেখে দিন, আমি এক্ষুনি গিয়ে কালেক্ট করে নেব।

ফোন ছাড়ার পর থেকে গোয়েন্দার মাথায় শুধু ফ্যাক্সের কথাই ঘুরছিল। কী খবর জানিয়েছেন অমল সিন্‌হা। বহুদিন ধরে লণ্ডনের বাসিন্দা অমলবাবু। বড় চাকরি করেন এবং বেশ প্রভাবশালী। ওঁর ভাইপো কৌশিকের ঘনিষ্ঠ বন্ধু, সেই সুবাদে ওর সঙ্গে পরিচয়। গত বছরের আগের বছর যখন দেশে এসেছিলেন, তখন সুন্দরবন সফরে একসঙ্গে তিনটে দিন কেটেছে ওদের।

অমল সিন্‌হার কাছে ডক্টর জ্যোতি মৈত্রের বেকার স্ট্রিটের ঠিকানা লিখে মানুষটার বিস্তারিত খবরাখবর জানতে চেয়েছিল কৌশিক। লণ্ডন পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ করার কথা লিখেছিল। ওখানকার মেয়রের সঙ্গে অমলবাবুর ভাল সম্পর্কের কথা জানে কৌশিক। তথ্য আবার তদন্তের কাজে দরকার বলে একটা ফর্মাল চিঠিও পাঠিয়েছে ও।

ক্যালকুলেটর বিক্রির ব্যবসা মেননের। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিটে অফিস। ফোন পাওয়ার মিনিট-চল্লিশের মধ্যে ওই অফিসে পৌঁছে গিয়েছিল কৌশিক। মেনন তখনও অফিসে আসেননি। ওঁকে ধন্যবাদ জানাবার কথা নিটাকে বলে অফিস থেকে বেরিয়ে এসেছিল গোয়েন্দা। বাংলায় কোনও গোপন খবর আনাবার দরকার হলে বরাবরই মেননের ফ্যাক্স নাম্বার দিয়ে থাকে ও। এখানে বাংলা খবরাখবর প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত গোপনই থেকে যায়, কারণ এ-অফিসের কেউই এক বর্ণ বাংলা পড়তে পারে না।

পথে বেরিয়ে উল্টো দিকের বাসস্টপে এসে দাঁড়াল কৌশিক। তারপর হাতের খবরের কাগজের ভাঁজের মধ্যে রেখে ফ্যাক্সে-পাঠানো অমল সিন্‌হার লম্বা নোটটা পড়ে নিল দ্রুত। উনি যে এত অল্প সময়ের মধ্যে এত খবর সংগ্রহ করে জানাতে পারবেন, এটা ও ভাবতে পারেনি। বোঝা যাচ্ছে মানুষটি সত্যিই প্রভাবশালী এবং লণ্ডন পুলিশ ওঁকে ভালরকম সাহায্যই করেছে। সবশেষে সিন্‌হা জানিয়েছেন, এ ব্যাপারে উনি যদি আরও কিছু খবর সংগ্রহ করতে পারেন সঙ্গে সঙ্গে তা ফ্যাক্স-মারফত জানিয়ে দেবেন।

মনে মনে শেষ কথাটার জবাব দিল গোয়েন্দা : ধন্যবাদ সিন্‌হাসাহেব। যা জানিয়েছেন তাতেই মনে হয় কাজ চলে যাবে উপস্থিত।

বাসস্টপে আর দাঁড়াবার দরকার নেই। সামনের দিকে কিছুটা হাঁটার পরে একটা ট্যাক্সি ধরে নিয়েছিল ও।

চেম্বারে যাওয়ার পথে ফ্যাক্সে-পাঠানো খবরগুলো ওর মাথার মধ্যে ঘুরে যাচ্ছিল সমানে। গোয়েন্দার কাজের একটা ধরন হল— কিছু খবর একসঙ্গে পেয়ে গেলে গুরুত্ব অনুসারে এক, দুই করে সেগুলো সাজিয়ে নেওয়া। সুতরাং মনে মনে এই সাজানোর ব্যাপারটা শুরু করে দিয়েছিল কৌশিক।

এক—বারতিনেক ক্রিমিনাল অফেন্সে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছেন ডক্টর জ্যোতি মৈত্র, কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ার জন্যে তিনবারই বেকসুর ছাড়া পেয়েছেন। দুই—এমিলি নামের এক ইংরেজ মহিলার সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু বিয়েটা পাঁচ বছরের বেশি টেকেনি। ডিভোর্সের মামলা এনেছিল এমিলিই। কারণ ডক্টর মৈত্র নাকি অ্যালকোহলিক এবং একাধিক মহিলার সঙ্গে ওঁর অবৈধ সম্পর্ক আছে। অভিযোগের ভিত্তিতে ডিভোর্স মঞ্জুর হয়েছে। ঘটনাটি দশ বছর আগেকার। ডক্টর মৈত্র তারপর দু-তিনটি মেয়ের সঙ্গে লিভ-টুগেদার করেছেন, কিন্তু বিয়ের মধ্যে আর যাননি। তিন—বেশ কয়েকটি চাকরি আর দু-চারটে ছোটখাটো ব্যবসা করেছেন, কিন্তু কোনও ব্যবসাই মদের ব্যবসা ছিল না। চার—এমিলির ডাক নাম এমা। এই এমার সঙ্গে আবার অমল সিন্‌হার ব্যক্তিগত পরিচয় আছে। এমিলি বিয়ে করেছে বিশাল ধনী এক বুড়োকে। যাওয়ার আগে 'এমা' সান্ত্বনা দিয়ে গেছে—ডক্টর মৈত্র নিজেকে যদি পাল্টান, ভবিষ্যতে আবার ও ফিরতে পারে।

এই সবতথ্য গোয়েন্দার মাথার মধ্যে ঘুরপাক খেয়েই যাচ্ছিল। ও আশা করছিল—তথ্যগুলোর ভেতর থেকে সমস্যা সমাধানের ছোট্ট একটা রুপোলি রেখা দেখা যাবে, কিন্তু তা হল না। একটু বাদে যা দেখা গেল তা হল চেম্বার।

ট্যাক্সি ছেড়ে চেম্বারে ঢুকতেই মুখার্জিবাবু উদ্‌গ্রীব হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট কী বলল?'

প্রশ্ন শুনে গোয়েন্দা অপ্রস্তুত মুখে জবাব দিল, 'এই রে, ওটার কথাই তো ভুলে মেরে দিয়েছিলাম।'

অবাক হলেন মুখার্জিবাবু। 'আপনারও ভুলো মন! আমি ভাবছিলাম—।'

কথাটা থামিয়ে দিয়ে গোয়েন্দা বলল, 'আসলে বাড়ি থেকে বেরুবার মুখে—। ঠিক আছে, আমি ওটা একেবারে সেরেই আসছি। কেউ এলে বা ফোন করলে বলবেন, ঘন্টাদুয়েকের মধ্যে ফিরছি।'

উলটো দিকে হাঁটা দিয়েছিল গোয়েন্দা। একটু পরেই রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে গেল।

ফিরল দু-ঘন্টার বদলে আড়াই ঘন্টা বাদে। মুখার্জিবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'একটু কফি নিয়ে আসি।'

'না, এখন থাক। ফোনটোন কিংবা কেউ—।'

'কেউ আসেনি, তবে তিনটে ফোন এসেছিল। একটা অলোক মৈত্রের। আপনাকে রাত সাড়ে-আটটার পরে ওঁর বাড়িতে ফোন করতে বলেছেন। দু-নম্বর ফোন সুনন্দ তরফদারের, পরে আবার ফোন করবে। তিন নম্বর ফোনের কোনও মেসেজ নেই, আপনি নেই শুনেই ছেড়ে দিয়েছে। ওদিককার খবর কী?'

টেবিলের একধারে এক গ্লাস জল ছিল, ওপরে বাহারি ঢাকনা। ঢাকনা সরিয়ে গ্লাসটা হাতে তুলে জলের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল কৌশিক। মুখার্জিবাবু বুঝতে পারলেন, জলে ধুলোবালি আছে কি না তা পরীক্ষার জন্যে ও-ভাবে তাকায়নি ও। এখন ওর মাথার মধ্যে সমস্যার জট খোলার চেষ্টা চলছে। যদ্দিন না সমাধান পাওয়া যাবে তদ্দিন এই দৃশ্যটা দেখা যাবে মাঝেমধ্যে।

একচুমুকে পুরো গ্লাসটা শেষ করে নিজের চেয়ারে বসে পড়ল গোয়েন্দা। তারপর মুখার্জিবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'মারোয়াড়ির ছদ্মবেশ ধরার সময় পুরনো দিনের কথা খুব মনে পড়ে যাচ্ছিল, তাই না?'

কথাটা শুনে অবাক হয়ে কৌশিকের দিকে তাকালেন মুখার্জিবাবু। হাতে কাজ না থাকলে গল্প করতে খুব ভালবাসে গোয়েন্দা, কিন্তু কাজ থাকলে কখনওই নয়। তখন ওর দিকে তাকালে মনে হবে, অলৌকিক কোনও উপায়ে পঁচিশ বছরের যুবকটির বয়েস পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে। অসম্ভব গম্ভীর, রাশভারী, কিন্তু সেই নিয়মটা তো এখন খাটছে না। মুখার্জিবাবু দেখলেন, গোয়েন্দার ঠোঁটের কোণে একটুকরো রহস্যময় হাসি লেগে আছে।

বয়েস বেড়ে গেলে বেশির ভাগ মানুষই বোধহয় একটু বেশিমাত্রায় নিয়মতান্ত্রিক হয়ে পড়েন। নিয়মের বাইরে হঠাৎ কিছু ঘটে গেলে তাঁরা একটু নড়েচড়ে বসেন, সম্ভব হলে প্রতিবাদও করেন। সেই অভ্যাস থেকেই মুখার্জিবাবু বোধহয় গোয়েন্দার লঘু কথার জবাবে একটা গুরু কথা বলে ফেললেন। 'বলব, পরে সব বলব। এখন গল্প ফাঁদলে আপনার কাজের ক্ষতি হতে পারে। ওদিককার খবর কী? পুলিশ-রিপোর্ট কী বলছে?'

'যা বলার তাই। রুটিন ইনভেস্টিগেশন তো। পরে সব বলছি। এখানে ঢোকার মুখেই এক মারোয়াড়ি ভদ্রলোককে দেখে আপনার ওই ছদ্মবেশের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। মারোয়াড়ি সাজা তো বেশ কঠিন কাজ, আপনি একা-একা সব সামাল দিলেন কী করে?'

পুরনো সেই দিনের কথায় এবার আক্রান্ত হলেন মধ্যবয়স্ক মানুষটি। 'মেক-আপ নেওয়া, ভাল মেক-আপ নেওয়াটা সত্যিই খুব কঠিন কাজ। চোখের নীচে কালচে ভাব বা কপালে চারটে বলিরেখা মানে অনেক-কিছু। রঙের ব্যবহার একটু বেশি কম হওয়া মানে পাঁচ-

দশ বছর বয়েস বেশি-কম হয়ে যাওয়া। তার ওপর আবার অন্য সমস্যাও আছে। চরিত্রের আচরণ হওয়া দরকার মেক-আপ-নেওয়া মানুষটির মতো। ধরুন, মাঝবয়সী এক মহিলাকে কিশোরী সাজানো হল। মহিলা স্লিম, মেক-আপও নিখুঁত—কিন্তু এটাই যথেষ্ট নয়। ওই মাঝময়সী মহিলাকে এবার কোন জিনিসটা আমদানি করতে হবে বলুন তো?'

'কোন্ জিনিসটা।' গোয়েন্দার চোখমুখ দেখে যে-কেউ বুঝতে পারবে মানুষটি সত্যিই ধাঁধায় পড়েছে।

মুখার্জিবাবু মুচকি হেসে বললেন, 'একটি কিশোরীর সবচেয়ে বড় সম্পদ কী? ছিপছিপে চেহারা নয়, দুই বিনুনির দুলুনি নয়, স্কার্ট বা ফ্রক নয়—সবচেয়ে বড় সম্পদ হল দুই চোখের বিদ্যুতের ঝিলিক। একটু দুষ্টুমি, একটু মজা—পৃথিবীর সব রহস্য তক্ষুনি-তক্ষুনি জেনে ফেলার অসীম কৌতূহল থাকে একজন কিশোরীর চোখে। এখন ধরুন আমি যে মহিলাকে খুব কষ্ট করে কিশোরী সাজালাম— তার তো উচিত চোখের দৃষ্টিতে কিশোরীর ওই বিদ্যুতের ঝিলিক নিয়ে আসার প্রাণপণ চেষ্টা করা, কিন্তু—।'

মুখার্জিবাবুকে থামিয়ে দিয়ে কৌশিক বলল, 'মেক-আপের তাহলে দেখছি বিস্তর ঝঞ্ঝাট আছে।'

'ঝঞ্ঝাট বলে ঝঞ্ঝাট! কত খেটেখুটে মাঝবয়সী এক মহিলাকে কিশোরী সাজালাম। কিন্তু তার চোখে কিসের দৃষ্টি ফুটল জানোন?'

'কিসের?'

'জামাই ধরার দৃষ্টি। আসলে ওই ভদ্রমহিলার নিজেরই ওই বয়েসের একটি মেয়ে আছে। তিনি তার জন্যে যোগ্য পাত্র খুঁজে বেড়ান সব সময়।'

গোয়েন্দা একটু হেসে বলল, 'এসব মনে রাখা এবং ঠিক সময়ে ঠিক-ঠিক আচার-আচরণ করা সত্যিই বেশ কঠিন।'

পুরনো কথা বলার বেশ একটা ঝোঁক এসে গিয়েছিল মুখার্জিবাবুর। 'মুশকিল কি জানেন, যে মেক-আপ নিয়েছে তার হাতে তো আর আয়না থাকে না সব সময়। সুতরাং একটা সময় মেক-আপের কথা ভুলে মেরে দেওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। চল্লিশ বছর বয়েসের অভিনেতা হয়তো আশি বছরের বুড়ো সেজেছে, কিন্তু সেটা কখনো ভুলে গেলেই কেলেঙ্কারি। আমিই তো একবার চরিত্রের পক্ষাঘাতের কথা ভুলে গিয়ে কয়েক পা স্টেজের মধ্যে হেঁটে গিয়েছিলাম গটগট করে। অবশ্য আমার কথা বাদ দিন, আমি তো আর পেশাদার অভিনেতা নই।'

ঝকঝকে একটা হাসি ফুটে উঠেছিল গোয়েন্দার মুখে। বলল, 'কাল সন্ধেয় শোভাবাজারের এক বনেদি বাড়িতে নিয়ে যাব আপনাকে। বাড়ির মালিক যাত্রাপাগল, নাটকপাগল। শুধু উনি নন, ওঁর বন্ধুও তাই। হারিয়ে-যাওয়া গানবাজনা, সংস্কৃতি ফিরিয়ে আনার জন্যে ওঁরা উঠেপড়ে লেগেছেন। আমাকেও ভেড়াতে চাইছেন, কিন্তু আমি ভিড়ে কী করব; ওসব আমি

আর কতটুকুই বা বুঝি! আপনি গেলে আপনার খুব ভাল লাগবে, আসলে সাবজেক্টটা তো আপনারই। কাজটাও ভাল। আপনার অবসর সময় ভালই কাটবে। আর আপনাকে পেলে ওদেরও নির্ঘাত কিছুটা উপকার হবে।

মুখার্জিবাবুর চোখমুখ ঝলমলে হয়ে উঠেছিল। 'ওই সময়টা কিন্তু বেশ কেটেছিল আমার। খুব খাটাখাটুনি আছে, অনিয়ম আছে, পাওনা পয়সাকড়িও সব সময় পাওয়া যায় না। এসব সত্যি, কিন্তু বেশ আনন্দও ছিল। আমাদের কমেডিয়ান ছিল হরিহরদা। আসরে নামলেই আসর মাত। ওদিকে দর্শকরা হাসছে, এদিকে হাসছি আমরা। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেত।'

রহস্যময় সেই হাসিটা ফিরে এসেছিল গোয়েন্দার ঠোঁটের কোনায়। 'সারা দিন চুরি-ডাকাতি-খুনের তদন্ত করেন, এর বাইরে তো একটু রিল্যাক্সড হওয়ার প্রয়োজন আছে—। অবশ্য সব সময় আপনি সন্ধেবেলায় অবসর পাবেন না। তবে যেটুকু পান, সেটুকুই বা মন্দ কী! কাল ওখানে আবার ডক্টর মৈত্রও আসছেন।'

'অলোকবাবুর ভাই ডক্টর জ্যোতি মৈত্র?'

'হ্যাঁ।'

চোখের দৃষ্টি ধারালো করে গোয়েন্দার দিকে তাকালেন মুখার্জিবাবু, তারপর মজার গলায় বললেন, 'একটু ঝেড়ে কাশুন তো।'

'এর আবার ঝেড়ে কাশার কী আছে?'

'আছে তো বটেই। অবশ্য আপনার শরীরের ভাষা পড়ে ব্যাপারটা আমার আগেই ধরা উচিত ছিল। আপনি কথাগুলো বলতে বলতে তিনবার পকেটে হাত ঢুকিয়েছেন, ঠোঁটের ওপর হাত রেখেছেন বারচারেক।'

গোয়েন্দা হেসে বলল, 'এ তো মহা মুশকিল হল দেখছি! আপনি শুধু আমার শরীরের ভাষাটাই ধরবেন, মুখের কথাগুলো কি কিছুই নয়? আমরা শোভাবাজারে রিল্যাক্স করব, সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের তদন্তের কাজও যদি একটু-আধটু চলে—খারাপ কী! তবে এখনও পর্যন্ত সবই রুটিন ইনভেস্টিগেশনের পর্যায়ে আছে।'

'পুলিশও রুটিন ইনভেস্টিগেশন চালাচ্ছে আপনিও তাই।'

'হ্যাঁ, সব কাজেরই তো একটা রুটিন থাকে। ডাক্তাররা যেমন অপারেশন করার আগে এক্স-রে করে দেখে নেয়। যা ভেবেছিল তাই হয়তো ঠিক, তবু এক্স-রের দরকার আছে।'

'মিলন মাইতির মৃত্যুর কারণ আপনি যেটা ভেবেছিলেন সেটা কি ঠিক?'

'হ্যাঁ, তাই। পোস্ট-মর্টেম রিপোর্ট বলছে পিস্তলের গুলিতেই মারা গেছে মিলন।'

'আর ওই যে ল্যাবে কী একটা পরীক্ষা করতে গিয়ে এসেছিলেন, তার থেকে কিছু—। মানে, আপনি যা ভেবেছিলেন তা কি ঠিক হয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'কী ভেবেছিলেন আপনি, আর পরীক্ষাতেই বা কী পাওয়া গিয়েছে?'

'পিনকুশনের নীচের কেসের সাদা পাউডারের গুঁড়ো পরীক্ষা করে জানা গেছে যে, ওটা ব্রাউন শ্যুগার।'

'অ্যাঁ! বলেন কি! ব্রাউন শ্যুগার মানে ওই নেশা করার ড্রাগ। মিলন মাইতি কি ওইসব নেশা করত?'

'হয়তো করত কিংবা করত না। কিংবা হয়তো নারকোটিকস চোরাচালনকারীদের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কিংবা ও হয়তো কিছুই জানত না, ওর ঘাড়ে বন্দুক রেখে গুলি ছোড়া হয়েছে।'

চোখ কপালে তুলে মুখার্জিবাবু বললেন, 'এ তো মনে হচ্ছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ। কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে কে জানে! সত্যি কথা বলতে কি আমি প্রথমে ভেবেছিলাম এটা একটা হাইওয়ে রবারি গোছের। মিলন মাইতির বয়েস কম, হয়তো বাধা দিতে গিয়েছিল—ডাকাতরা অমনি পিস্তল চালিয়েছে।'

'সেটা হওয়াও অসম্ভব নয়।'

'তাই যদি হয় তাহলে ওই পিনকুশনের মধ্যে ড্রাগ এল কোত্থেকে! না কি ড্রাগ রেখে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছে কেউ?'

'হ্যাঁ, সেটা হওয়াও অসম্ভব নয়।'

'আপনি কি এ-ব্যাপারে এখনও কোনও সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি?'

'না।'

মুখার্জিবাবুর চোখেমুখে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছিল।

কৌশিকের চোখমুখ কিন্তু আশ্চর্য রকমের শান্ত। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলল, 'মিলন মাইতির আইডেনটিটি কার্ডের ছবিটা কপি করিয়ে নিয়েছি। আপনি ঠিকই বলেছিলেন— অল্পবয়সীদের মৃত্যু সত্যিই খুব দুঃখের। ভাল কি মন্দ সে বিচার পরের কথা।'

কথাটা বলার একটু বাদে পকেট থেকে মিলনের ছবিটা বার করে মুখার্জিবাবুর দিকে এগিয়ে দিল গোয়েন্দা।

এর পর যা ঘটল তার জন্যে দুজনের কেউই প্রস্তুত ছিল না।

ছবিটা হাতে নিয়ে প্রায় আঁতকে উঠে মুখার্জিবাবু বললেন, 'আরে, এই লোকটাই তো সেদিন পাঁচ নম্বর বাড়ির ওই গেস্টহাউসের রিসেপশনে বসে ছিল।'

কথাটা শুনে গোয়েন্দার শান্ত ভাব নিমেষের মধ্যে ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো হয়ে গেল। তারপরেই প্রায় ধমকে উঠে বলল, 'কী যা-তা বলছেন! এ লোকটা গেস্টহাউসের রিসেপশনিস্ট হবে কী করে। মিলন মাইতি কাজ করত টনব্যাঙ্কিতে, সুনন্দ তরফদারের জুনিয়র কোলিগ্।'

উত্তরে মুখার্জিবাবু কেটে কেটে বললেন, 'তা হতে পারে। তবে ওই লোকটার সঙ্গেই সেদিন আমি কথা বলেছিলাম। ভুল হওয়ার কোনও কারণ নেই—কথা বলেছিলাম তো বেশ কিছুক্ষণ ধরে।'

নয়

গভীর রাতে চোরদের সবচেয়ে বড় শত্রু যদি সজাগ গৃহস্থ হয়, দ্বিতীয় শত্রু অবশ্যই সজাগ রাস্তার কুকুর। রাস্তার কুকুররা রাস্তাতেই থাকে, দিনের বেলার অসংখ্য পথচলতি মানুষ নিয়ে ওদের বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই। কিন্তু মাঝরাত শুরু হলেই ওদের মধ্যে বোধহয় একটা নৈতিক কর্তব্যবোধ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। নিজেদের এলাকায় অচেনা লোক দেখলেই সন্দিগ্ধ হয়, তারপর তাড়া করে। ওরা আবার একা-একা নয়, দল বেঁধে থাকে সব সময়। পাঁচ-সাতটা কুকুরের হঠাৎ ঘেউ-ঘেউ তেড়ে আসা তো যাচ্ছেতাই ব্যাপার! মাঝরাতে কাজে-অকাজে যাদের অচেনা এলাকায় যেতে হয় তারা এই উটকো ঝামেলার কথা হাড়ে-হাড়ে জানে। কিন্তু রাতের কুকুরদের কথা ভাবতে গেলেই কৌশিকের সবার আগে অতি-বিখ্যাত সেই নতুনদার কথা মনে পড়ে যায়।

ক'টা মাত্র আঁচড় কেটে নতুনদাকে অমর করে দিয়েছেন শরৎচন্দ্র। ইন্দ্রের দর্জিপাড়ার এই দাদাটি সম্পর্কে লেখক লিখেছেন, নতুনদার তখন প্রথম যৌবন। জীবনের এই সময়টায় নাকি হৃদয়ের প্রশস্ততা, সমবেদনার ব্যাপকতা যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমন আর কোনও কালে হয় না। কিন্তু এই ধারণার ঠিক উলটোদিকে ছিল নতুনদা। অমন স্বার্থপর, অসজ্জন ব্যক্তি জীবনে খুব অল্পই দেখেছে শ্রীকান্ত।

এই বাজে লোকটা তার দুর্ব্যবহারের শাস্তি পেয়েছিল অন্যভাবে। পায়ে বহুমূল্য পাম্পশু, গায়ে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, গলায় গলাবন্ধ এবং মাথায় টুপি-পরা এই নতুনদা কনকনে শীতের রাতে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়েছিল কুকুরের ভয়ে। এ কাহিনী সবার জানা। কিন্তু কৌশিক আলাদা ভাবে সেই পথের কুকুরগুলোর চরিত্র বিশ্লেষণ করেছিল।

কুকুরগুলো হঠাৎ কেন ক্ষেপে উঠেছিল নতুনদার ওপরে?

শরৎচন্দ্র চমৎকার একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

নিশুতি রাতে নদীর ধারে নতুনদাকে একা রেখে খাবারের সন্ধানে দূরের গ্রামে গিয়েছিল শ্রীকান্ত আর ইন্দ্রনাথ। তখন গলা খুলে গান ধরেছিল নতুনদা— ঠুন্ ঠুন্ পেয়ালা। খুব সম্ভব সেই সঙ্গীতচর্চাতেই আকৃষ্ট হয়ে গ্রামের কুকুরগুলো দল বেঁধে হাজির হয়েছিল। তারপর 'অশ্রুতপূর্ব গীত এবং অদৃষ্টপূর্ব পোশাকের ছটায় বিভ্রান্ত' হয়ে মহামান্য ব্যক্তিটিকে তাড়া করে।

গোয়েন্দা তার নোটবুকে 'অশ্রুতপূর্ব গীত' আর 'অদৃষ্টপূর্ব পোশাক'-এর কথা আলাদাভাবে লিখে রেখেছে। মাঝরাতের পথের কুকুররা যে গান কখনও শোনেনি সে গানকে কিছুতেই ভালভাবে নেয় না। আর যে পোশাক আগে কখনও দেখেনি হঠাৎ তা দেখলে ক্ষেপে যাবেই। সুতরাং রাতবিরেতে পথেঘাটে কখনও উলটোপালটা গান গাওয়া উচিত নয়। রাতের অতিথির উদ্ভট পোশাক পরা তো বাদ দিতে হবে সবার আগে। আর?

মাঝরাতের কুকুরদের শান্ত করার আর একটা মোক্ষম কায়দা কৌশিক শিখেছে ওর প্রিয় কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের 'বিবিকাহিনী' থেকে। ছোট উপন্যাসটির পটভূমিকায় আছে বেহালার

ব্রাহ্মসমাজ রোড। মাঠ, পুকুর সমেত খোলামেলা পাড়া। উপন্যাসের প্রধান চরিত্র মাঝেমধ্যে একটু বেশি রাত্তিরে বাড়ি ফেরে। ফেরার পথে সেই উপদ্রব—একপাল কুকুর পিছু নেয় ওর। পাড়াটা ওই চরিত্রের অচেনা নয়, কিন্তু ওখানে ওরা খুব বেশিদিন যায়নি। পাড়ার কুকুররা তাই তেমন করে চেনার সুযোগ পায়নি মানুষটিকে। অনেক সময় দলে আবার বেপাড়ার কুকুর এসেও জোটে। মোদ্দা কথা, উপন্যাসের ওই চরিত্রের মাঝরাত্তিরে বাড়ি ফেরাটাকে কুকুররা ভাল চোখে নেয়নি। তবে যাতে নেয় তার জন্যে কবি-ঔপন্যাসিক একটা বুদ্ধি জুগিয়ে দিয়েছিলেন চরিত্রটিকে। চরিত্রটি ফেরার সময় কালীমন্দিরের কোণ থেকে শুকনো কিছু বেগুনি কিনে নিত। ব্যস, এর পর থেকে পিছু-নেওয়া কুকুরের দল একেবারে শান্ত হয়ে গিয়েছিল। বেগুনির ঘুষে কাজ হয়েছিল চমৎকার।

প্রথমদিকে অবশ্য খটকা লেগেছিল গোয়েন্দার। কুকুর কি তেলেভাজা খায়? পরমুহূর্তেই ওর ভুল ভেঙেছিল। কেন খাবে না—নিশ্চয়ই খাবে। ওরা তো আর বাড়িতে পোষা বিলিতি কুকুর নয় যে খাওয়াদাওয়া নিয়ে হাজাররকম বায়নাক্কা তুলবে। রাস্তার কুকুর যা পায় তাই খায়। বরাবরই খেয়ে আসছে।

কিন্তু ঠাণ্ডা তেজেভাজার বদলে ওদের যদি ভাল দোকানের ডগ বিস্কুট দেওয়া হয়? কাজ তাহলে দশগুণ বেশি হবে নির্ঘাত। গোয়েন্দা তাই বাড়িতে এক বাক্স ডগবিস্কুট রেখে দিয়েছে। মাঝরাত্তিরে অচেনা পাড়ায় হানা দিতে গেলে ওই বিস্কুট সঙ্গে রাখে। রাস্তার কুকুরের পাল তেড়ে এলে বিস্কুট ছোড়ে, তাতে কাজ হয় মন্ত্রের মতো। কুকুরগুলো আক্রমণ থামিয়ে বিস্কুট খেতে শুরু করে দেয় লেজ নাড়াতে নাড়াতে, সেই ফাঁকে ওখান থেকে সরে পড়ে গোয়েন্দা।

এখন রাত দেড়টা। এবার একটা হানা দেওয়ার কাজে বেরুতে হবে। কোমরে ও পিস্তল গুঁজল সন্নার আগে। তারপর বাঁ পকেটে রাখল খাপে-মোড়া ছোট একটা ছুরি, নাইলনের ব্যাগ, দড়ির রোল, টর্চ আর একটা মাস্টার-কি। ডান পকেটে পলিথিনের ব্যাগে মোড়া ডগবিস্কুট।

গ্যারাজ থেকে শ্যাওলা রঙের ছোট ফিয়াটটা বার করে উত্তর কলকাতার দিকে গাড়ি ছোটাল গোয়েন্দা। একটু বাদে উত্তর কলকাতা থেকে আরও উত্তরে। আড়িয়াদহের কাছে একটা চেনা পেট্রল পাম্পে গাড়ি রেখে হাঁটা পথ ধরল।

দিনের বেলায় এসে বাড়িটা দেখে গেছে ও, সুতরাং চেনা বাড়ি খুঁজে পেতে কোনও অসুবিধে হল না। পকেটে ডগবিস্কুট, কিন্তু পথে কোনও কুকুর নেই। কোথাও কোনও লোকজনও দেখা যাচ্ছে না। রাস্তা দিয়ে মাঝেমধ্যে কিছু গাড়ি আর ট্রাক ছুটে যাচ্ছিল উর্ধ্বশ্বাসে।

গোয়েন্দার চেহারা বেতের মতো ছিপছিপে আর ওর পায়ের তলায় বুঝি মস্ত দুটো টিকটিকির পা বসানো। রেনওয়াটার পাইপ আর জানলার শেড ধরে তরতর করে একতলার ছাতে উঠে এল ও। দোতলা বাড়ি, কিন্তু একতলার পুরোটা জুড়ে দোতলা ওঠেনি। সুতরাং

বাড়ি দোতলা হলেও একদিকে একতলার কিছুটা ছাত রয়ে গেছে। গোয়েন্দা ওই একতলার ছাত সন্তর্পণে পেরিয়ে ওদিকে ঝুল খেয়ে একতলায় নেমে পড়ল। নামার পরে থামের আড়ালে উবু হয়ে বসে থাকল কিছুক্ষণ। নিঝুম রাত, কোথাও কোনও শব্দ নেই। আশেপাশের সবাই ঠিক অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

গোয়েন্দা পকেটের ছোট্ট টর্চটা বার করে জ্বালল। টর্চের কাচের পনেরো আনা কালো রঙে ঢাকা। এক আনা দিয়ে খুব সরু একটা আলোর ফালি বেরিয়েছিল। সেই আলো ঘোরাতেই গোয়েন্দা দেখল পাশাপাশি দুটো ঘরের একটা ভেতর থেকে বন্ধ, বাকিটায় তালা ঝুলছে।

এবার ও বেড়ালের পায়ে হাঁটল, তারপর তালা-দেওয়া ঘরের তালাটা খুলে ফেলল মাস্টার-কি দিয়ে। খোলা ঘরে ঢুকে ভেজিয়ে দিল দরজা।

টর্চের আলো ঘরের চারদিকে বারদুয়েক ঘুরিয়ে গোয়েন্দা বুঝল এটা একটা একশো ভাগ ব্যাচেলারের ঘর। অগোছালো, দেয়ালে দুটো পোস্টার সাঁটা। একটা একজন পপ সিঙ্গারের, অন্যটা পাইনবনের। ঘরের একটা আলমারি, একটা শোকেস আর দুটো বাক্সর তল্লাশি নিয়ে নিল চটপট। কিন্তু একতাড়া প্রেমপত্র আর দুই তরুণ-তরুণীর একটা রঙিন ছবি ছাড়া সঙ্গে নেওয়ার মতো আর কিছুই তেমন পেল না।

পকেট থেকে নাইলনের ব্যাগ বার করে ওগুলো ভরে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল গোয়েন্দা। ওর পা-দুটো কখনও টিকটিকির কখনও বা বেড়ালের—সুতরাং ছাত টপকে বাড়ির বাইরে বেরিয়ে আসতে ওর কয়েক মুহূর্তের বেশি সময় লাগেনি।

চুরির কাজটা খুব শান্তিপূর্ণ ভাবে শেষ করতে পারার জন্যে গোয়েন্দার মধ্যে বেশ একটা ফুর্তির ভাব এসে গিয়েছিল। মৃদু সুরে শিস দিতে দিতে ও লম্বা পা চালিয়েছিল পেট্রল পাম্পের দিকে। হঠাৎই সেই শিসের শব্দে পাশের গলি থেকে দুটো কুকুর তীরবেগে ছুটে এসে বারদুয়েক ভুক-ভুক করে ডেকেই লেজ নাড়তে শুরু করে দিয়েছিল।

গোয়েন্দা বুঝতে পারল এই দুটো কুকুরের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় অতি মাত্রায় প্রখর। ওরা পকেটের ডগবিস্কুটের কথা টের পেয়ে গেছে। ওদের দিকে খানচারেক বিস্কুট ছুড়তেই ওরা হামলে পড়েছিল ওগুলোর ওপর।

একটু বাদে পেট্রল পাম্প থেকে গাড়ি নিয়ে বাড়ির পথে রওনা দিল গোয়েন্দা। পথ এখন আগের চাইতেও ফাঁকা। অপারেশন ওভার, সুতরাং কোনওরকম উদ্বেগ-উত্তেজনা নেই। মনের আনন্দে আরও কিছুক্ষণ শিস দিয়ে প্রিয় গানের সুর ভাঁজল ও। তারপর একটু বেশি মাত্রায় গম্ভীর হয়ে গিয়ে সামনে-পেছনের অনেক কিছু ভাবতে শুরু করে দিল। ছবির ওই ছোকরার সঙ্গে সুনন্দ তরফদারের বেশ মিল আছে। মনে হয় ওঁরই ভাই। মুখোমুখি ওই মেয়েটি নির্ঘাত ওর প্রেমিকা। দুজনেরই প্রোফাইল ধরা হয়েছে। তার ওপর আবার আলো-ছায়ার কায়দা আছে। মেয়েটির মুখে ছায়া বেশি, তবে বোঝা যায় বেশ সুন্দরী। কিন্তু ওদের প্রেমপত্র কি কোনও আলো ফেলতে পারবে তদন্তের কাজে?

পারলে ভাল, না পারলে খারাপ—বোধহয় একটু বেশি রকমেরই খারাপ। কৌশিক যা-যা খুব অপছন্দ করে তার একটা হল পরের ব্যক্তিগত চিঠি পড়া। তবে এই পেশার প্রয়োজনে পড়তে হয় মাঝেমধ্যে। কিন্তু পড়ার জন্যে একতাড়া প্রেমপত্র নিয়ে আসা এই প্রথম।

রাত দুটো চল্লিশে বাড়ি ফিরে কৌশিক এক কাপ কালো কফি বানিয়ে নিল। কালো কফিতে মাথা ছেড়ে যায় বেশ। কফি শেষ করে টেবিল ল্যাম্পের তলায় প্রেমপত্রের তাড়া নিয়ে বসল। বছরসাতেকের প্রেমের চিঠির বাণ্ডিল। হালের চিঠি তিন মাস আগে লেখা।

সব চিঠিই প্রেমিকার, তবে প্রেমিক তার নিজের চিঠিরও কিছু-কিছু খসড়া রেখে দিয়েছে বাণ্ডিলের মধ্যে। চিঠির মধ্যে নামধাম কিছু নেই, কিন্তু মার্কামারা মেয়েলি ছাঁদের হরফের মধ্যে একটি মেয়ে তার গোপন হৃদয়ের সব উচ্ছ্বাস বুঝি উজাড় করে দিয়েছে অকপটে।

পড়তে পড়তে কঠিন, যুক্তিবাদী গোয়েন্দার বুকের ভেতরেও কাঁপুনি উঠছিল মাঝেমধ্যে। গোয়েন্দা কখনও প্রেমে পড়েনি। বারদুয়েক শুধু প্রেমের তীর ওর পানপাতার মতো হৃদয় ছুঁয়ে বেরিয়ে গেছে। সেই ছোঁয়াতেই কয়েকদিনের সব কাজকর্ম ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল ওর। হঠাৎ-হঠাৎ বুকের গভীর থেকে বড়-বড় নিশ্বাস বেরিয়ে আসত। খেতে ভাল লাগত না, শুলে ঘুম আসত না। কোনও-একজন নেই বলে পৃথিবী আশ্চর্য রকমের ফাঁকা-ফাঁকা ঠেকত। শরীরে সব সময় জ্বর-জ্বর ভাব থাকত।

বাঘে ছুঁলে যদি আঠারো ঘা হয়, প্রেমের তীর ছুঁলে নির্ঘাত ছত্রিশ ঘা হবে। ওই তীরে হৃদয় ফুটো হলে বাঁচার আর কোনও উপায়ও থাকে না। পরের প্রেমের চিঠি পড়তে গিয়ে গোয়েন্দার নিজের জীবনের কত কথা মনে পড়ে যাচ্ছিল। বেশির ভাগই তুচ্ছ ব্যাপার, কিন্তু আজও তার কী তীব্র আলোড়ন! গোয়েন্দার চোখের সামনে একটা-দুটো মুখের ঝাপসা আদল ভেসে উঠছিল বারবার।

প্রেমের চিঠি পড়া বন্ধ করে গোয়েন্দা উঠে গিয়ে চোখেমুখে ঠাণ্ডা জল ছেটাল ভাল করে। খোলা জানলা দিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়া আসছিল। বাইরে একটু যেন আলো-আঁধারি খেলা করছে। আর কিছুক্ষণ পরেই ভোরের প্রথম আলো ফুটবে।

মিনিট-পাঁচেক ঘরের এ-জানলা থেকে ও-জানলা পর্যন্ত পায়চারি করার পরে আবার কাজের টেবিলে গিয়ে বসল গোয়েন্দা। প্রেমপত্রের গোড়ার দিকে প্রেমিকা নেহাতই বালিকা, ক্লাস এইটের ছাত্রী। ছাত্রীর হাতের লেখা কাঁচা, তার ওপর আবাব বেশ কয়েকটা বানান ভুল। কিন্তু গভীর প্রেমের কথা জানানোর ব্যাপারে এসব বাধা শেষ পর্যন্ত আর বাধা হয়ে থাকেনি।

গোয়েন্দা লক্ষ করে দেখল মেয়েটির প্রেম যত পেকেছে হাতের লেখাও তত পেকেছে। আর কমেছে বানান ভুলের সংখ্যা। সাত বছরের প্রেমপর্বে এই উন্নতিটা ধাপে ধাপে হয়েছে। এটা আলাদা করে চোখে পড়ায় গোয়েন্দা বেশ মজা পেল। প্রেম মূককে শুধু বাচালই করে না, কাঁচা লেখককে পাকা লেখক করে, সেই সঙ্গে সঙ্গে ভুল বানানও শুধরে দেয়।

সবশেষে গোয়েন্দার সব মনোযোগ গিয়ে পড়ল প্রেমিকের প্রেমপত্রের একটা খসড়ার

ওপর। ওপরের তারিখ দেখে বোঝা যায় আজ থেকে তিন মাস আগের খসড়া। আসল চিঠি নির্ঘাত যথাসময়ে প্রেমিকার হাতে পৌঁছে গেছে।

এই চিঠিটা গোয়েন্দা খুব খুঁটিয়ে পড়ল, তারপর কয়েকটি লাইনের নীচে লাল কালি দিয়ে দাগ টেনে এক-দুই-তিন করে কথাগুলো লিখে নিল ডায়েরিতে।

এক। লালজি কি এখনও বিশ্বাস করেন—বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত আছে!

দুই। নোংরা পথে রোজগার খুব সহজ কাজ। কিন্তু তুমি কি চোরের সঙ্গে ঘর করবে?

তিন। বিদেশে যাওয়ার চেষ্টা করছি। গেলে তোমাকেও নিয়ে যাব। 'বালকের মতো কেউ ভালবাসতে জানে না'— কথাটা সত্যি। এও সত্যি, ভালবাসা নিখাদ হলে সেই বালকের বয়েস কখনও বাড়ে না।

কথাগুলো হেঁয়ালির মতো। এগুলোর জট ছাড়ালে কি কাজের কাজ হবে কিছু? নাকি পুরোটাই পণ্ডশ্রম? তাই হবে বোধহয়। অল্পবয়সী প্রেমিক-প্রেমিকার কথাবার্তা বা প্রেমপত্রের মধ্যে যুক্তিবুদ্ধি খুঁজতে যাওয়াটাই পাগলামি।

সাড়ে-তিনটে নাগাদ আকাশে ফিকে-হলুদ একটা আলো ফুটে উঠেছিল। আগের আলোর সঙ্গে এ আলোর বেশ কিছুটা তফাত আছে। একটু বাদেই চারদিকে পরিষ্কার একটা ভোর জেগে উঠবে।

রাত জাগতে গোয়েন্দার একেবারেই কষ্ট হয় না। রাত জেগে পরদিন পুরো কাজও করেছে। একটু শুধু গা ম্যাজম্যাজ করে আর হাই ওঠে—এ ছাড়া আর কোনও অসুবিধে হয় না। কিন্তু ভোরের দিকে দুটো ঘন্টা ঘুমিয়ে নিতে পারলে কষ্টের চিহ্ন থাকে না কোথাও। পরদিন যত খুশি ছোটাছুটি করা যায়।

টেলিফোনের প্লাগটা খুলে রেখে ভোরের স্নিগ্ধ আলোয় ঘুমোতে গেল গোয়েন্দা। যত জরুরি ফোনই হোক না কেন, দু-তিন ঘণ্টা সেগুলোর এখানে আসার কোনও দরকার নেই।

ঘুম থেকে উঠল সাড়ে-ছটায়। তারপর হাতমুখ ধুয়ে, ব্যায়াম করে, স্নান সেরে হাতে চায়ের কাপ আর বগলে সকালের খবরের কাগজ নিয়ে এসে যখন বেতের চেয়ারে বসল তখন ঠিক সাড়ে-সাতটা বাজে। গরম চায়ের কাপে ছোট্ট একটা চুমুক মেরে খবরের কাগজের প্রথম পাতার হেডিংগুলোয় দ্রুত চোখ বুলিয়ে নিল গোয়েন্দা। পাতা ওলটাবার আগে টেলিফোনের প্লাগটা আবার লাগিয়ে দিল যথাস্থানে।

লাগাবার মিনিট-তিনেকের মধ্যে টেলিফোন এল। ওপাশে সুনন্দ তরফদার। 'বহুক্ষণ ধরে চেষ্টা করছি আপনাকে, লাইন কি এনগেজ্ড ছিল?'

'না তো! কী ব্যাপার?'

'আর বলবেন না, এ এক অদ্ভুত সমস্যার মধ্যে পড়লাম তো। আবারও চোর ঢুকেছিল বাড়িতে।'

'আপনার ফ্ল্যাটে?'

'না-না, আমাদের বাড়িতে; আড়িয়াদহের বাড়িতে।'

'কী চুরি হয়েছে?'

কিছু তো বুঝতে পারছি না। আলমারি, বাক্স, শোকেস ঘাটা হয়েছে— চুরি যাওয়ার মতো বেশ কিছু জিনিসপত্র ছিল, কিন্তু সেগুলো তো ঠিকই আছে। এ ঠিক আমার ফ্ল্যাটের চুরির মতো, চোর এসেছিল, তবে সামনে পড়ে-থাকা দামি জিনিসপত্র ছোঁয়নি। এক অদ্ভুত চুরি! কী করি এখন বলুন তো?'

'পুলিশকে জানিয়েছেন?'

'না।'

'জানান, লোকাল থানায় জানান।'

'তা নয় জানালাম, কিন্তু পুলিশ যখন জিজ্ঞেস করবে, কী চুরি হয়েছে— কী বলব?'

'চুরি কি আপনার মা'র ঘরে হয়েছে?'

'না, ছোট ভাইয়ের ঘরে।'

'তাহলে ছোট ভাইকে বলুন না আর একবার ভাল করে খুঁজেটুজে দেখতে— চুরি নিশ্চয়ই গেছে, কিছু-না কিছু। চোর তো অকারণে ঘরে ঢোকেনি।'

ঢোক গেলার মতো একটা শব্দ উঠল টেলিফোনে। এক মুহূর্ত বাদে সুনন্দ তরফদার বললেন, 'সৈকত এখানে থাকলে তো ওই সব করত। আমাদের আর দৌড়োদৌড়ি করতে হত না।'

'সৈকত কে?'

'আমার ছোট ভাই। এই তো সবে বাঙ্গালোরে চলে গেল।'

'ওর সঙ্গে আর যোগাযোগ হয়নি?'

'বাঙ্গালোর পৌঁছেই ফোন করেছিল আমাকে। এখন ওকে ধরা কঠিন। বেশির ভাগ সময়ই ট্যুরে থাকে। যোগযোগ যা করার ওই করে। ধরতে গেলে প্রতি সপ্তাহেই ফোন করে। ফোন করলে জিজ্ঞেস করব।'

'অ!'

আরও কিছু শোনার জন্যে কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করার পরে সুনন্দ তরফদার জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করব এখন তাহলে?'

'থানায় জানান। যা হয়েছে তাই বলবেন। আমিও খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করব। কাল একটা ফোন দেবেন আমাকে।'

ফোন নামাবার পরে গোয়েন্দা খবরের কাগজ আর চায়ের কাপ সরিয়ে রেখে সামনের

সাদা দেয়ালটার দিকে তাকাল। কেউ এখন ওকে দেখলে বুঝতে পারবে গোয়েন্দার দৃষ্টি দেয়াল ভেদ করেছে। কিন্তু দৃষ্টি শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছেছে— তার হদিস বোধহয় কারও পক্ষেই করা সম্ভব নয়।

দশ

গোয়েন্দা দফতরের দুঁদে পুলিশ অফিসার অবনী ঘোষরায়কে চেনে না— এমন মানুষ এ শহরে খুব কমই আছে। বেয়াড়া, গোলমেলে কেসের জট ছাড়াতে এই গোয়েন্দাটি ওস্তাদ। গা-ছমছমে খুন-জখম-রাহাজানির বৃত্তান্ত খবরের কাগজে পড়ে দেশের মানুষ যখন আঁতকে ওঠে তখন রঙ্গমঞ্চে দেখা দেন জবরদস্ত অফিসার ঘোষরায়। তারপর বিচিত্র সব সূত্র ধরে পাকড়াও করে ফেলেন অপরাধীকে।

খবরের কাগজের পাতায় যখন ম্যাপট্যাপসমেত সেই তদন্তকাহিনী বার হয় তখন মেরুদণ্ড দিয়ে ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায় অনেক পাঠকের। কিন্তু খুব কাছের মানুষজন জানে, রহস্যভেদের ব্যাপারে আড়ালের আসল মানুষটি হল প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কৌশিক মিত্র। তরুণ ওই গোয়েন্দাটি সাহায্য না করলে ওই সব রহস্য বিশ বাঁও জলের তলাতেই পড়ে থাকত।

অবনী ঘোষরায় আড়ালের এই আসল গোয়েন্দাটির ঋণ স্বীকার মুক্তকণ্ঠে। কিন্তু মুশকিল হল, এ-দেশের মানুষ রাজনীতির দাদাদের কথা শুনে শুনে মুখের কথাকে অবিশ্বাস করতে শিখে গেছে। তার ফলে লোকে অবনী ঘোষরায়ের ঋণ স্বীকারের কথাটাকে আর বিশ্বাস করে না। ভাবে, গোয়েন্দা অযথা বিনয় দেখাচ্ছেন। যা করার উনি একাই করেছেন; যাকে ধরার উনি একাই ধরেছেন।

ঘোষরায়ের কাছে এ এক মজার অভিজ্ঞতা। মিথ্যেও বলা হল না, আবার পরের কৃতিত্বও হজম করা গেল নির্বিবাদে।

তবে প্রায়ই উনি গাঁইগুঁই করেন— বেয়াড়া-বিদঘুটে কেসগুলো শুধুমাত্র ওঁর ঘাড়ে এসেই পড়ে। অন্য অফিসারদের কাছে যায় সরল, সাদামাঠা কেসগুলো। ওইসব চোর-ডাকাতগুলো রামবোকা। ধরা পড়ার সবরকম প্রমাণ আর চিহ্ন ঘটনাস্থলে ফেলে যায়। খুনিরা অত্যন্ত দুর্বল মনের, বিবেকের যন্ত্রণায় নিজেরাই ধরা দেয়। আর যারা জন্ম-খুনি এবং অত্যন্ত সেয়ানা প্রকৃতির, তাদের জটপাকানো কীর্তিকলাপ এসে জমা পড়ে একটিমাত্র টেবিলের ওপর। সেই টেবিলটিতে বসেন ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়।

দীর্ঘ ত্রিশ বছরের কর্মজীবনে ঘোষরায় মানুষের অন্ধকার জীবনের বহু কাণ্ডকারখানা দেখেছেন। প্রথম-প্রথম ভয়ংকর ঘটনা দেখে শিউরে উঠতেন, তীব্র প্রতিক্রিয়াও হত। এখন আর সেসব হয় না। বুঝে গিয়েছেন—উল্টোদিকের ঘটনাগুলোও ঘটবে। যেমন আলো থাকলে অন্ধকার, সৎ থাকলে অসৎ, নিরপরাধ থাকলে অপরাধী। ফুলের রূপটাই সব নয়, ফুলে পোকাও ধরে। একেই বলে ভূয়োদর্শিতা। দেখে আর ঠেকে গোয়েন্দা কম শেখেননি। তবে আগে দেখার ব্যাপারটা যতটা ছিল, ঠেকার ব্যাপার ততটা ছিল না।

এখন বয়েস বেড়ে গেছে, চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার সময়ও হয়ে এল। এখন বেয়াড়া কাজে ঠেকে গেলেই যে উপসর্গটা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে তার নাম ডায়াবেটিস। সেটা কমাবার জন্যে শুধু ওষুধ আর করলার রসই যথেষ্ট নয়, ছুটতে হয় তরুণ প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কৌশিকের কাছেও।

কৌশিক শক্ত হাতে হাল ধরলেই নৌকো সঠিক পথে এগোয়, ধাঁধার জট খুলে আসে; আর ঠিক তখনই প্রবীণ অফিসারটির শরীরে চিনির অস্বাভাবিক বৃদ্ধি কমে আসে। তা, এই কেসটি নিয়ে ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের বিন্দুমাত্র দুর্ভাবনা নেই। অনেকদিন বাদে হাতে বেশ একটা সহজ-সরল কেস এসেছে।

গাড়ির যাত্রী খুন। মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি করা হয়েছে। গাড়ির ড্রাইভার ফেরার। লোকাল থানার ইনভেস্টিগেটিং অফিসারের রিপোর্ট আসতেই উনি অর্ডার দিয়েছেন ড্রাইভারকে খুঁজে বার করো। সেই ড্রাইভার ধরাও পড়েছে তার গাঁয়ের বাড়িতে। আর কিছুক্ষণের মধ্যে লোকটাকে নিয়ে আসা হবে এখানে। ভূয়োদর্শী ঘোষরায় জানেন, শক্ত জেরা আর পিলে-চমকানো ধমকের মুখে পড়লেই লোকটা খুনি ধরার হদিস দিয়ে দেবে।

এইরকম একটা নির্ঝঞ্ঝাট অপেক্ষার মুখে ওখানে এসে হাজির হল কৌশিক। ওকে দেখেই হই-হই করে অভ্যর্থনা জানালেন ঘোষরায়। 'আরে! এসো এসো। এ তো দেখছি মেঘ না চাইতেই জল। তোমার কথাই ভাবছিলাম।'

লাজুক মুখে গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কোনও দরকার কি—।'

'না-না, দরকার বলতে সেরকম কিছু নয়। ইদানীং দেখেছি হাতে কোনও কেস এলেই তোমার কথা মনে পড়ে যায় সবার আগে।'

'কী কেস এল আবার?'

'না-না, একেবারেই গোলমেলে কেস নয়। চাকরিতে তো কম দিন হল না। আমার অভিজ্ঞতা বলছে, একটু বাদেই খুনির খোঁজ পেয়ে যাব। তুমি বারাসতের খুনের খবরটা জানো বোধহয়। এক গাড়ির যাত্রীকে পাওয়া গেছে, মাথায় গুলি—।'

'মিলন মাইতি?'

অবাক হয়ে ঘোষরায় জিজ্ঞেস করলেন, 'চেনো নাকি?'

'না-না, এই কেসের আই. ও ধরবাবু আমার চেনা, ওঁর কাছেই শুনছিলাম—।'

'কেসটা এখন আমার হাতে এসেছে। আসার কোনও দরকার ছিল না, খুব সিম্পল কেস। আসলে জল ঘোলা করেছে খবরের কাগজ। ফলাও করে রিপোর্ট ছেপেছে, সঙ্গে সম্পাদকীয়। ওরা তো পিরামিডের মতো ধাপে ধাপে ওপরে ওঠে। খুন করেছে অপরাধী। কিন্তু দু-চার লাইন লেখার পরেই দাঁড়িয়ে গেল এর জন্যে দায়ী পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা। এর সঙ্গে আবার মান্ধাতা আমলের নিষ্পত্তিহীন কেসগুলোও জুড়ে দেয়। এতগুলো কেস, কিন্তু কোথাও অপরাধী ধরা পড়েনি। সব উদাহরণ আবার ঠিক নয়। ফাইল ঘাঁটার দরকার নেই, কয়েকটা

কেস আমার মনেই আছে। অপরাধী জেল হাজতে, আর আই খাটছে। তা, কাগজে আরও দু-চার লাইন লেখার পরে লেখা হল— গোটা রাজ্যে অপরাধমূলক কাজের সংখ্যা হু-হু করে বেড়ে চলেছে, কিন্তু এ—ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা সত্ত্বেও পুলিশ মন্ত্রী কোনও বিবৃতি দিচ্ছেন না। পিরামিড স্ট্রাকচার এবার আরও ওপরে উঠল। জনগণের নিরাপত্তার দায়িত্ব যে সরকার পালন করতে পারেন না, সেই সরকারের কি গদি আঁকড়ে পড়ে থাকার কোনও অধিকার আছে?'

কৌশিক হেসে উঠে বলল, 'বাহ্! আপনি তো দেখছি বেশ জঙ্গি নেতাদের কায়দায় বক্তৃতা করতে পারেন।'

কৌশিকের রসিকতার জবাবে ইন্সপেক্টর কিন্তু হাসলেন না, গম্ভীর মুখে বললেন, 'বক্তৃতা নয়, সত্যি কথাই বলছি। খবরের কাগজের ওইসব গরম-গরম কথা পড়ে আমাদের বড়কর্তারা রিঅ্যাক্ট করেন। ওদের রিঅ্যাকশান মানে টেলিফোনে আমাদের ধমক খাওয়া। মাঝেমধ্যে আবার অদ্ভুত আবদারের কথা—কদ্দিনের মধ্যে কেসটা আপনি ফয়সালা করতে পারছেন? আরে বাবা, তদন্ত মানে কি ফাইল চালাচালি! কে অপরাধী? কোথায় পাওয়া যাবে তাকে? এসব কি সোজা কাজ! কিন্তু এ নিয়ে কোনও প্রশ্ন করা চলবে না।'

'প্রশ্ন করার দরকার নেই! এ ধরনের ফোন এলে আপনি আপনার কাজের প্রোগ্রেস রিপোর্টটা জানিয়ে দেবেন। আপনি তো সতিই খুব খাটিয়ে অফিসার। বসে না থেকে কাজ করে যাচ্ছেন সমানে। সেটাই জানাবেন।'

'পাগল। ওসব জানাতে গেলে তো আবার ধমক খেতে হবে। আমরা তো সব চুনোপুঁটি।'

শেষের এই কথাটা ইন্সপেক্টর ঘোষরায় প্রায়ই বলেন। বলেন কিন্তু প্রতিবাদ শোনার জন্যে। কৌশিক সেটা ভাল ভাবে জানে বলেই বলল, 'আপনি যদি চুনোপুঁটি হন, তাহলে রুই-কাতলা কে?'

কথাটা শুনে একগাল হেসে ইন্সপেক্টর বললেন, 'কী খাবে? কফি, চা, না, ঠাণ্ডা কিছু?'

কৌশিকের ঠোঁটের কোণে একটা ঢেউ খেলে গিয়েছিল। বলল, 'লেবু-চা।'

খুব অল্প সময়ের মধ্যেই লেবু-চা এসে গেল। একটায় চিনি আছে, আর একটায় নেই। চিনিহীন চা ইন্সপেক্টরের জন্যে। উনি বেশ গল্প করার মেজাজে ছিলেন। লম্বা-চওড়া টেবিলে একটু তবলা বাজিয়ে নিয়ে বললেন, 'তা, মাঝেমধ্যে এইরকম একটু চলে এলে পারো। যা চাকরি, বেশ গুছিয়ে আড্ডা মারার তো সুযোগ নেই। মাঝেমধ্যে কাজের ফাঁকে তোমাদের সঙ্গে একটু আড্ডা মারতে পারলে মন-মেজাজ বেশ চাঙ্গা হয়।'

'আপনার সঙ্গে আড্ডা মারতে পারা তো ভাগ্যের কথা। আড্ডাও হয়, সেই সঙ্গে সঙ্গে আবার অনেক কিছু শেখাও যায়। কিন্তু কাজ ছাড়া ইন্সপেক্টর ঘোষরায়কে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

বেশ খোলামেলা গলায় হেসে উঠে ইন্সপেক্টর বললেন, 'আরে বাবা কাজের তো রকমফের আছে। বেয়াড়া ধরনের খুনটুন বা চুরি-ডাকাতি হলে অন্য দিকে মন দেওয়ার

সুযোগ পাই না সত্যি, কিন্তু মাঝে মাঝে সরল, সাদামাঠা কেসও তো কিছু পাওয়া যায়— তখন কাজের ফাঁকে আড্ডা মারতে দোষ কোথায়!'

'বারাসতের এই খুনটা কি আপনার কাছে খুব সহজ-সরল কেস বলে মনে হচ্ছে?'

টেবিলের ওপর ভারী হাতের ছোট্ট একটা ঘুসি মেরে ইন্সপেক্টর ঘোষরায় বললেন, 'আলবত। চোর-ডাকাত খুনি ঘাঁটাঘাঁটি করে সারা জীবনটাই তো কেটে গেল। অভিজ্ঞতার দাম পাব না একটুআধটু? বড়াই করছি না, আমরা অপরাধ এবং সমাধান—দুটোর গন্ধই অনেক সময় আগে থেকে পেয়ে যাই। লোকটার তো আসার সময় হয়ে গেল, একটু বোসো, মনে হয়, হাতেনাতেই তোমাকে কিছু প্রমাণ দিয়ে দিতে পারব।'

বলার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একজন কনস্টেবল এসে লম্বা একটা স্যালুট ঠুকল ইন্সপেক্টরের সামনে। সঙ্গে কোমরে দড়ি হাতে হ্যাণ্ডকাফ ছিঁচকে চোর মার্কা একটা লোক। কনস্টেবল বলল, 'এ হি হ্যায় ওহ্ ডেরাইভার।'

বোধহয় সব দুঁদে অফিসারের মধ্যেই একজন ডক্টর জেকিল আর একজন মিস্টার হাইড বাস করে। এরা বোধহয় পালা করে সারা দিনের মধ্যে বেশ কয়েকবার আত্মপ্রকাশ করে থাকে।

বারাসতের ওই গাড়ির ধরা-পড়া ড্রাইভারের দিকে কঠিন চোখে তাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই একটু আগের হাসিখুশি ইন্সপেক্টরের ভোল পালটে গিয়েছিল বেমালুম। কঠিন এবং হিংস্র চেহারায় ইন্সপেক্টর বাজখাঁই গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি টু ফোর সেভেন টু চালাও?'

ড্রাইভার ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল। মিনমিনে গলায় বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।'

এবার 'তুমি' থেকে 'তুই'। হুঙ্কার দিয়ে উঠে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'গাড়ি ফেলে পালিয়েছিলি কেন?'

ড্রাইভার একটু কেঁপে উঠেছিল, প্রশ্নের কোনও জবাব দিতে পারল না।

ইন্সপেক্টর মেঘ-ডাকা গলায় বললেন, 'টেবিলের ওই ধারটায় কোনও কাচ নেই। কেন নেই জানিস? যারা পাকা পকেটমার, তাদের দুটো হাত এখানে রেখে রুলের বাড়ি মেরে আঙুলগুলো ভেঙে দিই আমরা। ভাঙা আঙুলে তো আর পকেটমারি করা যায় না। আবার তোর মতো যারা এখানে আসে, তারা যদি মিথ্যে কথা বলে তাদের আঙুলগুলোর দশাও ওইরকম হয়। এখন তুই ঠিক কর— আমার কথার সত্যি উত্তর দিবি, না মিথ্যে বলবি। একটা কথা জেনে রাখিস—মিথ্যে বললে আমরা ধরতে পারি। তখন আর এক মিনিটও সময় দেব না, তোর হাতের দশটা আঙুল গাঁট থেকে ভেঙে দেব। সারা জীবনের মতো ড্রাইভারি করা তোর ঘুচে যাবে। আর যদি সত্যি কথা বলিস, বেঁচে যাবি তুই—।'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায়কে বুনো বাঘের মতো দেখাচ্ছিল। ওঁর ওই চেহারা দেখে আর গাঁক-গাঁক গলার ওইসব কথা শুনে শুকনো পাতার মতো কেঁপে উঠেছিল ড্রাইভার।

রোগা, ছোটখাটো চেহারার লোকটাকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত দৃষ্টি দিয়ে বারতিনেক মেপে

নেওয়ার পরে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'নাম কি?'

'আজ্ঞে, আমার?'

'তবে কি তোর বাবার?'

'আজ্ঞে গৌরাঙ্গ কর্মকার।'

'গাড়ি চালাবার লাইসেন্স আছে?'

'আজ্ঞে আছে।'

'যে লোকটা খুন হয়েছে সেই মিলন মাইতিকে তুই চিনতিস?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, আমার গাড়িতে বেশ কয়েকবার উঠেছে।'

'মিলন মাইতি ছাড়া গাড়িতে আর কে ছিল?'

'প্রথমে ছিল একটা মেয়েছেলে।'

'বাজারের?'

ইন্সপেক্টরের প্রশ্নের জবাবে রীতিমত বিব্রত হয়ে গৌরাঙ্গ বলল, 'আজ্ঞে না, উনি ওই কোম্পানিতে কাগজ-কলম সাপ্লাই করে থাকেন।'

'বেশ, ওকে নিয়ে মিলন মাইতি কোথায় গিয়েছিল?'

'আজ্ঞে ওল্ড চিনেবাজারে। ওখানে একটা দোকানে কাগজ-কলমের কয়েকটা পেটি নামাল গাড়ি থেকে। তারপর সাহেব বলল, গঙ্গার ধারে চলো। গঙ্গার ধারে একটা রেস্টুরেন্টে ওরা এক ঘণ্টা ছিল। বাবাসত যাওয়ার পথে সি.আই.টি-র মোড়ে সাপ্লাই-দিদিমণি নেমে গিয়েছিল।'

'তারপর কে উঠেছিল গাড়িতে?'

'আজ্ঞে তখন না।'

ধমকে উঠে ইন্সপেক্টর প্রশ্ন করলেন, 'তখনকার কথা কে জিজ্ঞেস করছে! পরে কে উঠেছিল গাড়িতে?'

'আজ্ঞে লেক টাউনের কাছে আর এক সাহেব উঠেছিল।'

'সাহেবকে তুই চিনতিস?'

'আজ্ঞে না, ওই প্রথম দেখলাম।'

'দুজনেই কি পেছনের সিটে বসেছিল?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কথাবার্তা তো কানে যাচ্ছিল। শুনে কী মনে হল, অনেক দিনের চেনাজানা?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'কী ধরনের কথাবার্তা চলছিল?'

'আজ্ঞে, মেয়েছেলে নিয়ে।'

'মেয়েছেলে মানে ওই কোম্পানির তোর সাপ্লাই-দিদিমণি?'

মাথা চুলকে বাধো-বাধো গলায় ড্রাইভার বলল, 'আজ্ঞে না, কথা শুনে বুঝলাম—বাজারের মেয়েছেলে। ওই নিয়ে ওদের মধ্যে হঠাৎ খুব ঝগড়া বেধে গেল।'

'ঝগড়া! কী ধরনের কথা হয়েছিল?'

'আজ্ঞে বুঝতে পারিনি।'

টেবিলের ওপর মাঝারি মাপের একটা ঘুষি মেরে হুংকার দিয়ে উঠলেন প্রকান্ড চেহারার ইন্সপেক্টর। 'মিথ্যে বলা হচ্ছে? ফিসফিস-গুজগুজ কানে গেল আর ঝগড়ার কথা বুঝতে পারলি না?'

কাঁদো-কাঁদো মুখে ড্রাইভার জবাব দিল, 'আজ্ঞে ওরা দুজন ইংলিশে ঝগড়া করছিল।'

এবার অবিকল করাত দিয়ে কাঠ কাটার মতো হয়ে উঠেছিল ইন্সপেক্টরের গলার স্বর। 'এই লোকটাই তো বারাসতে পৌঁছবার পরে মাথায় পিস্তল চালিয়ে খুন করেছিল মিলন মাইতিকে। তাই না?'

ড্রাইভার কথার জবাব দিল না। ওর মাথা ঝুঁকে পড়েছিল নীচের দিকে।

'আমরা সব জেনে গিয়েছি। মিথ্যে বললে তুই মরবি, সত্যি বললে বাঁচবি। বারাসতের কাছে এই লোকটাই গাড়ি থামাতে বলেছিল?'

ড্রাইভার কথা না বলে মাথাটা ওপর থেকে নীচের দিকে নাড়াল একবার।

'কী বলে গাড়ি থেকে নামাল মিলন মাইতিকে?'

ড্রাইভার মিনমিন করে জবাব দিল, 'কী একটা নাম করে বলল—চলো, এসেছে কি না দেখে আসি। ওরা নামার পরে আমার একটু সন্দ হয়েছিল। আমি লুকিয়ে-লুকিয়ে পেছন-পেছন গেলাম। ওখানে একটা পোড়ো মন্দির ছিল, জায়গাটা ফাঁকা-ফাঁকা। আলোটালো ছিল না, চাঁদের আলোয় দেখলাম ওই লোকটা মিলনবাবুর মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে পর-পর দুবার—। আমি এত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যে ওখান থেকে দৌড়ে পালাই, তারপর বাসে করে—।'

কথা শেষ করতে পারল না ড্রাইভার। একটু বাদে কেঁপে উঠে কান্নাজড়ানো গলায় বলল, 'আমার কোনও দোষ নেই স্যার—।'

ইন্সপেক্টরও ধারে বসে-থাকা কৌশিকের দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হেসে চোখ নাচালেন। ইঙ্গিতের অর্থ পরিষ্কার। বাংলা করলে এইরকম দাঁড়ায় : কী বলেছিলাম না একেবারে সাদামাঠা কেস। খুনির খোঁজ পেতে আমার বেশিক্ষণ লাগবে না।

ইন্সপেক্টরও এবার ভরসা দেওয়ার গলায় ড্রাইভারকে বললেন, 'চালাকি করতে গেলেই মরতিস। জেলে পচতে হত সারা জীবন। সত্যি কথা বলবি কেউ তোকে ছোঁবে না। কাজ মিটে গেলে গটগট করে বাড়ি চলে যাবি। কেউ তোর ক্ষতি করতে পারবে না। কেউ ভয় দেখালে আমাকে বলবি, আমি সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যবস্থা নেব। এবার বল্ লোকটার নাম কী?'

'বিশ্বাস করুন স্যার, নামটা একবারের জন্যেও আমার কানে আসেনি।'

'লেকটাউন থেকে ওঠার সময় লোকটাকে ভাল করে দেখেছিলি নিশ্চয়ই।'

জবাবে ড্রাইভার আস্তে করে মাথা কাত করল একপাশে।

'বয়েস কত?'

'বছর-পঞ্চাশ।'

'লম্বা?'

'আজ্ঞে আমার চাইতে এই এইটুকু বেশি।'

'তার মানে পাঁচ-ছয়। এবার একটু ভেবেচিন্তে বল, লোকটাকে দেখতে কেমন?'

'আজ্ঞে খুব ফর্সা। স্বাস্থ্য ভাল। চৌকোপানা মুখ। ডানদিকের ভুরুতে কাটা দাগ। নাকটা বেশ খাড়া। পরনে ছিল প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট।'

'বাহ্! তোর তো দেখার চোখ বেশ ভাল।' এর পরের কথাটা বলা হল পাশের কনস্টেবলকে—'যাও ওকে পাশের ঘরে নিয়ে যাও। ওখানে আমাদের আর্টিস্টবাবু অপেক্ষা করছেন। সব বলা আছে। এর মুখ থেকে খুনির বর্ণনা শুনে একটা ছবি আঁকতে হবে। যাও।'

কনস্টেবল ড্রাইভারকে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

কৌশিক অবাক হয়ে বলল, 'আপনি খুনির ছবি আঁকবেন বলে আগে থেকে আর্টিস্টকে খবর দিয়ে রেখেছেন!'

বাহাদুরি নেওয়ার গলায় ইন্সপেক্টর বললেন, 'অভিজ্ঞতা, স্রেফ অভিজ্ঞতা। আমি জানতাম ড্রাইভার কী বলবে। সুতরাং আগে থেকেই পরের কাজটা গুছিয়ে রেখেছি। কী, ঠিক করিনি?'

'হয়তো।'

ইন্সপেক্টর চোখ কপালে তুলে বললেন, 'হয়তো কেন বলছ?'

'ড্রাইভার আপনাকে মিথ্যে কথা বলেছে।'

'মিথ্যে! কী করে বুঝলে?'

'শরীরের ভাষা পড়ে।'

'কীসের ভাষা?'

'শরীরের ভাষা। অবশ্য আমারও ভুল হতে পারে। ঠিক আছে, এখন চলি। পরে আবার আসব।'

ইন্সপেক্টর এতটাই অবাক হয়েছিলেন যে ওঁর মুখ দিয়ে কোনও কথা বার হল না। কৌশিব ওর চোখের সামনেই বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

এগারো

কৌশিক আর মুখার্জির শোভাবাজারে পৌঁছতে একটু দেরি হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু কিশোরের বসার ঘরে যখন ওরা ঢুকল তখন আসর জমজমাট। কিশোর চৌধুরী উঠে এসে এঁদের আপ্যায়ন করে বসালেন। কিশোর বাদে ঘরে আছে ওর বন্ধু দিব্য মল্লিক, ডক্টর জ্যোতি মৈত্র এবং আর একজন অচেনা ভদ্রলোক। ভদ্রলোক লম্বা-চওড়া, অত্যন্ত সুপুরুষ, বয়েস বছর-পঁয়তাল্লিশ। ঘরের মধ্যে চায়ের শূন্য কাপ, বোঝা যায় সবে শেষ হয়েছে।

ভদ্রলোক বললেন, 'ঠিক আছে আর একবার বলছি, বাবা পেটে/মা হাটে/ আমি পা দিয়েছি আটে।'

কৌশিক ছাড়া বাকি সবাই লাইনগুলো বিড়-বিড় করতে করতে মাথা খাটাতে শুরু করে দিয়েছিলেন।

মুখার্জিবাবু ফিসফিস করে বললেন, 'বাবা পেটে— তার মানে বাবা তখনও জন্মায়নি, এটা আবার কী রকম ব্যাপার?'

কৌশিক কথাটার কোনও উত্তর দিল না, কিন্তু বুঝতে পারল এ ঘরে ধাঁধার আসর বেশ কিছুক্ষণ ধরে বসেছে।

ঘরের মধ্যে এখন শুধু তিনজনই নয়, মুখার্জিবাবুও মাঝেমধ্যে বিড়বিড় করে আউড়ে যাচ্ছিলেন ধাঁধাটা। কিন্তু ধাঁধা শেষ পর্যন্ত ধাঁধাই থেকে গেল।

একটু বাদে ডক্টর মৈত্র মৃদু হেসে বললেন, 'না, আমার দ্বারা এ-ধাঁধার জট ছড়ানো সম্ভব হবে না।' কিছুক্ষণ পরে একটু ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে একই কথা বললেন কিশোর আর দিব্যও।

সুপুরুষ ভদ্রলোকটি সুন্দর ভাবে হেসে বললেন, 'ধাঁধাটা অবশ্য হাতিঘোড়া কিছুই নয়, এর মানে হল—।'

কৌশিক ভদ্রলোককে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি একবার চেষ্টা করে দেখব।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয়ই।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে কৌশিক বলল, 'ধাঁধার ওই যে শেষ লাইন—আমি পা দিয়েছি আটে—এ-কথাটা বলছে একটা ছোট ছেলে যার বয়েস আট। কেউ একজন তাকে তিনটে প্রশ্ন করেছে। প্রথম প্রশ্ন—তোর বাবা কী করে? উত্তরে ছেলেটা বলেছে—বাবা পেটে, মানে বাবা পেটায়। কী পেটায়? না, হাঁড়ি। তার মানে ছেলেটার বাবা কুমোর। পিটিয়ে হাঁড়ি বানায়। পরের প্রশ্ন—তোর মা কোথায় গেছে? এটার উত্তর খুব সোজা। মা গেছে হাটে, কিছু হয়তো বিক্রি করতে। পরের প্রশ্ন—তোর বয়েস কত? তখন ওই উত্তর—পা দিয়েছি আটে।'

ভদ্রলোক ঝলমলে মুখে বললেন, 'বাহ্! আপনি একেবারে সঠিক উত্তর দিয়েছেন।'

কিশোর এবার কথার মাঝখানে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, 'আপনার সঙ্গে ওঁর আলাপ করিয়ে দিই অতনুদা—ইনি কৌশিক মিত্র, কলকাতায় পুরনো বাড়িঘর রেস্টোরেশনের ব্যাপারে খুব উৎসাহী। আর অতনুদা মানে অতনু দত্তের কথা কী বলব, পুরনো দিনের বিরাট বনেদি ঘরের ছেলে—।'

অতনু দত্ত যে ভাবে হাত তুলে কিশোরকে থামিয়ে দিলেন তাতে যে-কেউ বুঝবে উনি প্রথম আলাপেই কাউকে বংশপরিচয় দিতে চান না। কিন্তু উৎসাহী কিশোরকে থামানো মুশকিল। বললেন, 'এ কাজে অতনুদাই আমাকে টেনে এনেছেন। তার আগে, সত্যি কথা বলতে কি, পুরনো বাড়িঘরের মধ্যে আমি আলাদা করে কিছুই দেখতে পেতাম না। অতনুদাই শিখিয়েছে, পুরনো বাড়ির সঙ্গে আমাদের ঐতিহ্য কী ভাবে জড়িয়ে আছে। এ বোধহয় রক্তের

ঋণ। ভাঙাচোরা ঠাকুরদালান বা নাটমন্দির দেখলে বুকের ভেতরটা হু-হু করে ওঠে। এই অতনুদাই তো—।'

অতনু দত্ত এবার কিশোরকে থামাবার জন্যেই বোধহয় উঁচু গলায় আগের প্রসঙ্গে ঢুকে পড়লেন। বললেন,' কৌশিকবাবু, আপনি ধাঁধা নিয়ে বোধহয় আলাদা ভাবে চর্চা করেন না। করেন কি?'

প্রশ্নের উত্তরে দুদিকে মাথা নাড়িয়েছিল কৌশিক।

'না করারই কথা, বিশেষ করে আপনার যা বয়েস। এই ধাঁধা জিনিসটা তো আমাদের দেশ থেকে একেবারে উঠে যাওয়ার জোগাড় হয়েছে। এখন ধাঁধার বদলে যে বিদঘুটে ব্যাপারটা হাজির হয়েছে তার নাম কুইজ। টিভিতে দেখেন না, বুড়োবুড়ি পর্যন্ত সেজেগুজে কুইজের আসরে বসে। আর কীসব উদ্ভট প্রশ্ন! একটা হুমদো কুইজ-মাস্টার কর্ডলেস মাইক নিয়ে নেচে নেচে প্রোগ্রাম কনডাক্ট করে। এই প্রোগ্রামগুলো চোখে পড়লে আমি ভাবি— এর বদলে যদি আমাদের দেশের প্রাচীন ধাঁধাগুলো নিয়ে কুইজ করা যেত! ভেবে দেখুন না, অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা আসর জাঁকিয়ে বসে আছে আর কুইজমাস্টার প্রশ্ন করছে— বলো তো বন থেকে বেরুলো টিয়ে/ সোনার টোপর মাথায় দিয়ে। উত্তর কি?'

অতনু দত্তের প্রশ্নটাকে সত্যি ভেবে নিয়ে আগ বাড়িয়ে উত্তর দিলেন মুখার্জিবাবু—'আমি জানি, আনারস।'

উনি উত্তর দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৌশিক বলল, 'এঁর সঙ্গে আপনাদের আলাপ করিয়ে দিই। ইনি আমার বন্ধু-কাম-অভিভাবক, নাম সনাতন মুখার্জি। পুরনো দিনের যাত্রা-নাটকের বিস্তর খোঁজখবর রাখেন, নিজেও অভিনয় করতেন একসময়। আপনারা শিল্প-সংস্কৃতির চর্চা করেন তো, তা ভাবলাম—আপনাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলে উভয়পক্ষই খুশি হবে।'

দিব্য মল্লিক বলল, 'আমরা সত্যিই খুশি, এই ধরনের মানুষই তো খুঁজছি আমরা।'

কৌশিক জানাল, 'ইনি একজন ভাল অভিনেতাই শুধু নন, ভাল মেক-আপম্যানও। মেক-আপ নিয়ে আমাকে কত শত বোঝাচ্ছিলেন। তা, আমি বেলাইনের লোক, বললাম— আমি আর ওসব কী বুঝব! আসল জায়গায় নিয়ে যাব আপনাকে, তাঁরা আপনার গুণের কদর করবে।'

এসব কথা শুনে মুখার্জিবাবুর একটু-আধটু লজ্জা পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু উনি সম্পূর্ণ অন্য একটা ঘোরের মধ্যে ছিলেন বলে কথাগুলো বোধহয় কানেই ঢুকল না। ওঁর এই ঘোরটা ছিল ধাঁধার ঘোর। সেই ঘোর থেকে মুখার্জিবাবু বললেন, 'আমি একটা ধাঁধা বলছি, বলুন তো কী হবে! ধাঁধাটা হল— এ ঘর যায়, ওঘর যায়/দুমদুম করে আছাড় খায়। কী, বলুন তো?'

একটা ধাঁধার রহস্যভেদ করতে গেলে সামান্য যে সময়টুকু লাগে মুখার্জিবাবু সেটুকুও না দিয়ে বলে উঠলেন, 'পারলেন না তো, ঝাঁটা।'

অতনু দত্তও বোধহয় ওঁর আগের কথার ঘোরে ছিলেন। বললেন, 'এই ধাঁধা জিনিসটাও

কিন্তু বাঙালির সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে আছে। ধাঁধার মধ্যে মজা আছে, রহস্য আছে; তার সঙ্গে সঙ্গে আবার বাঙালির জীবনও মিশে আছে অনেকখানি। ওই যে ধরুন, কুমোরের ছেলেকে নিয়ে যে ধাঁধাটা—তার মধ্যে পুরনো দিনের বাঙালির জীবনের একটা ইতিহাসও লুকিয়ে আছে। সবে আট বছর বয়েসে পা-দেওয়া ছেলেটি ওই তিনটি প্রশ্ন কোথায় শুনল? জানাশোনা কেউ নিশ্চয়ই করেনি। কে করেছে তাহলে? হয়তো ওই ছেলেটার গাঁয়ের এক দোকানদার। ছেলেটা হয়তো দোকানের সামনে হাঁ করে দাঁড়িয়েছিল। খাবারের দোকান। তখন দোকানদার ওই তিনটে প্রশ্ন করেছিল ওকে। এই ধাঁধার মধ্যে আমাদের সমাজজীবনের একটা আস্ত ছবি কি উঠে আসেনি? নিশ্চয়ই এসেছে। তাহলে দেখুন, ধাঁধার মজা জানতে গিয়ে আমাদের পুরনো দিনের সমাজকেও কিছুটা চিনে ফেললাম আমরা। এটা কিন্তু শুধু একটা বাড়তি লাভ নয়। এর প্রয়োজন আছে। নিজেদের অতীত ইতিহাসকে জানতে না পারলে কোনও জাতই বড় হতে পারে না। শুধু ধাঁধা কেন, পুরনো কত প্রবাদ আছে। প্রবাদ, জনশ্রুতি, কিংবদন্তি—এর পেছনেও নানা ইতিহাস।'

এবার কেমন যেন মাইক কেড়ে নেওয়ার ভঙ্গিতে এগিয়ে এলেন দিব্য। 'প্রবাদ নিয়ে কিন্তু হেভি-হেভি গল্প আছে। ছেলেবেলায় জ্যাঠাবাবুদের মুখে শুনেছি। গল্পগুলো কিন্তু বানানো নয়। এই-যেমন—হরি ঘোষের গোয়াল। হরি ঘোষের গোয়াল বললেই বোঝা যায়—ফালতু জায়গা, সেখানে ফালতু লোকের হেভি গ্যাঞ্জাম। কিন্তু পেছনের ঘটনাটা তো অন্যরকম, আপনারা তো জানেন নিশ্চয়ই।'

ধাঁধার গল্পে আগেই মজে গিয়েছিলেন মুখার্জিবাবু, উনি ছেলেমানুষের ঢঙে বললেন, 'না-না, আমি ঠিক জানি না। আপনি একটু খুলে বলুন তো।'

দিব্য চেয়ারটা সামনের দিকে একটু টেনে এনে বললেন, 'এই যে বলরাম, ঘোষ স্ট্রিট—এটা কিন্তু খুব পুরনো রাস্তা। আজ থেকে প্রায় আড়াই শো বছর আগে বানানো হয়েছে। বলরামের দুই ছেলে—রামহরি ও শ্রীহরি। শ্রীহরি পরে বিশাল ধনী হয়েছিলেন। কাঁটাপুকুরে বানিয়েছিলেন মস্ত এক অট্টালিকা। ইংরেজরা এই সময় মিরকাশিমের কাছ থেকে মুঙ্গের কেড়ে নিয়েছিল। শোনা যায়—মুঙ্গের আর দুর্গ রক্ষার ভার যাঁর ওপর পড়েছিল তাঁর দেওয়ান হয়েছিলেন শ্রীহরি। লোকে এই জন্য ওঁকে দেওয়ান হরি ঘোষও বলত। মানুষটির টাকাপয়সার মা-বাপ ছিল না। তবে বড়লোক হলেই যে দানধ্যান করবে—তার কোনও মানে নেই। এই হরি ঘোষ ছিলেন অসম্ভব দয়ালু প্রকৃতির। ওঁর মস্ত বাড়ির মস্ত ঘরে রাজ্যের নিষ্কর্মা লোক এসে জুড়ো হয়েছিল। শুয়ে-বসে তাস-পাশা খেলত, গাঁজা খেত, তামাক টানত। খাওয়াপরার চিন্তা ছিল না। বিরাট রান্নাঘরে হাঁড়ি চাপানোই থাকত। খিদে পেলে পেট পুরে খেয়ে এসো। এই অলস, নিষ্কর্মা লোকগুলোকে দেখিয়ে লোকে আড়ালে ঠাট্টা করে বলত—হরি ঘোষের গোয়ালের গরু। ওই কথাটা মুখে মুখে ছড়াতে ছড়াতে প্রবাদ হয়ে যায়। হরি ঘোষ লোকগুলোকে শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে শুধু খাওয়ানোই নয়, তাদের সমস্তরকম দায়দায়িত্বও ঘাড় পেতে নিয়েছিলেন। এর মাতৃদায়, ওর পিতৃদায়, তমুকের কন্যাদায়—সব দায় শেষ

পর্যন্ত হরি ঘোষের দায়। তবে অতিরিক্ত দয়া দেখাবার জন্যেই শেষে ভুগতে হয়েছিল ওঁকে। এক বেয়াড়া আত্মীয়ের জামিনদার হয়েছিলেন। সেই আত্মীয়টি গা ঢাকা দিতেই কোম্পানি হরি ঘোষের সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল। মনের দুঃখে হরি ঘোষ তখন কাশী চলে যান। পরে সেখানেই মারা যান তিনি। মারা গেছেন আজ থেকে প্রায় পৌনে দুশো বছর আগে, কিন্তু হরি ঘোষের গোয়াল— এই কথাটা আজও কেমন চালু হয়ে আছে দেখুন।'

দিব্য থামতেই কিশোর বললেন, 'বিখ্যাত দাতাদের নামে বেশ কয়েকটা প্রবাদ চালু হয়ে গেছে। এই যেমন—লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।'

কিশোরের কথায় মুখার্জিবাবুর কৌতূহল বোধহয় আর এক ধাপ বেড়ে গিয়েছিল। চকচকে মুখে উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রকম? শুনি গল্পটা?'

পুরনো দিনের গল্পের স্রোত ঘরের মধ্যে পুরো দমে বয়ে চলেছে, কিন্তু কৌশিক আড়চোখে লক্ষ করছিল—মাঝেমধ্যে কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন ডক্টর মৈত্র।

কিশোর চৌধুরী কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'যত দূর জানি এই গৌরী সেন মানুষটি আজ থেকে তিনশো বছর আগে হুগলিতে জন্মেছিলেন। প্রথম দিকে ওঁর ব্যবসা খুব একটা বড় ছিল না। পরে কপাল ফিরেছিল কলকাতায় কারবার করতে এসে। বিশাল ধনসম্পত্তি করেছিলেন। কিন্তু বড় ব্যবসায়ী বলে নয়, ওঁর খ্যাতি ছড়িয়েছিল দানবীর বলে। টাকার জন্যে ঠেকে গিয়ে কেউ ওঁর কাছে হাত পাতলে উনি তাকে ফেরাতেন না—সে টাকার অঙ্ক যত বড়ই হোক না কেন। চেনা-অচেনা বলে কিছু ছিল না। তুমি বিপদে পড়ে হাত পাতলে আমি টাকা দেব। সেকালে দেনার দায়ে অনেককে জেলে পচতে হত। কিন্তু কেউ গিয়ে ওইসব কয়েদির হয়ে উমেদারি করলে তিনি এককথায় টাকা দিয়ে খালাস করে নিতেন। পালাপার্বণে নিজে থেকেও অনেককে উদ্ধার করতেন। মস্ত বড় ওই দাতাটিকে নিয়ে তখন প্রবাদ চালু হয়ে গেল—লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন।'

কিশোরের গল্প শুনতে শুনতে ঝলমল করে উঠেছিল অতনু দত্তের চোখমুখ। উনি বললেন, 'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে। বাঙালিদের মধ্যে যেসব দানবীর আছেন তাঁদের নিয়ে ছোট-ছোট নাটক করলে কেমন হয়? এই যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ—এঁরও তো দানধ্যানের অন্ত ছিল না। ওটা করলে সাধারণ মানুষকে আমাদের গৌরবময় ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতন করা যাবে।'

মুখার্জিবাবুর উত্তেজনা আরও এক ধাপ বেড়ে গিয়েছিল, উনি তড়বড় করে বলে উঠলেন, 'আচ্ছা, হর্ষবর্ধন কি বাঙালি ছিলেন?'

মল্লিক পকেট থেকে ছোট্ট একটা ডায়েরি বার করে বললেন, 'আপনি একটা দারুণ আইডিয়া দিয়েছেন, পরে এটা আমরা কাজে লাগাব। এবার পনেরো তারিখের অনুষ্ঠানটা আমরা কী ভাবে করব—আপনাকে একটু বলে নিই। কিছু কাটছাঁট অবশ্য হবে, ফাইনাল প্রোগ্রাম পরে দেখাব আপনাকে। তবে মোদ্দা ব্যাপারটা এইরকম হবে—নাচ, গান আর পালা তিনটেই থাকবে। একসঙ্গে নয়, তিন ভাগে। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগে থাকবে ঝুমুর, কীর্তন,

গম্ভীরা, বাউল আর ভাটিয়ালি। শেষ ভাগে পালা। ছোট-ছোট মাপের। পুরনো দিনে যেমন হত তেমনি। তার মধ্যে থাকবে সীতার পাতালপ্রবেশ, পঞ্চপাণ্ডবের কীর্তিকথা, সতী বেহুলা, রাধা-কৃষ্ণকথা, চৈতন্যলীলা। আচ্ছা, এর মধ্যে একটু হালকা করে বিদ্যাসুন্দর পালা ঢোকালে কেমন হয়?'

অতনু দত্ত খুব মনোযোগের সঙ্গে সব শুনছিলেন, মল্লিক থামতেই প্রশ্ন করলেন, 'আচ্ছা, এগুলো কি আপনারা জনসাধারণকে নিজেদের দেশ চেনাবার প্রোগ্রাম হিসেবে নিয়েছেন।'

'ঠিক তাই। এগুলো করব আমরা বহু দূরের গ্রামে। আসরে শামিয়ানা খাটানো হবে। হ্যাজাকের আলো জ্বলবে। আর অনুষ্ঠানের আর্টিস্ট হবে যতদূর সম্ভব গাঁয়ের লোকরাই।'

ডক্টর মৈত্র হঠাৎই যেন একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললেন, 'এসব ভালই, কিন্তু আমাদের ঝোঁক থাকবে প্রাচীন সব বাড়িঘর সারাই করে আগের চেহারায় ফিরিয়ে আনার দিকে। তাই তো?'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।' ঘরের ওদিকের তিনজন প্রায় একসঙ্গেই বলে উঠলেন।

কিশোর চৌধুরী বললেন, 'রেস্টোরেশনের কাজের ব্যাপারে আমি একটা খসড়াও তৈরি করেছি। এটা নিয়ে আপনাদের সঙ্গে একটু বসা দরকার।'

ডক্টর মৈত্র সবাইকে অবাক করে দিয়ে বললেন, 'আপনারা এখন নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা চালিয়ে যান, আমি পরে শুনে নেব। কয়েকটা জরুরি কাজ সারার জন্যে আমাকে উঠতে হবে এবার। ব্যবসার ব্যাপার, প্লিজ কিছু মনে করবেন না।'

কেউ কিছু জবাব দেওয়ার আগে কৌশিক ওই তিনজনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আমাকেও আজ আপনারা ছুটি দিয়ে দিন। আমার এক আত্মীয় অসুস্থ, তেমন সিরিয়াস নয় অবশ্য, তবে দেখা করার জন্যে যেতে হবে একবার।'

মুখার্জিবাবু আড্ডায় পুরোপুরি জমে গিয়েছিলেন, বললেন, 'আমি কি তাহলে একটু থেকে যাব—।'

'কী আশ্চর্য, নিশ্চয়ই থাকবেন। পরে দেখা হবে আবার।'

ডক্টর মৈত্র আর কৌশিক ঘরের সবার কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে বেরিয়ে এল বাইরে।

একই পথের যাত্রী কৌশিকও উঠে পড়েছিল ডক্টর মৈত্রের গাড়িতে। গাড়ি কিছুটা যাওয়ার পরেই ডক্টর মৈত্র হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আজ মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে।'

'কেন?' কৌশিকের গলায় উদ্বিগ্ন মানুষের সুর ফুটল।

'কাগজে হয়তো দেখে থাকবেন, মিলন মাইতি বলে একজন মারা গেছেন। পুলিশের অনুমান, গুলি করে মারা হয়েছে।'

কৌশিক ঢোক গিলে বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, খবরটা দেখেছি বলে মনে হচ্ছে। এটা বোধহয় সোনারপুরের দিকে ঘটেছে, তাই না?'

'না, সোনারপুর নয়—বারাসত। আসলে এই ইয়াংম্যানটির সঙ্গে অল্প কিছুদিনের মধ্যে আমার বেশ চেনাশোনা হয়ে গিয়েছিল। অসম্ভব এনারজেটিক। খাটাখাটুনির ব্যাপারে না

বলতে শুনিনি কখনও। একটা কোম্পানিতে ফুলটাইম কাজ করার পরে আমার কাছে পার্টটাইম করত। প্রতিদিন নয়, সপ্তাহে তিন-চারদিন। ভেবেছিলাম, ওকে আমার ব্যবসায় নিয়ে নেব, কিন্তু এমনই ইল-লাক—।'

'ওঁর মারা যাওয়ার কারণটা কী, কোনও ছিনতাই পার্টিকে বাধা দিতে গিয়ে কি—।'

'না-না, আসলে ওর কোম্পানির মালিক—।'

চমকে উঠে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'মালিক! মালিক কী করেছে?'

ডক্টর মৈত্র ঢোক গিলে কথা ঘোরাবার ভঙ্গিতে বললেন, 'আসলে ওর মালিকের একটু স্বপ্ন দেখাবার অভ্যেস ছিল।'

কৌশিকের মনে হল ডক্টর মৈত্র বোধহয় কিশোর চৌধুরীর বাড়ির সেই ধাঁধার আসরটা আর একবার বসাবার চেষ্টা করছেন। ও একটু ঘুরে বসে ভদ্রলোকের চোখে চোখ রেখে প্রশ্ন করল, 'স্বপ্ন! মালিকের স্বপ্ন দেখাবার অভ্যেস! ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারলাম না তো।'

রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠেছিল ডক্টর মৈত্রের মুখে। 'কেউ যদি তেমন করে স্বপ্ন দেখায়, আরেকজন দেখেও থাকে।'

'কীরকম?'

'মিলনের মালিকের নাকি একটা দাতা কর্ণ সাজার রোগ আছে।'

'দাতা কর্ণ সাজার রোগ!'

'মিস্টার চৌধুরীর বাড়িতে দানবীরদের সব গল্প শুনে এলেন তো। এ হচ্ছে আর এক ধরনের দাতা কর্ণ। দিচ্ছি দিচ্ছি, দিয়ে ফেললাম—এসব কথা সমানে বলে যাবে, কিন্তু কখনওই হাত উপুড় করবে না। রাতারাতি বড়লোক হওয়ার স্বপ্ন দেখাবে, কিন্তু হতে দেবে না। এ এক ধরনের হতাশার জন্ম দেয়। স্বপ্ন-দেখা মানুসটা সেই হতাশায় একবার ভুগতে শুরু করলে উলটোপালটা কাজের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন হল, দোষটা তাহলে কার—মালিকের না কর্মচারীর?'

কৌশিক এবার স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনার কি মনে হয়—ওই মিলন মাইতির খুন হওয়ার ঘটনার সঙ্গে ওই কোম্পানির মালিক কি কোনওভাবে জড়িত?'

ডক্টর মৈত্র অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠে খুব সতর্ক গলায় বললেন, 'সেটা আমি কী করে বলব? পুলিশ তদন্ত করছে, পুলিশই বার করবে। আমি মিলন মাইতির ব্যাপারে বিশেষ কিছুই জানি না। ঘটনাচক্রে আমার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল—এই পর্যন্ত। বাট আই লাইক্‌ড হিম। ওর এ-ভাবে মারা যাওয়াটা আমার কাছে খুবই শকিং। আমি তো আমার জায়গায় এসে গেলাম। আমার গাড়ি আপনাকে আপনার সেই অসুস্থ আত্মীয়ের বাড়িতে ছেড়ে আসবে। পরে টেলিফোনে যোগাযোগ হবে আপনার সঙ্গে। বাই।'

ডক্টর মৈত্র নামতেই ড্রাইভার জিজ্ঞেস করল, 'কোন্‌দিকে যাব?'

'সোজা।' গাড়ি সামনের দিকে ছুট লাগাতেই গোয়েন্দা আর একবার চমকে উঠল। ডক্টর

মৈত্র যে বাড়িটায় ঢুকলেন সে বাড়ির দেয়ালে পিতলের চকচকে ফলকের ওপরে ইংরেজিতে ‘পাঁচ’ সংখ্যাটা লেখা।

গাড়ি এর মধ্যেই বেশ কিছুটা চলে গেছে। জানলায় গোয়েন্দার মুখ। ও ভাবছিল, মুখার্জিবাবু যদি ঠিক দেখে থাকেন তাহলে এ বাড়ির একটা গেস্টহাউসের রিসেপশন কাউন্টারে সেদিন মিলন মাইতি ডিউটি দিচ্ছিল। কিন্তু কী ধরনের ডিউটি!

ওই গেস্টহাউস সম্পর্কে ইতিমধ্যে যেটুকু খবর ওর কানে এসেছে তাতে বোঝা যায়, অতিথি নিবাসের বাইরে-ভেতরে দু-রকম চেহারা। আসল চেহারাটা ঠিক কী ধরনের? আর, ডক্টর মৈত্র মিলন মাইতিকে দিয়ে কী কাজ করাতেন?

এইরকম সব প্রশ্ন গোয়েন্দার মাথায় উঠে আসছিল একটার পর একটা। কিন্তু বাইরে তার কোনও প্রকাশ ছিল না। সম্পূর্ণ অকারণে গাড়ি ছুটে চলেছিল খিদিরপুরের দিকে।

বারো

কলকাতায় ট্যাক্সিওয়ালাদের গায়ে এখন ইউনিফর্ম উঠেছে। সবাই অবশ্য পরতে চায় না। বিনি-ইউনিফর্ম ট্যাক্সিওয়ালাদের পুলিশ মাঝেমধ্যে ধরপাকড় করে। কিন্তু শাস্তি বা জরিমানাতেও তাদের এতকালের অভ্যাস বুঝি যাওয়ার নয় চট করে। তা ছাড়া ধর পাকড়ের ব্যাপারে ভাঁটা পড়ে প্রায়ই। ঢিলটানের মাত্রাও বাড়ে তখন। গরমের দুপুরে নোংরা গেঞ্জি পরা বা খালি-গা ট্যাক্সিওয়ালার সংখ্যা নেহাত কম নয়।

দৃশ্যগুলো মেগাসিটি কলকাতার পক্ষে সম্মানজনক নয় কিছুতেই। ঝকঝকে ট্যাক্সিতে তকতকে ইউনিফর্ম পরা বাধ্য ড্রাইভার থাকবে। তার দিকে সামান্য একটা আঙুল তুললেই পাশে এসে দাঁড়াবে, গাড়ির দরজা খুলে দেবে। যাত্রী তখন মনের সুখে যেখানে খুশি সেখানে যাবে। যাঁরা তিলোত্তমা কলকাতার স্বপ্ন দেখে থাকেন এমন একটি দৃশ্যের কল্পনা করতে গিয়ে তাঁদেরও বুঝি বুক কেঁপে ওঠে।

পরের কথা পরে। ভরদুপুরে এখন পার্কের পাশে ওই যে ট্যাক্সিটা দাঁড়িয়ে আছে তার ড্রাইভারের পরনে মোটামুটি পরিষ্কার একটা ইউনিফর্ম কিন্তু কাঁধে নোংরা গামছা। একটু আগেই বোধহয় ট্যাক্সিওয়ালা দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরেছে। খাওয়ার পরে চোখের পাতা একটু তো জুড়ে যাবেই, বিশেষ করে ধারে কাছে-যখন কোনও যাত্রী নেই। পরিচ্ছন্ন রাস্তার দুধারে কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া গাছের সারি। মৃদু হাওয়ায় ঝিরঝিরে পাতাগুলো দুলছিল।

ট্যাক্সিওয়ালার ঘুমের ভঙ্গিটা অদ্ভুত। মোটামুটি টানটান শরীর, কিন্তু মাথাটা একপাশে ঝুলে পড়েছে অনেকখানি।

এমনসময় পাশের রাস্তা থেকে দুটি ছেলেমেয়ে হনহন করে এগিয়ে এসে বলল, ‘যাবেন?’

ওই কথায় ঘুমের চটকা ভাঙল ট্যাক্সিওয়ালার, তারপর ঘাড় নেড়ে ইঙ্গিতে জানাল, উঠে পড়ুন।

ট্যাক্সি একটুখানি সোজা যাওয়ার পরে পেছনের সিটের ছেলেটি বলল, 'এবার বাঁদিক ধরে সোজা।'

বাঁদিকের সোজা রাস্তায় গাড়ির সংখ্যা বেশ বেশি। ট্যাক্সি একটা প্রাইভেট কারের পেছন ধরে এগোতে লাগল আস্তে আস্তে।

পেছনের সিটের যাত্রীদুজনের বয়েস বেশি নয়। ছেলেটি বছর-পঁচিশের, মেয়েটির বয়েস বেশি হলে বাইশ। দুজনকেই বেশ সুন্দর দেখতে। বিজ্ঞাপনের ভাষায় যাকে বলে একজনের জন্যে অন্যজন। কিন্তু এদের কথাবার্তা শুনলে যে-কারও মনে হবে, কোথায় যেন ঘোরতর অনৈতিক একটা কাণ্ড ঘটে চলেছে।

কিছু-কিছু কথা হয়তো ট্যাক্সিওয়ালারও কানে যাচ্ছিল, কিন্তু স্টিয়ারিংয়ের মানুষটি অতিমাত্রায় নির্বিকার। তাছাড়া এর বাংলা ভাষার জ্ঞানও বোধ হয় তেমন জোরালো নয়।

মেয়েটি হঠাৎই ছেলেটির বুকে মুখ গুঁজে বলল, 'আমি আর পারছি না!'

উত্তরে ছেলেটি কিছু না বলে মেয়েটির কাঁধে হাত রাখল। এ হাত বোধ হয় নির্ভরতা বাড়ানোর হাত, সাহস জোগানোর হাত। মেয়েটির একমাথা কালো কোঁকড়ানো চুল কাঁধ পর্যন্ত ছাঁটা। হাওয়ায় চুল উড়ছিল। ঠাসা চুলের মধ্যিখানে একটুখানি সিঁথি। খুঁটিয়ে দেখলে সেখানে যৎসামান্য সিঁদুরের গুঁড়ো দেখা যাবে।

এদের কথাবার্তা কানে গেলে যে-কেউ বুঝবে এই মেয়েটি এই ছেলেটির বউ নয়। যা এখন এখানে চলছে গম্ভীর বইয়ের ভাষায় তাকে বলে 'অবৈধ প্রণয়।'

কয়েক মুহূর্ত বুকে মাথা গুঁজে রাখার ফলে মেয়েটি বোধ হয় ওর আবেগ সামলে নিতে পেরেছিল কিছুটা। এবার মুখ তুলে নিয়ে কপালের চুল আঙুল দিয়ে পেছনের দিকে ঠেলে দিতে দিতে বলল, 'আমার মাঝেমধ্যে কী মনে হয় জানো—।'

'কী?'

'আমি খুন হয়ে যাব।'

চমকে উঠে ছেলেটি জানতে চাইল, 'কেন, কেন এরকম মনে হয়?'

'জানি না। হয়তো ঘরে বসে ম্যাগাজিন পড়ছি কিংবা চুল আঁচড়াচ্ছি, হঠাৎ মনে হল, কে বুঝি হাতে ছুরি বা ভোজালি নিয়ে পা টিপে টিপে গলায় কোপ বসাতে আসছে।'

ছেলেটি আবার সেই নির্ভরতার হাত রাখল মেয়েটির কাঁধের ওপর। 'বাড়িতে কি কোনও অশান্তি হয়েছে?'

'অশান্তি! পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়বন্ধু সবাই জানে—আমাদের মতো সুখী স্বামী—স্ত্রী খুব কমই আছে। কিন্তু আমি তো জানি সুখের কী ছিরি। দিনে-রাতে মানুষটা দু-রকমের। আগে এত ভয় করত না। এখন করে, ধরতে গেলে সব সময়ই। আমি আর বাঁচব না।'

'খুব বাঁচবে, আনন্দে বাঁচবে। জীবনে বড় রকমের দুর্ঘটনার মধ্যে পড়েনি এমন মানুষ পৃথিবীতে একজনও নেই। তবে বিপদ, দুঃখকষ্ট এগুলো আবার কেটেও যায়। মনে হয়

আমার বিদেশের চাকরিটা হয়ে যাবে। হয়ে গেলে আর কোনও চিন্তা নেই, তোমাকে নিয়ে সাত সমুদ্র, তেরো নদীর ওপারে উড়ে যাব। ডিভোর্স তুমি পেয়ে যাবে ঠিক। না পেলেও এসে যায় না। বাকি জীবনটা আমরা একসঙ্গে কাটাবই। লালজিকে কিছু বলেছ?'

'আভাস-ইঙ্গিতে বলেছি।'

'কী বললেন?'

'কিচ্ছু না। শুনে গম্ভীর হয়ে গেছেন।'

'গম্ভীর তো হবেনই— বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত আছে না! আচ্ছ, উনি কি সত্যিই এ কথাটা বিশ্বাস করেন?'

'জানি না।'

'থাক, এখন আর এর বেশি কিছু বলার দরকার নেই। বাইরের চাকরির অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা আমি হাতে পাওয়ার পরে বলবে। দরকার হলে আমিও তোমার সঙ্গে যাব। উনি রাজি হলে ভাল, না হলেও ভাল। তুমি প্রাপ্তবয়স্ক, তোমার ব্যাপারে তুমিই তো শেষ কথাটা বলবে। অবশ্য উনি চটে গেলে তুমি আর অর্ধেক রাজত্ব পাবে না। তোমার লোকসান মানে আমারও লোকসান। আর আমাদের ওপর রেগে থাকলে আমার দাদার কপালও পুড়বে। আমি যাতে উলটোপালটা কিছু না করে বসি, কলকাতার বাইরে গুড বয় হয়ে থাকি তার জন্যে দাদা বেচারার চেষ্টার কোনও অন্ত ছিল ছিল না। তবে দাদা হালে যে মেয়েটার খপ্পরে পড়েছে সে মেয়েটা মনে হয় একেবারেরই সুবিধের নয়। ওই যে মিলন মাইতির সঙ্গে —।'

মেয়েটি একটু যেন কাঁপা-কাঁপা গলায় বলল, 'তুমি ওই প্রসঙ্গটা বাদ দাও তো।'

ট্যাক্সি সোজা রাস্তার বাঁকের কাছাকাছি এলে ছেলেটি মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তাহলে এখন কোথায় যাবে?'

'আমাকে নিউ মার্কেটে নামিয়ে দাও, কিছু কেনাকাটা আছে, হয়ে গেলে একটা ট্যাক্সি ধরে নেব।'

'ঠিক আছে, আমি তাহলে কাল তোমাকে দুপুর একটার সময় ফোন করব।'

'আচ্ছা!'

ছেলেটি এবার ট্যাক্সিচালককে নির্দেশ দিল—'নিউ মার্কেটে চলুন।' উদাসীন প্রকৃতির মানুষটি কথার উত্তরে মাথা কাত করল একপাশে।

ট্যাক্সি আরও কিছুটা যাওয়ার পরে মেয়েটি গলা খাদে নামিয়ে বলল, 'এটা তুমি রেখে দাও তো।'

'এ কি! এ তো অনেক টাকা!'

'একটু বেশি রেখে দেওয়া ভাল। তুমি তো এখন এ-শহরে কিছুদিনের জন্য বাইরের লোক। হোটেলে আছ, খরচা তো কিছু বেশি হবেই।'

'আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগছে।'

'পরের কাছ থেকে টাকা নেওয়ার জন্যে?'

'তুমি পর নও, কিন্তু টাকাটা তো পরের।'

'টাকার আপন-পর বলে কিছু নেই, নিজের লোক দিলে নিতে হয়। নাও ধরো।'

ছেলেটি হাত বাড়াল না, কিন্তু ওর হাতে নোটের বাণ্ডিলটা ধরিয়ে দিল মেয়েটি। বাণ্ডিলের সব নোটই একশোর।

ছেলেটির চোখমুখের অস্বস্তির ভাব কাটছিল না। ধরা গলায় কী যেন বলতে গিয়েছিল, কিন্তু মেয়েটি থামিয়ে দিয়ে বলল, 'ঠিক আছে ধার দিচ্ছি। বিলেতের চাকরিটা পাওয়ার পরে পাউণ্ডের হিসেবে শোধ দিও।'

'আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে—।'

'কী?'

'তোমার সঙ্গে আমার প্রেমট্রেমগুলো বানানো ব্যাপার। টাকাপয়সা, সম্পত্তি হাতানোর জন্যে তোমার সুখের সংসার ভাঙতে যাচ্ছি।'

'আহা! কী আমার সুখের সংসার রে!'

'এখন ঠাট্টা করছ, পরে দেখবে এটাই ঢের বেশি সুখের সংসার ছিল।'

উত্তরে মেয়েটি ঝলমল করে হেসে উঠে বলল, 'তাহলে তো মিটেই গেল। দুজনে তখন গলা মিলিয়ে বলব লালজির কথাই ঠিক—বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত আছে।'

একই ভাবে মেয়েটি আর একবার হাসল, কিন্তু ছেলেটি হাসতে পারল না। ওর চোখেমুখে কেমন যেন অপরাধীর ছাপ ধরে গিয়েছিল।

একটু বাদে নিউ মার্কেট এসে গেল। মেয়েটি নেমে গেল হাত নেড়ে। ছেলেটি এবার চাপা কর্কশ গলায় ড্রাইভারকে নির্দেশ দিল, 'গাড়ি ঘুরিয়ে ডানদিকের রাস্তা ধরুন।'

নির্বিকার ড্রাইভার আদেশ পালন করল। গাড়ি ছুটতে লাগল ডানদিকের রাস্তা ধরে। হাতে-ধরা কারেন্সি নোটের বাণ্ডিলটা চকচকে চোখে উলটেপালটে দেখার পরে পকেটে ঢুকিয়ে রাখল ছেলেটি।

ট্যাক্সি কিছুটা সোজা যাওয়ার পরে আরও একবার বাঁক নিল। কিছুক্ষণ পরে যাত্রীটি বলল, 'বাঁদিকে বেঁধে।'

বাঁদিকে বড় বাড়িটার গায়ে সাঁটা ঝকঝকে পেতলের ফলকে ইংরেজির পাঁচ সংখ্যাটা লেখা। ট্যাক্সির ওই ছেলেটি চটপট ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে দ্রুত পায়ে ঢুকে গেল ওই বাড়ির ভেতরে।

এই ঘটনার ঠিক আধঘন্টা বাদে ট্যাক্সিওয়ালা কৌশিকের চেম্বারের সামনে এসে হাজির হল। ঘরে গোয়েন্দা নেই, কিন্তু ওর সহকারী মুখার্জিবাবু আছেন। মুখার্জিবাবু চোখে রিডিং গ্লাস এঁটে বাসী খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ইনি শব্দ করে কাগজ পড়েন। পড়ার সময় ছাত্রদের পড়া মুখস্থ করার মতো আওয়াজ ওঠে।

অচেনা একটা লোক সামনে দাঁড়াতেই উনি চশমার ওপরের ফাঁক দিয়ে ওর দিকে তাকালেন, তারপর একটানে চশমাটা খুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কাকে চাই?'

লোকটা মাথা চুলকে জিজ্ঞেস করল, 'মুখার্জিবাবু কৌন্ আসেন?'

গম্ভীর গলায় মুখার্জিবাবু পালটা প্রশ্ন করলেন, 'কেন, কী দরকার ওর সঙ্গে?'

'সে আপনাকে বলবে কেন? উনি যখুন আসবেন, ওকেই বলবে। আখুন আমি খুব থকে গিয়েসি। একটু বসি।'

বলেই লোকটা কৌশিকের চেয়ারে বসে পড়ল। অমনি হাঁ-হাঁ করে উঠলেন মুখার্জিবাবু। চড়া গলায় উনি কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই অত্যন্ত চেনা গলায় আগন্তুক বলে উঠল, 'যাক্, তাহলে বোঝা গেল আমিও খুব একটা খারাপ ছদ্মবেশ ধরি না।'

মুখার্জিবাবুর বিস্ময়ের ঘোর যেন আর কাটতেই চাইছিল না। চোখ গোল-গোল, মুখ সামান্য হাঁ। কোনওরকমে একটা ঢোঁক গিলে বললেন, 'আরে! আপনি তো জব্বর মেক-আপ নিয়েছেন। আমি চিনতেই পারিনি। গলার স্বরটা পর্যন্ত পালটে ফেলেছিলেন। আমিও অনেক কায়দাকানুন জানি, কিন্তু চেহারার ভোল এতখানি পালটে দিতে পারতাম না! বড় কোনও মেক-আপ ম্যানের কাছে গিয়েছিলেন নিশ্চয়ই।'

'না-না, নিজে যতটুকু যা পেরেছি।'

মেক-আপ তুলতে তুলতে গম্ভীর গলায় গোয়েন্দা বলল, 'আমার এক বন্ধুর তিনটে ট্যাক্সি আছে। তার একটা নিয়ে তিনদিন ধরে দুপুরে খেপ্ মারছি। দুদিন পুরো বেকার ছিলাম, আজ মনে হয় কিছুটা কাজ হয়েছে। আমি এখন আবার বেরুচ্ছি, বোধ হয় আজ আর ফিরতে পারব না। আপনাকে একটা কাজ দিচ্ছি। সেই পাঁচ নম্বর বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে ডিউটি দিন। চেনা কাউকে দেখতে পেলে পিছু নেবেন। সে হারিয়ে গেলে আবার আগের জায়গায় ফিরে যাবেন। একাধিক চেনা মানুষকেও দেখতে পারেন। মাঝেমধ্যে সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠবেন। ওই গেস্টহাউসটার ওপর নজর রাখবেন ভাল করে। মাল্টিস্টোরিড অফিসবাড়ি, সুতরাং অসুবিধে নেই। বেশির ভাগ লোকই ওখানে বেশির ভাগ লোককে চেনে না।'

'ছদ্মবেশ ধরে যাব?'

'নিশ্চয়ই। ওখানে এমন লোকও হাজির হতে পারে যিনি আপনাকে খুব ভালভাবে চেনেন।'

সমঝদারের ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে মুখার্জিবাবু বললেন, 'বুঝতে পেরেছি, আপনার কাজ ভালই এগোতে শুরু করেছে, কিন্তু এখন কী ধরনের মেক-আপ নিই বলুন তো?'

মাথার উইগ্‌টা আস্তে আস্তে খুলতে খুলতে কৌশিক বলল, 'অফিসবাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে একটানা কয়েক ঘন্টা নজরদারির কাজ চালানো তো, সুতরাং এমন মেক-আপ ধরতে হবে যাতে কেউ আপনাকে সন্দেহ না করে। আপনি এক কাজ করুন—।'

'কী?'

'এখন মাসের প্রথম দিক তো, মানে মাইনে পাওয়ার সময়—। আপনি কাবলিওয়ালা সেজে যান। মাসের গোড়ার দিকে অফিসপাড়ায় অফিসবাড়ির সামনে খাঁ সাহেব ঠায় কয়েক ঘন্টা দাঁড়িয়ে আছে—এর চেয়ে স্বাভাবিক দৃশ্য আর কী হতে পারে।'

মুখার্জিবাবু একটু দোনামোনা করে বললেন, 'মতলবটা জব্বর, কিন্তু আমার এই চেহারায় কি কাবুলিওয়ালা মানাবে?'

'খুব মানাবে। যেসব কাবলিওয়ালা বেশ কয়েক বছর ধরে কলকাতায় আছে তাদের সবার চেহারা আর আগের মতো তাগড়া থাকে না। আপনাকে দেখে না হয় একটু রোগা আফগান মনে হবে।'

'ঠিক আছে, কাবুলিই সাজব।'

'ওদের পোশাক-আশাক পাবেন কোথায়?'

'ও আপনি ভাববেন না। চিৎপুরের এক যাত্রাপার্টির সঙ্গে আমার খুব জানাশোনা আছে, ওখান থেকে ধার নিয়ে নেব কয়েক ঘন্টার জন্যে।'

'ভেরি গুড। কিন্তু একটা জিনিসের কথা ভুলবেন না কিন্তু—।'

'কী?'

'শুনেছি কারবারি কাবলিওয়ালার গায়ে বেশ চড়া গন্ধ থাকে—হিংটিংয়ের হয়তো। ওই গন্ধটা গায়ে লাগাতে ভুলবেন না।'

'বাহ্! এই পয়েন্টটা দারুণ বলেছেন তো। আপনার মাথায় আসেও বটে।'

'না-না, এর জন্যে আমার কোনও ক্রেডিট নেই। সব কৃতিত্ব ফিল্মমেকার তপন সিন্হার। উনি কাবুলিওয়ালা বলে একটা ছবি করেছিলেন, দেখেছেন?'

মৃদু চালে দুদিকে মাথা নাড়ালেন মুখার্জিবাবু।

'ছবির দুর্দান্ত একটা দৃশ্য হল—মঞ্চে ছোট্ট মিনি নাচছে—বোধ হয় কোথাও আমার হারিয়ে যাওয়ার নেই মানা গানের সঙ্গে সঙ্গে। দর্শকদের মধ্যে কাবুলিওয়ালা ছিল। কাবুলিওয়ালার কাছ থেকে টাকা ধার করেছিল কমেডিয়ান নৃপতি চাটুজ্যে— সকলের সঙ্গে সেও উপভোগ করছিল ওই নাচগান। হঠাৎ ওর নাকে এসে লাগল তীব্র একটা গন্ধ। কোত্থেকে আসছে গন্ধটা? মজার ভঙ্গিতে নাক টানতে টানতে কমেডিয়ান দেখতে পেল— একটু দূরে কাবুলিওয়ালা। ব্যস, অমনি ওখান থেকে চম্পট। দারুণ মজার শট। সেই থেকে কাবুলিওয়ালার কথা উঠলেই আমার ওই দৃশ্যটার কথা মনে পড়ে যায়।'

গোয়েন্দা মেক-আপ তোলার পরে পোশাক পালটে বেরিয়ে পড়ল ওখান থেকে। সঙ্গে সহকারী। একটু পরে দু-পথে দুজন।

কৌশিকের বন্ধু ও পরিচিত মানুষের সংখ্যাটা বিরাট। এঁরা আবার নানা ধরনের পেশার সঙ্গে যুক্ত। পঁচিশ মিনিট বাদে কৌশিক যে বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল সেখানে থাকেন বিখ্যাত অধ্যাপক অজেয় মজুমদার। কলেজে সাহিত্য পড়ান। একসময় কিছুটা কবিখ্যাতি হয়েছিল, কিন্তু সফল নোটবুক প্রণেতা হওয়ার ফলে কবিতা লেখার আর সময় পান না এখন। রসিক মানুষ, হাসতে হাসতে একদিন কৌশিককে বলেছিলেন : এই যে চটি নোট-বইটা, এটা লিখে দোতলা বাড়ি বানিয়েছি। আর এই যে পাঁচমিশেলি সহায়িকা, এটার টাকায় গাড়ি কিনেছি। এবার তুমিই বলো, এত সম্পন্ন হলে কি আর কবিতা লেখা যায়?'

অজেয়বাবু দরজা খুলে দরাজ অভ্যর্থনা জানালেন, 'আরে এসো এসো। অনেকদিন পরে এলে। কাজে, না অকাজে?'

'কাজে।'

'কী কাজ?'

সোফায় বসে পড়ে কৌশিক বলল, 'একটা লাইন প্রায়ই কানে আসছে—বোধহয় বড় কোনও সাহিত্যিকের লেখা। আমার সাহিত্য পড়ার দৌড় তো আপনি জানেন— ভাবলাম আপনার কাছে এলে নিশ্চয়ই হদিস পাব।'

'লাইনটা কী?'

'বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে।'

শুনে হা-হা করে হেসে উঠলেন অধ্যাপক। 'আমরা যখন আছি অভিশাপ দূর করে ছাড়ব। এখন বলো মেয়েটা কে। সঙ্গে নিয়ে এলে পারতে।'

বিব্রত মুখে কৌশিক বলল, 'না-না, বিশ্বাস করুন, আমার নিজের কোনও ব্যাপার নয়।'

অধ্যাপকের বিশ্বাস আসতে একটু দেরি হয়েছিল। কিছুক্ষণ মজা করার পরে বললেন, 'তুমি আমার ছাত্র হলে ওই সোফার ওপর, না-না এই সেন্টার-টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখতাম। এ-লাইনটা খুব বিখ্যাত লাইন। এটা আছে বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখরে। বাল্যপ্রণয় বা কাফ-লাভের কথা শেক্স্পিয়রেও আছে, তবে তা অন্য ভাবে। বাল্যপ্রণয়ে অভি- সম্পাত আছে—লাইনটা কিন্তু জব্বর। ছেলেবেলার বেশির ভাগ প্রেমই বেশি বয়সে টেঁকে না। সেই বুকের ভেতরে রক্তের ছলাৎ-ছলাৎ, মাথা-ঝিমঝিম, উদাস-উদাস ভাব— ছেলেবেলায় প্রেম যেমন জমে তেমন আর কখনোই নয়। চন্দ্রশেখরে প্রতাপের সঙ্গে শৈবলিনীর যখন প্রথম পরিচয়, তখন শৈবলিনী সাত-আট বছরের বালিকা; প্রতাপ কিশোর-বয়স্ক। এদের মধ্যে যখন ভালবাসা জন্মাল, তখন নায়কের বয়েস ষোলো আর নায়িকার আট। এটা জানাবার পরে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন, বালকের ন্যায় কেহ ভালবাসিতে জানে না। আমার কী মনে হয় জানো, বঙ্কিমের নিজের জীবনের কথাগুলো এসে গেছে এই প্রতাপ শৈবলিনীর প্রেমকাহিনীর মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের যখন দশ বছর আট মাস বয়েস তখন একটি পাঁচ বছরের মেয়ের সঙ্গে ওঁর বিয়ে হয়। বউয়ের নাম মোহিনী। মেয়েটি ছিল পরমাসুন্দরী, ষোলো বছর বয়সে মেয়েটি হঠাৎ মারা যায়। বিপত্নীক হওয়ার আট মাস বাদে বঙ্কিমচন্দ্র মায়ের আদেশে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেন। দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম রাজলক্ষ্মী, বয়েস বারো। এই রাজলক্ষ্মী সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র পরবর্তীকালে বলেছেন : আমার জীবনে রাজ-লক্ষ্মীর মস্ত প্রভাব। ও না থাকলে আমি কী হতাম জানি না! আমার যত ভুলত্রুটি সেসব শুধু ও জানে আর জানি।'

বিখ্যাত অধ্যাপকরা একবার মুখ খুললে চট করে আর থামতে পারেন না। কথাগুলো ভালই, কিন্তু গোয়েন্দার মাথায় এখন রহস্যের জট ছাড়াবার চিন্তা ছাড়া আর কিছুই জায়গা পাচ্ছিল না। শেষের দিকে সব কথা ওর কানেও ঢুকছিল না। ভাবছিল—বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ

আছে—কথাটা নীতিপরায়ণ বঙ্কিমচন্দ্রের হলে এই মানুষটা কি ওঁরই মতো....। তাই যদি হয় তাহলে ওরাও কি প্রতাপ-শৈবলিনীর ছায়া....।

হঠাৎ আলোর একটা ঝলকানি চোখের সামনে খেলে যেতেই গোয়েন্দা সোফা ছেড়ে উঠে পড়েছিল। অধ্যাপক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী ব্যাপার, উঠলে কেন?'

লাজুক মুখে গোয়েন্দা বলল, 'আসলে আপনার কাছে ওই লাইনটার সোর্স জানতে এসেছিলাম, জেনেও গেলাম—। এক্ষুনি আমাকে আবার ছুটতে হবে আর এক জায়গায়।'

অধ্যাপক কৌশিককে খুবই স্নেহ করেন, হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমার যা কাজের ধরন তাতে কখনো-কখনো প্রতিটি মুহূর্তই তোমার কাছে খুব দামি হয়ে ওঠে। ঠিক আছে, পরে এসো একদিন হাতে সময় নিয়ে, আড্ডা মারা যাবে। আমার এখনও দিনসাতেক ছুটি আছে।'

বিদায় নিয়ে প্রায় লাফিয়ে পথে নামল গোয়েন্দা। তারপর যে-ভাবে হাঁটতে শুরু করল সেটাকে হাঁটা না বলে দৌড় বলাই ভাল।

তেরো

ডক্টর জ্যোতি মৈত্র বললেন, 'আমি তো বহুকাল দেশছাড়া। আমার কাছে তাই সেদিনের কলকাতার অনেক স্মৃতি এখনও জ্বলজ্বল করে। এই যেমন ধরুন, কলেজ স্ট্রিটে গেলেই আমার বুকের ভেতরটা হু-হু করে ওঠে। কলেজ স্কোয়ারের পশ্চিম দিকে ছিল বিখ্যাত সেনেট বিল্ডিং। ওই বিল্ডিয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে যে-কারও বোধহয় অদ্ভুত একটা অনুভূতি হত। তার মধ্যে নিশ্চয়ই শ্রদ্ধা থাকত, ভালবাসা থাকত, পুরনো দিনের গৌরবময় কথাও থাকত। আমার চোখের সামনে তো ইতিহাসের পাতা ভাসত কয়েকটা।

'সেনেট-মানেই রোমান সেনেট। অসাধারণ সেই স্থাপত্য পৃথিবীর নানান জায়গায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এসব ব্যাপারে অবশ্য পণ্ডিতেরা আলো ফেলতে পারবেন। আমি অতশত জানি না। বিশাল বিশাল থামওয়ালা সেই সেনেট বিল্ডিং। এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত লম্বা লম্বা একগাদা সিঁড়ির ধাপ। আমার গা-ছমছম করে উঠত—অতীতের কত জ্ঞানীগুণী ওই সিঁড়ি ভেঙে ওঠানামা করেছেন।

'মনে আছে, ইন্টারমিডিয়েটের রেজাল্ট বেরুবার সময় সেনেটের ওই সিঁড়িতে বসে অপেক্ষা করেছিলাম বহুক্ষণ। সঙ্গে এক বন্ধু ছিল। তখন সবার আগে রেজাল্ট বেরুত নিউজ-বুলেটিনে। দুপুর-বিকেল থেকে অপেক্ষা করে করে রাত আটটা নাগাদ যখন বাড়ি ফিরে যাব ঠিক করেছি—ঠিক তখনই রেজাল্ট বেরিয়েছিল।

'সেনেটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে টেলিগ্রাম কিনেছিলাম বলেই বোধহয় সেনেট বিল্ডিংয়ের কথা একটু বেশি করে মনে পড়ে আমার। ওইরকম একটা বিশাল ঐতিহাসিক বিল্ডিং ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল বলুন তো? এটাই

হচ্ছে রিয়েল ভ্যান্ডালিজম। ভেঙে বানানো হয়েছে জঘন্য চেহারার একটা দেশলাই বাক্স। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির বাড়ি বানাবার জায়গা কি গোটা কলকাতায় আর কোথাও ছিল না?'

অতনু দত্ত মৃদু হেসে বললেন, 'আপনি তো অনেক পুরনো কথা বলছেন, হালে আর একটা জঘন্য কাণ্ড ঘটতে চলেছিল। ঐতিহাসিক টাউন হল ভেঙে সেখানে একটা মাল্টিস্টোরিড বানাবার তাল করা হয়েছিল, অনেক কষ্টে সেটা ঠেকানো গেছে।'

আঁতকে উঠে ডক্টর মৈত্র বললেন, 'বলছেন কি! বিখ্যাত টাউন হলের সঙ্গে কলকাতার তো নাড়ির সম্পর্ক। আমাদের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে এই হলটা। বেশ কয়েকটা ঐতিহাসিক বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল ওখানে। তাই না?'

'হ্যাঁ। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথ—। তালিকা বেশ লম্বা। দু-তলাতেই দুটি বিশাল হল আছে। হাজার লোক বসতে পারে স্বচ্ছন্দে।'

'কত বয়েস হল হলটার?'

'তা প্রায় দুশো বছর হতে চলল।'

'আচ্ছা, এদের কি মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল! ভাঙার কি আর কিছু খুঁজে পাচ্ছিল না?'

দিব্য মল্লিক বললেন, 'আপনি যখন কলেজ স্ট্রিটের কথা বলছেন তখন ওখানকার কফি হাউসের কথা মনে আছে নিশ্চয়ই?'

'কেন থাকবে না, একটা সময় কত আড্ডা মেরেছি ওখানে।'

'ওই কফি হাউস মানে অ্যালবার্ট হলটা ভেঙে দেওয়ার কথা একবার খুব শোনা যাচ্ছিল—'

ডক্টর মৈত্র উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'দেশে তো শুনেছি ঐতিহাসিক বাড়িঘর, মনুমেন্ট ইত্যাদি বাঁচিয়ে রাখার জন্যে একটা আইন আছে। তা ওই অ্যালবার্ট হল কি যথেষ্ট পরিমাণে ঐতিহাসিক নয়?'

জবাবে অতনু দত্ত বললেন, 'আলবত ঐতিহাসিক, একশো ভাগ ঐতিহাসিক্। আলবার্ট হলের বয়েস কম-বেশি একশো-কুড়ি। প্রতিষ্ঠাতা কেশবচন্দ্র সেন। এই হলটি বাংলা শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক জীবনের প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এক সময়। ভারত-সভা ওখানে স্থাপিত হয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আগে জাতীয় সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়েছিল এখানেই। এই হলে যাঁরা দুর্দান্ত সব বক্তৃতা দিয়ে গেছেন, তাঁদের মধ্যে আছে সুরেন্দ্রনাথ, সিস্টার নিবেদিতা, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, অ্যানি বেশান্ত—কে নন!'

'তাজ্জব ব্যাপার! যারা এই হলটা ভাঙার জন্যে বুলডোজার আনতে চেয়েছিল তারা কি এই সব খবর জানে না?'

এবার মুখ খুললেন কিশোর চৌধুরী। 'অত দূরে যাওয়ার দরকার কি! এই তো আমাদের এলাকায় শোভাবাজার রাজবাড়িতেই ওইরকম একটা ঘটনা ঘটতে চলেছিল। নাটমন্দির চত্বরে একটা বহুতল বাড়ি বানাবার পরিকল্পনা নিয়েছিল প্রোমোটাররা, কিন্তু একটি সংরক্ষণ

পরিষদ ওই বাড়ি বানাতে দেয়নি। এই ব্যাপারে কোর্ট-অর্ডার বার করা হয়েছিল। রিট পিটিশনে বলা হয়, এই চত্বর নাটমন্দিরের একটা অংশ, সুতরাং মন্দিরের সঙ্গে সঙ্গে চত্বরটিকেও বাঁচানো দরকার। এই মন্দির আর তার চত্বরে বিখ্যাত সব ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটে গিয়েছে।'

'কীরকম?'

'ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এখানে সমাবেশ হয়েছিল একেবারে সেই গোড়ার যুগে। নীলদর্পণ অনুবাদ বার করে শাস্তি পেয়েছিলেন জেমস লঙ। সেই ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছিল এখানে। বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃত চর্চার পীঠস্থান গৌড়ী সমাজ এখানেই গড়ে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা অভিনীত হয়েছিল এখানে। শিকাগো ধর্মসভা থেকে ফেরার পরে স্বামী বিবেকানন্দকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছিল এই চত্বরেই। খুব সম্ভবত সেটা ১৮৯৭ সালের ঘটনা।'

আর একবার অবাক হলেন ডক্টর মৈত্র। 'তা কী হল শেষ পর্যন্ত?'

'বেঁচে গেছে এলাকাটা প্রোমোটার-ডেভলপারদের হাত থেকে। কলকাতা পুরসভা ভারত সরকারের সাহায্য নিয়ে নাটমন্দির টেক-ওভার করেছে। এই তো কয়েক দিন আগে কর্পোরেশনের কমিশনার সরেজমিন তদারকিতে এসেছিলেন। কমিশনার জানিয়েছেন, নাট-মন্দির সংস্কারের কাজ এই পুজোর আগেই শুরু হয়ে যাবে। নাটমন্দিরের লাগোয়া জমি অধিগ্রহণ করা হয়ে গেলে ওখানে মস্ত একটা হেরিটেজ মিউজিয়াম বানানো হবে।'

'বাহ্! এ তো খুবই ভাল কথা। এত বড় বড় কাজ সরকারি সাহায্য না পেলে হওয়া কঠিন। তবে শুধু সরকারকে দিয়ে হবে না, বিভিন্ন বড় বড় কোম্পানিকেও এগিয়ে আসতে হবে। বেসরকারি কমিটি তৈরি করা দরকার। তাতে থাকবেন জ্ঞানীগুণীরা, বিদেশি এক্সপার্টদের পরামর্শ ও সাহায্যও নিতে হবে নিয়মিত। জনসাধারণকে সচেতন করার প্রোগ্রামও নেওয়া দরকার। দেশের সম্পত্তি, একে বাঁচানোর দায়িত্ব দেশের লোকেরই—এই বোধ জাগাতে হবে সবার আগে।'

ডক্টর মৈত্রের কথায় সায় দিয়ে কিশোর চৌধুরী বললেন, 'এ ব্যাপারে আমাদের ওই সব অনুষ্ঠান খুব সাহায্য করবে। আমরা আমাদের গ্রামের সব অনুষ্ঠানেই পুরনো দিনের নাচগান, পালা, যাত্রা ইত্যাদি রাখব। গ্রামের লোকদের দিয়ে রিহার্সালও চালু করে দিয়েছি। ওরা তো খুব ইন্টারেস্ট নিচ্ছে। পরে রেস্টোরেশনের ব্যাপারে ওদের সজাগ করার জন্যে ওই বিষয়ে ছোট ছোট নাটকও জুড়ে দেব আমরা।'

'ভাল ভাল, আপনাদের কাজ কেমন এগোচ্ছে?'

'প্রচণ্ড স্পিডে। হাই কমিশনের অফিস এবং বাইরে থেকেও কিছু সাহেবসুবো নিয়ে যাব আমরা। আসলে এই প্রোগ্রামগুলো বিদেশেও নিয়ে যেতে চাই। শুধু দেশের মানুষকে দেশ সম্পর্কে সজাগ করা নয়, এ-দেশের আসল পরিচয় বিদেশিদেরও জানানো আমাদের কাজের

মধ্যে পড়েছে। দল নিয়ে বাইরে যাওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজন পড়লে আপনাকে কিন্তু একটু-আধটু সাহায্য করতে হবে।'

'নিশ্চয়ই, আনন্দের সঙ্গে করব। বাই দি ওয়ে, কৌশিকবাবু, আপনার সেই বন্ধু না কার কথা যেন বলছিলেন—লণ্ডনে কিছুদিনের জন্যে অ্যাকোমোডেশন চান। শিগ্‌গিরই আমাকেও একবার ওখানে যেতে হবে, তা উনি কোন্ তারিখ আসছেন?'

'না-না, এখন দরকার নেই। উনি জার্নি ডেট ডেফার করেছেন, পরে প্রয়োজন হলে বলব আপনাকে।'

গোয়েন্দা এতক্ষণ নির্বাক শ্রোতা ছিল। কিন্তু বাইরের লোকে ওকে শ্রোতা ভাবলেও ওর আসল ভূমিকা ছিল দর্শকের। বিশেষ ধরনের দর্শক, যে শরীরের ভাষা জানে। আর পাঁচজনের হাত-মুখ-চোখের ভঙ্গি দেখে নানা গোপন কথা ধরে ফেলার এলেম রাখে। গোয়েন্দা চুপচাপ বসে থেকে কথার আড়ালের কথা ধরছিল এতক্ষণ।

অতনু দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কবে যাচ্ছেন লণ্ডনে?'

'খুব শিগ্‌গিরই। সাত-দশ দিনের মধ্যে হতে পারে। ব্যবসার কাজে যাব। একজনের কাছে একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট চেয়েছি, সেক্রেটারি দু-এক দিনের মধ্যে ডেট কনফার্ম করবে।' উত্তর দিয়ে ডক্টর মৈত্র একবার হাতঘড়ির দিকে তাকালেন।

'আচ্ছা, আপনি এখানে উঠেছেন কোথায়?'

'ঘুরেফিরে থাকছি, কখনও গেস্টহাউসে, কখনও হোটেলে।'

'আপনাদের নিজের বাড়ি বা আত্মীস্বজনের কাছে—।'

'বাবা-মা মারা গেছেন ছেলেবেলায়, সুতরাং দায়মুক্ত। আর আত্মীয়স্বজনকে ট্রাবল দিতে চাই না। আসলে একটানা বহু দিন প্রবাসে থাকলে যা হয়—ঘরের লোক পর হয়ে যায় না?'

এ কথার উত্তরে দুদিকে মাথা নেড়ে জোর গলায় প্রতিবাদ জানালেন অতনু দত্ত। 'আপনিই আসল ঘরের লোক। বাংলার, বাংলার মানুষের, কলকাতার ঐতিহ্য ধরে রাখার জন্যে যে কাজ করছেন—।'

'কাজ তো আমি শুরুই করলাম না। আপনারা বরং অনেকটা এগিয়ে গেছেন। আসলে কাজ করার লোকের খুব অভাব এখানে।'

'কাজ একবার শুরু করে ফেলতে পারলে কিন্তু কাজের লোক ঠিক জুটে যায়।'

'তা ঠিক। এই যেমন এই কাজের সুবাদে আপনাদের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। কৌশিক-বাবুকে পেলাম, আরও কাউকে কাউকে পেয়েছি।'

ডক্টর মৈত্রের কথাবার্তা শুনে কৌশিকের একটা খটকা কিছুটা দূর হল। ডক্টর মৈত্র কিশোরদের কাছে ওঁর আত্মীয়তার পরিচয়টা গোপন করে গেছেন। কিন্তু কেন? ওদিকে অলোক মৈত্রেই বা কী করে টের পেলেন যে, ওঁর ছোটভাই ভাগ্‌নিজামাই কিশোরের সঙ্গে অন্য ভাবে একটা সম্পর্ক গড়ে তুলেছে। এসব খবর চালান দেওয়ার জন্যে মধ্যিখানে কি একটা লোক আছে তাহলে? কে সেই লোক?

কিশোর কি এই আত্মীয়তার খবর কিছুই জানে না? না কি জেনেও না জানার ভান করছে! হয়তো সেটা অলোক মৈত্রের নির্দেশেই। তাহলে ব্যাপারটা এইরকম দাঁড়াচ্ছে, মৈত্রদের এই দু-ভাইয়ের মধ্যে সম্পর্ক একেবারেই ভাল নয়। সম্পর্ক খারাপ হওয়ার কারণ বোধহয় বিষয়সম্পত্তির ভাগবাঁটোয়ারা। গোয়েন্দার মাথায় প্রশ্ন উঠছিল একটার পর একটা।

আলোচনা ইতিমধ্যে আবার ঘুরে গিয়েছিল পালাগান, নাচ ইত্যাদি লোকসংস্কৃতির দিকে। অতনু দত্ত হাসতে হাসতে বললেন, 'পনেরো তারিখের অনুষ্ঠানের কাজ ওঁরা অনেকটা এগিয়ে ফেলেছেন। সিনসিনারি কিছু আঁকানো হয়ে গেছে। আদ্যিকালের রাজারাজড়ার ঘরদোরের ছবি। উডেন ফ্রেম, তার ওপর কাগজের বোর্ড, বোর্ডে ছবি আঁকানো হয়েছে। সেট হিসেবে চমৎকার। চেহারায় বেশ বড়সড়, অথচ খুব হালকা। ক্যারি করা সহজ। কিশোর ওগুলো ওঁদের একবার দেখিয়ে দিন না।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।' কিশোর মুখে 'হ্যাঁ-হ্যাঁ' করলেও ওর মধ্যে ওঠার কোনও লক্ষণ দেখা গেল না।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'অত বড় বড় কাগজের বোর্ড কোত্থেকে জোগাড় করলেন আপনারা?'

এপাশ থেকে জবাব দিলেন অতনু দত্ত, 'বোর্ডের সাপ্লায়ার আমাদের দিব্য। ওর তো মস্ত বড় কাগজের দোকান আছে।'

'দোকান কোথায়?'

'ব্রাবোর্ন রোডের কাছেই।'

'আপনার সঙ্গে কার্ড থাকলে আমাকে একটা দিন তো। আমার এক বন্ধু হালে বইয়ের ব্যবসায় নেমেছে। শুনছি কাগজের খুব ক্রাইসিস। ভাল কোয়ালিটির কাগজও পাচ্ছে না সব সময়। আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করার কথা বলে দেব।'

দিব্য মল্লিক ওঁর বাহারি ওয়ালেট থেকে একটা কার্ড বার করে এগিয়ে দিলেন কৌশিকের দিকে। কার্ডে একবার চোখ বুলিয়ে ওটা পকেটে রেখে দিল কৌশিক।

ডক্টর মৈত্র হাত আড়াল করে ছোট ছোট হাই তুললেন দু-তিনটে। কৌশিক এর আগেও বারদুয়েক ওঁকে এই সময় ওই ভাবে হাই তুলতে দেখেছে। হাই ঘুম পাওয়ার হাই নয়, নেশাখোরের হাই। রক্তে নেশার টান ধরলেই বুঝি এই রকম হাই ওঠে। কৌশিক যা ভেবেছিল ঠিক তাই, একটু বাদেই হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে ডক্টর মৈত্র বললেন, 'এখন চলি, একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, পরে আসব আবার।'

ভদ্রলোক চলে যাওয়ার পরে আবার সেই শিল্প-সংস্কৃতি-ঐতিহ্যের কথা ফিরে এল। কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'আপনারা আপনাদের অনুষ্ঠান কোথায় করবেন বলে ঠিক করেছেন?'

ও প্রশ্ন করেছিল কিশোরের দিকে তাকিয়ে, উত্তর দিলেন অতনু দত্ত। 'একেবারে আসল জায়গায়, প্রাচীন গৌড়ে।'

'প্রাচীন গৌড় মানে ঠিক কোথায়?'

'মালদার রামকেলিতে। এ জায়গাটা কিন্তু ঐতিহাসিক। শ্রীচৈতন্য নীলাচল থেকে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে ওখানে গিয়েছিলেন। সম্ভবত ১৫১৫ সাল নাগাদ। সেটা আলাউদ্দিন হোসেন শাহের শাসনকাল। মহাপ্রভু তখন গৌড়ে ছিলেন দশ মাস, কিন্তু রামকেলিতে মাত্র তিন দিন। ওই তিন দিনেই মস্ত এক ইতিহাস তৈরি হয়ে গেছে।'

'কীরকম?'

'রামকেলিতে শ্রীচৈতন্য আশ্রয় নিয়েছিলেন এক তমাল গাছের নীচে। সুলতান আলা-উদ্দিন হোসেন শাহের দুই দোর্দিণ্ডপ্রতাপ মন্ত্রী দবির খাস ও সাকর মল্লিক লুকিয়ে ওখানে দেখা করতে এসেছিলেন মহাপ্রভুর সঙ্গে। ওই একটি সাক্ষাতেই তাঁদের খোলনলচে পাল্টে গিয়েছিল। ছিলেন দুর্দান্ত রাজপুরুষ, হয়ে গেলেন পরম বৈষ্ণব। শ্রীচৈতন্য ওঁদের নাম পালটে দিলেন। একজনে নাম হল রূপ, আর একজনের সনাতন। বললেন : তোমাদের ওপর একটা গুরুদায়িত্ব দিচ্ছি। এখান থেকে পালিয়ে চলে যাও লুপ্ত বৃন্দাবন উদ্ধারের কাজে। ওঁদের গৌড় থেকে পালানো ইতিহাসের আরও দুটি চমকপ্রদ ঘটনা। পরে লুপ্ত বৃন্দাবন উদ্ধার করেছিলেন ওঁরা। শুধু তাই নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ব্যাখ্যা দিয়ে মূল্যবান সব বইপত্তর লিখেছিলেন। রামকেলির আর এক নাম গুপ্ত বৃন্দাবন।'

'শ্রীচৈতন্য যে ওখানে এসেছিলেন তার কি কোনও স্মৃতিচিহ্ন—।'

'আছে তো। সেদিনের সেই তমালতরুর বংশধরকে আজও বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে। তার কাছেই তৈরি হয়েছে একটি মন্দির। মন্দিরের বয়েস অবশ্য বেশি নয়।'

'আপনি গেছেন রামকেলিতে?'

'হ্যাঁ।'

'বেড়াতে না তীর্থটির্থ করতে?'

অতনু দত্ত গলা ছেড়ে হেসে উঠে বললেন, 'তীর্থধর্ম ইত্যাদি করার ব্যাপারে মহা-প্রভুর কৃপালাভ থেকে এখনও বঞ্চিত আছি, তবে শ্রীচৈতন্য আমার কাছে বিরাট এক বিস্ময়। নবদ্বীপের নিরস্ত্র ওই মানুষটি স্রেফ প্রেমের কথা শুনিয়ে গোটা ভারতে নবজাগরণ এনেছিলেন। সেই আমলে ট্রান্সপোর্ট বলতে ছিল পা-গাড়ি আর গরুর গাড়ি। নদীনালায় নৌকা। তার ওপর ছিল পদে পদে হাজার রকমের ভয়। এদিকে দস্যু, ওদিকে অত্যাচারী শাসক। পথেঘাটে, নদীনালায় সাপ, বাঘ কিংবা কুমীর। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের প্রেমের ডাকে, ধর্মের নতুন ব্যাখ্যায় সব বাধা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। গোটা ভারতবর্ষে তাঁর অনুগামীর দল ছড়িয়ে পড়েছিল হু হু করে। অমন ভাবের জোয়ার ভারতবর্ষে আর তেমন এল কোথায়। আমার মাথায় মাঝেমধ্যে একটা ছেলেমানুষি চিন্তা ভর করে। গান্ধীকে নিয়ে অ্যাটেনবরো

যেমন একটা ছবি তৈরি করেছেন, ওই রকম কেউ যদি শ্রীচৈতন্যকে নিয়ে করতেন! টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে থাকা পুরনো ভারতবর্ষে শুধুমাত্র প্রেমের কথা শুনিয়ে একটি মানুষ ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য, রাজনীতি, সমাজনীতিতে যে বিপ্লব নিয়ে এসেছিলেন তার তুলনা মেলা ভার।'

'আপনি তো বিষয়টা নিয়ে বেশ গভীরভাবে—।'

'কিছু গভীর-টভির নয়। নিজের দেশকে নিয়ে, নিজের দেশের বড় বড় মানুষদের নিয়ে অনেকেই একটু গর্ব করতে ভালবাসে, আমিও তাদের দলে।'

'অনুষ্ঠানের জায়গা হিসেবে রামকেলি বাছাই করার ব্যাপারে আপনারা অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছেন তাহলে।'

'হ্যাঁ, কিছুটা তো বটেই। আর একটা বাড়তি সুবিধে হল, রামকেলির কাছেই বাংলাদেশ বর্ডার। বাংলাদেশ থেকে কয়েকজন আসবেন আমাদের অনুষ্ঠানে। সুফি সাধকদের নিয়ে গবেষণা করছেন এমন কয়েকজন সাহেবও আসছেন ওঁদের সঙ্গে। পুরনো দিনের সাধকদের ছবি আঁকিয়ে একটা সেটও বানানো হয়েছে। ওটা তো পরশু বিকেলে আপনার বাড়িতে ডেলিভারি দেওয়ার কথা—তাই না কিশোরবাবু?'

প্রশ্নের উত্তরে খুব ছোট্ট করে একপাশে মাথা কাত করলেন কিশোর।

'সেই সেটিংয়ে ছবি আঁকছেন কে?'

'নামকরা কোনও পেন্টার নয়, তবে এই ছেলেটির কাজ ভাল। মিস্টার মল্লিকের দোকানের লাগোয়া গোডাউনে বসে কাজ করছে। কাছাকাছি থাকায় দরকার মতো ছবি অদলবদল করাতে কোনও অসুবিধে হচ্ছে না।'

পুরনো দিনের পুরনো কথায় সময় আরও কিছুটা গড়াবার পরে কৌশিক বিশাল বসার ঘরের চারদিক দেখতে দেখতে বলল, 'এত বড় ঘর, এত উঁচু সিলিং এখন কেউ বোধহয় আর বানাবে না। একদিন একটু সময় নিয়ে এসে আপনাদের বাড়িটা দেখতে হবে।'

চকচকে মুখে কিশোর চৌধুরী জবাব দিলেন, 'মোস্ট ওয়েলকাম। একদিন চলে আসুন, সেদিন এখানেই খাওয়াদাওয়া করবেন। আমার পূর্বপুরুষরা আর্কিটেকচারের খুব ভক্ত ছিলেন। ভেতর-বাড়ি, বাইরের বাড়ি, সব দিকেই ওঁদের বেশ খেয়াল ছিল। পুরনো আমলে সদরের ওপরেই চোখ থাকত সবার, খিড়কি নিয়ে কেউ তেমন মাথা ঘামাত না। খিড়কির পথ মানেই ছাই ফেলার পথ। কিন্তু আমাদের বাড়ির এই পথটার ওপরেও কর্তাদের বেশ নজর ছিল। ওইটা হচ্ছে খিড়কির রাস্তা।'

জানলা দিয়ে উঁকি মেরে কৌশিক বলল, 'খিড়কির পথ সত্যিই এত বড়সড় দেখা যায় না। আর আপনি রেখেছেনও ভারী সুন্দর করে। আজ আপনাদের খিড়কির পথ দিয়েই বিদায় নিই। পথটা বেরিয়েছে কোথায়?'

'বড় রাস্তাতেই। সদর থেকে আড়াইশো গজ দূরে।'

খিড়কির দরজা দিয়েই বার হচ্ছিল কৌশিক। দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে কিশোর বললেন, 'কাল দুপুরেই আমাদের বাড়িতে চলে আসুন না, প্লিজ। সময় হবে?'

'তা হবে, তবে—।'

'না-না, আর তবে-টবে নয়। আসুন। একসঙ্গে খাব আমরা।'

এ ভাবে কেউ আসতে বললে 'না' বলা কঠিন। একটু ইতস্তত করে জবাব দিল কৌশিক, 'ঠিক আছে আসব।' বিদায় নিয়ে পথে নামল ও।

এদিকের রাস্তায় দুটো আলোর একটা জ্বলছে না, তার ফলে পরিবেশ বেশ আলো-আঁধারি। এই পথে একটুখানি হাঁটার পরেই চমকে উঠে গোয়েন্দা 'বাস-স্টপ' লেখা খুঁটির আড়ালে সরে গেল। ওদিকের পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বেশ লম্বাচওড়া চেহারার একটা লোক কোল্ড ড্রিংকস খাচ্ছে। লোকটাকে কোথায় যেন দেখেছে! কোথায়? স্মৃতি একটু হাতড়াতেই হদিশ পেয়ে গেল। এই লোকটাকেই ও অলোক মৈত্রের বাড়ির সামনে দেখেছিল সেদিন।

লোকটা তাকিয়েছিল কিশোরদের সদর দরজার দিকে। নির্ঘাত নজরদারির কাজ করছে। কিংবা হয়তো আরও খারাপ কোনও উদ্দেশ্য আছে। কিন্তু ওর টার্গেট কে বা কারা?

মিনিট-পাঁচেক বাদে কিশোরদের বসার ঘরের আলো নিভে গেল। দিব্য মল্লিক আর অতনু দত্ত বোধহয় চলে গেলেন।

আলো নিভতেই লম্বাচওড়া লোকটা কাছে দাঁড়ানো একটা প্রাইভেট কারে উঠে পড়ল। ড্রাইভার মুখ ঘোরাতেই আর একটা চমকের মধ্যে পড়ল গোয়েন্দা। এ তো সেই মিলন মাইতির গাড়ির ড্রাইভার, একেই তো সেদিন জেরা করেছিলেন অবনী ঘোষরায়।

ওদিকে একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। ছুটেগিয়ে সেটায় উঠে পড়ে গোয়েন্দা বলল, 'সামনের ওই সাদা গাড়িটার পিছু নিন।'

চৌদ্দ

ঠিক সাড়ে-ন'টার সময় গোয়েন্দার চেম্বারে ফোন এল। ফোন তুললেন মুখার্জিবাবু। ফোনে কৌশিকের গলা। কৌশিক বলল, 'আজ বোধহয় আর অফিসে যেতে পারব না, সারাদিন ছুটোছুটি করতে হবে। কাল আপনি ডিউটি দিয়েছিলেন পাঁচ নম্বর বাড়ির সামনে?'

আমতা-আমতা করে মুখার্জিবাবু বললেন, 'না-না, মানে ব্যাপারটা কী হয়েছে জানেন, মন্টুর চেহারাটা এত বড়—।'

'কে মন্টু?'

'রাধাগোবিন্দ নট্ট কোম্পানির মন্টু সেন। থানার দারোগা, ডাকাত, জমিদারের লাঠিয়াল—এই চরিত্রগুলো ওর বাঁধা—।'

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না, আমি জানতে চাইছিলাম যে—।'

'সেটাই তো বলছি, কাল ছদ্মবেশ ধরে পাঁচ নম্বর বাড়ির সামনে নজরদারির কাজ করতে পারিনি।'

'কেন?'

'ওই মন্টুর চেহারাটা এতই বড় যে—।'

'কী আশ্চর্য, মন্টুটা কে?'

'কাবুলিওয়ালা। মানে রাধাগোবিন্দ নট্ট একবার কাবুলিওয়ালা পালা নামিয়েছিল, তাতে কাবুলিওয়ালা সেজেছিল মন্টু। ওর কস্টিউম এত বড় যে, ওই কুর্তা আর পাজামায় আমার মতো দুটো লোক ঢুকে যাবে। তাই ও-দুটো কাপড় মুড়ে আমার মাপে করে দেওয়ার জন্যে এক দর্জিকে দিয়ে এসেছিলাম। পেয়েও গেছি আজ সকালে। আমি এখন এখানে বসে মেক-আপ নিচ্ছি। কাল ওখানে পাহারা দিতে না পারার জন্যে কি কিছু ক্ষতি হয়ে গেল?'

'ও কথা আর এখন ভেবে কী লাভ? মেক-আপ হয়ে গেলে বেরিয়ে পড়ুন। গেস্ট-হাইসের ওপর নজর রাখবেন। আপনার চেনা কাউকে দেখলে পিছু নেওয়ার চেষ্টা করবেন। আর, আপনার বুদ্ধি-বিবেচনায় যা ভাল মনে হয় তাই করবেন।'

'আচ্ছা, কাবুলিওয়ালারা কী ভাষা বলে?'

'ভাষা? পুশ্‌তু। তবে এখানকার কাবুলিরা বাইরের পাঁচজনের সঙ্গে হিন্দিতেই কথা বলে।'

'তা বলে, তবে ওদের হিন্দির মধ্যে অদ্ভুত একটা ধাক্কা থাকে, ওটা বোধহয় পুশ্‌তুর।'

'হতে পারে।'

'আমি ওই ভাবে হিন্দি বলার ছোট্ট একটু মহড়া দিয়ে নিয়েছি, শুনবেন?'

'না, এখন আমার একদম সময় নেই; পরে শুনব। গুডলাক।' কথাটা বলেই টেলিফোনের লাইন কেটে দিয়েছিল কৌশিক।

একটু বাদে গোয়েন্দার চেম্বার থেকে যে লোকটি বেরুল তাকে এ-পাড়ার কেউ কখনও দেখেনি। কুর্তা-পাজামা-পাগড়িতে মোড়া আস্ত এক কাবুলিওয়ালা। মুখে দাড়ি-গোঁফের জঙ্গল, চোখে টিন্টেড গ্লাসের চশমা। কাবুলিওয়ালার গা থেকে অল্পস্বল্প হিংয়ের গন্ধ বার হচ্ছিল, তবে যাঁরা গন্ধবিশারদ তাঁরা আরও একটি গন্ধ পাবেন এই আফগানটির পোশাকে—সেটি হল ন্যাপথলিনের। কারণ কাবুলিওয়ালার এই কুর্তা-পাজামা পাক্কা এক বছর রাধাগোবিন্দ নট্ট কোম্পানির কস্টিউম-ট্রাঙ্কে বন্দিজীবন কাটিয়েছে।

পোশাকের আড়ালের মানুষটি পুরনো অভ্যাস থেকে ছুটে গিয়ে একটা বাসে ওঠার মুখে থমকে গেলেন। বাসে বেশ ভিড়। ঠেলে ওঠা যাবে ঠিকই, কিন্তু দাড়ি-গোঁফ-পাগড়ি অটুট রেখে নামা হয়তো যাবে না।

একটুখানি হাঁটার পরে একটা ট্যাক্সি ধরে নিয়েছিল কাবুলিওয়ালা। ওঠার মুখে ট্যাক্সির আয়নায় একঝলক নিজের মুখ দেখতে পেয়েছিল যাত্রীটি। বাহ্‌! ত্রুটিহীন মুখ। সঙ্গে সঙ্গে মানুষটি নস্টালজিয়ায় আক্রান্ত হল। পুরনো দিনের কত মধুর ছবি চোখের সামনে ভেসে

উঠতে লাগল একটার পর একটা। না, এর মধ্যে কাবুলের পাথুরে জমি বা রুক্ষ পাহাড় নেই। যা আছে তা হল সজল, সবুজ বাংলার গ্রাম।

ছেলেবেলার বা প্রথম যৌবনের গাঁয়ের কথা বারবার মনে পড়ে যাচ্ছিল মুখার্জিবাবুর। কী সুন্দর ছিল সেই দিনগুলো! একটা সময় শুধুই যাত্রা দেখা, আর একটা সময় শুধুই যাত্রা করা। সবগুলো মেলালে পালার সংখ্যা অনেক। তবে কাবুলিওয়ালা সাজা জীবনে এই প্রথম। সাজ তো নিখুঁত হয়েছে, কিন্তু পার্টটা কী? এ এমনই একটা পালা যেখানে আগে থেকে সংলাপ মুখস্থ করে রাখার কোনও সুযোগ নেই।

পাঁচ নম্বর বাড়ির একটু আগে ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছিল কাবুলিওয়ালা। দশটা-পাঁচটার অফিস শুরু হওয়ার মুখে অফিসপাড়ার ভিড় দেখার মতো। ফুটপাথে, রাস্তায় জনস্রোত। সব মানুষ এদিক থেকে ওদিকে যাচ্ছে। রাস্তায় উলটো স্রোত বলে কিছু নেই। খাঁসাহেব ভিড়ের মধ্যে কিছুক্ষণ ভাসার পরে একটা পানের দোকানের পাশে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন।

বিনা কাত্থা, ইলাইচি-সুপারি ঔর থোড়া জর্দা বলে পানের দোকানে একটা অর্ডার দাখিল করার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল মুখার্জিবাবুর। কিন্তু উনি ভরসা পাচ্ছিলেন না। কাবুলিওয়ালারা কি পান খায়? আগের দিন মস্ত একটা ভুল করে ফেলেছেন। ফোঁটাকাটা মারোয়াড়ির ছদ্মবেশ ধরে রেস্টুরেন্টে ঢুকে মনের আনন্দে চপ-কাটলেট খেয়েছেন। পরে একদিন ওই খাওয়ার গল্প তুলতে ভুলটা ধরিয়ে দিয়েছিল কৌশিক। বলেছিল, বিভিন্ন জাতের অনেকেই অবশ্য খাওয়ার পুরনো অভ্যাস পালটে ফেলেছে এখন; তবে ছদ্মবেশ ধরলে দলছুট না হওয়াই ভাল। রকমসকম অন্যরকম হলে অন্য লোকের সন্দেহ হতে পারে।

আধঘন্টা, চল্লিশ মিনিটের মধ্যে অফিসটাইমের বিচ্ছিরি ভিড়টা কেটে গিয়েছিল একদম। রাস্তায় এখন লোকজনের সংখ্যা বেশ কম। অফিসযাত্রী আছে তবে তাদের চলাফেরার মধ্যে বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা নেই। দেখলে মনে হবে যে কোনও সময় অফিসে একবার গেলেই হল!

চলার পথে অনেকেরই চোখ যাচ্ছিল এই কাবুলিওয়ালাটির দিকে, কিন্তু সে দেখা আর পাঁচটা স্বাভাবিক জিনিস দেখার মতো। দৃষ্টিতে বাড়তি কোনও কৌতূহল নেই। তার মানে ছদ্মবেশ নিখুঁত। শুধু তাই নয়, এ-পাড়ায় এই সময় একজন খাঁসাহেবের দাঁড়িয়ে থাকাটাও বুঝি খুব সহজ-স্বাভাবিক ঘটনা। মুখার্জিবাবু মনে মনে তরুণ গোয়েন্দার বুদ্ধি তারিফ করলেন আর একবার। না, ছোকরার দেখার চোখ আছে বলতে হবে। অফিসপাড়ায় মাসের প্রথম দিকে এক কাবুলিওয়ালা টাকা-ধার-নেওয়া বাবুদের কাছ থেকে আসল কিংবা সুদ আদায়ের জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ—এর চেয়ে স্বাভাবিক দৃশ্য আর কী হতে পারে!

পাঁচ নম্বর বাড়ির পাশে দেয়ালের গায়ে একচিলতে রকের মতো জায়গা আছে, সেখানে

একটু আয়েশ করে বসার পরে মুখার্জিবাবুর মাথায় এলোমেলো চিন্তার ছোট্ট একটা ঝড় উঠল।

নীল আকাশে টুকরো-টুকরো সাদা মেঘ ভাসছিল, সেদিকে তাকাতেই বেশ কয়েকটি দার্শনিক প্রশ্নের মুখোমুখি হলেন পঞ্চাশ বছরের এই মানুষটি। যেমন—জীবন কী? চোর-পুলিশে যে খেলা চলে, জীবন-মৃত্যুর মধ্যেও কি সেই একই খেলা! ছেলেবেলার এক ডাগর-চোখ সঙ্গিনীর কথাও মনে পড়ে গেল হঠাৎ। ওই মেয়েটি তো ওঁর জীবন-সঙ্গিনীও হতে পারত!

হঠাৎ কেমন এক অভিমান জেগে উঠল মানুষটির। মনে হল, জীবনে যা-যা হওয়া উচিত ছিল—তার অনেক কিছুই হয়নি ওঁর জীবনে। অভিমানের পিছু পিছু আসে ব্যর্থতাবোধ আর হতাশা। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সে-সব এল না। যা এল তার নাম ঘুম। ভাত খাওয়ার দেড় ঘন্টা বাদে ভাত-ঘুমে চোখ জড়িয়ে এসেছিল মুখার্জিবাবুর।

ঠিক সেই সময় বেনেপুকুর বস্তি এলাকায় একটা ছোট্ট ঘরে বসে খুব দরকারি কিছু কথাবার্তা চালাচ্ছিল কৌশিক। যার সঙ্গে চালাচ্ছিল তার পাম অ্যান্টনি গোম্‌স্‌। এমন অভিব্যক্তিহীন মানুষের মুখ আর একটাও দেখেনি গোয়েন্দা। মানুষটার দুঃখ, সুখ, সাফল্য, ব্যর্থতা, হতাশা, রাগ, বিরক্তি কিছুই বোধহয় ওর মুখ দেখে বোঝা যায় না। চেহারা দেখে বয়েসের আন্দাজ পাওয়াও কঠিন। কখনও মনে হবে চল্লিশ, কখনও বা পঞ্চাশ।

হাজার একটা ধান্দায় ঘোরে, তার মধ্যে প্রধান হল গুপ্তচরগিরি। পুলিশের অত্যন্ত আস্থাভাজন এই লোকটা গত পঁচিশ বছর ধরে ইনফর্মারের কাজ করে যাচ্ছে। এর আনা প্রায় প্রতিটি খবরই পাকা। পাকা খবরে রহস্যের কিনারা হয়, চোর-গুণ্ডা-ডাকাত ধরা পড়ে, চোরাই মালের হদিস মেলে। কিন্তু পুলিশের ইনাম বা বাহবাতে মানুষটার চোখমুখের চেহারা মুহূর্তের জন্যেও পালটায় না। জাতে খ্রিস্টান। ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, উর্দু মাতৃভাষার মতো বলে। কাজ চালাবার মতো আরও কয়েকটা ভাষা জানে। হাতের কাজ জানে নানারকম। অসম্ভব বুদ্ধিমান, কিন্তু চোখমুখ দেখলে মনে হয়, ঘটে একবিন্দুও সার পদার্থ নেই।

এমন একজন মানুষের সামনে একটানা অনেকক্ষণ দরকারি কথাবার্তা চালিয়ে যাওয়া খুব কঠিন কাজ। হঠাৎ-হঠাৎ মনে হবে, লোকটা শুনছে না; কিংবা শুনলেও বুঝছে না। চোখে চোখ রেখে কথা চালাতে গিয়ে মাঝে মধ্যেই বেশ অস্বস্তির মধ্যে পড়ছিল গোয়েন্দা, কিন্তু ও খুব ভালভাবেই জানে, ওর প্রতিটি কথাই গেঁথে যাচ্ছে ভাবলেশহীন এই গুপ্তচরটির মাথায়।

সবকিছু বলার পরে কৌশিক বলল, 'তাহলে গোম্‌সসাহেব, এসব ব্যাপারে কিছু খবরা-খবর জোগাড় করতে পারলেই আমাকে জানাবেন।'

বহুক্ষণ বাদে একচলিতে হাসি ফুটে উঠল গোম্‌সের মুখে। 'নিশ্চয়ই জানাব। আপনার

ফোন নাম্বার তো আমার কাছে আছে। ফাঁক পেলে আমি নিজেও চলে যেতে পারি আপনার কাছে।'

ওখান থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি নিয়ে শোভাবাজারে হাজির হল কৌশিক। বসার ঘরেই ছিলেন কিশোর চৌধুরী, এগিয়ে এসে সমাদরের সঙ্গে আপ্যায়ন করে কৌশিককে বসালেন। কৌশিক লক্ষ করে দেখেছে, বনেদি পরিবারের কেউ-কেউ অভ্যর্থনা করার এই বিশেষ কেতাটি এখনও টিকিয়ে রেখেছেন সযত্নে। সাধু বাংলায় একেই বলে বোধহয় 'প্রত্যুদ্‌গমন'।

অভ্যর্থনার শুরুতেই ছিল সুগন্ধী ঠাণ্ডা শরবত।

কিশোর চৌধুরী বললেন, 'আমার মিসেস সকালের দিকে বেরিয়েছে, ওর একটা মেডিক্যাল চেক-আপ করানোর কথা।'

'সে কি! কী হয়েছে।'

'না-না, নাথিং সিরিয়াস। রুটিন চেক-আপ বলা যেতে পারে। তারপর যাবে কিছু সোশাল ওয়ার্ক করতে। ইন ফ্যাক্ট, এটা এখন ওর প্রায় প্রতিদিনের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

'সোশাল ওয়ার্ক। বাহ্‌! খুব ভাল।'

'আমাদের দুজনের ঘাড়ে দু-ধরনের ভূত। আমি চাই পুরনো কলকাতা বাঁচাতে, আর আমার গিন্নি চায়—আজকের কলকাতার গরিব-দুঃখীদের বাঁচাতে।'

'আপনাদের দুজনেই খুব বড় দুটো কাজ করছেন—সত্যিই বড়।'

'বড়-ছোট জানি না, তবে ও আজ বেরুবার আগে খুব দোনামনা করছিল। বলছিল, বাড়িতে অতিথি আসবে, অথচ আমি—। আমিই ওকে জোর করে পাঠালাম। বললাম, তোমার প্রোগ্রাম তো আগে থেকে ঠিক করা আছে, এখন না গেলে বাজে ব্যাপার হবে—।'

'ঠিক করেছেন। আমি তো এখানে আসছিই, ভবিষ্যতেও আসব। বরং আপনি আজ এই নেমন্তন্নের ব্যাপারটা বাদ দিলে পারতেন!'

'কী আশ্চর্য, এটাকে আবার নেমন্তন্ন বলছেন কেন?'

'তবে কী বলব, পিতৃরক্ষা!'

কৌশিকের কথা শুনে কিশোর গলা ছেড়ে হেসে উঠেছিলেন।

শরবত শেষ হওয়ার পরে শুরু হল বাড়ি দেখা এবং দেখানো।

অবাক হয়ে বাড়ি দেখছিল কৌশিক। এটা বাড়ি না বলে প্রাসাদ বলাই ভাল। কত ঘর, আর প্রতিটি ঘরই বিশাল মাপের। ঘরে-ঘরে পুরনো দিনের আসবাবপত্র, অসাধারণ সব কারুকার্য। কালো কিংবা হালকা লালের আভাস-ধরানো ফার্নিচারের কাঠগুলো বোধহয় মেহগনির। শোকেসে প্রাচীন ইতালি, ফ্রান্স, ইংল্যাণ্ডের নানা স্মারক। দেওয়ালের বিশাল-বিশাল আয়নাগুলো নির্ঘাত বেলজিয়ামের। বিলিতি কোকিল-বসানো সুদৃশ্য দেয়ালঘড়িটি

বোধহয় পুরনো দিনের সুইজারল্যাণ্ড থেকে আনা। এর মধ্যেই আছে আবার পুরুলিয়ার ছৌ নাচের মুখোস, পোড়ামাটির ঘোড়া, কিংবা কষ্টিপাথরের বিশালাক্ষী।

বেশ তারিফ করার গলায় কৌশিক বলল, 'আপনার কালেকশন তো দারুণ!'

'আমার আর কোথায়, সবই আমার পূর্বপুরুষের।'

পূর্বপুরুষদের নানা কীর্তিকাহিনী, শখ-সাধ ও বাতিকের গল্প করতে করতে তিন-তলা বাড়ির প্রতিটি ঘরই দেখালেন কিশোর। ছাতে ওঠার জন্যে লোহার তৈরি একটা ঘোরানো সিঁড়ি আছে, সেটা দিয়ে ছাতে উঠে গৃহস্বামী বললেন, 'এটা হল আমাদের বাড়ির শেষ ঘর—চিলেকোঠা।' তিনটি তলা দেখার পরে বাড়ির পেছনদিকে এল অতিথি। পাঁচিলঘেরা অনেকটা খোলা জমি, এখানে বুঝি অনায়াসে একটা বহুতল বাড়ি বানানো যায়।

কৌশিকের বিস্ময়ের ঘোর বোধহয় কাটছিল না। বলল 'আপনাদের যা বাড়ি, এই বাড়িতে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করলে কলকাতার পুরনো সব বাড়িকেই ভালবাসতে ইচ্ছে করবে।'

বাড়ির প্রশংসা খুশি মনে শোনার পরে কিশোর চৌধুরী বললেন, 'আমাদের বাড়ির যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, কিন্তু পুরনো কলকাতার বাড়ি বলতে যেগুলো বোঝায় সেগুলো আরও পুরনো।'

আদি কলকাতার গল্প করতে করতে ওরা আবার ফিরে এল বসার ঘরে। গল্প ধাক্কা খেল খাবার-ঘরে আসার পরে। খাবারের টেবিলের দিকে তাকিয়ে চোখ কপালে তুলে কৌশিক বলল, 'উরিব্বাস! এ কী করেছেন!'

'কিচ্ছু না। শুরু করুন তো, ইয়াংম্যান—।'

এই 'কিচ্ছু না' মানে কম করে দশটি পদ। কয়েক রকমের সব্জি, ডাল, ভাজা, মাছ আর মাংস। সরু চালের সুগন্ধী ভাত। চমৎকার রান্না। পরিবেশন করছিল বাড়ির কাজের লোক।

খাওয়ার মাঝপথেই আবার ফিরে এল পুরনো দিনের পুরনো গল্প। হঠাৎ কিশোর বললেন, 'ও, আপনাদের সেই মুখার্জিবাবুকে একবার পাঠিয়ে দেবেন তো। মানুষটি দারুণ ইন্টারেস্টিং আর একেবারে গাঁয়ের যাত্রা-থিয়েটারের লোক। শহুরে প্যাঁচ-পয়জার নেই। রামকেলিতে ওঁর ডিরেকশনে দুটো ছোট কৌতুক-নক্শা নামাব। আমি শুনলাম, গাঁয়ের আসরে এই ধরনের স্কিটের খুব চাহিদা আছে।'

'আপনার কি নক্শা লেখা হয়ে গেছে?'

'না-না, আমি বিষয় সাপ্লাই করব, নাটকের ফর্মে ওগুলো দাঁড় করানোর দায়িত্ব মুখার্জিবাবুর।'

'বিষয়গুলো কী?'

'ঐতিহাসিক। দুটে বিষয় ভেবেছি। দুটোই ওই মালদারই। একটু দাঁড় করিয়ে দিতে পারলে ওখানকার লোকরা খুব ভালভাবে নেবে।'

'কীরকম?'

'একটা হচ্ছে কণ্ঠীবদল। নামমাত্র খরচায় বিয়ে করে বউ ঘরে তোলা। শ্রীচৈতন্য তো মস্ত বড় সমাজসংস্কারক ছিলেন। তাঁর নানা সংস্কারের একটি ছিল অর্থনীতি নিয়ে। রাম-কেলিতে মস্ত বড় মেলা বসত। একটা জায়গায় জড়ো হত তরুণী বৈষ্ণবীরা। এরা সব বিয়ের পাত্রী। মেলা থেকে বউ আনার জন্যে এখানে হাজির হত যুবক বৈষ্ণবেরা। বিয়ের খরচা কত ছিল বলুন তো?'

'কত?'

'এখনকার দিনে মেয়ের বিয়ে দিতে গেলে অনেক বাপ-মাকে জমি বাড়ি বেচতে হয়। বরপণ বা টিভি, ফ্রিজ ইত্যাদি হাজাররকম বায়নাক্কা মেটাবার জন্যে বাইরে গিয়ে ধারদেনা করতে হয়। কিন্তু মহাপ্রভু সেদিন গণবিবাহ চালু করে দিয়ে সমাজের একটা বড় অংশের মস্ত বড় সমস্যা মিটিয়ে দিয়েছিলেন রাতারাতি। বিয়ের খরচা মিটত মাত্র পাঁচটা সিকি খরচা করে।'

'পাঁচ সিকির বিয়ে।'

'ঠিক তাই। মেলায় দাঁড়ানো মেয়েদের ভেতর থেকে পাত্রী পছন্দ করো, তারপর পাঁচ সিকির বদলে কণ্ঠীবদল করে বিয়ে করে ফেল। হ্যাঁ, আর একটা খরচা ছিল—এক সিকি দিয়ে কণ্ঠী কিনতে হত। তার মানে টোটাল খরচা হচ্ছে মাত্র দেড় টাকা। আমার মনে হয়, এই নিয়মটা এখন আমাদের সমাজের প্রতিটি স্তরেই চালু করা দরকার। কন্যাদায়গ্রস্ত বাপ-মা বা অনূঢ়া কন্যা বলতে যে কী বোঝায় তা আর মধ্যবিত্ত বাঙালিকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই। শিক্ষার আলো যতই পড়ুক না কেন, এ-দিকের অন্ধকার আর ঘুচল কোথায়? তা, এটা নিয়ে একটা ছোট্ট নাটক। নক্‌শাই বলা ভাল। ঠাট্টা, মজার ভেতর দিয়ে গাঁয়ের লোককে সামাজিক একটা ব্যাধির বিষয়ে সজাগ করে দেওয়া। শেষের দিকে এইরকম একটা দৃশ্য থাকতে পারে—ছেলের বাপ এগিয়ে এসে মেয়ের বাপকে বলল : আপনাকে আর জমিজমা বেচে মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করত হবে না। চলুন আমরা কণ্ঠীবদলের আয়োজন করি। শেষ কী ভাবে হবে সেটা অবশ্য মুখার্জিবাবুই ঠিক করবেন, তবে এইরকম একটা মেসেজ থাকলে মন্দ হয় না। এটা আমার একটা সাজেশন।'

'খুব ভাল সাজেশন। নাটককে শুনেছি সমাজের আয়না বলা হয়। তা নিজেদের বেয়াড়া কাজকর্ম দেখে কারও যদি চৈতন্য ফেরে—সেটা তো খুব ভাল ব্যাপার। আপনার আর একটা নাটকের বিষয় কী?'

'সেটা শুধুই মজার। ঘটনাটা মালদারই। সে আমলে সুলতান ইউসুফের পেয়ারের এক নর্তকী ছিল ফজলবিবি। সুলতান তার জন্যে আমবাগানে চমৎকার একটি বাড়ি বানিয়ে দিয়েছিলেন। চারদিকে আমবাগান, মধ্যিখানে ছবির মতো বাড়ি, সেই বাড়িতে বাস করতেন অপরূপা নাচনেওয়ালি। সন্ধে হলেই ইউসুফ ওখানে এসে হাজির হতেন। তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে সোনার পাত্রে সুরা খেতেন, ওদিকে চলত নাচ আর গজল। ঘুঙুরের বোলে আর নর্তকীর ছিপছিপে শরীরে বিদ্যুৎ খেলা করে যেত পালা করে।'

মৃদু হাততালি দিয়ে কৌশিক বলল, 'দারুণ বলছেন তো। আপনি কি সাহিত্য-টাহিত্য করতেন?'

'না-না, কখনওই না। তবে এই নক্‌শাটার প্রথম দিকে নর্তকীর ছিপছিপে শরীর আর নাচের ওপর খুব জোর দিতে হবে। কারণ, এর পরেই আসব অ্যান্টি-ক্লাইম্যাক্স।'

'কী রকম?'

'সুলতানের আদর আর মোগলাই খানা খেয়ে ফুলে যাবে তন্বী নর্তকীর শরীর। মোটা হতে হতে হয়ে যাবে বিদিকিচ্ছিরি এক মাংসের তাল। বিশাল ওই বপু দেখে সুলতানের ভালবাসা চটে গেল। তিনি নর্তকীর বাড়িতে আসা বন্ধ করে দিলেন। এদিকে ওই আম-বাগানের একটা গাছে বিরাট-বিরাট আম ফলত। লোকে আড়ালে ঠাট্টা করে ফজলবিবির নামে ওই গাছের আমের নাম রেখেছিল ফজল আম। পরে পাঁচজনের মুখে ফিরতে ফিরতে ফজল আম হয়ে গেল ফজলি আম। ফজলবিবি মারা গেছে আজ থেকে প্রায় পাঁচশো বছর আগে। তার নাম এখন আর কেই বা জানে! কিন্তু এ-দেশে ফজলি আমের নাম জানে না—এমন লোক কেউ নেই। নাটকের সঙ্গে পুরনো দিনের একটু ইতিহাস-টিতিহাসও মেশানো দরকার। সব মিলিয়ে কেমন হবে বলুন তো?'

'দারুণ। দুটো নাটকই বেশ জমে যাবে।'

'জমানোর দায়িত্ব মুখার্জিবাবুর। আপনি ওকে একবার আসতে বলবেন তো—যত তাড়াতাড়ি সম্ভব।'

'নিশ্চয়ই বলব, দেখা হলেই বলব।'

আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পরে উঠে পড়ল কৌশিক। 'চলি এবার। বেশ কেটে গেল সময়টা। আপনার গল্পের স্টক দেখছি অফুরন্ত।'

কিশোরের চোখদুটো ভাসা-ভাসা। এমন চোখ বোধহয় সবসময়ই কিছু-না-কিছু স্বপ্ন দেখে থাকে। হাসতে হাসতে বললেন, 'বেকার মানুষ। কাজকম্ম কিছু নেই তো, তাই শুধু গল্প পড়ি আর গল্প বানাই।'

সদর দরজার মুখে কৌশিকের জন্যে বিশাল একটা চমক অপেক্ষা করছিল। সামনের ভদ্রমহিলার দিকে চোখ পড়তেই মৃদু একটা শব্দ আর একটু হলেই বেরিয়ে আসছিল ওর মুখ ঠেলে। কিন্তু মনোভাব গোপন করার কৌশল খুব ভালভাবে রপ্ত করেছে কৌশিক। মহিলাকে পথ দেওয়ার জন্য নির্বিকার মুখে একপাশে সরে দাঁড়িয়েছিল শুধু।

কিশোর চৌধুরী হই-হই করে বলে উঠলেন, 'যাক তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তবু—। ইনিই কৌশিক মিত্র, আর এ হচ্ছে আমার বউ—তুলি। ওঁর কথাই তোমাকে আজ সকালে বলছিলাম—।'

ভদ্রমহিলা বিব্রত মুখে বললেন, 'আমার খুব খারাপ লাগছে, আপনাকে নেমন্তন্ন করা হল, অথচ আমি থাকতে পারলাম না। আজ আমার—।'

ওঁর স্বামী থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি সব বলেছি।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ সব শুনেছি। পরে আবার আসা যাবে।' কথাটা কেমন যেন খাপছাড়া ভঙ্গিতে বলে কর্তা-গিন্নির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়েছিল কৌশিক।

পরশু দুপুরে এক ট্যাক্সিওয়ালা এই মহিলাকেই একটি যুবকের বুকে মাথা রেখে বলতে শুনেছে—'আমি আর পারছি না!' ট্যাক্সিওয়ালার ছদ্মবেশে যে ছিল তাকে চেনা মহিলার পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু কৌশিকের দেখার মধ্যে বিন্দুমাত্র ভুল নেই। ভদ্রমহিলার গালের নীচের দিকে ছোট্ট একটা আঁচিল আছে, সেটা সেদিন অবশ্য ওর চোখ এড়িয়ে গিয়েছিল।

পনেরো

সকাল আটটায় সময় ডোরবেল বাজল কৌশিকদের ফ্ল্যাটে। প্রথমে একবার, তারপর দুবার, তারপরে তিনবার।

দরজা খোলার আগেই কৌশিক ভেতর থেকে চেঁচিয়ে উঠল—'আসছি অবনীদা।'

দরজা খুলতেই ও-পাশে গোয়েন্দা দফতরের বিখ্যাত পুলিশ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়কে দেখা গেল। সকাল আটটা, বাতাসে সামান্য শীতের ভাব; কিন্তু এই দুঁদে অফিসারটির কপালে বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছিল। মুখচোখে ক্লান্তির ছাপ। ঘরে ঢুকতে ঢুকতে উনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কী করে বুঝলে যে আমি এসেছি? তোমার দরজায় তো আইহোল নেই—।'

বসার চেয়ার দেখিয়ে দিয়ে হাসতে হাসতে জবাব দিল কৌশিক, 'আন্দাজে বলেছি।'

'না-না, আন্দাজ নয়। আমি দেখেছি তোমার সব কিছুর পেছনেই একটা অঙ্ক কাজ করে।'

কৌশিক এবার একটু গলা ছেড়ে হাসল। 'এর মধ্যে আপনি আবার অঙ্ক পেলেন কোথায়! বরাবরই দেখেছি কাজের ব্যাপারে আপনি অত্যন্ত সিরিয়াস। খুব ইনভল্‌ভ্‌ড হয়ে কাজ করেন। তার ফলে কেসের কোথাও একটু জট পাকিয়ে গেলেই অস্থির হয়ে পড়েন কিছুটা। অস্থির হলেই রাত্তিরে আপনার ভাল ঘুম হয় না। আর ঘুম না হলে মাঝেমধ্যে এই সময় আমাদের বাড়িতে চলে আসেন। আমি অবশ্য কোনও ফ্যাক্টর নই, আমাকে উপলক্ষ করে আপনি নিজের যুক্তিতর্কগুলো একটু ঝালাই করে নেন—এই যা।'

বিনীতভাবে এই ধরনের কথা কেউ বললে—যাকে বলা হচ্ছে তিনি সাধারণত একটা আপত্তি তুলে থাকেন। এই সময় তো ঘোষরায়ের বলা উচিত ছিল—না-না, তুমি উপলক্ষ নয়, তুমিই লক্ষ্য। কিন্তু এখন উনি ওসব কথার মধ্যে না গিয়ে কপালে সামান্য ভাঁজ ফেলে প্রশ্ন করলেন, 'কেস একটু গোলমেলে হয়ে উঠলে এই সময় তোমার ডেরায় আমি মাঝে-মধ্যেই হানা দিই—ঠিক। কিন্তু তুমি কী করে এখন বুঝলে যে, আমার হাতের কেসটা এখন একটু গোলমেলে হয়ে উঠেছে।'

'ওহ্‌! আপনি এসেই দেখছি জেরা শুরু করে দিয়েছেন। জবরদস্ত পুলিশ অফিসারদের আমি এই জন্যেই এড়িয়ে চলতে চাই। সেদিন আপনি বলেছিলেন এবারের কেসটা খুব সহজ

কেস। সহজ কেসের তো চটপট কিনারা হয়ে যায়। হলে খবরের কাগজ, টি ভি মারফত জানতে পারতম। পারিনি যখন, তখন ধরে নিতে হবে কেসটা কঠিন হয়ে উঠেছে।'

'ব্যস, এইটুকুই! তুমি বলতে চাও এর পেছনে তোমার আর কোনও অনুমান কাজ করেনি?' প্রশ্নটা করার পরেই ও-দিকের বড় চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে পড়লেন পুলিশ ইন্সপেক্টর। বসার পরে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মু'ছে একই প্রশ্ন করলেন আবার।

বিব্রত মুখে উত্তর দিল কৌশিক। 'আসলে সেদিনই, মানে মিলন মাইতির ড্রাইভারকে আপনি যেদিন জেরা করেছিলেন, আমার মনে হয়েছিল—।'

'কী মনে হয়েছিল?'

'কিছু-কিছু কথা মিথ্যে বলছে ড্রাইভার।'

'ঠিক তাই। পরে সেটা আমি ধরতে পেরেছি। কী ধরেছি পরে বলছি। কিন্তু সেদিন তুমি ওর মিথ্যেটা ধরলে কী করে?'

'শরীরের ভাষা পড়ে।'

'কীসের ভাষা?'

'শরীরের ভাষা।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, সেদিন তুমি বলছিলে বটে। ব্যাপারটা কী একটু খুলে বলো তো।'

'বলছি' বলে কৌশিক ভেতরে গিয়ে দু-কাপ চায়ের কথা বলে এল।

একটু আগেই পুলিশ ইন্সপেক্টর তাঁর মস্ত বড় মুখটা মস্ত বড় রুমাল দিয়ে মুছেছিলেন, কিন্তু এখন সেখানে আবার বিন্দু-বিন্দু ঘাম ফুটে উঠেছে। ইন্সপেক্টর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বললেন, 'আমার কপালটা এমন—কোনও কিছুই দেখি সহজে মেটে না। দিব্যি সাদামাঠা কেস ছিল, দুই আর দুইয়ের যোগফল চার লিখে হাত ধুয়ে ফেলব, তা না—। আরও খারাপ লাগে কী জানো—বড়কর্তাদের ধমক। ফোন তুলেই জিজ্ঞেস করে, কেসের কদ্দূর? তুমি জানো আমি কাজে ফাঁকি দিই না। যা করার তার থেকে বোধহয় একটু বেশিই করি। কিন্তু তার কোনও রিকগ্‌নিশন নেই। আরে বাবা, কেসের ফয়সালা করা কি অত সহজ! অপরাধী কি আমার দোরগোড়ায় আছে যে, বেরুলাম আর ধরলাম। তারপর আছে এই কাগজওলারা, অকারণে পুলিশকে গালাগালি দেওয়া এদের মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে। হালে আর এক উৎপাত শুরু হয়েছে—টি ভি। প্যারালাল একটা ইনকুয়ারি চালাতে গিয়ে এরা যা করে তা আর কহতব্য নয়। অপরাধের কিনারা না হলে ঘুরেফিরে দোষ চাপানো হয় সেই পুলিশের ওপরেই। আরে বাবা, অপরাধ হয়েছে—তার জন্যে পুলিশ আছে, বিচারব্যবস্থা আছে। তোদের এমন ঝাঁপিয়ে পড়ে জল ঘোলা করে কাজে বাগড়া দেওয়ার কী দরকার!'

মৃদু হেসে কৌশিক বলল, 'মিডিয়াপার্সনরা এ-ব্যাপারে হয়তো জনমত সৃষ্টি করে।'

কথাটা শুনেই চটে গেলেন ইন্সপেক্টর। 'জনমত কি কেসের সুরাহা করতে পারে?'

'তা পারে না, তবে কাজ ফেলে না রেখে আপনারা যাতে চটপট সুরাহার দিকে এগোন তার জন্যে একটা চাপ সৃষ্টি করতে পারে।'

'করে লাভ?'

'পুলিশের বড়কর্তা তখন মেজকর্তাকে, মেজকর্তা তখন ছোটকর্তাকে চাপের মধ্যে রাখেন।'

'রেখে লাভ?'

'পুলিশ তখন তার কাজে ঢিলটান দিতে পারে না। মিলন মাইতির হত্যারহস্যের কোনও কূলকিনারা পুলিশ এখনও করতে পারেনি বলে কাল খবরের কাগজে একটা সম্পাদকীয় বেরিয়েছে। ভাষা যাকে বলে জ্বালাময়ী। ওটা নিশ্চয়ই আপনাদের ওপর একটা বাড়তি চাপ তৈরি করেছে।'

কিছুটা দুঃখী এবং কিছুটা বিব্রত মানুষের মতো মুখ করে অবনী ঘোষরায় বললেন, 'তুমি কি বলছ ওই চাপ তৈরি না হলে আজ সকালে আমি তোমার কাছে আসতাম না?'

'না-না, কী আশ্চর্য! আপনি আবার এর মধ্যে আপনাকে জড়াচ্ছেন কেন? আমরা তো একটা সাধারণ আলোচনা করছিলাম।'

চা এসে গিয়েছিল। চিনি-ছাড়া চায়ের কাপটা ইন্সপেক্টরের দিকে এগিয়ে দিয়ে কৌশিক বলল, 'নিন, চা খান।'

রুমাল দিয়ে চোখমুখ আর একবার মুছে নিয়ে চায়ের কাপে বেশ লম্বা একটা চুমুক দিলেন ইন্সপেক্টর। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'হ্যাঁ, তুমি শরীরের ভাষা না কীসের কথা যেন বলছিলে—। সে দিন কী করে বুঝলে যে আমার জেরার মুখে ড্রাইভারটা মিথ্যে কথা বলছে!'

'শরীরের কয়েকটা লক্ষণ দেখে বুঝেছিলাম। মুখের ভাষায় একটা লোক বেমালুম মিথ্যে বলতে পারে। সে যদি পাকা মিথ্যেবাদী হয় তো কথাই নেই। কিন্তু মিথ্যে বলার সময় তার শরীরে কিছু লক্ষণ ফুটে ওঠে। শরীরের ভাষা যে জানে, তার কাছে ওই মিথ্যেটা ধরা পড়ে যায়। যে জানে না, সে মুখের কথাটাকেই বিশ্বাস করে নেয়।'

একটু নড়েচড়ে বসে ইন্সপেক্টর বললেন, 'কীরকম, একটু শুনি।'

কৌশিক ওর চায়ের কাপে ছোট্ট একটা চুমুক দিল। তারপর চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বলল, 'মিথ্যেবাদীরা মিথ্যে বলার সময় আই কনট্যাক্ট করে না।'

'সেটা আবার কী?'

'যাকে মিথ্যে বলছে তার চোখে চোখ রাখে না। চোখ সাধারণত একটু নিচুর দিকে নামানো থাকে। আসলে লোকটা তো জানে সে মিথ্যে বলছে, সুতরাং একটা অপরাধবোধ কাজ করে যায় গোপনে। সেই বোধ থেকেই চোখে চোখ রাখে না। যে সত্যি কথা বলে সে চোখে চোখ রেখে কথা বলে। তার চোখে পলকও পড়ে কম। যে লোকটা মিথ্যে বলছে সে যদি চোখের দিকে তাকায়ও তার চোখ পিটপিট করবে। যাকে বলে ব্লিঙ্ক করা। সুযোগ

পেলেই পিটপিটে চোখ ঘুরিয়ে নেয় অন্যদিকে। তবে কারও চোখে যদি কোনও প্রবলেম থাকে, এই নিয়মটা খাটে না। আমি লক্ষ করে দেখেছি আপনার ওই ড্রাইভারের চোখের কোনও অসুখ নেই। অন্যান্য কথা বলার সময় দৃষ্টি বেশ স্বাভাবিক ছিল।'

'তা তুমি ওটা দেখে বুঝতে পারলে লোকটা মিথ্যে বলছে।'

'হ্যাঁ।'

'আর কিছু? মানে আর কিছু তোমার চোখে পড়েছিল?'

'পড়েছিল। শরীরের আর একটা লক্ষণ দেখে বুঝলাম, লোকটা আদপেই নিরপরাধ নয়। বরং মাঝেমধ্যেই অপরাধ করে থাকে—ক্রিমিনাল অফেন্স; রোগাপটকা হলে কী হবে।'

'অ্যাঁ! কী দেখে বুঝলে?'

'লোকটা মুখে আপনাকে হুজুর-হুজুর করছিল, কিন্তু মাঝেমধ্যেই হাতে মুঠো পাকাচ্ছিল—যাকে বলে ঘুসি মারার হাত। মুঠো-করা হাতদুটো ও লুকোচ্ছিল পেছনদিকে কিংবা পকেটের মধ্য। আপনি ভাবছেন আপনার ধমক-ধামক খেয়ে লোকটা ভয়ে কাঁপছে, কিন্তু আদত ব্যাপারটা ছিল অন্যরকম। ভেতরে ভেতরে লোকটা হিংস্র হয়ে উঠছিল আপনার কথা শুনে।'

থমথমে মুখে বিস্ময় প্রকাশ করলেন ইন্সপেক্টর—'স্ট্রেঞ্জ!'

একটু পরে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'ও হ্যাঁ, আপনি বলছিলেন আপনি ওর কী-একটা মিথ্যে কথা পরে ধরতে পেরেছেন—কী সেটা?'

'জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কার গাড়ি চালাস? বলেছিল শ্যামবাবুর। শ্যামবাবু থাকে কোথায়? না, ফড়েপুকুরে। ঠিকানা কী? বলেছিল, এখন তো ওকে পাবেন না, দেশে গেছে। দেশ কোথায়? না, চুঁচ্‌ড়ো। কবে ফিরবে? দু-তিনদিনের মধ্যেই। বলেছিলাম, ফিরলেই আমাকে খবের দিবি। পরে দেখি সব ভোঁ-ভাঁ!'

'গাড়ির মালিক পালিয়েছে?'

'পালাবে কোন্ চুলোয়। আসলে গাড়ির মালিকের ওই নাম নয়, ফড়েপুকুরেও থাকে না। কলকাতাও ছাড়েনি। ব্যাটা ডাহা মিথ্যে বলেছিল আমাকে।'

'গাড়ির মালিকটা কে?'

'পাত্তা পেয়ে গিয়েছি অনেকটা। আজকালের মধ্যেই তাকে তুলব। ড্রাইভারকে কড়কালাম—হারামজাদা, মিথ্যে বলেছিলি কেন? হাতজোড় করে ব্যাটা বলল : স্যার আমি মালিককে দেখিইনি। এক দালাল আমাকে ডেরাইভারির চাকরিটা পাইয়ে দিয়েছে। তার কাছেই শুনেছি মালিকের ওই নাম, বাড়ির ঠিকানা।'

'আপনার কী মনে হয়, কথাটার মধ্যে কি কিছু সত্যি আছে?'

'না, একেবারেই নয়। লোকটার আরও কয়েকটা মিথ্যে আমি ধরে ফেলেছি, সেগুলো অবিশ্যি তত সিরিয়াস নয়। তবে আসল কথাগুলো সত্যি।'

'সেদিন তো ড্রাইভারের মুখ থেকে খুনির চেহারার বর্ণনা শুনে আর্টিস্টকে দিয়ে একটা ছবি আঁকিয়েছিলেন। তা, সেই ছবিটা কি আপনার অপরাধী ধরার ব্যাপারে কোনও কাজে এসেছে?'

'আমার ঝঞ্ঝাটিয়া কপালের কথা তোমাকে বলেছিলাম না, এখানেও ঠিক তাই—।'

'কেন, কী হল আবার! ছবি হারিয়েছে?'

'আঁকানো হলে তো হারানোর প্রশ্ন, আঁকানোই হয়নি।'

'সে কি! সেদিন তো আপনি আগে থেকেই একজন পেন্টারকে ধরে পাশের ঘরে বসিয়ে রেখেছিলেন।'

'তা রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম চটপট ছবি আঁকিয়ে অপরাধীকে খুঁজে বার করার কাজে লেগে যাওয়া যাবে। কিন্তু ছবি আঁকানো গেল না।'

'কেন?'

'আর্টিস্ট বলল : আমার চোখ করকর করছে, বোধহয় কনজাংটিভাইটিস হয়েছে। চোখ জবাফুলের মতো লাল।'

'আর একজন আর্টিস্টকে নিয়ে এলেই তো পারতেন।'

'এনেছিলাম তো। বাইরের আর্টিস্ট, আমাদের লাইনের কাজটাজ আগে কখনও করেনি। তবে ছবি আঁকার খুব সুনাম আছে নাকি। দিলাম কাজ, আঁকলও ছবি দুদিন ধরে, তারপর—।'

'তারপর কী?'

পকেট থেকে আবার সেই মস্ত রুমালটা বার করলেন দুঁদে পুলিশ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়। তারপর চোখমুখ, কপাল, ঘাড় খুব ভাল করে মুছে নিয়ে বললেন, 'চোর-ডাকাত-খুনেদের নিয়ে আমার কারবার, সারা জীবনে এই দিয়ে বিস্তর ঝামেলার মধ্যে পড়েছি, কিন্তু এইরকম অদ্ভুত অবস্থার মুখোমুখি এর আগে আর কখনও হইনি।'

অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল কৌশিক, 'কেন, কী হয়েছিল?'

'নতুন আর্টিস্টকে জিজ্ঞেস করলাম, ছবি আঁকা হয়েছে? বলল, হ্যাঁ। নিখুঁত ভাবে ছবি আঁকার জন্যে দু-রাত্তির উনি নাকি ঘুমোতে পারেননি। শুনে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। আজকাল তো খেটেখুটে কাজ করার চল্ তেমন নেই। কেউ যদি করে তো খুব ভাল। বললাম, দেখান আপনার ছবি। ও মা! ছবি দেখে তো আমার ভিরমি খাওয়ার জোগাড়।'

'কেন, ড্রাইভার খুনির যে বর্ণনা দিয়েছে তার সঙ্গে কি ছবি তেমন মেলেনি?'

'কী বলছ, তেমন মেলেনি! ওই ছবি দেখলে তোমার মাথা খারাপ হয়ে যেত।'

'কীরকম?'

'ছবির চোখটোখ হাওয়া, মুখের জায়গায় একটা ফুল, মাথার ওপর যেন বটের ঝুরি নেমেছে। আমি ঢোক গিলে জিজ্ঞেস করেছিলাম—এটা কী? আমার কথার উত্তরে ওই

ছোকরা আর্টিস্ট বিচ্ছিরি ভাবে বলে উঠেছিল : এটা কী বুঝতে পারছেন না! এটাই তো ওই লোকটার ছবি। আমি ড্রাইভারের মুখ থেকে খুনির চেহারার বর্ণনা শুনেছি। এরপর ওর পোর্ট্রেট নিয়ে বিস্তর চিন্তাভাবনা করে ছবি এঁকেছি। আপনি ছবিটা কী ভাবে দেখছেন জানি না, তবে আমি আমার কাজে সন্তুষ্ট।'

'শুনে আপনি কী বললেন?'

'আমার ইচ্ছে করছিল আর্টিস্টের গালে টেনে এক থাপ্পড় কষাই। তারপর ঘাড় ধাক্কা দিয়ে লক-আপে পুরে দিই।'

'তা, দিয়েছিলেন নাকি?'

'পাগল! এইসব করলে তো তোমরাই আমাকে গালাগালি দিতে সবার আগে। কাগজওয়ালারা বলত—শিল্পীর স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ। শিল্পীর হেনস্থা। আমি অনেক কষ্টে রাগ হজম করে বলেছিলাম : এই ছবি দেখে খুনি ধরব কী করে? আপনি পারবেন? ছোকরা অমনি টেঁটিয়ার মতো উত্তর দিয়েছিল : চোর-ডাকাত-খুনি ধরা আর্টিস্টের কাজ নয়। উত্তর শুনে আমার ইচ্ছে করছিল ব্যাটাকে ধর্ষণের কেসে জড়িয়ে দিই। রাগ কমাবার জন্যে আমি উলটো দিক থেকে এক-দুই গুনতে শুরু করে দিয়েছিলাম। আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ছোকরা লম্বা একটা লেকচার ঝাড়ল। বলল : পিকাসোর নাম শুনেছেন? পিকাসো একবার ওর এক বান্ধবীর ছবি এঁকেছিলেন। মুখের জায়গায় ছিল শুধু লতা-পাতা-ফুল। গগ্যাঁ একবার একটা ঘোড়ার ছবি এঁকেছিলেন। সাধারণ ঘোড়ার সঙ্গে তার তেমন মিল নেই, আর ঘোড়ার রঙ ছিল সবুজ। এগুলো ছবি হিসেবে অস্বীকার করার ক্ষমতা আছে কারও? তারপর হুড়হুড় করে কত যে ফরাসি আর্টিস্টের নাম বলে গেল—কী বলব! একটা নামও আগে শুনিনি আমি। সত্যি কথা বলতে কি, ওইসব নাম শুনতে শুনতে আমার মধ্যে কেমন যেন একটা হীনম্মন্যতা বোধ তৈরি হয়েছিল। আমি তখন ছবি আঁকার পারিশ্রমি বাবদ পাঁচশোটা টাকা ওই ছোকরার হাতে গুঁজে দিয়ে কোনওমতে উদ্ধার পাই।'

সমব্যথীর গলায় কৌশিক বলল, 'যাক যা হবার হয়েছে। তা, আপনি ওই অপরাধীর ছবি আঁকাবার কী ব্যবস্থা নিলেন এখন?'

'আমাদের পুরনো আর্টিস্টের চোখ ভাল হয়ে এসেছে প্রায়। ওই এঁকে দেবে এবার। মাঝখান থেকে কয়েকটা দিন নষ্ট হয়ে গেল—এই যা।'

'তা, আপনি কী আর করবেন? এসব কাজ তো তাড়াতাড়ি সারা যায় না সবসময়।'

অবনী ঘোষরায়ের মুখ হঠাৎই বেশ করুণ হয়ে উঠল। উনি বললেন, 'এ যাত্রা তুমি আমাকে একটু বাঁচিয়ে দাও কৌশিক। ওপর থেকে এত চাপ আসছে না, কী বলব। ওটা না থাকলে তদন্ত চালাতে আমার কোনও অসুবিধে হত না। এখনও বলছি, কেসটা তত গোলমেলে নয়। আমাদের আর্টিস্টের চোখে কনজাংটিভাইটিস না হলে এর মধ্যেই আমি অনেকটা এগিয়ে যেতে পারতাম।'

'তা ঠিক। কিন্তু কী করবেন বলুন,-অসুখবিসুখের ওপর তো কারও হাত নেই। আপনার আর্টিস্টের চোখ তো ভাল হয়ে এসেছে, সাসপেক্টের ছবি আঁকতে সময় নেবে কেমন?'

'ও তো ছবি বেশ তাড়াতাড়ি আঁকে। মনে হয়, কাল-পরশুর মধ্যে পেয়ে যাব। পেয়ে গেলে কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে খুব একটা অসুবিধে হবে না। তবে চাপের মুখে কাজ তো, যদি কোথাও ঠেকে যাই—। তুমি এখন কলকাতায় আছ তো?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ আছি।'

'যদি কোনও দরকার পড়ে—।'

'ফোন করবেন, আমি সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়ে যাব।'

একটু যেন আশ্বস্ত দেখাল ইন্সপেক্টর ঘোষরায়কে। বললেন, 'ঠিক আছে, আজ তাহলে চলি।'

ইন্সপেক্টর চলে যাওয়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে আলোক মৈত্রের ফোন এল। ওঁর গলার স্বর শুনে কৌশিক বুঝতে পারল, উনি কিছুটা বিরক্ত। 'মিলন মাইতির খুনের কোনও কিনারা করতে পারলেন?'

এত সরাসরি এই ধরনের প্রশ্ন করলে যে কেউ বিব্রত বোধ করবে। একটু থমকে গিয়ে জবাব দিল কৌশিক, 'না মানে—।'

এবার বুঝি চটেই গেলেন অলোক মৈত্র। 'আপনি বলছেন, না, মানে—. পুলিশও বলছে, না, মানে—। টেলিফোনে এই যে হুমকিগুলো আমি শুনছি, সেগুলো তাহলে তো আপনাদের আর শোনাবার কোনও দরকার নেই।'

'কী হুমকি শুনছেন?'

'আপনার শুনে লাভ?' সশব্দে টেলিফোনটা নামিয়ে রেখেছিলেন অলোক মৈত্র।

ষোলো

দোকানের নাম লাহোর রেস্টুরেন্ট। কাউন্টারে এক রোগা চেহারার প্রৌঢ় শিখ বসে আছেন। মাথায় বড় একটা পাগড়ি। মুখে একরাশ কাঁচাপাকা দাড়ি। কাগজ-কলম বাগিয়ে ধরে মন দিয়ে কিসের যেন হিসেব কষছেন। দোকানের মাথায় ঝোলানো বিবর্ণ বোর্ড এবং কাউন্টারে বসা এই মানুষটি ছাড়া দোকানের আর কোথাও লাহোরের চিহ্নমাত্র নেই।

খানচারেক বেঢপ লম্বা টেবিল, টেবিলের দুপাশে বিচ্ছিরি চেহারার কাঠের বেঞ্চি। এই হল রেস্টুরেন্টর আসবাবপত্র। প্রতিটি টেবিলের মধ্যিখানে অ্যালুমিনিয়ামের জাগে জল, প্লাস্টিকের বাটিতে মোটা দানার ডেলাপাকানো নুন। দোকানের ছেঁড়াফাটা পোশাক-পরা তিন বেয়ারার মুলুক হয় গয়া নয় ছাপরা। কিংবা বিহারের অন্য কোনও জেলা। এক ছোকরা ঘুরে ঘুরে টেবিলের ফাঁকা গ্লাসে জল ভরছে। এর দেশ মেদিনীপুর। ছোকরার দাদা কাজ করে এখানকারই রান্নাঘরে। রান্নাঘরেব দ্বিতীয় রাঁধুনির দেশ এলাহাবাদ। কিন্তু এ-দোকানে

যারা খায় তারা লাহোরের রান্নার সুখ্যাতি করে প্রাণভরে। এখানে সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয় তড়কা আর রুটি। সঙ্গে প্লেটে করে দেওয়া হয় চারফালি-করা একটা পেঁয়াজ আর কাঁচা লঙ্কা।

এখন বেলা দেড়টা। দোকানে দুজন খাচ্ছে চাবল ঔর সব্জি, বাকি তিনজন তড়কা আর রুটি।

বাইরে চড়া রোদের দুপুর। চওড়া রাস্তা দিয়ে সব রকমের যানবাহন যাচ্ছে। তবে এখন ভরদুপুর বলেই বোধহয় সংখ্যাটা বেশি নয়। দেয়ালে পিঠ দিয়ে বসে এক যুবক রাস্তার দিকে তাকাতে তাকাতে তড়কা-রুটি খাচ্ছিল। ম্লান চেহারার এই মানুষটার দিকে চাইলেই এর পেশা কী আন্দাজ করা যায়। ঢোলা হাওয়াই শার্টের দু-পকেটে কম করে কুড়িটা পেন। পেনের কালির দাগ হাওয়াই শার্টের বেশ কয়েক জায়গায়। হাতেও কালি, নাকের নীচেও সরু একটা কালির পোচ। বোঝাই যায়, পেনের কাজ করতে করতে অসাবধানে নাক চুলকে নিয়েছে।

রাস্তার ওধারে একটা টেম্পোতে মাল উঠছে। সাবধানে ওঠাবার বহর দেখে যে কারও মনে হবে ভেতরে কাঁচের জিনিস আছে। টেম্পোওয়ালা স্টিয়ারিংয়ে মাথা রেখে ঝিমোচ্ছিল।

মাল আসছিল একটা দোকানের পাশের গলি থেকে। গলিটা একটুখানি যাওয়ার পরেই একটা দরজায় ধাক্কা খেয়েছে। বড় দরজা। টেম্পোয় মাল তুলছিল দুজন লোক। মাল তোলা হয়ে গেলে দুজনের একজন দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। তারপর টেম্পোওয়ালার ঘুম ভাঙিয়ে লোকদুটো সামনের সিটে বসে পড়ল। টেম্পোওয়ালার পরনে খাকি জামা, জামার হাতা দিয়ে চোখমুখ মুছে নিয়ে টেম্পো ছোটাল সামনের দিকে।

টেম্পো ছুটতেই লাহোর রেস্টুরেন্টের পেনওয়ালা ছোকরা রুটি-তড়কা খাওয়া বন্ধ করে বিল মেটাল খাবারের, তারপর নেমে পড়ল রাস্তায়। পথে লোকজনের সংখ্যা বেশি না হলেও কম নয়। রাস্তায় সাধারণ মানুষের ভিড়ে পেনওয়ালা মিশে গিয়েছিল দিব্যি। মিশে গিয়েই ছোকরা উলটো ফুটপাথে পায়চারি করল দু-চারবার, তারপর ওই গলিটায় ঢুকে পড়ল সাট্ করে। গলি-আটকানো দরজায় মস্ত একটা তালা ঝুলছিল, ছোকরা সেই তালা নিমেষে খুলে ফেলে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

ঘন্টাখানেক বাদে পেনওয়ালা ফের বেরিয়ে এল দরজা খুলে, তারপর মিশে গেল রাস্তার ভিড়ে।

রাস্তার লোকের সংখ্যা এখন আগের তুলনায় বেড়েছে। রোদ্দুরের সেই বিচ্ছিরি তেজটা আর নেই। একটু বাদেই বিকেল শুরু হয়ে যাবে। তারপরেই ফিরতি বাসে বাদুড়ঝোলা হয়ে ফিরবে অফিসের মানুষজন। পেনওয়ালা ছোকরা ভিড়ের মধ্যে কিছুক্ষণ হাঁটার পরে একটা চলতি মিনিবাসে টুক করে লাফিয়ে উঠে পড়েছিল।

আধঘন্টা বাদে ছোকরা মিনিবাস থেকে নামল, তারপর যে বাড়িটায় গিয়ে ঢুকল সেখানে প্রাইভেট ইনভেস্টিগেটর কৌশিক মিত্র থাকে।

আরও ঘন্টাখানেক যাওয়ার পরে গোয়েন্দার ঘরে টেলিফোন বাজল। ফোন তুলল গোয়েন্দা। টেলিফোনে ভাঙা-ভাঙা কণ্ঠস্বর—'কৌশিকবাবু আছেন?'

'বলছি।'

'নমস্কার, আমি গোম্‌স বলছি স্যার।'

'নমস্কার। কোত্থেকে বলছেন?'

'পাবলিক বুথ্ থেকে।'

'খবর সব ভাল।'

'হ্যাঁ স্যার। আপনি যেমন বলেছিলেন তেমনই করেছি। টেম্পোওয়ালা সেজে দাঁড়িয়েছিলাম। ওরা আমাকেই ভাড়া করল। মাল পৌঁছে দিলাম এক বাড়িতে। সেখান থেকে আবার কিছু মাল চাপাল। সেগুলো পৌঁছে দিলাম আর এক জায়গায়।'

'বাড়িদুটোর ঠিকানা নিয়েছেন?'

'হ্যাঁ স্যার, নোট-বইতে লিখে নিয়েছি।'

'বিশেষ কিছু দেখলেন বা শুনলেন?'

'দেখা করে বলব স্যার।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিক। টেলিফোনে এসব না বলাই ভাল। আমি সকাল নটা পর্যন্ত সাধারণত বাড়িতেই থাকি। চলে আসবেন। সম্ভব হলে আসার আগে একটা ফোন করবেন।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'টেম্পো নিয়ে কতক্ষণ দাঁড়াবার পরে ওই পার্টি আপনার কাছে এসেছিল ভাড়ার জন্যে?'

'বেশক্ষিণ না স্যার, আপনি আসার আগে ঘন্টাখানেক দাঁড়িয়েছিলাম।'

কথাটা শুনে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল কৌশিক। 'আমি! আমি আবার কখন গেলাম ওখানে?'

ভাঙা গলার খুকখুকে হাসি উঠল এবার টেলিফোনে। 'আপনার পেনওয়ালার মেক-আপ খুব ভাল হয়েছিল স্যার। আগে চিনতে পারিনি, কিন্তু আপনি লাহোর রেস্টুরেণ্টে ঢোকার সময় চিনে ফেলেছিলাম।'

তারিফ করার গলায় গোয়েন্দা বলল, 'বাহ্! আপনার নজর তো দারুণ গোমস্‌সাহেব। আমি দেখছিলাম আপনি সারাক্ষণই স্টিয়ারিংয়ে মাথা রেখে ঝিমোচ্ছেন।'

টেলিফোনের ওদিকে যে ঝানু গুপ্তচরটি আছেন তিনি প্রশংসায় বিচলিত হওয়ার পাত্তর নন, বাহবা পাওয়ার উত্তরে অতি মাত্রায় ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'ঠিক আছে স্যার, আমি তাহলে বাকি খোঁজখবরগুলো নিয়ে আপনার সঙ্গে সময়মত দেখা করব। এখন তাহলে ছাড়ি স্যার।'

টেলিফোন নামিয়ে রাখল গোয়েন্দা। ওর অহংবোধে বড় রকমের একটা খোঁচা লাগিয়ে

দিয়েছে এই গুপ্তচরটি। কৌশিক মুখে না বললেও মনে মনে জানত, জবরদস্ত মেক-আপ নিতে পারে ও। শুধু চেহারা পালটানো নয়, চেহারা পালটাবার সঙ্গে সঙ্গে ও হাঁটার ভঙ্গি, গলার স্বর ও মুখের ভাষাও পালটে ফেলে আনেকখানি। কিন্তু গোম্‌স অত দূর থেকেও ওকে চিনে ফেলেছে!

একটু মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল গোয়েন্দার, কিন্তু পরে ও এই ভাবে নিজেকে সামাল দিল—। দোষ ওর মেক-আপের নয়—কিন্ত গোম্‌সের চোখ যাকে বলে এক্স-রে আই, ভেতরের চেহারাটাও দেখে ফেলে ঠিক।

ঘড়ির দিকে তাকাল কৌশিক, আর পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাদে ওকে অলোক মৈত্রের কাছে পৌঁছতে হবে। মানুষটা ওর ওপর একটু চটেই আছে। অবশ্য চটে-থাকা লোকদের গোয়েন্দারা পছন্দ করে বেশি করে। কারণ রাগ হলেই বেফাঁস কথা, আর বেফাঁস কথা হলেই রহস্য সমাধানের কিছু বাড়তি সূত্র।

মিনিট-চল্লিশ বাদে কৌশিক যখন অলোক মৈত্রের বাড়িতে হাজির হল তখনও ভদ্রলোক চটেই ছিলেন। পরনে ধপধপে সাদা হাওয়াই শার্ট ও ট্রাউজার্স। কৌশিককে দেখার পরেই উনি হাতঘড়ির দিকে তাকালেন, তারপর গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনাকে আসতে বলেছি বলেই বসে আছি, কিন্তু বেশিক্ষণ বসতে পারব না। আমার একটা জরুরি ফোন এসেছে, বেরুতে হবে একটু বাদেই। দাঁড়িয়ে কেন, বসুন।'

কৌশিক বসার পরেই আবার মুখ খুললেন মৈত্র। 'আমরা অনেক সময় পুলিশের কাজে সন্তুষ্ট হতে পারি না বলে আপনাদের কাছে ছুটি, কিন্তু শখের গোয়েন্দার কাজ যদি শুধুই শখ করে গোয়েন্দাগিরি করা হয়—তাহলে আমাদের ছোটাছুটি তো নেহাতই পণ্ডশ্রম হয়ে দাঁড়ায়। ভরসন্ধেয় জলজ্যান্ত মানুষটাকে গুলি করে মারা হল, অথচ অ্যাদ্দিনেও আপনারা খুনির বিন্দুমাত্র হদিস করতে পারলেন না!'

'আমি তো চেষ্টা করে যাচ্ছি।'

'চেষ্টা সবাই করে, কিন্তু কাজের কাজটা কী হল?'

'শেষ পর্যন্ত কী হবে সেটা জানতে হলে তো শেষ পর্যন্ত যাওয়া দরকার।'

'শেষ পর্যন্ত যাওয়ার আগে কেউ-কেউ শেষও হয়ে যেতে পারে। আমার ভাইয়ের লণ্ডন ব্যাকগ্রাউণ্ড সম্পর্কে আপনাকে খোঁজখবর নিতে বলেছিলাম, সেই খোঁজ পাওয়ার জন্যে আর কদ্দিন আমাকে অপেক্ষা করতে হবে?'

'খবর তো বেশ কয়েকদিন আগেই পেয়ে গিয়েছি।'

নড়েচড়ে বসলেন অলোক মৈত্র। 'কী খবর?'

'তেমন আপত্তিকর কিছু পাইনি। মানে ভদ্রলোক কনভিকটেড হননি কখনও।'

'জেলে যাওয়ার অবস্থাও হয়েছিল তাহলে! বেশ এবার শুনি ওর বিরুদ্ধে আনা অভিযোগগুলো কী-কী!'

'বারতিনেক ক্রিমিনাল অফেন্সে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন ডক্টর জ্যোতি মৈত্র, কিন্তু অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ায় তিনবারই বেকসুর ছাড়া পেয়ে গেছেন।'

কথাটা শুনে ঠাট্টার গলায় হেসে উঠলেন অলোকবাবু। 'বাহ্! আমার ভাইটি দেখছি সত্যি-সত্যি সাধুপরুষ! তিনবারই লণ্ডন পুলিশকে কলা দেখিয়ে বেরিয়ে এল। বেশ, বিলেতের মাটিতে ওর বাকি পরিচয়টুকু শুনি এবার।'

'এমিলি নামে এক ইংরেজ মহিলার সঙ্গে ডক্টর মৈত্রের বিয়ে হয়েছিল, কিন্তু বিয়েটা পাঁচ বছরের বেশি টেঁকেনি। ডির্ভোসি হয়ে যায়।'

'চমৎকার! কেন ডিভোর্স হল?'

'ওই মহিলা ডক্টর মৈত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন—উনি অ্যাল্‌কোহ্‌লিক ও একাধিক মেয়ের সঙ্গে ওঁর অবৈধ সম্পর্ক আছে।'

শুনে রীতিমত উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন অলোক মৈত্র। 'থাক-থাক, আর বলার দরকার নেই, এ তো দেখছি নানা গুণের অবতার। আপনি কি এগুলো সমর্থন করেন?'

'আমার সমর্থন-অসমর্থনের কোনও প্রশ্নই উঠছে না।'

'আলবত উঠছে। আপনি একটু আগেই বললেন না, জ্যোতির বিরুদ্ধে তেমন আপত্তিকর কিছু পাওয়া যায়নি।'

'হ্যাঁ। সেটা তো ঠিকই। তিন-তিনবার ওঁকে ধরা হয়েছে, কিন্তু একবারও দোষী প্রমাণ করা যায়নি। আর ডিভোর্সের মামলা বলছেন—সে ভাবে উনি হয়তো কনটেস্টও করেননি। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কই যদি নষ্ট হয়ে যায়—কোনও-কোনও স্বামী বা স্ত্রী একটু বেশি মাত্রায় নিরাসক্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া ইংল্যাণ্ডে ইংরেজ মহিলার প্রতি বিচারকরা একটু পক্ষপাতও দেখাতে পারেন, বিশেষ করে সাদা চামড়ার মহিলা যদি তার কালো স্বামীর বিরুদ্ধে ডিভোর্সের মামলা নিয়ে আসে।'

'এর মধ্যে আপনি আবার সাদা চামড়া, কালো চামড়া টেনে আনছেন কেন?'

'বেশ, আনব না। কিন্তু বনিবনা না হলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ডিভোর্স হবে—এর মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নেই তো।'

'আছে। ওদের ওদেশে কথায়-কথায় ডিভোর্স। কিন্তু আমাদের দেশে ক'টা হয় বলুন তো?'

একটু অস্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠেছিল কৌশিকের মধ্যে। 'আপনার সঙ্গে এ নিয়ে তর্ক করতে চাই না, কিন্তু দিন তো পালটে গেছে। বিবাহিত জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মিলমিশ নেই। উঠতে-বসতে অশান্তি। অথচ লোকলজ্জায় ডিভোর্স নেওয়া যাবে না, এর কোনও মানে হয়?'

'মিলমিশের ইচ্ছে থাকলে খুব হয়। সুখে-শান্তিতে থাকতে গেলে কিছুটা তো ছাড়তে হয়। অল্পবিস্তর আত্মত্যাগ করাও দরকার।'

'তাতেও হয় না সব সময়। তাই যদি হত আমাদের দেশে বিবাহিত মেয়েদের মধ্যে এত আত্মহত্যার ঘটনা ঘটত না।'

'আত্মহত্যা দুর্বলরা করে।'

'ঠিক। আর, সবলরা ডিভোর্সের চেষ্টা করে।'

'আপনার কথা মানতে পারলাম না।'

একটু ইতস্তত করে কৌশিক বলল, 'আপনাকে একটা কথা বলি। একটু হয়তো ব্যক্তিগত হয়ে যাবে, তবু বলছি। এটা অবশ্য কথার কথা। আপনার ভাগ্নি নিশাকে আপনি প্রাণ দিয়ে ভালবাসেন। ও যদি ওর স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে চলতে না পারে। সব দোষ ধরুন ওর স্বামীরই। নিরুপায় হয়ে ও যদি ডির্ভোস চায়, আপনি কি সমর্থন করবেন না?'

একটু তীব্র চোখে তাকিয়ে উত্তর দিলেন অলোক মৈত্র—'না।'

'কী বলবেন আপনি? মানিয়ে চলার চেষ্টা করতে । আরও বেশি আত্মত্যাগ করতে—এই তো?'

'ধরুন তাই।'

'ও আপনার কথা শুনে খুব সিনসিয়ারলি চেষ্টা করল, কিন্তু পারল না। নিরুপায় হয়ে আত্মহত্যার কথা ভাবতে শুরু করে দিয়েছে। এমন সময় হয়তো ওর জীবনে আর একটি ছেলে এসে হাজির হল, যে ওকে সত্যিই ভালবাসে। সে বলল, চলো আমরা দুজনে আর একবার বাঁচার চেষ্টা করি। তখন যদি ও ডিভোর্স করে ওই ছেলেটিকে বিয়ে করতে চায়, আপনি রাজি হবেন না?'

'না।'

'কেন?'

'এমনও হতে পারে, ওই ছেলেটির সঙ্গে ওর হঠাৎ একটা সম্পর্ক তৈরি হয়ে গেছে। যাকে বলে অ্যাডভেঞ্চার। কিংবা ওই ছেলেটির মাথায় হয়তো অন্য মতলব ঘুরছে। মিষ্টি-মিষ্টি কথা শুনিয়ে মাথাটা বিগড়ে দিয়েছে একদম।'

'এটা তো আপনার অনুমান।'

'সব মানুষই নিজের অনুমানকে মূল্য দেয়।'

'আপনার ভাগ্নি প্রাপ্তবয়স্ক। ডিভোর্স নিয়ে ওই ছেলেটির সঙ্গে যদি সংসার পাততে চায়, আপনি কী করবেন?'

'কী আর করব, সম্পর্ক রাখব না। আমার সম্পত্তির এক কানাকড়িও দেব না ওকে।'

'এটা কি আপনার রাগ?'

'রাগ ভাবলে রাগ, সুবিবেচনা ভাবলে সুবিবেচনা।'

'আচ্ছা, আপনি কি বঙ্কিমের ভক্ত?'

অবাক হয়ে কৌশিকের দিকে তাকালেন অলোক মৈত্র। 'বঙ্কিম! কোন্ বঙ্কিমের কথা বলছেন?'

'লেখক বঙ্কিম, বঙ্কিমচন্দ্র।'

'কে বলল আমি ওঁর ভক্ত?'

'কেউ বলেনি, আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে।'

রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠেছিল অলোকবাবুর ঠোঁটে। 'বঙ্কিমচন্দ্রের ভক্ত কে নন? যাঁরা বাংলা ভাষায় মর্ডান ক্লাসিক পছন্দ করেন, তাঁরাই ওঁকে পছন্দ করবেন।'

'বঙ্কিম কি একটু বেশিমাত্রায় নীতিবাগীশ নন?'

'যারা বেশি মাত্রায় দুর্নীতিবাগীশ তারাই শুধু এই কথাটা বলে।'

'আচ্ছা, বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন— বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে। কথাটা কি আপনি মানেন?'

'মানি।'

'কেন?'

'এ ভাবে সবকিছুর চুলচেরা বিশ্লেষণ করা যায় না। সে ক্ষমতা নেইও আমার। তবে এটা জানি, সত্যিকারের একজন বড় লেখক জীবনের সারকথাগুলো ধরে ফেলে এই ভাবেই প্রকাশ করে থাকেন। ছেলেবেলার সঙ্গীসাথির ভাল লাগার সঙ্গে আসল প্রেমের হয়তো অনেক তফাত। যারা এই সামান্য মুগ্ধতাকে প্রেম-ভালবাসা বলে ধরে নেয় তারা পরে পস্তায়। আমি আমার জীবনেই এইরকম কয়েকটা ঘটনা দেখেছি। আমি সত্যিই বিশ্বাস করি— বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে।'

'এটা হয়তো এক ধরনের অবসেশান। তাছাড়া, সব মানুষেরই কিছু-কিছু প্রিয় ধারণা থাকে। লালাবাবুর গল্পটাও আপনার প্রিয় গল্প। তাই না?'

'হ্যাঁ, প্রিয় তো বটেই। বিরাট ধনী একটা মানুষ একদিন হঠাৎই সবকিছু ছেড়েছুড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন—এটা কি কম কথা!'

'ঠিক। এমন ত্যাগ ক'জন করতে পারেন! আপনি তো কয়েক বছর ধরেই বিষয়-ব্যবসা ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন, কিন্তু পারছেন কোথায়!'

কথাটা শুনে একটু অসন্তুষ্ট হলেন অলোকবাবু। 'আপনি বসুন। আমি উঠছি। চা-টা খেয়ে যাবেন। গল্পে গল্পে একটু বেশি সময়ই কেটে গেল। পরে দেখা হবে, অবশ্য সত্যিকারের যদি কোনও কাজ থাকে।'

'আর একটা কথা—।'

অলোকবাবু উঠতে গিয়েও উঠলেন না। 'বলুন।'

'আপনি বলছিলেন, টেলিফোনে আপনাকে কিছু হুমকি দেওয়া হচ্ছে। কী সেগুলো?'

'গুরুত্ব দেওয়ার মতো নয়।'

'তবু শুনি।'

'আমার বিষয়-আশয়, সম্পত্তির আইনসম্মত উত্তরাধিকার আমার ভাই জ্যোতি, দলিল বা গিফ্‌ট তৈরির সময় এটা যেন আমি মনে রাখি—নাহলে বিপদে পড়তে হবে। একদিন এইরকম একটা ফোন এসেছিল।'

কৌশিকের কপালে কয়েকটা ভাঁজ ফুটে উঠল। 'আর কোনও হুমকি?'

'আমাদের অফিসের ম্যানেজার সুনন্দ তরফদারকে আমি যা ভাবছি সে তা নয়। অত্যন্ত বিপজ্জনক লোক। তার সম্পর্কে আমি যেন সাবধান থাকি। এটা আর একদিনের ফোন।'

'আর?'

'আমার ভাগ্‌নি নিশার সম্পর্কেও যা-তা কথা বলে ফোন আসছে। সে নাকি যার-তার সঙ্গে ফ্লার্ট করে বেড়ায়।'

'আর ভাগ্‌নিজামাই কিশোর চৌধুরীর সম্পর্কে কোনও ফোন আসেনি?'

'এসেছে। তার মতো বাউণ্ডুলে লোক নাকি গোটা কলকাতায় আর একটাও নেই। পুরনো কলকাতার ভাঙাচোরা জিনিস সাজিয়ে রাখার জন্যে ও নাকি ওর সবকিছু বেচে-টেচে দিচ্ছে।'

'কাশীতে আপনার যে বোন থাকেন তাঁর সম্পর্কে কোনও উড়ো ফোন আসছে না?'

কৌশিকের এই প্রশ্নে বেশ অবাকই হলেন অলোক মৈত্র। তারপরে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে খসখসে গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে?'

একটু হাসার চেষ্টা করে জবাব দিল কৌশিক, 'মানে তো খুব পরিষ্কার। আপনি যাঁদের মধ্যে আপনার বিষয়সম্পত্তি ভাগবাটোয়ারা করে দিতে চান তাঁদের কেউ বা কেউ-কেউ অন্য দাবিদার সম্পর্কে আপনার মন বিষিয়ে দিতে চাইছেন। আমি কি ভুল বলেছি?'

'হয়তো না।'

'আপনি কাউকে সন্দেহ করেন?'

'করি।'

'কে সে?'

'আপনি যাদের কথা শুনলেন তাদের মধ্যে সে নেই।'

'তবে তার কী লাভ?'

'তার হয়তো অন্য ক্যালকুলেশন আছে।'

'কী সেটা?'

'যাদের দেওয়ার কথা ভাবছি তাদের ওপর যদি আমার মন বিষিয়ে যায়, আমি অন্য কারও-কারও কথা ভাবতে পারি।'

'যাঁকে সন্দেহ করছেন, কে সে?'

'আর একটু শ্যিওর হয়ে নিই, তারপর বলব।'

'আর একটা কথা, আপনার ছোটভাই যে এখন কলকাতায় আছেন এ-কথা কি আপনি আপনার ভাগ্নি বা ভাগ্নিজামাইকে জানিয়েছেন?'

'না, ইচ্ছে করেই জানাইনি। আমার ভাই কী মতলবে এতকাল বাদে দেশে ফিরেছে সেটা পরিষ্কার ভাবে না জানার আগে জানাব না।'

'কিন্তু আপনার ভাই তো অন্য একটা সূত্রে আপনার ভাগ্নিজামাইয়ের সঙ্গে আলাপ করে নিয়েছে।'

'হ্যাঁ, সেটা নিয়ে তো একটু উদ্বেগের মধ্যে আছি আমি। তবে মনে হয় না এই পরিচয়টা ফাঁস হয়েছে, হলে আমার ভাগ্নির কাছ থেকেই জানতে পারতাম।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে কৌশিক বলল, 'জল যখন ঘোলা হয়েছে কিছুটা, আপনার ফাইনাল গিফ্‌ট ডিড বা উইল তৈরির কাজটা একটু পিছিয়ে দিলে হয় না?'

'না, এই ব্যাপারটা যত তাড়াতাড়ি পারি শেষ করতে চাই। বয়েস তো হয়েছে।'

'কী এমন বয়েস! তাছাড়া আপনার শরীরস্বাস্থ্যও চমৎকার।'

'মৃত্যু সবসময় স্বাভাবিক হয় না, অপঘাতেও তো মরতে পারি।'

শুকনো একটা হাসি ঠোঁটের কোণায় ঝুলিয়ে কথাটা বলার পরেই উঠে দাঁড়ালেন অলোক মৈত্র। তারপর বললেন, 'আমি চলি, আমার একটু দেরিই হয়ে গেল। আপনি কিন্তু চা খেয়ে যাবেন।'

মৈত্রসাহেব চলে যাওয়ার পরে টেবিলে খাবারের পাহাড় সাজিয়ে যে মানুষটি খুব খাতির করে কৌশিককে খাওয়াতে শুরু করে দিয়েছিল তার নাম কালিন্দীচরণ। মোটাসোটা মানুষটির পরনে ধুতি, গায়ে ফতুয়া। এ-বাড়ির দুর্ধর্ষ সব রান্নার আর অতিথিকে যত্ন করে খাওয়ানোর পুরো দায়িত্ব ও একাই ভালবেসে কাঁধে তুলে নিয়েছে।

জোর জবরদস্তি করে একের পর এক আইটেম খাওয়াতে খাওয়াতে অনর্গল গল্প জুড়ে দেয় কালিন্দীচরণ। ক'টা দিনই বা পরিচয়, কিন্তু এর মধ্যেই সে কৌশিককে এত পছন্দ করে ফেলেছে যে, গল্পের কোনও বাছবিচার রাখে না। আজকের গল্পের বিষয় নিশাদিদিমণি। এই দিদিমণিটিকে কালিন্দীচরণ প্রাণ দিয়ে ভালবাসে। ওর গল্পের ভেতর থেকে গোয়েন্দা বেশ কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে নিচ্ছিল।

সতেরো

আর্কিটেক্টের নাম অরুণ মজুমদার। বয়েস চল্লিশের আশেপাশে—কিন্তু এই বয়েসেই স্থপতি হিসেবে খুব নামডাক হয়ে গেছে ওঁর। বেশ বড়-বড় কয়েকটা কাজ করেছেন। লেকটাউনে বড় রাস্তার ওপর নিজের তৈরি দোতলা বাহারি বাড়ি। একতলায় অফিসঘর। সন্ধের মুখে কৌশিক যখন ওই অফিসঘরে এসে ঢুকল তখন আর্কিটেক্টের সামনে পাঁচ-ছ'জনের একটা দল বসে ছিল। এরা একটা কোঅপারেটিভ বডি তৈরি করে বাড়ি বানাতে

চায়। কথাবার্তা তাই নিয়েই চলছিল। কৌশিক নিঃশব্দে পেছন দিকের একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

ঝকঝকে, তকতকে বড়সড় অফিসঘর। দেয়ালে ফ্রেমে-বাঁধানো সাত-আটটা বড়-বড় বাড়ির ছবি। ছবির মতো বাড়ি। এক-একটা বাড়ির এক-এক ধরনের ডিজাইন। সব বাড়িই এই স্থপতির বানানো। কৌশিক বসে বসে দেয়ালের ছবিগুলো বেশ খুঁটিয়ে দেখছিল।

পেশা বা জীবিকার ছায়া পড়ে বেশ কিছু ঘরের দেয়ালে। চোখের ছবি, চশমার ছবি, গোলগাল বাচ্চার ছবি মুহূর্তের মধ্যে জানিয়ে দেয় ঘরের মালিক কী কাজ করেন। পেশার বাইরে গৃহকর্তার রুচি বা পছন্দের একটা ছাপও ধরা থাকে ঘরের দেয়ালে। তবে শৌখিন বড়লোকের বেলায় কথাটা খাটে না প্রায়ই। কারণ, অনেক সময় তাঁদের ঘর সাজাবার দায়িত্ব নিয়ে নেন ইন্টিরিয়র ডেকরেটররা।

প্রস্তাবিত বাড়ির ফ্লোর-স্পেসের অঙ্কটা আর একবার বুঝে নিয়ে ঘর ছাড়ল কোঅপারেটিভ হাউজিং সোসায়েটির দলটা। তারপরেই অরুণ মজুমদার কৌশিকের দিকে ঝলমলে মুখে তাকিয়ে চোখ নাচিয়ে বললেন, 'তারপর কী খবর তোমার স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড? দূরে কেন, কাছে এসে বোসো।'

সুদর্শন এবং মধুর ব্যক্তিত্বের এই গোয়েন্দাটিকে অনেকেই বেশ পছন্দ করেন। সামনের চেয়ারটায় বসতে বসতে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'অরুণদা আমার ওটা কী হল? জোগাড় করতে পেরেছেন?'

রহস্যময় ভঙ্গিতে স্থপতি বললেন, 'গোয়েন্দার কাজ বলে কথা। দিচ্ছি দেব বলে ফেলে রাখার উপায় নেই। এর মধ্যে একটা-দুটো মার্ডার হয়ে গেলে পরে তুমিই হয়তো একদিন বলবে—আপনি ওটা দিতে দেরি করেছেন বলেই অঘটন ঘটে গেল। অদ্দিনের পুরনো প্ল্যান—এত অল্প সময়ের মধ্যে আর্কাইভ থেকে বার করিয়ে কপি করানো কি চাট্টিখানি কথা! তোমার, আমার দুজনেরই কপাল ভাল—ইউনিয়নের পাণ্ডা মুকুন্দবাবুকে পেয়ে গিয়েছিলাম। ওঁকে না পেলে এই অসাধ্যসাধন আর কাউকে দিয়ে হত না।'

কিং-সাইজ একটা ফিলটার-টিপ্ড ধরিয়ে একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে অরুণ মজুমদার বললেন, 'সে আমলের আর্কিটেক্টের কাজের ধরনটাই ছিল আলাদা। তুমি যে বাড়িটার প্ল্যান বার করতে বলেছিলে সেটা সত্যিই দেখার মতো। আজ থেকে দেড়শো বছর আগের কাজ, সেই আমলে এমন নিখুঁত নক্‌শা—সত্যি ভাবা যায় না! বাড়ির আর্কিটেক্ট ছিলেন ব্ল্যানফোর্ড, শুনেছি এই ইংরেজটির সে আমলে খুব চাহিদা ছিল, অথচ উনি খুব বেশি বাড়ি বানাননি। বিভিন্ন কাজে এঁকে সাহায্য করেছিলেন একজন বাঙালি আর্কিটেক্ট। নাম হরিজীবন মিত্র—মিত্র না লিখে অবশ্য মিটার লিখতেন। আরও একটা খবর শুনলাম—কদ্দুর সত্যি জানি না, সেই আমলের নামকরা আর্কিটেক্ট আর. বায়নের সঙ্গে এই জুটির খুব ভাল-ভালবাসা ছিল। এঁরা একসঙ্গে মিলে কোনও কাজ করেছেন কি না জানি না।'

'আর. বায়নে কে?'

কপালে হাত ঠেকিয়ে অরুণ মজুমদার বললেন, 'উরিব্ বাবা, ইনি এক নমস্য আর্কিটেক্ট। তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির সঙ্গে ছিলেন। ইনিই সেদিনকার নিউ মার্কেট বা হগ মার্কেটের নক্‌শা বানিয়েছিলেন। অসাধারণ স্থাপত্য। এর জন্যে হাজার টাকা পুরস্কারও পেয়েছিলেন। তখন হাজার টাকা মানে বিরাট টাকা। আজ থেকে একশো পঁচিশ বছর আগের ঘটনা। নিউ মার্কেটই কলকাতার প্রথম মিউনিসিপ্যাল মার্কেট। তোমার ওই প্রেমিসেসের প্ল্যান খুঁজতে গিয়ে আমি পুরনো কলকাতার কিছু ইতিহাসও জেনে ফেললাম। তা, তুমি ওই বাড়িটার প্ল্যান নিয়ে করবেটা কী, কোথাও কোনও গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছ নাকি?'

কৌশিক হেসে উঠে বলল, 'আপনি মন্দ বলেননি কিন্তু। কলকাতার বহু পুরনো বাড়ির নীচেটা খোঁড়াখুঁড়ি করলে মোহর-টোহর পাওয়া যেতে পারে। সে আমলে চোর-ডাকাতের ভয় ছিল, অত্যাচারী শাসকের ভয় ছিল, দেশে ব্যাঙ্ক-ট্যাঙ্কের কোনও অস্তিত্ব ছিল না—বড় মানুষরা সোনাদানা, মোহরটোহর রাখবে কোথায়? নিরাপদ জায়গা বলতে ছিল মাটির তলা।'

'খোঁড়ো তা হলে, আকবারি মোহর পেলে দু-একটা দিও আমাকে।'

হেসে উঠে কৌশিক বলল, 'নিশ্চয়ই দেব। আপনি আর্কাইভ ঘেঁটে এত কষ্ট করে পুরনো বাড়ির একটা প্ল্যান বার করে দিলেন আমাকে, আর আপনাকে কয়েকটা মোহর দিতে পারব না আমি! কিন্তু মাটির তলায় শুধু গুপ্তধন নয়, অপরাধও চাপা দেয় মানুষ।'

'কীরকম?'

'ধরুন ওই সব বাড়ির কোনও একটার মেঝে খুঁড়ে হয়তো একজোড়া কঙ্কাল পেলাম!'

হঠাৎই মুখ গম্ভীর করে অরুণ মজুমদার বললেন, 'কী সাঙ্ঘাতিক! ওই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেছে নাকি?'

'না-না, এমনি বললাম।'

'কিচ্ছু বলা যায় না। রহস্য সমাধানের আগে গোয়েন্দাদের কোন্‌টা এমনি আর কোন্‌টা ওমনি বোঝা কঠিন। দাঁড়াও পাপ বিদেয় করি আগে।'

উঠে গিয়ে আর্কিটেক্ট একটা আলমারি খুললেন, তার পর ট্রেসিং পেপারের একটা রোল বার করে কৌশিকের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নাও তোমার পুরনো বাড়ির নক্‌শার কপি। তোমার কাজ মিটে গেলে আমাকে ফেরত দিও তো। নক্‌শাটায় ইন্টারেস্টিং কয়েকটা অ্যাঙ্গেল আছে, আমি একটু স্টাডি করব।'

মুচকি হেসে কৌশিক বলল, 'পুরনো কলকাতার সবকিছুর মধ্যেই কিছু না কিছু ইন্টাররেস্টিং অ্যাঙ্গেল আছে, আপনি যদি কয়েকটা দিন একটু খুঁটিয়ে দেখেন, আপনার ঠিক নেশা ধরে যাবে।'

'তোমার ধরে গেছে বুঝি?'

'কিছুটা বোধ হয়। যে কাজটা এখন হাতে নিয়েছি তার মধ্যে শুধু পুরনো কলকাতা নয়, প্রাচীন গৌড় পর্যন্ত জড়িয়ে আছে। পুরনো কিছু-কিছু গল্পসল্প শুনছি—বেশ লাগছে কিন্তু।'

'তা লাগুক, কিন্তু তুমি অপরাধী হিসেবে কাকে সন্দেহ করছ? লর্ড ক্লাইভ? অযোধ্যার নবাব? না, তর্কপঞ্চানন?'

গলা ছেড়ে হেসে উঠে গোয়েন্দা বলল, 'টাইম-মেশিনে চাপছি না এখন, তার অবশ্য দরকারও নেই। আমি যে অপরাধীর খোঁজ করছি সে আমাদেরই মতো রক্তমাংসের মানুষ। আজ উঠি তা হলে—।'

'সে কি! চা-টা খাবে না?'

'আজ থাক, হাতের কাজটাজগুলো সারার পরে একদিন জমিয়ে আড্ডা মারা যাবে। তখন শুধু চা নয় প্রচুর খাবারদাবারও খাব।'

'ঠিক আছে, অপরাধী ধরার পরে এসো।'

'অপরাধী হাত থেকে বরাবরের জন্যে পালিয়ে গেলেও আসব।'

সন্ধে সাতটা নাগাদ গোয়েন্দা যখন ওর চেম্বারে গিয়ে পৌঁছল তখন মুখার্জিবাবু বড়-বড় হাই তুলছিলেন। ওকে দেখে আর একটা হাই হাত আড়াল দিয়ে তুলে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমি বহুক্ষণ ধরে যাব-যাব করছিলাম, মন কিন্তু বলছিল, যত দেরিই হোক না কেন আপনি ঠিক একবার আসবেন। তদন্তের মাঝখানে আপনার এরকম একটানা উধাও হয়ে যাওয়া মানেই কাজ এগোনো। চটপট একটু কফি নিয়ে আসি।'

'আনুন। যে রকম লম্বা-লম্বা হাই তুলছেন, একটু কালো কফি না খেলে আপনি চাঙ্গা হবেন না।'

মৃদু হেসে ফ্লাস্কটা নিয়ে কফি আনতে চলে গেলেন মুখার্জিবাবু। কাছেই কফির দোকান, একটু বাদেই কফি নিয়ে ফিরে এলেন উনি। তারপর দুটো কাপ ঢেলে একটা এগিয়ে দিলেন কৌশিকের দিকে আর একটা নিজে নিলেন। চোখ বুজে কফির কাপে পর-পর দুটো চুমুক মারলেন মুখার্জিবাবু। গলা খাঁকারি দিলেন, দু-হাতের তালু ঘষলেন। ওঁর চোখেমুখে একটু চনমনে ভাব ফুটে উঠেছিল। বললেন, 'কফিতে কী থাকে বলুন তো? একটু খেলেই ঘুম-টুম হাওয়া হয়ে যায়, শরীরে বেশ একটা চাঙ্গা ভাবও আসে।'

কথাটার কোনও জবাব না দিয়ে গোয়েন্দা বলল, 'কাল গিয়েছিলেন তো পাঁচ নম্বর বাড়ির সামনে?'

'হ্যাঁ-অ্যা।'

'তেমন কিছু দেখলেন কি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, অনেক কিছু। ওই বাড়িটা কিন্তু আমার একেবারেই সুবিধের ঠেকছে না।'

'কেন?'

'সেই মেয়েটাকে দেখলাম।'

'কোন্ মেয়েটাকে?'

'ওই যে সুনন্দ তরফদারের ভাইরের সঙ্গে যে মেয়েটার খুব পিরিত। সেই হাওড়া স্টেশন থেকে ওই ছোকরা তো ওই মেয়েটার কাছেই গিয়েছিল। মেয়ে না তো বউ। সিঁথিতে একটু যেন সিদুঁরের গুঁড়ো ছিল।'

কৌশিক একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'সেই মেয়েটা! আপনি শ্যিওর?'

মুখার্জিবাবু আমতা-আমতা করে বললেন, 'সত্যি কথা বলতে কি, মেয়েদের চেহারা দু-একবার দেখে আমি ঠিক মনে রাখতে পারি না। কেমন যেন গুলিয়ে যায়। মেয়েরা আসলে গিরগিটির জাত। গিরগিটি রং বদলায়, আর মেয়েরা রং-ঢং দুটোই বদলায়।'

গোয়েন্দার দৃষ্টি ধারালো হয়ে উঠেছিল। 'তাহলে আপনি কী করে বুঝলেন যে, এই মেয়েটি সেই মেয়েটি?'

'প্রথমে তো বুঝতে পারিনি। মেয়েটি ট্যাক্সি থেকে নেমে গট-গট করে ঢুকে গেল পাঁচ নম্বর বাড়ির ভেতর। কেমন যেন সন্দেহ হওয়াতে একটু দূরত্ব বজায় রেখে পিছু নিলাম। হ্যাঁ, ঠিক, তিনতলার ওই গেস্টহাউসের দরজা ঠেলে শাঁ করে ভেতরে ঢুকে গেল। ভঙ্গি দেখে বুঝলাম, ওখানে মেয়েটির নিয়মিত যাতায়াত আছে। নেমে এসে নীচে দাঁড়িয়ে আবার নজর রাখলাম চারদিকে। ঘন্টাখানেক বাদে মেয়েটি নামল, তারপর একটা ট্যাক্সিতে চেপে উধাও হয়ে গেল। ফিরল মিনিট-পঁয়তাল্লিশ বাদে। সঙ্গে সেদিনের সেই ছোকরা, মানে সুনন্দর ভাই। ব্যস, বুঝে গেলাম কেন মেয়েটাকে চেনা-চেনা ঠেকছিল। ওই মেয়েটাই সেই মেয়েটা।'

গোয়েন্দার দৃষ্টি আগের মতোই ধারালো ছিল। বলল, 'যেহেতু সুনন্দবাবুর ভাইয়ের সঙ্গে ওকে দেখেছেন, অমনি ধরে নিলেন এই মেয়েটাই সেদিনের সেই মেয়েটা।'

'না-না, এবার আর ভুল করিনি, আইডেন্টিফিকেশন মার্ক দেখে নিয়েছি।'

'কীরকম?'

'বাঁদিকের গালে একটা আঁচিল। ভাল করে দেখেছি। ও মেয়ে এবার যতই মেক-আপ পালটাক না কেন, ঠিক চিনে ফেলব আমি। ট্যাক্সি থেকে নেমে দু'জনে মিলে ওই গেস্ট-হাউসটায় ঢুকে গেল আবার।'

'তারপর?'

'ঘন্টাখানেক বাদে বেরিয়ে এসে আবার ট্যাক্সি ধরে উধাও। আধ ঘন্টা-চল্লিশ মিনিট বাদে সুনন্দর ভাই ফিরে এল। একা। হাতে কাগজে-মোড়া বড়-বড় কয়েকটা ছবি, বোধহয় পেন্টিং। খুব যত্ন করে ওই ছবিগুলো প্রায় বুকে জড়িয়ে গেস্টহাউসে গেল। কিছুক্ষণ বাদে গালে আঁচিলঅলা মেয়েটি ফিরল একটা জিপসি ভ্যানে। সঙ্গে দুটি সুন্দরী মেয়ে, আর, দুই ভদ্রলোক।

চেহারা দেখলেই বোঝা যায় খুব ধনী এবং অবাঙালি। সবাই মিলে ঢুকে গেল ওই গেস্টহাউসে। বেরুল ঘন্টাদেড়েক বাদে। আরও কয়েকটা মেয়ে ঢুকল, বেরুল। সব ক'টা মেয়েরই সাজ খুব চড়া। দেখে মনে হয় মডেলিংয়ের কাজটাজ করে। ও হ্যাঁ, ইতিমধ্যে গাড়িতে কয়েক পেটি মালও এসেছিল। পিচবোর্ডের বাক্স। দূর থেকে চোখে পড়ল, একটা বাক্সের গায়ে ছাপানো হরফে লেখা আছে হুইস্কি। বোধ হয় কোনও পার্টি ছিল ওই গেস্টহাউসে।'

'তা থাকতে পারে, কিন্তু ওই ক'টা লোকের জন্যে পেটি-পেটি হুইস্কি আসবে কেন?'

'তবে?'

'সুনন্দবাবু একদম গোড়ার দিকে ওই গেস্টহাউসে লিকার-লঞ্চিংয়ের একটা ঘটনার কথা বলেছিলেন না, মনে হয় ওটা মিথ্যে নয়। ওখান থেকে হয়তো নতুন ব্র্যান্ডের হুইস্কি-টুইস্কির ক্যাম্পেন হয়।'

অবাক হয়ে মুখার্জিবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কি সেই একেবারে গোড়ার দিকে— এক বৃষ্টির সন্ধ্যায়, মিলন মাইতির সঙ্গে সুনন্দর ওখানে মদ খেতে আসার গল্পটা বলছেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ওটা যে নেহাতই গাঁজাখুরি গল্প, সে তো আমি পরদিনই ধরে ফেলেছিলাম।'

'তা ফেলেছিলেন, তবে এমনও তো হতে পারে—।'

'কী?'

'আর একটা মিথ্যে গল্প শুনিয়ে আমাদের কেউ ভুল দিকে ঠেলে দিচ্ছে।'

একটু কাঁধ ঝাঁকিয়ে মুখার্জিবাবু প্রশ্ন তুললেন, 'তাতে লাভ?'

'এটা কী বলছেন আপনি। গোয়েন্দা তদন্তে নেমেছে, আসল অপরাধী তো সুযোগ পেলেই তাকে উলটো পথ দেখিয়ে দেবে।'

একটু চমকে উঠে মুখার্জিবাবু বললেন, 'বলেন কী! কেসটা তখন আমরা সবেমাত্র হাতে নিয়েছি। কাজ হাতে নিতে না নিতেই অপরাধী আমাদের খোঁজ পেয়ে গেল।'

'পাওয়াটা অসম্ভব ভাবছেন কেন? সেই সময় হয়তো সুনন্দবাবুর পেছনে কোনও লোক ফিট করা ছিল। সে জেনে গেল, ওই মানুষটার সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়ে গেছে—। গোয়েন্দার সঙ্গে কেউ নিশ্চয়ই খোশগল্প করতে আসে না। ব্যস, আমাদের ওপর নজর রাখা শুরু হয়ে গিয়েছিল অমনি।'

মুখার্জিবাবু দুদিকে বেশ জোরের সঙ্গে মাথা নাড়াতে-নাড়াতে বললেন, 'সুনন্দ তরফদারের পেছনে লোক লাগবে কেন? ওই লোকটাই তো যত নষ্টের গোড়া—পরে আপনি আমার কথাটা মিলিয়ে দেখে নেবেন।'

গোয়েন্দা চোখমুখ ধারালো করে বলল, 'অপরাধের জগৎটা বড় অদ্ভুত। ওখানে যে-

কোনও মানুষ যে-কোনও কাণ্ড করে বসতে পারে। শেষে হয়তো দেখা যাবে, মিলন মাইতির খুনের ব্যাপারে এই সুনন্দ তরফদারই কলকাঠি নাড়িয়েছে।'

মুখার্জিবাবু গালে হাত ঘষতে ঘষতে বললেন, 'সন্ধের সময় একটা লোক এল। এই লোকটার দেখি দারুণ খাতির। হাতে একটা ছোট অ্যাটাচি ছিল, সুনন্দর ভাই ওটা প্রায় ছিনিয়ে নিল। তিন-চারটে তোষামুদে লোক হেঁ-হেঁ করতে করতে পিছু নিয়েছিল। সদলবলে বড়বাবু ঢুকলেন গিয়ে গেস্টহাউসে।'

'লোকটাকে আগে দেখেছেন কোথাও?'

কপালে ভাঁজ ফেলে মুখার্জিবাবু আর একবার স্মৃতি হাতড়ালেন, তারপর দুদিকে মাথা নাড়িয়ে বললেন, 'নাহ্।'

'দেখতে কেমন ভদ্রলোককে?'

'বেশ হ্যান্ডসাম। বয়েস পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন হবে। মাঝারি হাইট। গায়ের রঙ বেশ ফর্সা। খাড়া নাক, চৌকা চোয়াল। পোশাক-আশাক টিপটপ। দেখলেই বোঝা যায় বিস্তর পয়সাকড়ি আছে। বড় ব্যবসায়ী। শিল্পপতিও হতে পারে।'

খুব মনোযোগ দিয়ে মুখার্জিবাবুর কথা শুনছিল গোয়েন্দা। মুখার্জিবাবু থামতেই জিজ্ঞেস করল, 'গালে আঁচিলঅলা সেই মেয়েটা তখন কোথায় ছিল?'

'ও তো বিকেল-বিকেলই কেটে পড়েছিল। তবে আর একটা মেয়ে ছিল ওখানে। মেয়েটাকেও দেখতে বেশ সুন্দরী। হিন্দি সিনেমার নায়িকার মতো। হাবভাবও সেই রকম। অসম্ভব গায়েপড়া গোছের।'

'গেস্টহাউস থেকে ভদ্রলোক বেরুলেন কখন?'

'আর বলবেন না, সেটা দেখে আসার সুযোগ পাইনি।'

'কেন?'

'ওই বড়বাবুগোছের লোকটা গেস্টহাউসে ঢোকার পরে বাইরে একটা রকের ওপর বসে রুমাল ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলাম। সারা দিন ধকল তো কম যায়নি। গায়ে ওই বিচ্ছিরি পোশাক, গালে একগাদা নকল দড়ির গরম। একটু বোধ হয় অন্যমনস্কও হয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ একটা লোক ঠিকানা-লেখা একটুকরো কাগজ এগিয়ে দিল সামনে। ঠিকানার পাশে লেখা ছিল, নিয়ার নিউ মার্কেট। ওই ঠিকানা-টিকানার কথা কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করলে, যদি আমার জানা থাকে, আমি খুব পরিষ্কার ভাবে বুঝিয়ে দিই। তা, ঠিকানা-লেখা কাগজটা দেখাতেই আমি গড়গড় করে সব ওকে বুঝিয়ে দিলাম। তাড়াহুড়োর মাথায় একটুখানি ভুল হয়ে গিয়েছিল।'

'কী ভুল?'

'ঠিক সেই মুহূর্তে আমার খেয়াল ছিল না যে আমি আফগান সেজে বসে আছি। পরিষ্কার বাংলায় ওকে বুঝিয়ে দিয়েছিলাম—কী ভাবে ওখান থেকে নিউ মার্কেট যেতে হবে।'

'শুনে লোকটা অদ্ভুত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে কেটে কেটে বলল ঃ বাহ্। আপনি তো দারুণ সুন্দর বাংলা শিখে গিয়েছেন! অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, হ্যাঁ, অনেক দিন তো এখানে আছি। শুনে লোকটা বিদ্‌ঘুটে একটা হাসি হেসে বলল : হ্যাঁ, বহু দিন। এত দিন যে খানসাহেব আপনি আপনার মাতৃভাষাও বোধ হয় ভুলে গেছেন! বুঝতে পারলাম লোকটা আমাকে ধরে ফেলেছে কিংবা সন্দেহ করছে। অবস্থা সামাল দেওয়ার জন্যে ভাবলাম—পুশ্‌তু অ্যাকসেন্টে হিন্দিতে লোকটাকে কষে একটা ধমক লাগাই। কিন্তু দিতে গিয়েই বুঝতে পারলাম এই লোকটাই সে দিন আমার পিছু নিয়েছিল। লোকটাকে বেশ বিপজ্জনকও দেখাচ্ছিল। হঠাৎ আমি উঠে পড়ে একটা চলন্ত ট্যাক্সি দাঁড় করিয়ে কেটে পড়েছিলাম ওখান থেকে।'

'কেমন দেখতে লোকটাকে?'

'এক্কেবারে পাক্কা ভিলেন। দশাসই চেহারা। ছ'ফুটের বেশ কিছুটা ওপর দিকে। ভুরু থেকে কপাল পর্যন্ত বড় একটা কাটা দাগ। বোধ হয় ছুরিফুরি খেয়েছিল কখনও।'

লোকটার চেহারার বর্ণনা শুনে গোয়েন্দার চোয়াল বেশ শক্ত হয়ে উঠেছিল। কয়েক মুহূর্তে চুপ করে থাকার পরে বলল, 'আপনি তখন ওখান থেকে সরে পড়ে ভাল করেছেন।'

পালটা প্রশ্ন করলেন মুখার্জিবাবু, 'কেন?'

একই প্রশ্ন বারতিনেক করার পরেও কৌশিক কোনও উত্তর দিল না। উত্তর না পেয়েও প্রবীণ সহকারীটি কিন্তু ক্ষুব্ধ হলেন না, কারণ উনি খুব ভালভাবেই জানেন মাথার মধ্যে একগাদা প্রশ্ন ভিড় করে এলে গোয়েন্দার কথা বন্ধ হয়ে যায়।

মিনিট-দশেক বাদে ওরা বেরিয়ে পড়েছিল ওখান থেকে। কিন্তু পথে বেরিয়েও ওদের মধ্যে কোনও কথা হয়নি।

গম্ভীর মুখে বাড়ি ফিরে এসে গোয়েন্দা ওর ডায়েরি নিয়ে বসেছিল, তারপর বহুক্ষণ ধরে সাঙ্কেতিক ভাষায় অনেক-কিছু লেখালেখি করল।

মাঝরাতে গোয়েন্দা প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম আর পিস্তল সঙ্গে নিয়ে গাড়ি হাঁকিয়ে একটি অভিযানে গিয়েছিল। নিঃশব্দ অভিযান। আর পাঁচজন যখন ঘুমে অজ্ঞান, তখন ও একটি বাড়িতে হানা দিয়ে বেশ কিছু গোপন তথ্য সংগ্রহ করে নিয়েছিল। শেষরাতের দিকে বাড়ি ফিরে এসেছিল গোয়েন্দা।

আঠারো

সাতসকালেই ডোরবেল। ফ্ল্যাটের দরজা খুলে কৌশিক দেখল একটা ডিমওয়ালা। লোকটা মিনমিন করে বলল, 'ডিম নেবেন, খুব ভাল ডিম।'

দুদিকে মাথা নাড়িয়ে দরজা বন্ধ করতে যাচ্ছিল কৌশিক, কিন্তু তার আগেই লোকটা পা বাড়িয়ে একটা পাল্লা আটকে দিয়ে চাপা গলায় বলল, 'একটু ভেতরে যাব।' কথাটা কানে যেতেই সতর্ক হয়ে উঠল কৌশিক। ধারালো চোখে ডিমওয়ালার মুখের দিকে তাকাবার পরে

একফালিতে হাসি ফুটে উঠেছিল ওর ঠোঁটে। আধভেজানো পাল্লা খুলে দিতেই অবিকল বেড়ালের ভঙ্গিতে ঘরে ঢুকে পড়ল লোকটা।

দরজা বন্ধ করে আগন্তুকের দিকে তাকিয়ে গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল 'কী ব্যাপার গোম্‌সসাহেব! হঠাৎ একেবারে ছদ্মবেশ ধরে এলেন যে?'

মাথার গামছা খুলতে খুলতে পাকা ইনফর্মারটি বলল, 'আমার আগেই সন্দেহ হয়েছিল, আপনার বাড়ির ওপর নজর রাখা হয়েছে। এখন দেখলাম ব্যাপারটা ঠিক।'

কৌতূহলী হয়ে গোয়েন্দা প্রশ্ন করল, 'নজর রেখেছে! কে?'

'আপনার বাড়ির কাছে একটা হজমিওয়ালাকে দেখলাম। ও কদ্দিন বসছে এখানে?'

রহস্যময় একটা হাসি ফুটে উঠেছিল গোয়েন্দার ঠোঁটে। 'এই কেসটা আমি হাতে নেওয়ার ঠিক দুদিন পর থেকেই বসছে।'

'ওহ্ ! আপনি তাহলে গোড়া থেকে নজরদারের ওপর নজরদারি করছেন।'

'না করে উপায় কি বলুন? এই হজমিওয়ালাটার বসা উচিত ছিল কোনও একটা প্রাইমারি স্কুলের সামনে, তাও আবার টিফিনের সময়। কিংবা ঘিঞ্জি বস্তি-এলাকায়। ওসব জায়গায় না গেলে ওর হজমি কেনার বাচ্চাকাচ্চা পাবে কোথায়! এ পাড়াটা একটু উঠ্‌তি বড়লোকদের পাড়া। এখানে ওই হজমিওয়ালা খদ্দের তো দূরের কথা, তাড়াবার মতো যথেষ্ট পরিমাণে মাছিও পাবে না। যাক, বেচারার এ-বাড়ির ওপর নজর রাখা কাজ, রাখুক। আপনার ওদিককার খবরাখবর কী বলুন?'

প্রশ্নটা করেই অ্যান্টনি গোম্‌সের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল গোয়েন্দা। কিন্তু না, অভিব্যক্তিহীন মানুষটার চোখমুখ দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। আরও কয়েক মুহূর্ত কৌশিককে সংশয়ের মধ্যে ফেলে রাখার পরে গোম্‌স ওর বুকপকেট থেকে দুটো ফোটোগ্রাফ বার করে এগিয়ে দিল। ছবিদুটো হাতে নিয়ে কৌশিক অবাক হয়ে বলল, 'আরেব্ বাবা! আপনি দেখছি ছবিও জোগাড় করে ফেলেছেন এর মধ্যে!'

মানুষটার বিস্ময় দেখে গোম্‌সের ঠোঁটে একটুখানি বাহাদুরির হাসি ফোটা উচিত ছিল, কিন্তু কোথায় কী! মুখটাকে নিরেট পাথরের মতো রেখেই গোম্‌স বলল, 'ওরা পুরনো পাপী তো, ছবি জোগাড় করতে কোনও অসুবিধে হয়নি।'

'ভাল করেছেন, কিন্তু আসল ব্যাপারের কদ্দুর? খবর কতটা কী জোগাড় করতে পারলেন?'

দুটো ফোটোগ্রাফের একটার বলশালী, হিংস্র চেহারার, লোকটার দিকে আঙুল তুলে গোম্‌স বলল, 'এ লোকটা প্রথমে ছোটখাটো কাজ করত।'

'ছোটখাটো মানে?'

'ময়দানে সন্ধে-রাত্তিরে ছিনতাই করত।'

'তাই নাকি?'

'তারপর ব্লেড আর ক্ষুর ধরল, তবে সে কাজগুলোও ছোট কাজ ছিল।'

গোয়েন্দা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ব্লেড, ক্ষুর নিয়ে ছোট কাজ—সেটা আবার কী?'

কোনও একটা অভিব্যক্তি ফোটা উচিত ছিল গোম্‌সের চোখেমুখে, কিন্তু ফুটল না। চাল-ডালের হিসেব দেওয়ার ভঙ্গিতে গুপ্তচরটি বলল, 'আজ্ঞে ছোট কাজই, রেটও খুব কম ছিল। মাত্র দুশো টাকা দিলে দেখিয়ে-দেওয়া লোকের গালে ব্লেড বা ক্ষুর চালিয়ে গাল দু-ফাঁক করে দিত।'

শিউরে উঠে গোয়েন্দা বলল, 'একে আপনি ছোট মাপের কাজ বলছেন! মারামারি করতে গিয়ে গুণ্ডারা চুরি, ক্ষুর, ব্লেড চালায়—তার একটা মানে বোঝা যায়। আর এ একেবারে ঠাণ্ডা মাথায় মাত্র দুশোটা টাকার জন্যে...। দুশো টাকা পেয়ে যদি এই কাজ করে, দু-হাজার টাকা পেলে তো মানুষ খুন করবে হাসতে হাসতে—।'

'আজ্ঞে ও এখন সেই লাইনেই গেছে। দু-হাজার নয়, লোক খুন করতে আরও বেশি টাকা নেয়। তবে পার্টি বুঝে। মালদার পার্টির কাজ হলে বেশি টাকা। পার্টি একটু কমজোরি হলে কিংবা জানাশোনা হলে কম টাকাতেও কাজ করে দেয়—।'

'কাজ মানে খুন তো?'

গোম্‌সের পাথরের মতো চোখমুখে এবারও কোনও ফাটল ধরল না। আগেরই মতো নিস্পৃহ ভঙ্গিতে জবাব দিল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

বাকি ছবিটায় কৌশিক চোখ রাখতেই গোম্‌স বলল, 'এই লোকটা স্যার আরও গন্দা কাজ করে। একদম গোড়ার দিকে মেয়েছেলের দালালি করত। তারপর মেয়ে কেনাবেচা। গ্রাম থেকে, রেল-ইস্টিশন থেকে মেয়েছেলে তুলে এনে পার্টি ধরে বেচে দিত। ও কাজ এখনও করে, তবে আগের চেয়ে কম। এখন ওর বড় কাজ হল বর্ডার দিয়ে ড্রাগ পাচার করা। কলকাতার কয়েকটা ঠেকে ড্রাগ-পেড্‌লিংও করে। এর বাইরেও দু-চারটে ধান্দা আছে।'

গম্ভীর মুখে গোয়েন্দা বলল, 'তা না হয় হল, কিন্তু এখানে ওরা ঠিক কী ধরনের কাজের সঙ্গে জড়িয়ে আছে?'

'সেটা স্যার এখনও জানতে পারিনি।'

'আন্দাজ?'

'আমি স্যার আন্দাজে কাজ করি না। পাকা খবর পেলে দিই, নাহলে চেপে যাই।'

ছবিদুটো জেম্‌স ক্লিপ দিয়ে ডায়েরির ভেতরের পাতায় আটকে রেখে গোয়েন্দা বলল, 'আপনি লোকদুটোর ওপর আরও দু-তিনটে দিন নজর রাখুন। বাড়তি কিছু জানতে পারলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। হয় ফোনে নয় এখানে এসে। আপনার বেনেপুকুরের বাড়িতে যেতে বললেও চলে যাব।'

'ঠিক আছে স্যার।'

'আপনাকে কিছু টাকা দিই এখন।'

'দিন স্যার, পাঁচশো দিন, না-না সাতশো।'

পৃথিবীর একটি জাদুদণ্ডের নাম বোধহয় টাকা। সাতশো টাকা হাতে পেয়ে গোমস্ সাহেবের মুখে একচিলতে হাসি ফুটে উঠেছিল।

দেওয়ালের বোধহয় কান আছে, সেই কানে যাতে কোনও কথা না পৌঁছয় তার জন্যেই বোধহয় দুজনের মধ্যে পরের কথাগুলো অস্বাভাবিক নিচু গলায় হল। গোম্‌স দুটো ঠিকানা-লেখা কাগজও দিল গোয়েন্দাকে।

একটু বাদে কৌশিকের ফ্ল্যাট থেকে মার্কামারা ডিমওয়ালাটা বেরিয়ে গেল।

আরও ঘন্টাখানেক বাদে গোয়েন্দাও বেরিয়ে পড়ল তৈরি হয়ে। বেরুতেই খদ্দেরহীন হজমিওয়ালা একটু যেন চঞ্চল হয়ে উঠে ওকে দেখল।

এ পাড়াটা মোটামুটি নির্জনই। এদিক-ওদিক কয়েকটা হাইরাইজ উঠছে, সেগুলো তৈরি হয়ে গেলে এই হজমিওয়ালা কিছু খদ্দের হয়তো পাবে। কিন্তু বাড়ি তৈরি হয়ে লোক আসতে আসতে কম করে আরও তিন-চার বছর। কৌশিকের খুব ইচ্ছে করছিল এগিয়ে গিয়ে হজমিওয়ালাকে বলে : আর তিনটে-চারটে বছর তুমি যদি ভাই কষ্টেসৃষ্টে কাটিয়ে দাও, মাল বেচার জন্যে খদ্দের পাবে এখানে। কিন্তু পৃথিবীটা অন্যরকম, বলার কথা সব সময় বলা যায় না। তবে মনে মনে কথা বলতে দোষ কোথায়! মনে মনে কথাটা বলতে বলতে এবং তারপরেই সামান্য হাসতে হাসতে কিছুটা যাওয়ার পরে একটা মিনিবাসে উঠে পড়ল কৌশিক।

টনব্যাঙ্কি কোম্পানিতে যখন পৌঁছল তখন ওর ঘড়িতে দশটা পঁচিশ। সাড়ে-দশটা নাগাদ আসবে বলেছিল। তার মানে ঠিক সময়ে এসে গেছে।

কলকাতার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে সময়মতো পৌঁছতে পারাটা রীতিমত কঠিন কাজ। পথঘাটের অব্যবস্থা, গাড়ির জঙ্গল তো আছেই। বাড়তি সমস্যাটা আর এক ধরনের। এখানে কিছু মানুষের মনে যদি কোনও কারণে হঠাৎ কিছু দুঃখ জমে ওঠে, তারা সেটা দূর করার জন্যে পথের মাঝখানে এসে বসে পড়ে। তাদের প্রতি সবাই খুব সহানুভূতিশীল। বিনা বাক্যব্যয়ে দুদিকের বাস-ট্রাম-গাড়ি থেমে যায়। একটু বাদেই গাড়িভর্তি পুলিশ চলে আসে। তারা এদের পাশে দাঁড়িয়ে দেখে, পথে-বসা দুঃখী মানুষদের মনে কেউ যেন ভুলেও কোনও আঘাত না দিয়ে ফেলে।

মাপে একটু ছোট হলেও টনব্যাঙ্কির ম্যানেজারের ঘরটা সুন্দর করে সাজানো। সুনন্দ তরফদার আপ্যায়ন করে কৌশিককে বসালেন। এদিকের চেয়ারে এক সুন্দরী মহিলা বসে-ছিলেন। ওঁর দিকে চোখ পড়তেই গোয়েন্দা একটু বুঝি চমকে উঠেছিল। ভদ্রমহিলাকে ও বোধহয় আগে কখনও দেখেনি, কিন্তু চেহারার বর্ণনা শুনেছে।

সুনন্দবাবু কয়েকটা চালানে দ্রুত সই করে ভদ্রমহিলার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'বসিরহাটের দিকে আমাদের একটা গাড়ি যাচ্ছে কিছু মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট সাপ্লাই দিতে, আপনি আপনার মালপত্তর নিয়ে ওই গাড়িতেই চলে যেতে পারেন। ভেহ্‌কিল ডিপার্টমেন্টকে আমার বলা আছে। আপনি যেখানে যাবেন, সেই জায়গাটা তো বসিরহাটের কাছেই। তাই না?'

নিচু গলায় উত্তর দিলেন ভদ্রমহিলা, 'হ্যাঁ।'

'ঠিক আছে।'

এই 'ঠিক আছে'র অর্থ, এবার আসুন।

ভদ্রমহিলা কাগজপত্র গুছিয়ে তুলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'আপনাদের স্টাফ?'

'না-না, আমাদের এখানে স্টেশনারি গুড্‌সের সাপ্লায়ার। এখানে ওঁর কিছু মালপত্র রিজেকটেড হয়েছে, কিন্তু সেগুলো উনি কোম্পানিতে ফেরত না দিয়ে আর এক জায়গায় সাপ্লাই দেবেন। দু-নম্বর জিনিসের বাজার যে এক নম্বর জিনিসের বাজারের চেয়ে ভাল, সেটা আমার জানা ছিল না আগে। আসলে, কোনও এস্টেট ডিপার্টমেন্ট যদি বাতিল মাল ভাল কোয়ালিটির বলে ফার্মে ঢোকাতে পারে, কমিশনটা বেশি পায়।'

'এ ভদ্রমহিলার কথা আপনি বোধহয় আমাকে একবার বলেছিলেন।'

'আমি! কী ব্যাপারে বলুন তো?'

'না-না, তেমন কিছু নয়, বলেছিলেন লেখাপড়া-জানা মেয়ে, ব্যবসা করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়।'

সুনন্দ তরফদারের মুখে একটু যেন দ্বিধা, সংশয়। 'বলেছিলাম বুঝি! আসলে মেয়েটি খুব পরিশ্রমী—।'

'মিলন মাইতি যেদিন খুন হন, সেদিন তো এই ভদ্রমহিলাই ওঁর গাড়িতে ছিলেন কিছুক্ষণ। তাই না?'

এক মুহূর্তের জন্যে তরফদারের চোখমুখ যেন ফ্যাকাশে হয়ে উঠেছিল। তারপরেই উনি কেমন যেন প্রতিবাদ করার গলায় বলে উঠলেন, 'ছিলেন। কিন্তু তো খুব অল্প সময়ের জন্য। সঙ্গে মালপত্র ছিল বলে মিলন ওঁকে একটা লিফ্‌ট দিয়েছিল। সে তো খুবই সামান্য পথ। তখন আমি ভদ্রমহিলাকে খুব একটা চিনতাম না। পরে দেখলাম, বেশ অনেস্ট, আপরাইট। নিজের কাজকর্মের বাইরে অন্য কোনও ঝঞ্ঝাটের মধ্যে থাকেন না।'

উত্তরে খুব উদাসীন ভঙ্গির একট 'অ'-বার হল গোয়েন্দার মুখ থেকে। তারপরেই ও জিজ্ঞেস করলে, 'আপনাদের চিফ অলোক মৈত্র কি এখন কলকাতায় নেই?'

'না, দিল্লিতে। গতকাল গেছেন, আগামী কাল ফিরবেন।'

'উনি এই বয়েসেও খুব হিল্লি-দিল্লি করেন, না?'

'করেন, তবে কালকেই বলছিলেন, আর করবেন না।'

'কেন?'

'কেন আবার, বরাবরের জন্যে সব ছেড়েছুড়ে হিমালয়বাসী হবেন বলে।'

'সে তো উনি বহুদিন ধরেই বলে আসছেন।'

'না, এবার সত্যি-সত্যিই হচ্ছেন। কাল আমাকে ডেকে পরিষ্কার ভাষায় জানালেন, নতুন একটা গিফ্‌ট ডিড করা হয়ে গেছে, এটা ফাইন্যাল।'

সুনন্দর চোখে চোখ রেখে স্পষ্ট গলায় আচমকা গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করে বসল, 'আপনি তো এই ব্যবসার একটা শেয়ার পেয়েছেন। তাই না?'

এত সরাসরি এমন একটা প্রশ্ন আশা করেননি সুনন্দ তরফদার। প্রশ্নের ধাক্কাতেই ওঁর মুখ থেকে বোধহয় উত্তরটা খসে পড়েছিল। 'না, আমি কিছুই পাইনি।'

'সেকি! আমি যদ্দূর জানতাম—কোম্পানির দুটো শেয়ার এই কোম্পানির দুজন পাবে। একজন আপনি, আর একজন—।'

'মিলন মাইতি। হ্যাঁ, বেঁচে থাকলে ও হয়তো কিছু পেত।'

'আসলে—।'

'আসলে কী?'

'আমি গোড়াতেই আপনাকে বলেছিলাম—আমার সামনে মস্ত বিপদ। আমি একটা চক্রান্তের শিকার হতে যাচ্ছি, কিন্তু আপনি কিছুই করলেন না।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'অলোকবাবু একটা সময় আপনাকে খুব পছন্দ করতেন। হালে ওঁর চটে যাওয়ার মতো কোনও ঘটনা ঘটেছে কি?'

'না। তবে কোনও একটা ব্যাপারের সঙ্গে আমাকে জড়িয়ে দিয়ে ওঁর মনে সন্দেহ ঢোকাতে অসুবিধেটা কোথায়? তা ছাড়া—।'

'তা ছাড়া কী?'

'খবর পেয়েছি আমার ছোটভাই বাঙ্গালোর থেকে কলকাতায় ফিরে এসেছে। ওই বোধহয় গোলমালটা আরও বেশি করে পাকিয়েছে।'

'কীরকম?'

'সে অনেক কথা। পরে বলব একদিন। অবশ্য আপনার না শুনলেও কিছু এসে যায় না। এ একেবারে পারিবারিক কথা।'

সুনন্দ তরফদারের চেহারাটা হঠাৎই কেমন যেন হতাশ এবং রাগী মানুষের মতো হয়ে উঠেছিল।

পাশে কাচের গ্লাসে জল ছিল, সেটা একঢোক খেয়ে নিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'কথায়

বলে না বুড়ো বয়েসে ভীমরতি ধরে, ঠিক তাই। আমি তো বাইরের লোক, নিজের যে অত পেয়ারের ভাগ্নি—তাকে পর্যন্ত কিছু দিল না।'

'সে কি! ওরই তো শুনেছি সবচেয়ে বড় শেয়ারটা পাওয়ার কথা ছিল। আপনি ঠিক শুনেছেন তো?'

'বেঠিক শোনার কোনও কারণ নেই। বুড়ো নিজের মুখে বলেছে। ওর চেম্বারে বসে কথা বলছিলাম কাল। এমন সময়, একটা টেলিফোন এল। ওদিক থেকে কে কী বলেছে জানি না, বুড়ো হঠাৎ ভীষণ উত্তেজিত হয়ে টেলিফোন নামিয়ে রেখে বলল : আমার বিষয়-সম্পত্তি-ব্যবসা কাকে কী দেব সে ব্যাপারে ডিকটেট করবে বাইরের লোক। এই নিয়ে আবার হুমকিও দিচ্ছে! জীবনে কোনও অন্যায়ের সঙ্গে কখনও আপস করিনি, কোনও হুমকিতে মাথা নোয়াইনি, আর আজ কি না—। আমি যা ঠিক মনে করছি তাই করব, ঠিক মনে করেছি বলেই আমার ভাগ্নিকে কিছু দিচ্ছি না—কিচ্ছু না। এটা নীতির প্রশ্ন।'

কথাগুলো খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনছিল গোয়েন্দা। সুনন্দ থামতেই জিজ্ঞেস করল, 'আর, আর কী বলেছিলেন?'

সুনন্দ তরফদার এবার আর হতাশা ও রাগ গোপন রাখতে পারলেন না। ওঁর চোখেমুখে লালচে, কালো আর বেগুনি—তিনটে রংই পালা করে খেলে গেল। তারপর কেমন যেন হিংস্র মুখ করে বললেন, 'আমি কখনও কিছু চাইনি, কিন্তু নিজের থেকেই বহুকাল আমার মুখের সামনে গাজর ঝুলিয়ে রেখেছিল। কেন? এখন এক কথায় পুরনো প্রতিশ্রুতি ভুলতে দেব না। শুনুন, যে জন্যে আপনাকে আমি ডেকেছি। বুড়োর ওই দানপত্রে কী আছে, মানে কে কী পেল, সেটা আমি জানতে চাই। যে ভাবে পারেন আমাকে জেনে এসে বলবেন। এর জন্যে আপনার যা ফিজ তার পাঁচগুণ বেশি দেব। চাইলে পুরো টাকাটা এখনও দিয়ে দিতে পারি।'

কথাটা শোনার পরে খুব ঠাণ্ডা গলায় গোয়েন্দা বলল, 'কিন্তু ও দানপত্রটি উনি কোথায় রেখেছেন?'

'হয় বাড়িতে, নয় অ্যাডভোকেটের কাছে, কিংবা লকারে। এই নিন ওর অ্যাডভোকেটের ঠিকানা।' ড্রয়ার খুলে তরফদার একটা ভিজিটিং কার্ড প্রায় ছুড়ে দিলেন গোয়েন্দার দিকে।

কার্ডে চোখ বুলিয়ে গোয়েন্দা সেটা পকেটে রেখে দিল, তারপর আগের চেয়েও ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'গিফট ডিড অলোকবাবুর বাড়িতে কিংবা অ্যাডভোকেটের চেম্বারে থাকলে আমি খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু ব্যাঙ্কের লকারে থাকলে কিছু করার নেই।'

'কী আশ্চর্য! ব্যাঙ্কের লকারে রাখা মানে তো লকার থেকে বার করাও—আপনাকে নজর রাখতে হবে।'

'তা ঠিক। কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী?'

'দানপত্রে কে-কী পেল সেটা জেনে আপনার কী লাভ?'

'লাভ আছে বলেই তো আপনাকে দায়িত্ব দিচ্ছি। নিছক কৌতূহল মেটানোর জন্যে নয়। আপনি কাজটা নিচ্ছেন তো?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে গোয়েন্দা বলল, 'আমি যে ধরনের কাজ করে থাকি তার মধ্যে এটা পড়ে না। তবু আমি নিচ্ছি।'

কথাটা শুনে সুনন্দ তরফদারের দু-চোখে এক মুহূর্তের জন্যে বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল। 'আপনি কত অসাধ্যসাধন করেছেন, সে তুলনায় এ কাজটা আপনার কাছে তো কিছুই নয়। আপনাকে কি টাকাটা এখন দেব?'

দুদিকে মাথা নাড়িয়ে গোয়েন্দা বলল, 'আপনার আর কোনও দরকারি কথা আছে কি?'

'না, উপস্থিত আর কিছু নেই।'

'ঠিক আছে, আমি চলি তাহলে এখন।' কথাটা বলার পরেই ঘর থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল গোয়েন্দা।

ওখান থেকে বেরিয়ে ও অলোক মৈত্রের বাড়িতে এসে হাজির হল। কিন্তু কম্পাউণ্ডে ঢোকার মুখেই দুজনকে আসতে দেখে বিদ্যুৎগতিতে সরে গিয়েছিল ঝাঁকড়া গাছটার আড়ালে।

আড়াল থেকে দেখল দুজনের একজন কিশোর চৌধুরীর বউ, অপরজন সেই ছোকরা—যাকে কেউ-কেউ সুনন্দ তরফদারের ছোট ভাই হিসেবে জানে।

ওরা রাস্তার বাঁকে মিলিয়ে যেতেই ও বাড়িতে ঢুকল কৌশিক। আর ওকে দেখেই মোটাসোটা ক্যালিন্দীচরণ ছেলেমানুষি খুশি গলায় এনে বলল, 'ইশ্! আর একটু আগে এলেই আপনার সঙ্গে নিশাদিদিমণির দেখা হয়ে যেত।'

কৌশিক মনে মনে প্রশ্ন করল, 'নিশাদিদিমণি না তুলিদিদিমণি?' কিন্তু মনে মনে প্রশ্ন করলে তো তার কোনও উত্তর পাওয়া যায় না।

কালিন্দীচরণ নিজের খেয়ালে আরও কিছুক্ষণ গল্প করে যাওয়ার পরে জিজ্ঞেস করল, 'কী খাবেন বলুন?'

'যা দেবে তাই। এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভীষণ খিদে পেয়ে যেতেই তোমার কথা মনে পড়ল। তাই ঢুকে পড়লাম।'

অতিথির খিদে পাওয়ার কথা শুনে কেমন যেন ব্যাকুল হয়ে পড়েছিল কালিন্দীচরণ। কিছুক্ষণের মধ্যেই ও খাবার-টেবিলে খাবারের মস্ত একটা পাহাড় বানিয়ে ফেলল।

কৌশিক যখন খেতে খেতে রান্নার তারিফ করে যাচ্ছিল তখন মানুষটার চোখেমুখে বেশ একটা তৃপ্তির ছাপ ফুটে উঠেছিল। অতিথিকে ভালমন্দ খাওয়াতে পেরে আর কোনও পুরুষমানুষকে কৌশিক এতখানি খুশি হতে দেখেনি কখনও।

খাওয়াতে খাওয়াতে গল্প জুড়েছিল কালিন্দীচরণ। সব গল্পই এ-বাড়ির গল্প। কৌশিক খুব সন্তর্পণে গল্পের বিষয় গড়িয়ে দিয়েছিল নিশাদিদিমণির দিকে।

নিশাদিদিমণিকে কালিন্দীচরণ সত্যিই খুব ভালবাসে। যাকে খুব ভালবাসা যায় তার দুঃখে মানুষ কাতর হবেই। গল্প করতে করতে হঠাৎই আবেগতাড়িত হয়ে কালিন্দীচরণ চাপা গলায় বলল, 'দিদিমণির মতো মেয়ে হয় না, কিন্তু ওর কপালটা সত্যিই খুব খারাপ। আপনাকে নিজেদের লোক ভাবি বলেই বলছি দাদা, আপনি কিন্তু কাউকে বলবেন না....।'

উনিশ

ফিল্মের ডিরেক্টরদের একটা মার্কামারা চেহারার সঙ্গে অনেকেই পরিচিত। তাঁদের মাথায় টুপি থাকে, গলায় ঝোলে ভিউ-ফাইণ্ডার। প্রায়ই সামনে দু-হাত ঠেলে দিয়ে দুটো বুড়ো আঙুল টানটান করে ঠেকিয়ে, উঁচুতে তোলা আঙুলগুলোর সাহায্যে একটা ফ্রেম তৈরি করেন। ওই ফ্রেমের মধ্যেই শুটিংয়ের দৃশ্য বন্দি করতে চান তাঁরা। মাঝেমধ্যে গিয়ে মুভি ক্যামেরায় চোখ রাখেন। চলচ্চিত্রের পাত্রপাত্রীদের নির্দেশ দেন প্রয়োজনমতো। ছবির পরিচালকদের এটি একটি সাধারণ চেহারা। কিন্তু যাত্রার নির্দেশকদের পোশাক-আশাক, রকমসকম কেমন হয়?

এক-এক জায়গায় নির্ঘাত এক-একরকম। তবে মুখার্জিবাবুর সঙ্গে মার্কামারা ওই চলচ্চিত্র-পরিচালকদের বেশ একটা মিল ছিল। দুপুর-রোদে খোলা আকাশের নীচে শুটিং নয়, যাত্রার মহড়া চলছে কিশোর চৌধুরীর বৈঠকখানায়; কিন্তু মুখার্জিবাবুর মাথায় একটা টুপি। বগলের খাতায় লেখা সংলাপ। নির্দেশনা দিতে গিয়ে ওঁর বিরক্তির মাত্রা উত্তরোত্তর বাড়ছিল। শেষে একটানে টুপি খুলে বেতের চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ে বললেন, 'নাহ্! এদের দ্বারা আর যাই হোক অভিনয় করা সম্ভব নয়। এইটুকু তো পার্ট, কিন্তু কেউ কিছু মুখস্থ করেনি। মাঝে আর তো ক'টা দিন, এর মধ্যে আসরে আমি পালা নামাব কী করে! মিস্টার চৌধুরী আপনি দয়া করে অন্য কোনও ডিরেক্টর দেখুন। আমার দ্বারা হবে না।'

কিশোর চৌধুরীর বিশাল বৈঠকখানার মধ্যিখানে আসবাবপত্র সরিয়ে যাত্রায় মহড়ার জায়গা বার করা হয়েছে। চারদিকে বেশ কিছু চেয়ার। সেখানে বসে আছেন দিব্য মল্লিক, অতনু দত্ত, কিশোর ও কৌশিক। ডক্টর মৈত্র যাত্রার মহড়া দেখার ব্যাপারে খুব উৎসাহী। আসবেন বলেছেন, কিন্তু এখনও এসে পৌঁছননি।

ঘরের মধ্যিখানে ফরাস পাতা। যাত্রায় অভিনয় করার জন্যে মালদা'র কয়েকজন গাঁয়ের মানুষ নিয়ে এসেছেন কিশোর চৌধুরী। পরিচালক মুখার্জিবাবুর ধমক খেয়ে তারা সব মুখ চুন করে বসেছিল। মাথার ওপর ফ্যান ঘুরছিল ফুল স্পিডে, কিন্তু সেই হাওয়া

যথেষ্ট মনে না করার জন্যেই বুঝি টুপি ঘুরিয়ে হাওয়া খাচ্ছিলেন মুখার্জিবাবু। ওঁর মুখ থমথমে।

ঘরের মধ্যে অস্বস্তিকর অবস্থা। অবস্থার কোনও হেরফের হল না পাক্কা এক মিনিট। তারপর কিশোর চৌধুরী উঠে গিয়ে গাঁয়ের ওই লোকগুলোর সামনে হাঁটু মুড়ে বসে বললেন, 'ডিরেক্টরসাহেব আজ তিনদিন হল আলাদা-আলাদা কাগজে প্রত্যেকের পার্ট লিখে তোমাদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছেন। এইটুকুন-এইটুকুন পার্ট, একবার দেখলেই মনে থেকে যায়; আর তোমরা তিন দিনেও ওগুলো মুখস্থ করতে পারোনি। শোনো, তোমাদের কপাল ভাল যে, মুখার্জিসাহেবের মতো এত বড় একজন পরিচালক তোমাদের কাজ শেখাচ্ছেন। যা শেখাচ্ছেন যত্ন করে শিখে নাও, সুযোগ জীবনে বারবার নাও আসতে পারে। এ তো আর যাত্রার অধিকারীর কাছে পালাগান শেখা নয়।'

কৌশিক লক্ষ করে দেখল, কিশোর চৌধুরীর এই বক্তৃতায় মুখার্জিবাবুর চোখমুখ বেশ কোমল হলেও গাঁয়ের লোকরা খুব একটা খুশি হল না।

একটু বাদে মুখার্জিবাবু তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে টুপিটা পরে গাঁয়ের নটদের দিকে আঙুল তুলে বললেন, 'শোনো, আজ আর একটা মাত্র দৃশ্যের মহড়া হবে। তারপর তোমরা তোমাদের ঘরে গিয়ে পার্ট মুখস্থ করতে বসে যাবে। কাল এসে দেখি যদি পার্ট মুখস্থ হয়েছে তাহলেই মহড়া চলবে, নাহলে নয়।'

ফরাসের ওপর খাঁচার সিংহের কায়দায় বারতিনেক পায়চারি করে নিয়ে মুখার্জিবাবু গাঁয়ের লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'পুরো ব্যাপারটা আর একবার বলছি, ভাল করে শোনো। এটা আজকের ব্যাপার নয়, কয়েকশো বছর আগের ঘটনা। তখন সুলতানের আমল। সুলতানের নাম ইউসুফ। তোমরা সেই সুলতানি আমলের লোক। আছ কোথায়? না, তোমাদেরই গাঁয়ে। মানে মালদার গাঁয়ে। আশেপাশে এখন যেমন আমবাগান দেখ, তখনও তাই ছিল। তা, তোমরা দেখলে, মানে আগে থেকেই জানো, একটা আমবাগানের মধ্যে সুন্দর একটা বাড়ি আছে। সেখানে কে থাকে? না, সুলতানের পেয়ারের এক নাচনেওয়ালি। তার নাম কী?'

অমনি গাঁয়ের লোকগুলো প্রায় একসঙ্গেই উত্তর দিয়ে উঠল—'ফজলবিবি'।

'গুড। তা, এই ফজলবিবিকে দেখতে কেমন ছিল?'

এবার অবিকল পাঠশালার পড়ুয়াদের ঢঙে জবাব দিল মাঝবয়েসী গাঁয়ের লোকগুলো— 'আগে ছিল খুব রোগা, পরে খুব মোটা।'

'বেশ। ছিল ছিপছিপে, হয়ে গেল হাতির মতো মোটা। তা অমন মোটা মেয়েছেলে হেলেদুলে চললে বা নাচের ভঙ্গি করলে তোমাদের কী পায়?'

উত্তরে হে-হে করে হেসে উঠল গাঁয়ের লোকগুলো।

'ঠিক, এই রকমের হাসিই পায়। গজু তুমি উঠে এসো। তুমি হলে গিয়ে আমওয়ালা। তুমি ঝুড়িটা ওই কাপড় দিয়ে ঢেকে মাথায় তোলো। ওই হচ্ছে ফজলবিবির বাগান—। তুমি মস্ত ঝুড়িটা মাথায় নিয়ে কুঁজো হয়ে বেরুচ্ছ ওই বাগান থেকে। নাও, বার হলে—। খাঁদা, তুমি আসছ উল্টো দিক থেকে। হ্যাঁ, এবার কী বলবে বলো। '

খাঁদা বিড়বিড় করে পার্টটা একবার ঝালাই করে নিয়ে বলল, 'গজু তোমার ওই ঝুড়িতে কী আছে?'

'এঁজ্ঞে আম।'

'ক' কুড়ি?'

'এঁজ্ঞে এক কুড়ি।'

'সে কী গো! এত বড় ঝুড়ি আব মাত্র এক কুড়ি আম!'

'এঁজ্ঞে এ তো যে সে আম লয়।'

'কী আম তবে?'

গজু চারদিক একবার দেখে নিয়ে বলল, 'মস্ত বড়-বড় এই আমগুলোর লতুন নাম দিয়েছি আমরা।

'কী নাম গো?'

'আমের চেহারা তো ঠিক ফজলবিবির মতো; তাই এ আমের নাম দিয়েছি ফজল আম। ফজলি আমও বলতে পারো। হে-হে, হে-হে-হে-হে।'

'বেড়ে বলেছ তো, ফজলি আম। হা-হা, হো-হো-হি-হি।'

'আস্তে হাসো। পেয়ারের বিবিকে নিয়ে মজা করছি জানতে পারলে সুলতান আমাদের গর্দান নেবে। হে-হে, হে-হে, হে-হে।'

চড়-চড় করে হাততালি দিয়ে উঠলেন ডক্টর মৈত্র। উনি দ্বিতীয় দফা মহড়ার শুরুতেই ঘরে ঢুকে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিলেন দোরগোড়ায়।

নাটনটীরা হাততালি পেলে সবার আগে বোধহয় বুক ফুলে ওঠে পরিচালকের। মুখার্জিবাবু টুপি খুলে মুখ-চোখ-ঘাড়ের ঘাম মুছে নিয়ে হাসি-হাসি মুখে বললেন, 'আমি যা চাই তার দশ ভাগের এক ভাগও করতে পারেনি এরা। তবে মন্দের ভাল, পার্ট ভোলেনি এবার। কিন্তু মুখস্থ আরও ভালভাবে করতে হবে। আর, ওরকম কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে হাসি কেন? বেদম হাসি হাসলে হাসতে-হাসতে শরীর তো বেঁকেচুরে যায়। কী গো, যায় না?'

গাঁয়ের লোকগুলো একপাশে মাথা নাড়তেই মুখার্জিবাবু বললেন, 'যাও আজকের মতো মহড়া শেষ। তবে তোমাদের কাজ শেষ নয়, ঘরে গিয়ে পার্ট মুখস্থ করবে। বসে-বসে নয় কিন্তু, অ্যাকশন দিয়ে—যেমন দেখিয়ে দিয়েছি।'

বলার সঙ্গে সঙ্গে লোকগুলো উঠে পড়ে দুদ্দাড় করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ডক্টর মৈত্র বললেন, 'এই যে নাটকের ফর্ম, মানে ডায়ালাগ্-টায়ালগ্ কি আপনারই লেখা?'

লাজুক মুখে মুখার্জিবাবু মাথা কাত করলেন একপাশে।

আবার তারিফ ফুটে উঠল ডক্টর মৈত্রের গলায়—'বাহ্! রাস্টিক ব্যাপারটা তো বেশ ভাল এনেছেন। একেবারে গণ্ডগ্রামের লোক এই ভাবেই তো কথা বলে।'

'না-না, আমি ঠিক পারিনি। গাঁয়ের লোকদের কথাবার্তা আরও সহজ-সরল হয়, মজা থাকে, এক ধরনের উদ্ভট পণ্ডিতিও থাকে। এই যে বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, নীলদর্পণ—এ তো গ্রামের লোকদের সংলাপের মণিমুক্তো। গাঁয়ের লোকদের ঠিক-ঠিক সংলাপ লিখতে গেলে তো পরিচালকদের এগুলো বারবার পড়া উচিত।'

এবার মুখ খুললেন অতনু দত্ত। 'ওসব ক্লাসিকের কথা এখন বাদ দিন। আপনি যা করেছেন বেশ করেছেন, আমাদের খুব ভাল লেগেছে।'

প্রশংসা শোনার পরেও হতাশ দেখাচ্ছিল মুখার্জিবাবুকে। 'আমি কিন্তু আমার কাজে মোটেও সন্তুষ্ট হতে পারিনি। শেষের এই লোকদুটো তবু যা হোক উতরে দিয়েছে, কিন্তু বাকিগুলো একেবারে গোলা। মনে হয় জীবনে কখনও অভিনয় করেনি। আপনি যদি কিশোরবাবু আমাকে অভিনেতাদের একটু বাছাই করে নিতে দিতেন—।'

কথাটার মধ্যে বোধহয় মৃদু একটা অভিযোগ ছিল। একটু বিব্রত মুখে কিশোর চৌধুরী বললেন, 'আমি আসলে মালদার গাঁয়ের লোকদের দিয়েই অভিনয় করাতে চেয়েছিলাম—!'

'বেশ তো, আপনি আমাকে একবার সঙ্গে নিয়ে গেলে আমি ওই গ্রাম থেকেই ভাল অভিনেতাদের বাছাই করে আনতাম। ওখানে ঝুমুরের দলটল আছে শুনেছি—। তা ছাড়া একটু খুঁজলেই চলনসই যাত্রার অভিনেতা পাওয়া যায় গাঁয়ের মধ্যে।'

ডক্টর মৈত্র বললেন, 'আমাকে ঠিকানা দিলে আমিও তো নিয়ে আসতে পারতাম। আমি তো একদিনের জন্যে মালদা, না-না প্রাচীন গৌড় ঘুরে এলাম।'

'তাই নাকি! আপনি যে ওখানে যাবেন, কিছুই তো বলেননি আমাদের!' অবাক হয়ে বললেন কিশোর চৌধুরী।

'ঠিক ছিল না। হেকটিক ট্যুর। একটা দিন ছিলাম।'

'কেমন লাগল গৌড়ভূমি?'

'মর্মান্তিক! আমি তো পরশু একটা প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করে ফেলেছি। কনফারেন্স, পরে ককটেল অ্যান্ড ডিনার। আপনারা সবাই আসবেন।'

ডক্টর মৈত্র অ্যাটাচি খুলে নিমন্ত্রণের চিঠি বার করে প্রত্যেকের হাতে ধরিয়ে দিলেন।

কৌশিক বলল, 'গৌড় কেন আপনার মর্মান্তিক বলে মনে হয়েছে, ব্যাপারটা তো ঠিক বুঝতে পারলাম না।'

'সত্যিই মর্মান্তিক! একটা সভ্য দেশে যে এইরকম একটা কাণ্ড ঘটতে পারে—আমি কল্পনাই করতে পারি না। পরশু প্রেস কনফারেন্সে আসুন, আমি সব বলব। ছবিও দেখাব। আচ্ছা, অ্যান্‌'স ইন্‌ কীরকম কেটারার? কনফারেন্সে খাওয়ানো-দাওয়ানোর দায়িত্ব ওদের ওপরেই দিয়েছি। কেমন?'

'ভাল কেটারার। বড়-বড় কাজ করে শুনেছি।' উত্তর দিল কৌশিক।

আর মাত্র কয়েকটা দিন পরে মালদার রামকেলিতে বিশাল এক অনুষ্ঠান। বাঙালির শিল্প-সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে হই-চই ফেলে দেওয়ার বিরাট এক পরিকল্পনা নিয়েছেন কিশোর চৌধুরী। এত দিন ধরে কী তার তোড়জোড়! কয়েকটি দেশের ডেপুটি হাই-কমিশনের কর্তাব্যক্তিরা, বেশ কিছু সাহেবসুবো, বাংলাদেশের মানী কিছু লোকজন অনুষ্ঠানে আসবেন। অ্যাদ্দিন ধরে এসব নিয়ে কিশোর কী বকবক করতেন, কিন্তু হালে খুব চুপচাপ হয়ে গেছেন। ডক্টর মৈত্র এটা লক্ষ করেছেন বলেই বেশ গলা তুলে বললেন, 'কী মিস্টার চৌধুরী আপনি হঠাৎ এত চুপচাপ কেন? টেনশন হচ্ছে? না-না, ওসব একদম পাত্তা দেবেন না। আপনি হচ্ছেন দলের পাণ্ডা, না-না পাণ্ডা নন, ঠিক শব্দটা কী হবে যেন—।'

ঠিক শব্দ জোগান দিলেন অতনু দত্ত—'পাণ্ডা নন, প্রাণপুরুষ।'

'কার্‌রেক্ট! তা প্রাণপুরুষ এত ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আমাদের চলবে কী করে? আপনি একটু ওয়ার্ম-আপ করে নিন। আর একটা কথা, সেদিন আমাকে ফার্স্ট রোয়ে একটা সিট দেবেন, আমি আপনাদের পুরো অনুষ্ঠানটা দেখতে চাই—।'

একটু পরে 'কাজ আছে' বলে উঠে পড়লেন ডক্টর মৈত্র। তার একটু বাদে কৌশিকও উঠে পড়ল। ঘরের বাকি সবাই রয়ে গেলেন।

বেরুবার চল্লিশ মিনিটের মধ্যে কৌশিক একটা ট্যাক্সি নিয়ে হাজির হল কালীঘাটে। এখানে একটা পুরনো আমলের তিনতলার একতলায় অ্যাডভোকেট কিরণ সেনের চেম্বার। কৌশিকের সঙ্গে খুব রোগা আর লম্বা চেহারার এক ভদ্রলোক ছিলেন।

চেম্বারে ঢুকতেই উকিলবাবু একটুখানি আপ্যায়নের হাসি হেসে সামনে-বসা একমাত্র মক্কেলের দিকে নজর দিলেন।

টেবিলের সামনে আদ্যিকালের দু-সারি চেয়ার। দ্বিতীয় সারিতে কৌশিক বসল।

উকিলবাবুর বয়স বোধহয় সত্তরের ওপরে। মাথায় একরাশ ধপধপে সাদা চুল। চুলগুলো হয়তো আইনের কূট ব্যাখ্যার চাপে বহুকাল আগেই পেকে গেছে। উকিলবাবু চোখের চশমা

খুলে টেবিলের ওপর রেখে সামনের মক্কেলকে বললেন, 'বিষয়-আশয়ের ব্যাপার, তার ওপর আবার জ্ঞাতির সঙ্গে বিবাদ। এ-ব্যাপারে আমার পরামর্শ যদি চান, আমি বলব আপসে মিটমাট করার চেষ্টা করুন। কারণ, মামলা-মোকদ্দমা করলে চট করে নিষ্পত্তি হয় না বেশির ভাগ ক্ষেত্রে। আজ আপনি বাড়ি যান, আপনার নিকট আত্মীয়বন্ধুর সঙ্গে কথা বলে দেখুন সমঝোতার কোনও রাস্তা খোলা আছে কি না—। যদি না থাকে, আসবেন আবার। আমি মামলা ঠুকে দেব।'

আইন যার ব্যবসা, সেই মানুষটির মুখ থেকে এই ধরনের কথা শুনলে, আইন-ব্যবসায়ীটির প্রতি মক্কেলের শ্রদ্ধা একলাফে দশ গুণ বেড়ে যাবে। কাজের সুবাদে কৌশিককে মাঝেমধ্যে নানা উকিলের কাছে যেতে হয়, তাদের অনেকের মুখেই ও হুবহু এই কথাটা শুনেছে। এটা কি বঁড়শি-গাঁথা রুই-কাতলাকে হুইলে সুতো ছেড়ে জলে খেলানো? তাই হবে বোধহয়। পুরোপুরি বাগে আনতে হলে আগে একটু ছেড়ে দেওয়াটাই নিয়ম। কৌশিক এই মুহূর্তে যে-কারও সঙ্গে বাজি রেখে বলতে পারে—এই লোকটি এক সপ্তাহের মধ্যে ফিরে এসে এই উকিলবাবুর সাহায্যেই তার আত্মীয়টির বিরুদ্ধে মামলা ঠুকে যাবে।

উকিলবাবুর পরামর্শে বিচলিত মক্কেল বলল, 'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন, আমি মিটমাটের চেষ্টা করে দেখব একবার; তবে মনে হয় না কোনও কাজ হবে।'

'হতেও তো পারে, দেখুন না। প্রথমেই মামলা-মোকদ্দমার মধ্যে ঢোকার জন্যে কাউকেই আমি পরামর্শ দিই না।'

কৌশিকের হাসি পেয়ে গেল। সত্যিই যদি তাই হত, সব যদি আপসেই রফা হত, তাহলে এই উকিলবাবুদের চলত কী করে!

মক্কেলটি চলে যেতেই অ্যাডভোকেট কিরণ সেন আর একবার আপ্যায়নের হাসি হেসে বললেন, 'সামনে আসুন। এবার আমি ফ্রি ম্যান, তখন তো আপনার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথাই হল না। ব্যাপারটা কী একটু খোলসা করে বলুন তো। আপনি চলে যাওয়ার পর থেকেই আমি বেশ দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি—।'

উকিলবাবু আরও কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই গোয়েন্দা ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'আপনার সেই গিফ্‌ট ডিডের দুটো কপি হয়ে গেছে?'

'কপি মানে টাইপ-করা কপি তো? হ্যাঁ, হয়ে গেছে।'

'দিন তাহলে ওগুলো। ইনি কাজ শুরু করে দিন। ওহ্! এঁর সঙ্গে আপনার আলাপই করিয়ে দেওয়া হল না। ইনি অজয় সিংহ। ডকুমেন্ট আসল কি নকল ধরার ব্যাপারে ইনি আমাদের সাহায্য করে থাকেন। এঁর কাজ এত ভাল যে আমরা ঠাট্টা করে এঁর নাম দিয়েছি মাস্টার ফোর্জার। আসলে ফোর্জারি ধরার ব্যাপারে এঁর জুড়ি নেই। আর ইনি হচ্ছেন—।'

অজয় সিংহ হাত তুলে কৌশিককে থামিয়ে দিয়ে লাজুক মুখে বললেন, 'কী আশ্চর্য! এঁর আবার নাম বলার কী দরকার, আমরা বহু দিন থেকেই এঁকে চিনি। দিন ওগুলো দিন, শুনে যা বুঝেছি—ঘন্টাখানেকের আগে কাজটা তুলতে পারব না।'

পুরনো আমলের বাড়ি। মধ্যিখানে লম্বাচওড়া একটা করিডর থাকার ফলে এ-ঘর আর ও-ঘরের মধ্যে বেশ কিছুটা ব্যবধান। ও-পাশের ঘরেই কাজ শুরু করলেন অজয় সিংহ। এদিকে, এই চেম্বারে মুখোমুখি দুজন। গলা খাদে নামিয়ে কিরণ সেন বললেন, 'তখন বলে গেলেন অলোকের জীবনসংশয় হতে পারে। কিন্তু কেন? একটু খুলে বলুন তো।'

কৌশিকের গলা আরও একটু নীচে নামল। বলল, 'অলোকবাবু ওঁর ব্যবসা, বিষয়আশয় পছন্দসই লোকদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করতে চাইছেন—ভাল। কিন্তু দানপত্র তৈরি হওয়ার পরে দেখা গেল পুরো ব্যাপরাটা উল্টো-পাল্টা হয়ে গেছে। উনি মুখে যা বলেছিলেন তার সঙ্গে কাজের কোনও মিল নেই। এর ফলে বেশ কিছু দাবিদারের মধ্যে হতাশা ও রাগ বেড়ে যেতে পারে। তার থেকে একটা অঘটন ঘটে যাওয়া অসম্ভব নয়। এটা গেল একটা দিক। আর একটা দিক হল—এই দানপত্র তৈরির পেছনে যদি কোনও চক্রান্তকারীর প্ররোচনা থাকে—কাজ হাসিল হয়ে যাওযার পরে সে চাইবে আপদ বিদেয় হোক। অলোকবাবু যদি খুনই হয়ে যান, তাহলে তো তিনি আর মত পালটে আগের মতো দানপত্রটা ছিঁড়ে ফেলার সুযোগ পাচ্ছেন না।'

গোয়েন্দার কথায় গম্ভীর মুখে সায় দিয়ে উকিলবাবু বললেন, আপনার আশঙ্কার মধ্যে যুক্তি আছে। আগের দানপত্র আর পরের দানপত্রের মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। এত তাড়াতাড়ি এত পরিবর্তন স্বাভাবিক ঘটনা নয়। বোঝা যায় অলোক চটে গিয়ে বঞ্চিত করেছে কাউকে-কাউকে। কিন্তু আমি বলছি কি, এত ঝাঞ্ঝাট-ঝামেলার মধ্যে না গিয়ে দানপত্রের কথা আপাতত চেপে গেলেই তো বিপদ এড়ানো যায়।'

'না, তার আর কোনও উপায় নেই। দানপত্র যে তৈরি হয়ে গেছে--এ-কথাটা এর মধ্যেই কেউ-কেউ জেনে গেছে। তা ছাড়া বিপদের ভয়ে দানপত্র কিছুদিন সরিয়ে রাখার কথা বললে উল্টো ফল ফলতে পারে। অলোকবাবু অত্যন্ত একরোখা, জেদি মানুষ—।'

'ঠিক বলেছেন, আমি তো ওর ছেলেবেলার বন্ধু। ওর জেদ, গোয়ার্তুমি—এইটুকুন বয়েস থেকেই অস্বাভাবিক রকমের বেশি। আর একটা ব্যাপার, কোনও বিষয়ে ওর যদি একটা ধারণা গড়ে ওঠে, তার থেকে ওকে ফেরানো অসম্ভব। সে আপনি যতই যুক্তি-তর্ক দেখান না কেন, ও কিছুই মানতে চাইবে না। এইরকম একটা বিদঘুটে ধারণা মাথায় চেপে বসার জন্যে দ্বিতীয়বার আর বিয়ের পিঁড়িতেই বসল না অলোক। একুশ বছর বয়েসে বিয়ে করেছিল, স্ত্রী মারা যায় তেইশে। মাত্র তিন বছরের বিবাহিত জীবন। বাচ্চাকাচ্চাও হয়নি। একেবারে নিঃসঙ্গ জীবন বলতে যা বোঝায়, ঠিক তাই। ওর স্ত্রীর নাম লীলা। আমরা

সবাই এক গ্রামের মানুষ। লীলা ছিল আমাদের ছেলেবেলার খেলার সঙ্গিনী। সে-আমলে টাইফয়েডের ভাল চিকিৎসা ছিল না। লীলা মারা যায় টাইফয়েডেই। মারা যাওয়ার পরে অলোক আমাকে একদিন বলেছিল : এ-রকম যে হবে আমি আগেই জানতাম। কেন? না, বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের এই কথাটা তখন ওর মাথয় একেবারে গেঁথে ছিল।'

কৌশিক মৃদু হেসে বলল, 'শুধু তখন ছিল না, এখনও আছে।'

'ওহ্! এ-নিয়ে আপনার সঙ্গে তাহলে ওর কথা হয়েছে।'

'খুব বেশি নয়, সামান্যই। আমি একদিন আসব আপনার কাছে, এই ব্যাপারে আমার কিছু জানার আছে। ভাল কথা, আপনার মাদ্রাজের সেই বন্ধুকে ফোন করেছিলেন অলোক-বাবুকে আরও কয়েকটা দিন আটকে রাখার জন্যে?'

'হ্যাঁ, আপনি চলে যাওয়া পরেই ফোন করেছিলাম।বলেছি দিল্লি থেকে অলোকের মাদ্রাজে যাওয়ার কথা। গেলে তোমার সঙ্গে দেখা করবেই। দেখা করলে তুমি কোনও অছিলায় ওকে কয়েকটা দিন আটকে রাখার চেষ্টা করবে। এখন কলকাতায় ফিরলে ওর জীবনহানির আশঙ্কা আছে। তারপর এদিকের ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে বলেছি। মাদ্রাজের আশুও আমাদের ছেলেবেলার বন্ধু। মস্ত বড় সলিসিটর। ওর চেষ্টায় কোনও ত্রুটি থাকবে না।'

কথায় কথায় আরও কিছুটা সময় যাওয়ার পরে ও-ঘর থেকে অজয় সিংহ হাঁক পাড়লেন—'কৌশিকবাবু একবার আসবেন তো।'

'আসছি' বলে জবাব দিল কৌশিক, তারপর উকিলবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কাজটা বোধহয় হয়ে গেছে।'

একটু বাদে ফিরে এসে উকিলবাবুর টেবিলে দুটো গিফ্‌ট ডিড ফেলে দিয়ে বলল, 'বলুন তো এর মধ্যে কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা নকল?'

চোখে চশমা এঁটে উকিলবাবু ঝুঁকে পড়ে বেশ কিছুক্ষণ ধরে ডিডদুটো পরীক্ষা করার পরে চোখ কপালে তুলে বললেন, 'এ তো দেখছি দারুণ জালিয়াতি! কোন্‌টা আসল আর কোন্‌টা জাল আমি নিজেই ধরতে পারছি না!'

কৌশিক গম্ভীর মুখে ডিডদুটো রোল করে একটায় লাল আর একটায় নীল ব্যান্ড জড়িয়ে বলল, 'এই লাল ব্যান্ডেরটা হচ্ছে জাল দানপত্র, এটা আপনার চেম্বারের ওই আলমারিতে রাখুন। সবাই জানে আপনি ওখানে উইলটুইল ইত্যাদি দরকারি কাগজপত্র রাখেন। চোর এলে জাল দানপত্রটাই চুরি করবে। আর এই সবুজ ব্যান্ডওয়ালাটা আসল—এটা আপনি আপনার ভেতরের ঘরের স্টিল-আলমারির লকারে রেখে দিন। নিন, আমাদের সামনেই জাল উইলটা এই আলমারিতে ঢোকান তো, না হলে পরে গুলিয়ে যেতে পারে।'

উকিলবাবু বাধ্য ছেলের মতো লাল ব্যান্ডওয়ালা দানপত্রটা সামনের কাঠের আলমারিতে ঢুকিয়ে কাঁধ সামান্য ঝাঁকিয়ে বললেন, 'এ ঘরে চোর আসবে, চুরি করে বোকা বনবে। তাতে আবার আপনার রহস্য সমাধানের সুবিধে হবে। ঠিক আছে, আপনি গোয়েন্দা, আপনার কথা আমার শোনা উচিত।'

মৃদু হেসে কৌশিক উত্তর দিল, 'প্লিজ, আর দু-চারটে দিন শুনুন। আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুর প্রাণ বাঁচাবার জন্যেই শুনুন। পরে যদি দেখেন আমার আশঙ্কা অমূলক, শুনবেন না। দানপত্রের একটা টাইপ্‌ড কপি আমার কাছে রেখে দিলাম। আমি এটা একটু স্টাডি করব। আজ চলি তাহলে। গুড নাইট।'

পথে বেরিয়েই একটা ট্যাক্সি পেয়ে গিয়েছিল ওরা। ট্যাক্সি একটুখানি যাওয়ার পরে অজয় সিংহ ওঁর ব্যাগ খুলে জেম্‌স ক্লিপ লাগানো কিছু কাগজ গোয়েন্দার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই নিন আপনারটা। দুটো থাকল তাহলে উকিলবাবুর কাছে।'

কৌশিক ওটা নিয়ে বলল, 'আপনাকে কোথায় নামাব বলুন অজয়বাবু?'

'গড়িয়াহাটের মোড়ে নেমে যাব। আপনি এখন কোন্ দিকে? বাড়ি?'

'না, আমাকে একবার বেনেপুকুরের গোমসের কাছে যেতে হবে।'

কুড়ি

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে দুঁদে পুলিশ অফিসার শুকনো মুখে আপ্যায়নের হাসি হেসে বললেন, 'কনস্টেবল পাঠিয়ে ডেকে আনালাম বলে তুমি আবার চটে যাওনি তো কৌশিক?'

সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠল তরুণ গোয়েন্দাটি— 'কী যে বলেন অবনীদা! আমি কী এমন তালেবর যে আমাকে ডেকে পাঠানো যাবে না? তা ছাড়া আপনার সঙ্গে আমার যা সম্পর্ক—যখন ইচ্ছে তখন তলব করবেন।'

ঘোষরায়ের বিব্রত ভাবটা এখনও যায়নি। একটু থেমে-থেমে বললেন, 'তোমাকে আমি বহুবার টেলিফোনে ধরবার চেষ্টা করেছি—।'

'ধরবেন কী করে, আমার বাড়ির টেলিফোন খারাপ হয়ে বসে আছে। প্রায়ই বিগড়োয়। আজকাল টেলিফোন থাকা না-থাকা দুই-ই সমান।'

'ভেবেছিলাম আমিই হাজির হয়ে যাব তোমার ডেরায়, কিন্তু—।'

'না, আমি দেখছি আপনি সত্যিই আমাকে খুব পর ভাবেন।'

'পর নয় রে ভাই, তুমি হলে গিয়ে আমার মধুসূদন, বিপদতারণ মধুসূদন। দিব্যি ছিল কেসটা, সোজাসাপটা, কিন্তু আমার কপালের গুণে গোলমেলে হয়ে উঠেছে। আমাদের অত ভাল আর্টিস্টটার চোখে কনজাংটিভাইটিস হয়ে গেল হঠাৎ। রোগটা কয়েকদিন আগে কিংবা পরে হলে আমি তরে যেতাম নির্ঘাত।'

'সে কী, সারেনি এখনও! আপনি সেদিন বললেন যে, সারার মুখে।'

'বললাম না আমার কপালের গুণ! সারার মুখে আবার ধরেছে। ভাল হয়ে এসেছে অনেকখানি। তবে দু-তিন দিনের আগে কাজটা ধরতে পারবে বলে মনে হয় না। এদিকে বড়কর্তাদের ধমক—কেস কত দূর এগোল? মার্কামারা ধমক আর প্রশ্ন।'

'আপনার কাজ কি একেবারেই এগোয়নি?'

'কেন এগোবে না? আমি তো আর হাত-পা গুটিয়ে বসে নেই।' কথাটা বলার পরেই নিজের চেয়ারে বসে পড়লেন অবনী ঘোষরায়।

উলটোদিকের চেয়ারে কৌশিকও বসল, তারপরেই প্রশ্ন করল, 'মিলন মাইতির খুনি হিসেবে কাউকে কি আপনি সন্দেহ করছেন?'

'না-না, অদ্দূর আর এগুবার সুযোগ পেলাম কোথায়, তবে—।'

'তবে কী?'

'মিলন মাইতি যে গাড়ি চেপে যাচ্ছিল সেদিন, সেটা তো ভাড়ার গাড়ি—। সেই গাড়িটার আসল মালিকের খোঁজ পেয়ে গিয়েছি আমি।'

'কে?'

'মিলন মাইতি যে কোম্পানিতে কাজ করত সেখানকারই একজন বড় সাহেবের।'

'কী নাম?'

'সুনন্দ তরফদার।'

উত্তরটা শুনে কৌশিক বোধহয় একটু চমকে উঠেছিল।

সতর্ক চোখের দুঁদে অফিসারটি জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি চেনো না কি?'

'এই নামের একজনকে চিনি, তবে তিনি বহু বছর ধরে দিল্লির বাসিন্দা।'

একটু হতাশ হয়ে ঘোষরায় বললেন, 'তাহলে তুমি আমার আর কী উপকারে এলে!'

'লোকটাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন?'

'কী করে করব? খোঁজ পেয়ে তড়িঘড়ি করে ধরতে গেলাম, কিন্তু তার আগেই পাখি হাওয়া। লোকটা নির্ঘাত খোঁজখবর রাখছিল। বিপদের গন্ধ পেয়েই পালিয়েছে। আমার মনে হয়, মিলন মাইতির খুনের সঙ্গে এই লোকটা জড়িত।'

কৌশিকের কপালে বেশ কয়েকটা ভাঁজ ফুটে উঠেছিল। ঘোষরায় বুঝতে পারলেন, ছোকরার মাথার মধ্যে রহস্য সমাধানের জটিল অঙ্ক কষার কাজ চলছে।

জোর করে নিজেকে শান্ত করে রাখার চেষ্টা করলেন অফিসার, কিন্তু বেশিক্ষণ পারলেন না। একটু বাদেই অস্থির ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলেন, 'কী, কী মনে হচ্ছে? আমার অনুমান ঠিক?'

একটু অবাক হওয়ার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল কৌশিকের মুখে। 'আপনার এই কেসটার

তদন্তের ব্যাপার তো আমি খুব একটা জানি না। তবে আপনি পাকা মাথার লোক, মনে হয় ঠিক পথেই এগোচ্ছেন।'

'আর পাকা মাথা! মাথা বেশি পেকে গেলে ঝুনো হয়ে যায়। আমি এখন বোধহয় সেই অবস্থার দিকে এগোতে শুরু করে দিয়েছি!'

'কী যে বলেন! আপনার বিশ্লেষণের পদ্ধতি আমার খুব ভাল লাগে। আমার মনে হয়—।'

'কী মনে হয়?'

'মনে হয়, আপনার আর্টিস্ট মিলন মাইতির ওই গাড়ির ড্রাইভারের মুখ থেকে খুনির বর্ণনা শুনে ছবি আঁকার পরে আপনার তদন্তের কাজ তরতর করে এগোবে।'

আমারও তো তাই মনে হয়, তবে— আসলে আর্টিস্টের ওই চোখের অসুখটা না ধরলে অ্যাদ্দিনে—।'

'যাকগে ও নিয়ে আর আফসোস করবেন না। সেরে তো এসেছে প্রায়। মনে হয়, দু-তিন দিনের মধ্যেই ছবি পেয়ে যাবেন। আর ছবি পেয়ে গেলে, আপনার যে নেটওয়ার্ক, অপরাধী বেশি দিন গা ঢাকা দিয়ে থাকতে পারবে না।'

'না রে ভাই, বুদ্ধি-বিবেচনা আর নেটওয়ার্ক থাকলেই সব হয় না। শেষকালে ভাগ্যের ছোট্ট একটা লাথি খাওয়া দরকার। সেই লাথি খেলে শেষ হার্ডলটা টপকে যাওয়া যায়। গত কয়েক বছর ধরে দেখছি আমার সেই ভাগ্যটা তুমি। তোমার ধাক্কা না খেলে কাজটা পুরো হয় না। তুমি এখন কলকাতায় আছ তো?'

'আছি।'

'প্লিজ থেকো। তোমার সাহায্যের আমার দরকার হতে পারে।'

'এখন আপনার একটু সাহায্য আমার দরকার।' হাসতে হাসতে জবাব দিল কৌশিক।

'কী সাহায্য? নিঃসঙ্কোচে বলো। তোমার জন্যে, যাকে বলে— আই ক্যান ওভারস্টেপ মাই লিমিট।'

'না-না, অত বড়সড় কিছু নয়। আপনার মেয়ের বিয়েতে তো খাওয়ানোর দায়িত্বে ছিল অ্যান্স ইন—তাই না?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, কেন?'

'দারুণ খাইয়েছিল, সে স্বাদ এখনও আমার জিভে লেগে আছে। আমার এক বন্ধু বিয়ে করছে, কেটারারের কথা জিজ্ঞেস করছিল—আমি অ্যান্স ইনের কথা বলেছি।'

'তা আমার কাজ হল এখন অ্যান্স ইনের মালিককে ফোন করে বলে দেওয়া—যাতে তোমাদের শস্তায় সেরা জিনিস দেয়—এই তো?'

'হ্যাঁ, মানে আপনার যদি কোনও অসুবিধে না থাকে—।'

'কী আশ্চর্য! এর আবার অসুবিধে কী? অ্যানের মালিক প্রবোধ আমার খুব চেনা লোক। আমার কাছে নানা ভাবে ওবলিগেটেডও।'

রিসিভার তুলে নিয়ে অফিসার অপারেটরকে বললেন, 'অ্যান্'স ইন্‌কে ধরো তো—।'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল কেটারারকে। একটু নড়েচড়ে বসে বাজখাঁই গলায় অবনী ঘোষরায় বললেন, 'কে? প্রবোধ! শোনো, আমার ছোট ভাই কৌশিক তোমার কাছে যাচ্ছে। তোমাদের সার্ভিস চায়। ওর ব্যাপার মানে আমার ব্যাপার—কোনও তফাত রাখবে না কিন্তু।'

উলটো দিকের চেয়ারে বসেও উত্তরটা শুনতে পেল কৌশিক— 'ঠিক আছে স্যার, আপনি ও নিয়ে একদম চিন্তা করবেন না।'

রিসিভার নামিয়ে রেখে ঘোষরায় বললেন, 'বলে দিলাম। ওদের ঠিকানাটা তুমি জানো তো?'

'জানি।'

'কখন যাবে তুমি?

'এখনই।'

'এখনই? বেশ। বন্ধুর বিয়ে দাও আর যাই করো, কাছাকাছি থেকো কিন্তু।'

অভয় দেওয়ার হাসি হেসে কৌশিক বলল, 'ইয়েস স্যার। এখন চলি তাহলে।'

অ্যান্‌স ইন্-এর অফিস ওয়াটারলু স্ট্রিটে। ছোট্ট দুখানা ঘর, কিন্তু খুব কায়দা করে সাজানো। কয়েক বছর হল এই কেটারার খুব নাম করে ফেলেছে। ক্রিকেট টিম এলে এরাই লাঞ্চ খাওয়ায়। বেশ কিছু বিদেশি প্রতিনিধি-দলের আপ্যায়নের দায়িত্বও এরা পেয়ে থাকে। অ্যান'স ইনের মালিকের পুরো নাম প্রবোধ সি চক্রবর্তী।

কৌশিক মিনিট-পনেরোর মধ্যে ইন-এর মালিকের সঙ্গে সব দরকারি কথাবার্তা সেরে বেরিয়ে এল অফিস থেকে। তারপর একটা ট্যাক্সি ধরে সোজা ওর চেম্বারে।

মুখার্জিবাবু একটা চেয়ারে বসে আর একটা চেয়ারে পা তুলে দিয়ে বড় বড় হাই তুলছিলেন। আজ একটু আগে এসে পড়েছে কৌশিক। তরুণ মালিকের দিকে চোখ পড়তেই প্রবীণ সহকারীটি তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন।

গোয়েন্দা হাসতে হাসতে বলল, 'গোয়েন্দার অ্যাসিসট্যান্ট যদি সাতসকালে চেম্বারে বসে এত বড়-বড় হাই তোলে, আমাদের ক্লায়েন্ট তো পালাবে!'

লাজুক মুখে উত্তর দিলেন মুখার্জিবাবু—'এমনও তো ভাবতে পারে—অ্যাসিসট্যান্ট অত্যন্ত ডিউটিফুল। সারারাত্তির ধরে দরকারি সব কাজকর্ম সারার পরেও সকালে এসে অফিসে ডিউটি দিচ্ছে।'

'এখন আপনি বোধহয় খুব নাটুকে সংলাপের ঘোরে আছেন, না? শুনুন, একবার বাইরে আসুন তো। না -না, দরজায় তালা লাগাবার দরকার নেই। এই তো গলির মুখেই যাব।'

গলির মুখে বড় রাস্তা। দুদিক দিয়েই বিস্তর বাস, মিনিবাস আসা-যাওয়া করছে। আকাশে ঝকঝকে, মিষ্টি রোদ। 'আচ্ছা, ওই যে লাল রঙের সরকারি বাসটা আসছে ওটা কত নম্বর বলুন তো?'

গোয়েন্দার প্রশ্নের জবাবে মুখার্জিবাবুর চশমার আড়ালের চোখদুটো ধারালো ও ছোট হল। বললেন, 'ওটা তো তিন নম্বর,' তারপরেই নিজেকে সংশোধন করলেন—'না-না, টু-বি।'

কাছে এলে দেখা গেল বাসের নম্বর এস-১২।

মুখার্জিবাবু গজগজ করে উঠলেন, 'আজকাল বাসের নম্বরগুলো এত বিচ্ছিরিভাবে লেখা থাকে—কিচ্ছু পড়া যায় না।'

'খুব পড়া যায়। আচ্ছা, এখন যেটা আসছে সেটা কত নম্বর?'

'টু থার্টি নাইন-এ।'

কিন্তু একদম কাছে এলে দেখা গেল থার্টি-বি।

একই ধরনের আরও কয়েকটা পরীক্ষায় ফেল করলেন মুখার্জিবাবু।

একটু পেছনেই একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়িয়েছিল। কৌশিক বলল, 'এটা আপনার শেষ পরীক্ষা, নাম্বারপ্লেটটা পড়ুন তো।'

পরীক্ষার প্রতিটি পেপারে ফেল করার জন্যে মুখার্জিবাবুর আত্মবিশ্বাস একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছিল। চোখ ছোট-বড় করে নাম্বারপ্লেটটা দেখে নিয়ে বললেন, 'টু সেভেন, বাকিটা—বাকিটা ঝাপসা দেখাচ্ছে।'

'টু সেভেনটাও ঝাপসা, ওখানে লেখা আছে নাইন থ্রি। চোখের মাথাটা দেখছি ভাল-মতনই খেয়ে বসে আছেন। এই চোখ নিয়ে আপনি গোয়েন্দাগিরি করবেন কী করে বলুন তো?'

কাঁচুমাচু মুখে মুখার্জিবাবু বলললেন, 'না-না, বিশ্বাস করুন, এ[illegible] খারাপ কিন্তু আগে ছিল না।'

'ঠিক আছে, ধরা যাক মাত্র পনেরো মিনিট আগেই হয়েছে। হয়েছে তো?'

'আমার কিন্তু কাছের জিনিস পড়তে-টড়তে কোনও অসুবিধে হয় না, আপনি পরীক্ষা করে দেখুন।'

কৌশিক হেসে উঠে জবাব দিল, 'আমি কি ডাক্তার যে পরীক্ষা করব!'

চেম্বারে ফিরে এসে গোয়েন্দা পকেট থেকে চারশো টাকা বার করে মুখার্জিবাবুর দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, 'আপনি এক্ষুনি বৌবাজারের বড় কোনও চশমার দোকানে চলে যান। চোখ পরীক্ষা করিয়ে চশমা বানাতে দিয়ে আসুন। আর্জেন্ট অর্ডার। কাল ফার্স্ট আওয়ারেই ডেলিভারি দিতে বলবেন। অনেকগুলো জরুরি কাজ আছে, চশমার পাওয়ার না পালটে সেগুলো করতে যাওয়া ঠিক নয়। লাস্ট চোখ দেখিয়েছিলেন কবে? দশ বছর আগে?'

'না-না, অদ্দিন হবে না। আমি লাস্ট চোখ দেখিয়েছি—তা, আট বছর হল।'

কৌশিক হেসে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি এখন আসুন। আমি একটু বাদেই বেরিয়ে যাব। ডুপ্লিকেট চাবি আছে তো আপনার কাছে?'

একপাশে লম্বা করে মাথা কাত করে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন মুখার্জিবাবু, তারপরেই ফিরে এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী?'

'আমার যে চশমার পাওয়ার বেড়েছে—আপনি কী করে ধরলেন?'

'খটকা লেগেছিল বলেই—।'

'কী ধরনের খটকা?'

'আপনি ওই পাঁচ নম্বর বাড়িতে বড়বাবুগোছের একটা লোককে দেখেছিলেন না—যাকে সবাই খুব খাতির করছিল।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, ওই ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার চেনা কারও চেহারার কি খুব মিল আছে?'

'চেনা? কই ঠিক মনে পড়ছে না তো।'

'আমি যদি বলি ডক্টর মৈত্রের সঙ্গে ওই ভদ্রলোকের চেহারার খুব মিল।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আপনি জানলেন কী করে?'

'আচ্ছা, এবার যদি বলি, আপনি যাকে দেখেছেন—তিনিই ডক্টর মৈত্র।'

'তাই?' মুখ শুকনো হয়ে গিয়েছিল মুখার্জিবাবুর।

'তাই কি না কী করে বলব, আমি তো আর ওখানে ছিলাম না। এটা আমার অনুমান—।'

মুখার্জিবাবু চলে যাওয়ার ঘন্টাখানেক বাদে গোয়েন্দার চেম্বারের পাড়া যেমন ছিল ঠিক তেমনই রইল। খুঁজলে পরে অবশ্য আশেপাশে সামান্য কিছু পরিবর্তন দেখা যেতে পারে। যেমন—আকাশের রোদ আর একটু চড়া হয়েছে, রোদ্দুরের সেই কাঁচামিঠে ভাবটা আর নেই। রাস্তার দু-পাশের বাস-মিনিবাসের সংখ্যা আগের মতো থাকলেও ঝুলন্ত অফিস-যাত্রীর চিহ্ন আর দেখা যাচ্ছে না। ঘড়ির হিসেবে একটু আগেই দুপুর শুরু হয়ে গেছে কলকাতায়।

এমন সময় গলির মুখে বড় রাস্তায় একটা সাদা রঙের ভাড়ার গাড়ি এসে দাঁড়াল। ডিকি বোঝাই মালপত্রে। ভেতরে কী আছে তার অনেকটাই দেখা যাচ্ছিল বাইরে থেকে। যেমন বেশ কিছু নারকেলের দড়ি, নতুন জনতা স্টোভ, এক বাণ্ডিল সাঁড়াশি, চিমনিবিহীন গোটাচারেক হ্যারিকেন। উপচে-পড়া এই জিনিসগুলো দেখে যে-কেউ ধরে নেবে, হার্ডওয়ার দোকানের মাল যাচ্ছে গাড়িতে।

ঠিকানা-লেখা কাগজ দেখে গাড়ির ড্রাইভার গলির ভেতরে ঢুকে গাড়ির যাত্রীটিকে ডেকে নিয়ে এল। যাত্রীটি এসেই অল্প কিছুটা হাঁ-হওয়া ডিকি বেশ খুঁটিয়ে দেখে বলল, 'আর একটা বাঁধন দিলে হত না ড্রাইভারসাহেব, মাল পড়ে যেতে পারে তো—।'

ড্রাইভার কথাটাকে উড়িয়ে দিলে বলল, 'না-না, কিচ্ছু পড়বে না, আমি খুব মজবুত করে বেঁধেছি।'

এই যাত্রীটিই যে হার্ডওয়ার দোকানের মালিক, শহর থেকে মাল কিনে মফস্বলে নিয়ে যাচ্ছে—এ-বিষয়ে উপস্থিত ছড়ানো-ছেটানো দু-চারজন দর্শকের কোনওরকম সংশয় থাকার কথা নয়।

মফস্বলি দোকানের মালিকের পরনে ছোট মাপের হাফ-হাতা শার্ট আর পাজামা। শার্টের বুকপকেট আর পাজামার দুটো পকেট কাগজপত্র, রুমাল, ব্যাগ ইত্যাদিতে ঠাসা। নাকের নীচে ঝাঁটা গোঁফ, চোখে লালচে ফ্রেমের চশমা। চপচপে তেলমাখানো চুলে সিঁথি কাটা হয়েছে মধ্যিখান থেকে। মুখভর্তি পান, পানের রসে ঠোঁট লাল। পায়ে কাদা-মাখা রবারের জুতো। লোকটি দুহাত মাথায় ঠেকিয়ে বিড়বিড় করতে করতে সূর্যপ্রণাম করল, তারপর গাড়িতে উঠে বসে ড্রাইভারকে বলল, 'নাও, চলো এবার।'

প্রায় ঘন্টাখানেক ছোটার পর গাড়ি এসে দাঁড়াল টনব্যাক্সি কোম্পানির সামনে। আশেপাশে দু-তিনটে ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে আছে। ওদিকে চায়ের দোকানের সামনে কিছু খদ্দের। গাড়ির যাত্রীটি বলল, 'ড্রাইভারসাহেব, আমার দোকানের এক কর্মচারীর আসার কথা। কিছুক্ষণ দেখব, এল তো ভাল, নাহলে আমরাই রওনা দেব।'

ঘন্টার হিসেবে ভাড়া-করা গাড়ি, সুতরাং কথাটার কোনওরকম প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না মাস-মাইনের ড্রাইভারের মধ্যে। ড্রাইভার শুধু একটু এলিয়ে বসে পকেট থেকে খৈনির কৌটো বার করল।

হঠাৎ কোনও দুর্যোগ দেখা না দিলে কিংবা আকাশ ভেঙে বৃষ্টি না নামলে কলকাতার কাজের দিনের দুপুরের চেহারায় খুব একটা রদবদল দেখা যায় না। রাস্তা দিয়ে মাঝেমধ্যে দু-এক খণ্ড মেঘের ছায়া ভেসে যাচ্ছিল শুধু।

আধঘন্টা বাদে টনব্যাক্সির মেন গেট দিয়ে একটা সাদা ভ্যান বেরিয়ে এল। গাড়ির পাশে রেড ক্রস, নীচে লেখা মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট। জানলার পাশে বসা যাত্রীদের মুখ দেখা যাচ্ছিল।

এদিকের ভাড়া গাড়ির দোকানদার যাত্রীটি হঠাৎ চঞ্চল হয়ে বলল, 'ড্রাইভারসাহেব, আমার কর্মচারীর জন্যে আর অপেক্ষা করার সময় নেই। যাওয়া যাক এবার।'

ড্রাইভার খৈনির শেষ থুতুটা পিচিক করে জানলার বাইরে ফেলে গাড়িতে স্টার্ট দিল। রাস্তা মোটামুটি ফাঁকাই। এই ভাড়া গাড়িটার সামনে দু-তিনটে রং-চটা প্রাইভেট কার, ওগুলোর

আগে টনব্যাক্সির ধপধপে সাদা ভ্যান। এদিকে রাস্তাটা ভালই, সুতরাং সব গাড়িই বেশ অক্লেশে গড়িয়ে চলেছিল।

মধ্যিখানে ভাল রাস্তা খারাপ হল, রাস্তায় গাড়ি-বাস ট্রাকের ভিড় বাড়ল, সোজা রাস্তা কোথাও-কোথাও দুমুখো হল; কিন্তু একই পথে ছিল টনব্যাক্সির মেডিক্যাল ইকুইপমেন্টের ভ্যান আর এই ভাড়ার গাড়িটা।

দুটো গাড়িই মোটামুটি একই সময়ে বসিরহাটের একটা গঞ্জগোছের এলাকায় এসে দাঁড়াল। ভ্যানের লোকজন মেডিক্যাল ইকুইপমেণ্ট সাপ্লাই দিতে গেল ওদিকের ওই হেল্‌থ সেন্টারে। আর ড্রাইভারের পাশের সিট থেকে এক ভদ্রমহিলা নেমে কুলির মাথায় কিছু স্টেশনারি গুড্‌স চাপিয়ে হাঁটা দিলেন সোজা পথে।

ভাড়াগাড়ির দোকানদার যাত্রীটি গাড়ি থেকে নেমে ডিকির চারটে হ্যারিকেন টেনে বার করে ড্রাইভারকে বলল, 'বাকি মালপত্তর এখনই তুমি বার করবে না, আমি আসছি।'

ড্রাইভার দু-হাত মাথার ওপর তুলে আড়মোড়া ভেঙে বলল, 'ঠিক আছে।'

শহর কলকাতার সঙ্গে এ এলাকাটার বেশ কিছুটা তফাত। চারপাশের গাছপালা বেশ সবুজ। মিহি বাতাসে একটু ধুলো থাকলেও ধোঁয়াকালির গন্ধ নেই। পথের মেঠো লোক আর বাবুদের সংখ্যা প্রায় সমান-সমান। অধিকাংশ বাবুর সঙ্গেই আবার সাইকেল।

হাতে হ্যারিকেন-ঝোলানো দোকানদারটি ওই দিদিমণির পিছু-পিছু হাঁটছিল। দিদিমণি পাকা রাস্তা ছেড়ে মেঠো পথ ধরলেন। মেঠো পথ পানাপুকুরের পাশ দিয়ে যে দিকে গেছে সেই পথের মোড়ের দোকানে ঢুকে গেলেন তিনি।

হাতে-হ্যারিকেন দোকানদারটি গুনগুন করে ঠাকুরের গান গাইতে গাইতে হাঁটছিল। মোড়ের দোকানের মাথার সাইনবোর্ডে লেখা লক্ষ্মী ফার্টিলাইজার্স। কিন্তু সারের সঙ্গে সঙ্গে বইখাতাও বিক্রি হয় এখানে। দিদিমণি দোকানে ঢুকতেই মালিক গদি ছেড়ে নেমে এল হাসিমুখে, তারপর কুলির মাথা থেকে স্টেশনারি গুড্‌সের প্যাকেট নামিয়ে রাখল তক্তপোশের ওপর।

রোদ্দুরের জোর কমে গেছে। এখন বিকেল, একটু বাদেই সন্ধে নামবে। দোকানদারটি সোজা পথেই হেঁটে যাচ্ছিল। ওর হাতে ঝুলছিল চিমনিবিহীন চারটে হ্যারিকেন। হ্যারিকেনে তেল নেই। পলতেও নেই। অন্ধকারে পথ দেখাবার কোনও ক্ষমতাই নেই এদের। চলতে চলতে দোকানদারটি থমকে দাঁড়াল হঠাৎ, তারপর একই পথ ধরে ফিরে এল সেই গাড়ির কাছে।

ড্রাইভার ডিকির বাঁধন খুলতে যাচ্ছিল কিন্তু দোকানদারটি হাঁ-হাঁ করে উঠে বলল, 'খুলবে না, খুলবে না। আমার পয়সা, মেহনত দুটোই বরবাদ হল। এ মাল যাবে কলকাতার একটা দোকানে। নাও, গাড়ি ঘোরাও।'

হ্যারিকেন-চারটে চেপেচুপে ডিকিতে ঢুকিয়ে দেওয়ার পরে গাড়ি কলকাতা ফেরার পথে ছুটতে শুরু করল আবার।

একুশ

এক-একটা ভরদুপুরে হঠাৎই সন্ধ্যা নেমে আসে। এটা তেমনই এক দুপুর। ঘড়িতে বেলা একটা, কিন্তু সারা আকাশ কুচকুচে কালো মেঘে ছেয়ে গেছে। আকাশের ওই কোণে কিছু কালো মেঘ ছিল, তবে সেটা যে এত দ্রুত ডালপালা ছড়িয়ে দেবে চারদিকে— কেউই আন্দাজ করতে পারেনি।

হিসেবমতো সবে বর্ষাকাল শেষ হয়েছে, সেই নিয়মে এটা অসময়ের দুর্যোগ। বাতাস হঠাৎই বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তার মানে দূরে কোথায় বৃষ্টি নেমেছে। সৈকত চঞ্চল হয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ট্যাক্সির খোঁজ করছিল, কিন্তু নিশার মধ্যে বিন্দুমাত্র ছটফটানি ছিল না। বরং ও কেমন যেন উদাস হয়ে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের মাথার দিকে চেয়ে ছিল।

শ্বেতপাথরের স্মৃতিসৌধের মাথায় পরী, তার ঠিক ওপরেই কালো আকাশ। নিশার মধ্যে বিচিত্র এক বিস্ময়বোধ তৈরি হয়েছিল। পরীসমেত স্মৃতিসৌধ কি আচমকা আর একটু ওপরে উঠে গেছে, নাকি কালো আকাশ হঠাৎ আরও কিছুটা নেমে এসেছে।

আকাশ বোধহয় আরও কিছুটা কালো হয়েছে. বাতাসে আরও কিছুটা জোলো ভাব। পলিথিনে মোড়া মস্ত একটা প্যাকেট সৈকতের হাতে, সৈকত নিশার হাত ধরে একটা টান মেরে ছটফটে গলায় বলল, 'চলো, ওই শেড্‌টার দিকে যাই, যে-কোনও মুহূর্তে বৃষ্টি নেমে যেতে পারে।

বলতে না বলতেই বৃষ্টির দু-চারটে বড়-বড় ফোঁটা পড়ল গায়ে-মাথায়। অমনি নিশার হাত ধরে শেড্ লক্ষ করে ছুট লাগাল সৈকত। শেডের নীচে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড জোরে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। বৃষ্টিতে ঢেকে গিয়েছিল চারপাশ। ওদিকের গির্জা, এদিকের স্মৃতিসৌধ, চারদিকের গাছপালা—সব যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছিল।

শেডের নীচে আর যারা মাথা বাঁচাবার জন্যে ছুটে এসেছিল তাদের মধ্যে ছিল একটা হকারগোছের লোক, জনাদুই জনমজুর আর একটা বেহদ্দ বাউণ্ডুলে।

বুকের মধ্যে পলিথিন-মোড়া প্যাকেটটা প্রায় আঁকড়ে ধরে হায়-হায়-করা গলায় সৈকত বলল, 'ইশ্! এর চাইতে পার্ক স্ট্রিটের কোনও রেস্টুরেন্টে বসলে ভাল হত! ছবিগুলোয় যদি জলটল লেগে যায় তো কেলেঙ্কারি!'

নিশা সৈকতের একটা হাত ধরে গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছিল, ছেলেমানুষি ভঙ্গিতে কথার পিঠে কথা জুড়ল—'ভিজবে কেন? ছবিগুলো তো পলিথিন শিট দিয়ে আষ্টেপৃষ্ঠে মোড়া।'

'তা ঠিক, কিন্তু বৃষ্টির ছাঁট কোত্থেকে কোথায় কী ভাবে লেগে যাবে কে জানে! বিখ্যাত পেন্টারের আঁকা জল রংয়ের ছবি, জল লাগলেই গেলাম—।'

'লাগলে লাগবে, তুমি পরে আবার ওই পেন্টারকে দিয়ে একটু ঠিকঠাক করিয়ে নিও।'

'ঠিক করাতে গেলে তো আমাকে ওপারে যেতে হবে। উনি মারা গেছেন আজ থেকে পনেরো বছর আগে।'

'তাহলে ছবিগুলো তোমাকে কে দিল? ওঁর বউ?'

'বউও মারা গেছে। এখন ছবির সব রাইট একমাত্র ছেলের। আকাট ছেলে। ছবির ব্যাপার আমি তো কিচ্ছু বুঝি না, কিন্তু ও বোধহয় আমার চেয়েও কম বোঝে। বাড়িতে যা ছবি আছে সব বেচেটেচে দিয়ে দু-হাতে টাকা ওড়াচ্ছে। আমার কাছে তিনটে ছবি আছে, কত দাম বলো তো?'

'কত?'

'পাঁচ লাখ। আমি তো নিজের হাতে ডক্টর মৈত্রের চেক পৌঁছে দিয়ে ছবির ডেলিভারি নিলাম।'

'বলো কী! ছবির এত দাম!'

'আমার তো মনে হয় ডক্টর মৈত্র জাত-ব্যবসায়ী। লণ্ডনের অকশান-হাউসে এই ছবি ঠিক দশ গুণ বেশি দামে বেচে দেবেন। ওহ্। তোমাকে আসল ব্যাপারটাই বলা হয়নি। আমার পাশপোর্ট ভিসা সব রেডি। ডক্টর মৈত্রই এত তাড়াতাড়ি সব বার করে দিয়েছেন। কাল সকালে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে অ্যাঞ্জেল ট্র্যাভেল্স-এ গিয়ে ওঁর টিকিটের কনকার্মেশান নিতে বলেছেন। উনি এখনও আমাকে স্পষ্ট করে কিছু বলেননি, তবে আমার কী মনে হয় জানো?'

'কী?'

'ওঁর সঙ্গে উনি আমার টিকিটও কাটছেন।'

সৈকতের হাতটা নিশার ধরাই ছিল, এক ঝটকায় ওকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'তাই!'

বিব্রত মুখে সৈকত বলল, 'নাও হতে পারে, তবে কেন জানি না আমার বারবার মনে হচ্ছে—।'

'যাওয়ার দিন কবে?'

'সামনের শনিবার, চোদ্দ তারিখ।'

'এই শনিবার। ওহ্! কী দারুণ ব্যাপার! আচ্ছা তোমার চাকরিটা ঠিক কী ধরনের?'

'আর্ট-ডিলার বা আর্ট-কালেক্টরের অ্যাসিট্যান্টের কাজ। দেশবিদেশ থেকে ছবি জোগাড় করতে হবে। ডক্টর মৈত্র বলেছেন, একজন ফ্রেঞ্চ আর্ট-ডিলারের সঙ্গে আমাকে জুড়ে দেবেন গোড়ার দিকে। হাতে-কলমে একটু কাজ শেখার পরে ডক্টর মৈত্রের কোম্পানিতে কাজ করব।

আমি কিছুই জিজ্ঞেস করিনি, তবে যা আভাস পেয়েছি—ট্রেনিং পিরিয়ড শেষ হয়ে যাওয়ার পরে আমার মাইনেপত্তরের অঙ্কটা বেশ ভালই হবে।'

'বিলেতে গিয়ে আমাকে ভুলে যাবে তো?'

সৈকত হাসতে হাসতে বলল, 'তার চান্স কোথায়? এ-চাকরিটা হয়ে গেলে বেশির ভাগ সময় হয়তো এখানেই থাকতে হবে আমাকে। এখান থেকেই ছবিটবি কিনতে হবে। জানো তো, বিদেশের বাজারে এখন ভারতীয় ছবির চাহিদা দিনকে দিন বাড়ছে। তবে বিলেতে মাঝে মধ্যেই যেতে হবে আমাকে। আমাদের হানিমুন আমরা সাহেবদের দেশেই সারব—এ কথাটা কিন্তু এখনই পাকা হয়ে যাক।'

শেডের নীচের সেই বেহদ্দ বাউণ্ডুলে লোকটা আর একজন জনমজুর কখন যেন চলে গেছে। হকার আর দ্বিতীয় জনমজুর যাব-যাব করছে, কিন্তু খুব একটা ভরসা পাচ্ছে না বোধহয়। বৃষ্টি আগের তুলনায় কমেছে, তবে যে-কোনও মুহূর্তে দ্বিগুণ জোরে নামতে পারে আবার। আকাশ প্রায় আগের মতনই কালো। বৃষ্টির মধ্যে কেমন যেন একটা ধোঁয়া-ধোঁয়া ভাব।

নিশা হঠাৎই ওর মুখটা সৈকতের বুকের ওপর চেপে ধরে সামান্য ধরা আর অস্পষ্ট গলায় বলল, 'তুমি হয়তো বাইরে থেকে ঘুরে এসে শুনবে আমি আর নেই।'

একটা হাত দিয়ে নিশাকে আরও কিছুটা বুকের মধ্যে টেনে নিয়ে সৈকত বলল, 'এই ধরনের আজেবাজে কথা কিন্তু কক্ষনো বলবে না।'

'বানিয়ে-বানিয়ে বলছি না। আজকাল প্রায়ই এই ভয়টা আমাকে চেপে ধরে।'

'কেন?'

'জানি না। হয়তো বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে বলেই। হয়তো বাল্যপ্রণয়ে সারা জীবনের মতো অভিশপ্ত হয়ে থাকতে চাই বলেই।'

'একটা কথা বলব?'

'বলো।'

'এ ভাবে জিজ্ঞেস করতে বিচ্ছিরি লাগছে, তবু বলছি—তোমার কর্তা কি তোমাকে সন্দেহ করে?'

'না। তবে—।'

'তবে কী?'

'আমার সঙ্গে ওর সম্পর্ক মাঝেমধ্যে আশ্চর্য রকমের ঠাণ্ডা হয়ে যায়। তখন মনে হয়, ও যেন একেবারে অচেনা কেউ। ওর সঙ্গে এক ছাদের নীচে কখনও থাকিনি, এক বিছানায় কখনও শুইনি। তখন ইচ্ছে করে ছুটে কোনও ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিয়ে দিই।'

'কেন? রাগ হয়? অপমানিত বোধ করো?'

হঠাৎই কেঁদে ফেলে নিশা বলল, 'না, ভয় করে। ভীষণ ভয় করে। জানি না কেন এত ভয় করে। আমি বোধহয় আর বেশিদিন বাঁচব না।'

সৈকতের এক হাত আটকে আছে পাঁচ লাখ টাকার জল-রঙের ছবিতে। বুকে মাথা রেখে নিশার ওই কান্না দেখে ওর ইচ্ছে হচ্ছিল হাতের ছবিগুলো সামনে জমে-ওঠা জলের মধ্যে একটানে ছুড়ে ফেলে দিয়ে একে আরও কাছে টেনে নিয়ে পাগলের মতো চুমু খায়।

এই যে চারদিকের এত ঘন বৃষ্টি, খোলা আকাশের নীচে সবকিছু আড়াল করে রাখার এই যে চমৎকার অন্ধকার, চারদিকের সতেজ সবুজ গাছপালা আর লম্বা-লম্বা ঘাস—এ সবই তো ভয় ভাঙিয়ে প্রেমিকাকে সাহসী করে তোলার জন্যে। কিন্তু মাহেন্দ্রক্ষণ তো অনন্তকাল অপেক্ষা করে না! হঠাৎই চারদিকের সব কিছু পাল্টাতে শুরু করে দিল। কালো মেঘের বুক চিরে একফালি ঝকঝকে দুপুরের রোদ বেরিয়ে এল সবার আগে।

হুকারগোছের লোকটা বোধহয় দেহাতি হিন্দুস্থানি, ভাঙা-ভাঙা গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কিত্‌না টেম হুয়া বাবুজি?'

ঘড়ির দিকে না তাকিয়েই উত্তর দিল সৈকত, 'দুটো।'

তাই শুনে লোকটা ঘাসজলের ওপর দিয়ে ছপছপ করতে করতে হাঁটা দিল সামনের রাস্তার দিকে।

আকাশের কালো মেঘ পাতলা আর টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে। পেছনে কয়েক ফালি গাঢ় নীল আকাশ! চাপা হলুদ রঙের আলো ছড়িয়ে পড়েছে চারদিকে।

বৃষ্টি থেমে গেছে একেবারে। গভীর এক ভালাবাসার হাত নিশার পিঠের ওপর রেখে সৈকত বলল, 'চলো এবার।'

নিশা হাতের মুঠোর মধ্যে দলাপাকানো ছোট্ট রুমাল দিয়ে চোখের দুটো কোণা মুছে নিয়ে পা লম্বা করে লম্বা ঘাসের ওপর পা রাখল। ঘাসের ওপর গোড়ালি-ডোবা জল, কিন্তু কোনও কাদা নেই। ছেলেমানুষের ঢঙে জল ছিটিয়ে হাঁটতে হাঁটতে নিশার চোখমুখ আগের মতোই ঝলমলে হয়ে উঠেছিল। গলার ভেতরে একটু আগের সেই ভার-ভার ভাবটা আর নেই। ঝরঝরে গলায় নিশা হঠাৎ বলে উঠল, 'আচ্ছা, এত লোক থাকতে ডক্টর মৈত্র এই চারকরিটার জন্যে তোমাকে বাছলেন কেন?'

অবাক হয়ে সৈকত বলল, 'কেন চাকরি পাওয়ার কি কোনও যোগ্যতা নেই আমার?'

'না-না, সে-কথা বলছি না আমি; ভাল চাকরি পাওয়ার অনেক যোগ্যতাই আছে তোমার। তবে সে তো অন্য লাইনে। এই ছবিটবির ব্যাপারে তোমার তো কোনও অভিজ্ঞতাই নেই।'

'এখন নেই, পরে হবে। আমাকে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেবেন ডক্টর মৈত্র। ট্রেনিং পেলে শিখতে কতক্ষণ! ছাত্র হিসেবে খুব তো একটা খারাপ ছিলাম না।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে নিশা বলল, 'আমার না এখন সবতাতেই ভয়। এর মধ্যে কোনও চক্রান্ত নেই তো?'

'চক্রান্ত! কী বলছ তুমি?'

নিশা প্রশ্নের কোনও উত্তর দিল না।

হঠাৎ একটা ফাঁকা ট্যাক্সি চোখে পড়ে যেতেই সৈকত চেঁচিয়ে উঠল—'ট্যাক্সি।'

উলটো পথের ট্যাক্সি, কিন্তু এক চক্কর ঘুরে ওদের সামনে এসে দাঁড়াল। ট্যাক্সিতে ওঠার পরে সৈকত বলল, 'পার্ক স্ট্রিটে চলুন।'

রোদ হঠাৎই বেশ চড়া হতে শুরু করে দিয়েছিল। আশপাশের রাস্তাঘাটে, মাঠে প্রবল বর্ষণের কত চিহ্ন, কিন্তু ঝকঝকে নীল আকাশের দিকে তাকালে সে কথা বিশ্বাস করা কঠিন। একটু আগের সেই বিহ্বলতা সৈকতের মধ্যে এখন আর নেই। খসখসে গলায় ও বলল, 'চক্রান্তটা হয়তো আমারই। বড় চাকরি, সুখের জীবনের কথা শুনিয়ে তোমাকে একবার বিয়ে করে ফেলতে পারলে, রাজকন্যার সঙ্গে সঙ্গে তো অর্ধেক রাজত্বও হাতে এসে যাবে।'

আহত হয়ে নিশা বলল, 'তুমি দেখছি জেঠুর ওই কথাটা আর ভুলতেই পারছ না।'

কলকাতায় প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে গেল, কিন্তু বারাসাতের আকাশে মেঘের বিন্দুমাত্র চিহ্ন ছিল না। জেলার এস পি শুভব্রত শিকদারের ঘর থেকে বেরুবার মুখে কৌশিক বলল, মিস্টার শিকদার, আপনার পাক্কা এক ঘন্টা সময় নষ্ট করে দিয়ে গেলাম!'

'নষ্ট কী বলছেন! আপনি যে খবর এনেছেন সেটা তো বিরাট। আপনি যে ভাবে এগোচ্ছেন ঠিক সেই ভাবেই এগোন। রেড্ করার জন্যে জাস্ট গিভ মি আ রিং—আমি ফোর্স নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে হাজির হয়ে যাব। আর একটা কথা, এর মধ্যে যদি কোনওরকম সাহায্যের দরকার হয়, আমাকে জানাবেন—। এ কেসটা আমার টপ প্রায়রিটি লিস্টে থাকল। আপনি এখন কোথায় যাবেন?'

'বারাসাত টু কালীঘাট।'

'আমাদের এক অফিসার লালবাজারে যাচ্ছেন । আপনি ওঁর সঙ্গে চলে যেতে পারেন।'

'ভালই হল, আমার একটু তাড়া আছে। আমি সেন্টালে নেমে মেট্রো ধরে নেব।'

রাস্তায় কোনও জ্যাম ছিল না। পুলিশের গাড়ি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এসে সেন্টালে নামিয়ে দিল কৌশিককে। মাটির নীচের স্টেশনে নামতে না নামতেই মেট্রো রেলও পেয়ে গেল। তারপর কালীঘাট আর কতক্ষণই বা!

নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছুটা আগেই অ্যাডভোকেট কিরণ সেনের চেম্বারে পৌঁছে গিয়েছিল কৌশিক।

উকিলবাবু একটু খাতির করেই গোয়েন্দাকে চেম্বারে বসিয়ে বললেন, 'আমাদের এক জাজ্ কাল রাত্তিরে হার্ট-অ্যাটাকে মারা গেছেন। বড্ড ভালমানুষ ছিলেন, বয়েসও খুব একটা

বেশি হয়নি। শরীরস্বাস্থ্যও বেশ ভাল ছিল—। এই ধরনের মৃত্যুগুলো খুব দুঃখের। তা, আজ ফার্স্ট আওয়ারে একটা কনডোলেন্স মিটিং হওয়ার পরে কোর্ট ছুটি হয়ে গেল। ফিরে এসে ভাবলাম আপনাকে একটা ওই খবরটা জানাই–

'হ্যাঁ, ব্যাপারটা কী একটু খুলে বলুন তো।'

দুপুর শেষ হয়ে বিকেল শুরু হয়েছে সবে। পুরনো আমলের খড়খড়ি-লাগানো বড়-বড় জানলা দিয়ে প্রচুর আলো ঢুকছে ঘরে। আলো জ্বালাবার কোনও দরকার নেই এখন। মুখোমুখি চেয়ারে কৌশিক আর উকিলবাবু।

উকিলবাবু বললেন, 'কাল রাত্তিরে আমাদের আশু ফোন করেছিল মাদ্রাজ থেকে। জিজ্ঞেস করলাম, কী ব্যাপার? বলল, খবর সব ভালই। অলোক দিল্লিতে এসে টেলিফোনে ওর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। এখন অলোক তিরুপতিতে, কাল আসছে মাদ্রাজে। এই পর্যন্ত সব ঠিকঠাক। আশু কোন্ লাইনে ওকে মাদ্রাজে দু-চার দিনের জন্যে আটকে দেবে—সে পরিকল্পনাও ওর ছকা হয়ে গেছে। এমন সময়, মানে কাল সন্ধেয় এখান থেকে একটা ফোন গেছে আশুর কাছে—অদ্ভুত ফোন!'

'কী রকম?'

'যে ফোন করেছিল তার ধারণা—অলোক এর মধ্যেই পৌঁছে গেছে আশুর কাছে। আশু জানাল—না, ও নেই, কাল আসতে পারে। কেন, কী দরকার? উত্তরে লোকটা বলেছিল—একটা আর্জেন্ট মেসেজ আছে, নোট করে নিন।'

'কী মেসেজ?'

'সেটাই তো অদ্ভুত! লোকটা বলল, টনব্যাক্সির ম্যানেজার সুনন্দ তরফদার রহস্যজনকভাবে উধাও হয়ে গেছেন। অলোক মৈত্র যেন এক্ষুনি কলকাতায় ফিরে আসেন।'

'যে মেসেজ দিয়েছিল সে কি ওঁর কোম্পানির কেউ?'

'না। আশু পরিচয় জানতে চেয়েছিল, দেযনি। বলেছে, খবরটা দিলেই হবে। এ ব্যাপারটাও রহস্যজনক। অলোক সত্যি-সত্যিই বড় কোনও একটা বিপদের মধ্যে পড়বে না তো?'

অলোক মৈত্রের বাল্যবন্ধু কিরণবাবুকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছিল।

চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছিল তরুণ গোয়েন্দা কৌশিকের চোখেমুখেও। কয়েক মুহূর্ত বাদে ও বলল, 'বিপদের আশঙ্কা আছে বলেই আমি চেয়েছিলাম—এই সময় কয়েকটা দিন উনি কলকাতার বাইরে থাকুন। এখন দেখছি বিপদ আসার নতুন একটা রাস্তাও তৈরি হচ্ছে আবার।'

'নতুন রাস্তা! কী সাঙ্ঘাতিক! আচ্ছা, সুনন্দ তরফদারের রহস্যজনক ভাবে উধাও হয়ে যাওয়ার খবরটা কি ঠিক?'

'শুনছি তো ঠিক।'

'কিডন্যাপ্‌ড? নাকি নিজে থেকে গা ঢাকা দিয়েছে?'

'কিছুই জানতে পারিনি এখনও।'

'সুনন্দর এক ভাই আছে, আমার মনে হয় আশুকে ও-ই ফোন করেছিল।'

কথাটা শুনে কপালে তিনটে রেখা ফুটে উঠল কৌশিকের। 'ওর ভাইয়ের কথা মনে হচ্ছে কেন আপনার?'

'এটাই তো স্বাভাবিক। বাড়ির কেউ উধাও হয়ে গেলে বাড়ির লোকরাই তো উদ্বিগ্ন হবে সব চাইতে বেশি। সুনন্দর বাড়িতে শুনেছি ওর বৃদ্ধা মা আর ছোট ভাই থাকে। ভাই ইয়ং-ম্যান। ভাইয়ের ফোন করাটাই স্বাভাবিক।'

'ঠিক। কিন্তু ভাই আত্মপরিচয় দেবে না কেন? এমনও তো হতে পারে, এই সময় কলকাতায় অলোক মৈত্রকে ডেকে আনাটা একটা চক্রান্ত।'

'চক্রান্ত!'

'হ্যাঁ, এখন অবশ্য এটা আমার নেহাতই অনুমান।'

অলোক মৈত্রের বাল্যবন্ধুর উদ্বেগের মাত্রা আরও বেড়ে গিয়েছিল। পাকা চুলের মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে উকিলবাবু বললেন, 'নির্বিরোধ, ভালমানুষ, কারও সাতেপাঁচে থাকে না; তার হঠাৎ এমন একটা—আচ্ছা, এমনও তো হতে পারে, আমরা অকারণে একটু বেশি পরিমাণে দুর্ভাবনা করছি!'

'হতে পারে।' সঙ্গে সঙ্গে শান্ত গলায় উত্তর দিল কৌশিক।

এ-ভাবে সায় দেওয়ার জন্যেই বুঝি উকিলবাবুর পুরনো খট্‌কাটা ফিরে এল আবার। 'আচ্ছা, আমরা কি পুলিশকে জানাব?'

'জানাবার মতো তেমন কোনও ঘটনা ঘটেনি তো এখনও। পুলিশকে জানানো মানে লোক জানাজানি। অপরাধীরা তাহলে সজাগ হয়ে যাবে।'

উকিলবাবু এবার ওঁর পুরো মাথার চুল আঙুল দিয়ে ঘেঁটে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি যা ভাল বোঝেন তাই করুন।'

হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে গোয়েন্দা বলল, 'আমি তাহলে উঠি এখন। এক জায়গায় যেতে হবে। আমার ফোন নাম্বার তো আপনার কাছে আছে, কোনও ডেভলপমেন্ট হলে জানাবেন।'

উকিলবাবুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে যখন পথে বেরুল কৌশিক তখন কালীঘাটের আকাশে পুরোদস্তুর একটা বিকেল নেমে গেছে। তিন-চারতলা বাড়িগুলোর ছাতের কার্নিশের কোথাও-কোথাও রোদ্দুর, পথে শুধু মনোরম ছায়া।

আরও কিছুটা যাওয়ার পরে একটা পাবলিক বুথ থেকে মুখার্জিবাবুকে ফোন করল কৌশিক। টেলিফোনে মুখার্জিবাবুর একটু চেঁচিয়ে কথা বলার স্বভাব। কথার ধাক্কায় রিসিভারটাকে কান থেকে একটু দূরে সরিয়ে রেখেছিল কৌশিক।

আজ একটু উত্তেজিত হওয়ার কারণ ছিল মুখার্জিবাবুর। গলার স্বর আর এক পর্দা তুলে বললেন, 'সন্ধেয় ডক্টর মৈত্রের প্রেস কনফারেন্সের কথা মনে আছে তো?'

'আছে, কিন্তু আমি যেতে পারছি না।'

'সে কী, কেন?'

'আর বলবেন না, পা মচকে গেছে বিচ্ছিরি ভাবে।'

'অ্যাঁ! হল কী করে?'

'সিঁড়ি দিয়ে নামতে গিয়ে। অন্যমনস্ক থাকার খেসারত।'

'আপনি এখন কোত্থেকে বলছেন?'

'বাড়ি থেকে।'

'কোনও ভাবে কি ওখানে যাওয়ার উপায় নেই?'

'কী করে যাব? খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে কি প্রেস কনফারেন্স অ্যাটেন্ড করা যায়? তবে আপনি অবশ্যই যাবেন, আর ডক্টর মৈত্রকে মনে করে বলবেন—কেন যেতে পারলাম না আমি। যদি পায়ের ব্যথা কমে, কাল চেম্বারে দেখা হবে আপনার সঙ্গে।'

টেলিফোন বুথ থেকে বেরিয়ে একরকম লাফিয়ে লাফিয়েই বাসস্টপের দিকে এগোতে লাগল গোয়েন্দা। অক্লেশে নির্জলা কিছু মিথ্যে বলার জন্যে ওর বেশ হাসি পাচ্ছিল। কেউ-কেউ মজা করে বলে থাকে, চোখেমুখে মিথ্যে বলতে পারলে উকিল হিসেবে চট করে সফল হওয়া যায়। এবার কেউ ওই কথাটা বললে ও উকিলের সঙ্গে গোয়েন্দাকেও জুড়ে দেবে।

বাইশ

বেশ কয়েক বছর আগে মুখার্জিবাবু পরশুরামের 'লম্বকর্ণ' গল্পটির নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। অভিনয়ও করিয়েছিলেন পাড়ার ছেলেদের দিয়ে। নাটক তেমন জমেনি, কিন্তু ওই গল্পটির বেশ কিছু সংলাপ ওঁর মনে আছে আজও। গল্পের উদয় এক জায়গায় বলেছিল, 'যাই বলো, বাঘের মাপ কখনও ল্যাজসুদ্ধ হতে পারে না। তা হলে মেয়েছেলেদের মাপও চুলসুদ্ধ হবে না কেন? আমার বউয়ের বিনুনিটাই তো তিন ফুট হবে। তবে কি বলতে চাও, বউ আট ফুট লম্বা।'

সংলাপটা মনে পড়তেই ফিক করে হেসে ফেললেন মুখার্জিবাবু। প্রেস কনফারেন্সের শেষ সারিতে বসে মাইকের সামনে দিয়ে দ্রুত গতিতে বারকয় হেঁটে-যাওয়া মেয়েটিকে দেখে ওঁর হঠাৎই উদয়ের ওই সংলাপটির কথা মনে পড়ে গিয়েছিল।

সেই পাঁচ নম্বর বাড়ির তিনতলার হলঘরে প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন হয়েছে। মুখার্জিবাবু জীবনে এই প্রথম প্রেস কনফারেন্সে এসেছেন। অথচ খবরের কাগজের সুবাদে এই শব্দ দুটির সঙ্গে ওঁর দীর্ঘকালের পরিচয়। কী ভাবে কী হয়—সেটা দেখা ও শোনার জন্যে ওঁর কৌতূহল টানটান হয়ে ছিল।

হলঘরে আট সারি চেয়ার পাতা হয়েছে। প্রথম দুটো সারি প্রেসের জন্য সংরক্ষিত। বাকি সব চেয়ারে মান্যগণ্য অতিথিরা। চেয়ারের সারির সামনে ধপধপে সাদা কাপড় পাতা লম্বা একটা টেবিল। টেবিলের ওপাশে তিনটে শূন্য চেয়ার। সামনে মাইক।

যে মেয়েটি প্রায় তিনফুট লম্বা বিনুনি দ্রুত এদিক-ওদিক করতে করতে চলাফেরা করছিল, সেই মেয়েটি বেশ লম্বা। উচ্চতা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চির মতো হবে। একটু উঁকিঝুঁকি মেরে মুখার্জিবাবু দেখলেন ওর পায়ে প্রায় আড়াই ইঞ্চি হিল তোলা জুতো। তার মানে ওর আসল উচ্চতা পাঁচ সাড়ে-পাঁচ। কোনও বাঙালি মেয়ের এই হাইট মানে তো সে বেশ লম্বা। তাহলে আরও লম্বা হতে চায় কেন?

বিশ্বসুন্দরী সুস্মিতা সেন লম্বায় নাকি পাঁচ ফুট ন' ইঞ্চি। সুন্দরী এবং মোটমুটি লম্বা বাঙালি মেয়েরা কি এই জন্যেই এখন আরও বেশি লম্বা হতে চায়?

টিভিতে সুস্মিতা সেনকে দেখেছেন মুখার্জিবাবু। কিন্তু তার বোধহয় বিনুনি ছিল না। যদি থাকত, তাহলে পরশুরামের ল্যাজসুদ্ধ বাঘ মাপার হিসেবে বিশ্বসুন্দরীর উচ্চতা দাঁড়াত গিয়ে—। নিজের মনেই আর একবার হাসলেন উনি।

ব্যাকবেঞ্চে বসে কল্পনা বোধহয় খোলে ভাল। উনি আরও কী যেন ভাবতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই ওই লম্বা সুন্দরী মাইকের সামনে এসে ছোট্ট একটা তুড়ি বাজাল। তুড়ির শব্দ গমগম করে ছড়িয়ে পড়ল গোটা হলঘরে। তার মানে মাইক কাজ করছে।

সুন্দরী মেয়েটি এবার ওর চড়া পর্দায় পেন্ট-করা মুখ মাইকের আর একটু সামনে এগিয়ে নিয়ে এসে বলল, 'আজকের এই প্রেস কনফারেন্সে আমরা ডক্টর জ্যোতি মৈত্রের পক্ষ থেকে আপনাদের প্রথমেই জানাই উষ্ণ অভ্যর্থনা। ডক্টর মৈত্র সম্পর্কে আপনারা অনেক কিছু জানেন, তবু দু-একটি কথা বলে নেওয়া হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ডক্টর মৈত্র প্রবাসী বাঙালি। বিদেশে অত্যন্ত সম্মানিত মানুষ। একজন বড় ব্যবসায়ী। দেশের নানা গঠনমূলক প্রকল্পে তিনি অর্থ বিনিয়োগ করবেন। তাঁর পরিকল্পনায় অভিনবত্ব আছে। বিশেষজ্ঞদের অভিমত, তাঁর পরিকল্পনা রূপায়িত হলে দেশের সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। বেশ কিছু নতুন চাকরির সুযোগ তৈরি হবে। উপস্থিত তিনি দেশের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের কাজে নিজেকে যুক্ত রেখেছেন। প্রথম পর্যায়ে তিনি আমাদের দেশের পুরাকীর্তি সংরক্ষণের ওপর জোর দিয়েছেন। বিশ্বাস করেন, নিজের পুরনো দেশকে ভালবাসতে না পারলে নতুন দেশ গড়া সম্ভব নয়। এই বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছু বক্তব্য রাখার জন্য আজ আপনাদের এখানে ডেকেছেন। আমি ডক্টর মৈত্রকে তাঁর কথা বলার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি।'

মাত্র তিন হাত দূরে দাঁড়িয়েছিলেন ডক্টর মৈত্র। ওঁর পরনে সাদা ট্রাউজার্স এবং চকোলেট রংয়ের টি-শার্ট। তিনি এগোতেই লম্বা-বিনুনি সুন্দরী উলটো দিকে চলে গেল শাঁ করে।

ডক্টর মৈত্র স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে মাইকের সামনে এসে 'বাও' করলেন, তারপর হাত তুলে

নমস্কার করে বললেন, 'ফ্রেন্ডস, উই অল লাভ আওয়ার রিচ আর্কিটেকচারাল হেরিটেজ। বাট ইজ দ্যাট অল?'

একটু ছটফটে ভঙ্গিতে মাইকটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে টেবিলের সামনের দিকে চলে এলেন ডক্টর মৈত্র। শ্রোতার সংখ্যা জনা-চল্লিশ। যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াও এঁদের কাছে পৌঁছনো যেতে পারে।

মুখার্জিবাবুর মাথায় ছোট্ট একটা অঙ্ক কষা হয়ে গেল। এইভাবে যাঁরা টেবিলের পেছন থেকে সামনের দিকে চলে আসেন, মাইক থাকা সত্ত্বেও ব্যবহার করেন না—তাঁরা নিশ্চয়ই একটু বেশি মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী।

ডক্টর মৈত্রের দাঁড়ানোর ভঙ্গিটি ঘরোয়া। বেশ ঘরোয়া ভঙ্গিতেই এবার তিনি তাঁর কথা শুরু করলেন। 'বহু বছর বিদেশে পড়ে আছি। যখন ওখানে যাই তখন এক পণ্ডিত মানুষের লেখায় পড়েছিলাম—যে-দেশে থাকবে সে-দেশের মানুষকে ভালবাসবে, সে-দেশের সংস্কৃতির মধ্যে মনপ্রাণ ঢেলে মিশে যাবে। মাথা উঁচু করে আনন্দের সঙ্গে বেঁচে থাকার এটাই সহজ রাস্তা। খুব খাঁটি কথা। সেই ভাবেই ছিলাম বিলেতে; ভালই ছিলাম। কিন্তু জীবনের এই শেষ ধাপে এসে হঠাৎ মনে হল, নিজের দেশকেই ভালবাসা হল না। আই সিম্পলি ফরগট ইট। কেন এমন মনে হয়েছিল জানি না। তবে দেশে ফিরে এসেই টের পেয়েছিলাম-- দেশের ওপর আমার ভীষণ টান। যদি জিজ্ঞেস করেন, কেন? আমি বুঝিয়ে বলতে পারব না। আই অ্যাডমিট মাই ল্যাপ্‌সেস। দেশকে জানতে গেলে তো সবার আগে এসে পড়ে ইতিহাস। ইতিহাস মানে তো শুধু ডেটা আর ইনফর্মেশন নয়—দেয়ার আর অলসো সাম লিভিং পেজেস। তা আমি ওসব জ্যান্ত পাতার কয়েকটায় ঘুরে এলাম সবে। ভাবলাম ভ্রমণ শুরু করা যাক প্রাচীন বাংলার রাজধানী গৌড়কে দিয়ে। গৌড় মানে সেই কবেকার ইতিহাস। তারপর গোপালদেব, ধর্মপাল, দেবপালের আমলে বাংলার স্থাপত্য, চিত্রকলার কী হয়েছিল! টুয়েল্‌ভ্‌থ্‌ সেঞ্চুরির বল্লাল সেনের সময় উন্নত গৌড়ের কথা গোটা পৃথিবী জানত। তারপর শেষ হিন্দুরাজা লক্ষ্মণ সেনের গৌড় চলে যায় বখতিয়ার খিলজির দখলে। তখন ভাঙচুর বিস্তর হয়েছে, তবে পরে সেই গৌড়েই অসাধারণ বিল্ডিং, মনুমেন্ট তৈরি হয় যার আর্কিটেকচারাল স্কিল অতুলনীয়। সৌধ, মসজিদ, দুর্গের কারুকাজ, ইঞ্জিনিয়ারিং দেখার মতো। এসব আমাদের, মানে বাঙালিদের গৌরবময় ঐতিহ্য। তা, দেখতে দেখতে গর্বে আমার বুক ফুলে উঠছিল, শ্রদ্ধায় মাথা নত হচ্ছিল। আমি পিয়াসবারি দেখলাম, চিকা মসজিদ দেখলাম, দেখলাম গুমটি দরওয়াজা, ফিরোজ মিনার, বারোদুয়ারি দেখলাম—। তারপর যা দেখলাম তাতে আমার চক্ষু চড়কগাছ। একে বর্বরতা বললে কম বলা হয়। এ তো প্রকাশ্য দিবালোকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন। ঘটনাটা দেখে আমি কী দুঃখ পেয়েছি কী বলব। ছবি তুলে এনেছি কয়েকটা। আপনারা ওগুলো দেখুন, আপনাদের কাগজে ছাপুন, সঙ্গে লম্বা রিপোর্ট দিন। দিস কিলিং বিজনেস শুড বি স্টপ্‌ড অ্যাট ওয়ান্‌স।'

এই পর্যন্ত বলার পরে ডক্টর মৈত্র একটু থামলেন, তারপর টেবিলে রাখা গ্লাসটা তুলে নিয়ে এক চুমুক জল খেলেন। ওঁর শেষের কথাগুলো শুনে শ্রোতাদের মধ্যে বেশ একটা কৌতূহল তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ব্যাপারটা কী? ঠাণ্ডা মাথায় খুন বলে ঠিক কী বোঝাতে চাইছেন উনি!

জলের গ্লাসটা হাত থেকে নামিয়ে রেখে ডক্টর মৈত্র বললেন, 'প্রায় প্রতিটি পুরা-কীর্তির পাশেই একটা করে সরকারি নোটিস ঝোলানো আছে। প্রতিটিতেই খুব স্পষ্ট করে লেখা : দিস মনুমেন্ট হ্যাজ বিন ডিক্লেয়ারড টু বি অব ন্যাশানাল ইম্পর্টান্স আন্ডার দি এনসিয়েন্ট মনুমেন্টস অ্যান্ড আর্কেওলজিক্যাল সাইটস্ অ্যান্ড রিমেন্স্ অ্যাক্ট এট্সেট্রা এট্সেট্রা। তারপর সাবধান করে দিয়ে বলা হয়েছে—এইসব প্রাচীন সৌধের কেউ যদি কোনও ক্ষতি করে তাকে শাস্তি পেতে হবে। শাস্তি মানে তিন মাস পর্যন্ত জেল অথবা পাঁচ হাজার টাকার জরিমানা। দুটি শাস্তি একসঙ্গেও চলতে পারে। তা, এই সরকারি ওয়ার্নিংকে কী ভাবে বুড়ো আঙুল দেখানো হয়েছে আপনারা কল্পনাও করতে পারবেন না। আমি ওইসব কাণ্ডকারখানা দেখে তো থ! কী বুকের পাটা ক্রিমিন্যালদের। ওইসব অমূল্য সৌধ থেকে ইট খুলে নিয়ে গিয়ে থাকার জন্যে বাড়ি বানিয়েছে। দেয়ালে এখনও প্লাস্টার পড়েনি বলে বাইরে থেকে বোঝা যাচ্ছে। দূরে কোথাও লুকিয়ে-চুরিয়ে যে বাড়ি বানাবার কাজে ওই ইটগুলো ব্যবহার করছে—তা নয় কিন্তু। বাড়ি বানাবার সাইট মনুমেন্টের নাকের ডগায়। ট্যুরিস্টরা দেখছে, সরকারি কর্মচারীরা দেখছে, পুলিশ ও সিকিউরিটির লোকজন দেখছে। কিন্তু কারও ওসব নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয় না। এই ভাবে যদি আরও কয়েক বছর চলে, তাহলে ওখানে পুরাকীর্তির আর কোনও অবশিষ্ট থাকবে না। তার বদলে বিচ্ছিরি চেহারার বেশ কিছু মাঠকোঠা দেখা যাবে। শুনেছি, বিশেষ ধরনের লাল ইটে ওইসব প্রাচীন সৌধ বানানো হয়েছে। দি কেমব্রিজ হিস্ট্রি অব ইণ্ডিয়া নাকি দাখিল দরওয়াজাকে বিশ্বের সুন্দরতম ইটের কাজ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে। তা সেই ইটগুলো কি এং কিছু বাজে লোকের কুৎসিত বাড়ি তৈরির কাজে লেগে যাবে? আমি ওইসব মাঠকোঠার কিছু ছবি তুলে এনেছি। রঙিন ছবি। আজকের ইটের সঙ্গে দাখিল দরওয়াজার ইট কী ভাবে মিশেছে— আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন। লিপি, ছবির কিছু প্রিন্ট এঁদের দিয়ে দাও।'

ওই সুন্দরী, লম্বা মেয়েটির নাম লিপি। হাতে একগোছা ছবি নিয়ে সবাইকে একটা করে প্রিন্ট দিতে শুরু করে দিল। প্রথমে প্রথম সারি, তারপর দ্বিতীয় সারি—। শেষ সারিতে এসে ছবি বিলি করার সময় মুখার্জিবাবু চমকে উঠে দেখলেন, এ তো সেই মেয়েটি। হ্যাঁ সেই মেয়েটিই—ভুল করার কোনও উপায় নেই, ওই তো গালের ওপর জ্বলজ্বল করছে আঁচিলটা।

ছবি হাতে পাওয়ার পরে প্রত্যেকেই 'ধন্যবাদ' জানাচ্ছিল, কিন্তু মুখার্জিবাবু ওই শব্দটা আর বার করতে পারলেন না—মেয়েটি শেষ সারিতে ছবি বিলি করে ফিরে গিয়েছিল আগের জায়গায়।

মুখার্জিবাবু রীতিমত বিচলিত বোধ করছিলেন, কিন্তু আঁচিলটা ঠিক দেখেছেন তো? পাশে অতনু দত্ত বসে আছেন, ওঁকে মৃদু একটা খোঁচা মেরে মুখার্জিবাবু বললেন, 'আচ্ছা...।' তারপরেই থেমে গেলেন। কোনও মহিলার গালে আঁচিল আছে কি না—এই ধরনের প্রশ্ন কোনও ভদ্রলোককে করা যায় না।

মুখটা একটু এগিয়ে নিয়ে এসে অতনু দত্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'কী বলছেন?'

ঢোক গিলে কথা ঘোরালেন মুখার্জিবাবু। 'না-না, তেমন কিছু না। আমার চশমার পাওয়ারটা বেশ বেড়েছে, আজ নতুন চশমা ডেলিভারি দেওয়ার কথা ছিল; কিন্তু দোকানদার বলল—কাল আসুন।'

'অসুবিধে হচ্ছে খুব?'

'হ্যাঁ, মানে না— ।'

ছবি দেখে শ্রোতাদের একটা অংশ কিছুটা উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। মাঠের মধ্যে বেঢপ চেহারার বাড়ি। এই তো মোটা-মোটা ইটের পাশে সরু-সরু ইট। কয়েকশো বছরের পুরনো অমূল্য সৌধ থেকে খুলে এনে গাঁথা হয়েছে। দেয়ালে এখনও প্লাস্টার পড়েনি বলে জঘন্য এই অপরাধটা ধরা যাচ্ছে। দুদিন বাদে কিচ্ছু আর বোঝা যাবে না। সিমেন্ট-বালির পলেস্তারায় ঢেকে যাবে প্রাচীন শিল্পকর্ম।

প্রেসের তরফ থেকে কিছু প্রশ্ন এসেছিল ডক্টর মৈত্রের কাছে। তিনি সেগুলোর পরিষ্কার উত্তর দেওয়ার পরে বললেন, 'আমাদের প্রাচীন সম্পদ রেস্টোরেশনের ব্যাপারে আমি সে-ভাবে এখনও কোনও কাজই শুরু করতে পারিনি। যাঁরা পেরেছেন এবং সুন্দরভাবে কাজকর্ম এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আজ এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন। আমি কিশোর চৌধুরীকে অনুরোধ করব তাঁর কাজের ধারা সম্পর্কে দু-চার কথা বলতে।'

প্রথম সারিতেই বসে ছিলেন কিশোর চৌধুরী, তিনি প্রস্তাবের জবাবে বিব্রত মুখে, 'কী আশ্চর্য! আমি আবার— না-না' ইত্যাদি বললেন দু-চারবার; কিন্তু শেষ পর্যন্ত অনুরোধ এড়াতে না পেরে ধীর পায়ে মাইকের সামনে এসে দাঁড়ালেন। ডক্টর মৈত্র টেবিল ছেড়ে একটু সরে গিয়েছিলেন।

পাতলা, সুশ্রী চেহারার, ভাষা-ভাষা চোখের এই মানুষটিকে দেখলে মনে হয়—এ ভাবে বক্তৃতা দেওয়া-টেওয়া এঁর খুব একটা আসে না। জড়সড় মুখে কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকার পরে কিশোর চৌধুরী বললেন, 'নমস্কার। আমি খুবই সামান্য ব্যক্তি—। ডক্টর মৈত্র এ ভাবে আমাকে ডেকে এনে—। আমি বলতে-টলতে পারি না। তাছাড়া আমার বলার আছেটাই বা কী? আমি আপনাদের মতো কলকাতাকে ভালবাসি। আমি চাই, কী বলব—পুরনো কলকাতা আবার তার গৌরব নিয়ে উঠে আসুক। কলকাতায় পুরনো দিনের কত সুন্দর সুন্দর বাড়িঘর আছে। কিন্তু সে সবের কিছু কিছু একেবারে ভেঙেচুরে পড়েছে। সেগুলো যদি সারানো যায় আবার। এ কাজ বিরাট কাজ, সবাই মিলে একসঙ্গে যদি—। এই কাজে

সরকারি সাহায্যও পাওয়া যাবে নিশ্চয়ই। আর একটা কথা—কাজটা যে ভাল কাজ, এটা করা আমাদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে—এই বোধটা জনসাধারণের মধ্যে জাগানো দরকার। আমরা কয়েকজন এদিকে একটু বেশি করে মন দিয়েছি এবার। সামনের পনেরো তারিখে মালদায় যাচ্ছি আমরা। একটা কালচারাল ট্রুপ তৈরি করা হয়েছে। দলের প্রায় সবাই গাঁয়ের লোক। নাচ, গান, পালা, থিয়েটার ইত্যাদি হবে। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হল—প্রাচীন ঐতিহ্যের প্রতি সাধারণ মানুষের চোখ ফিরিয়ে আনা। দেশের পুরনো সম্পদকে নিজের বলে তারা যাতে ভাবতে পারে—সেই ব্যাপারে সচেতনতা তৈরি করা। এ কাজে নেমেছি আমরা। জানি না কতটা সফল হব! আমরা আমাদের এইসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বিদেশেও নিয়ে যাব। আমরা চাই প্রবাসী ভারতীয় এবং বিদেশিরাও এই কাজের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করুক। ওহ্! ভাল কথা, আজ সকালেই খবর পেলাম, বাংলাদেশ সরকার আমাদের এই দলটিকে তাঁদের দেশে অনুষ্ঠান করার জন্য বিশেষ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আমরা এবারই বাংলাদেশে দুটি অনুষ্ঠান করব। পরে কোনও এক সময় আরও কিছু অনুষ্ঠান করার ইচ্ছে রইল। আমাদের এই উদ্যোগে আপনাদের শুভেচ্ছা প্রার্থনা করি। নমস্কার।'

কিশোর চৌধরীর বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চটপট করে কিছু হাততালি পড়ল। লম্বা-বিনুনি সেই সুন্দরী মেয়েটি মাইকের সামনে এসে বলল, 'আমাদের কনফারেন্স এখানেই শেষ হল। আপনাদের ধন্যবাদ। এবার আপনারা অনুগ্রহ করে ককটেল ও ডিনারে অংশ নিন।'

হলের কয়েকটা চড়া অলো নিবিয়ে দেওয়া হল। যা রইল তা চমৎকার আলো-আঁধারি। দেয়ালের বিভিন্ন লুকনো কোণ থেকে চাপা আলো বেরিয়ে এসেছে। এই আলোয় সব কিছুই দেখা যায়, তবে একটু আগের সেই চোখ-ধাঁধানো ব্যাপারটা নেই।

অ্যান্'স ইনের উর্দিপরা বেয়ারারা ট্রেতে হুইস্কির গ্লাস সাজিয়ে অতিথি-অভ্যাগতদের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল। দু-চারজন বাদে প্রায় সবাই গ্লাস তুলে নিচ্ছিল। গ্লাসের মধ্যে বরফের কিউব। মুখার্জিবাবু একটা গ্লাস তুলে নিলেন। বহুকাল আগে সেই যাত্রা-থিয়েটারের আমলে এ জিনিসটা ওঁর চলত। হয় দিশি নয় কমদামি বিলিতি। তারপর সব বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আবার, অনেকদিন বাদে—।

মুখার্জিবাবু লম্বা একটা চুমুক দিলেন। অনভ্যাসের জন্যে মুখের মধ্যে তিক্ত একটা স্বাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু আরও দু-তিনটে চুমুক মারার পরে ওই তেতো-তেতো ভাবটা কেটে গেল একদম। আর সঙ্গে সঙ্গে পুরনো দিনের সেইসব রঙিন স্মৃতি জেগে উঠল। বেশ ছিল সেই জীবনটা! তখন কষ্টকে কষ্ট বলে মনে হত না। সামান্য আনন্দ চোখের নিমেষে হাজার গুণ বড় হয়ে উঠত।

প্রথম গ্লাসটা একটু তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে গিয়েছিল। ট্রে-ভর্তি হুইস্কি নিয়ে আর একজন বেয়ারা আসতেই উনি আর একটি গ্লাস তুলে নিয়েছিলেন। দিব্যি একটা ফুরফুরে মেজাজ

এসে গিয়েছিল মুখার্জিবাবুর। মেজাজ এবং কিছুটা আত্মবিশ্বাস। চশমাটা খুলে উনি বুকপকেটে ঢোকালেন, তারপর আবার পরে নিলেন।

হলটা বেশ বড়। দুদিকে দেয়ালে ঘেঁষে কয়েকটা সোফাসেট, বাকি দুটো দিকে এল শেপের লম্বা টেবিল গরম ও সুগন্ধী খাবারদাবারে ভর্তি। নক্‌শাকাটা রুপোর বাসনপত্র থেকে আলো ঠিকরে পড়ছিল। একধারে পোর্সিলিনের বাসন আর ন্যাপকিন সাজানো।

খাবারদাবারের দিকে বিশেষ কেউ এখনও যায়নি। হাতে গ্লাস-ধরা মানুষগুলো ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নিজেদের মধ্যে গল্পগুজব করছিল। কেউ কেউ চেয়ারে কিংবা সোফাতেও বসে ছিল।

গ্লাস হাতে নিয়ে মুখার্জিবাবু নিজের মনে এদিক-সেদিক হাঁটছিলেন।

হঠাৎ কোনও একটা দল থেকে ডক্টর মৈত্র বেরিয়ে এসে বললেন, 'মিস্টার মুখার্জি, আপনি এসেছেন, আমি খুব খুশি হয়েছি। কিন্তু কৌশিকের কী হল? ও এল না কেন?'

মুখার্জিবাবু বললেন, 'আর বলবেন না। দিব্যি ভালমানুষ, হঠাৎ সিঁড়ি থেকে পা পিছলে পড়ে গিয়ে একেবারে যাচ্ছেতাই—। পা-টা বিচ্ছিরি ভাবে ফুলে গিয়েছে, ভাঙল কি না কে জানে! ও আমাকে বারবার বলে দিয়েছে—ব্যাপারটা যাতে আপনাকে একটু বুঝিয়ে বলি—।'

'হাউ স্যাড! তা, কিশোর এক্স-রে করিয়েছে তো?'

'হ্যাঁ, মানে করতে যাওয়ার তো কথা।'

অবিকল প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ দেওয়ার ঢঙে কথাগুলো বলছিলেন মুখার্জিবাবু। ভঙ্গিটাও বেশ নাটুকে ছিল, তার ফলে এক এক করে ওঁর পাশে শ্রোতা হিসেবে হাজির হয়েছিলেন কিশোর চৌধুরী, দিব্য মল্লিক আর অতনু দত্ত। বিবরণ চলেছিল বেশ কিছুক্ষণ।

মুখার্জিবাবুর চোখমুখ আর বলার ভঙ্গি দেখে সবাই ধরে নিয়েছিল—কৌশিকের পক্ষে পা বাঁচানোই কঠিন হয়ে পড়বে। ইশ্! এই বয়েস থেকেই ক্রাচ!

ককটেল-পার্টিতে কোনও একটা জায়গায় একটা দল বোধহয় বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। এখানে দলবদল হয় প্রায়ই। একটা 'হ্যালো', একটু বেশি চেনা মানুষের সঙ্গে কয়েকটা কথা, সদ্যপরিচিত কারও সঙ্গে শিষ্ট, মার্জিত কিছু শব্দ বিনিময়। তারপরেই রোলিং স্টোন। উর্দিপরা বেয়ারারা এই আড্ডার ফাঁকে ফাঁকেই হাতে ট্রে নিয়ে ঘোরে। কোনও ট্রেতে হুইস্কিভর্তি গ্লাস, কোনও ট্রেতে স্ন্যাক্স। এই ককটেল-পার্টিটাতে স্ন্যাক্সের বেশ বাহার ছিল। কোনও ট্রেতে ফিশ ফিঙ্গার, কোনওটায় মিট বল, কোথাও পোর্সিলিনের বাটিভর্তি কাজুবাদাম আর পোটাটো চিপ্‌স। টুকরো-টুকরো ছানার মতো মশলাদার মাছ মুখার্জিবাবুর খুব ভাল লাগছিল। এগুলো গেঁথে খাওয়ার জন্যে লম্বা চেহারার টুথপিকও রাখা হয়েছিল ট্রের একপাশে।

দ্বিতীয় গ্লাস শেষ করে তৃতীয় গ্লাস হাতে নিতেই মুখার্জিবাবুর নিজেকে বেশ একটা কেউকেটা বলে মনে হচ্ছিল। একেই বলে বোধহয় প্রতিফলিত মহিমা। ধনী এবং প্রভাবশালীদের সঙ্গে হাতে গ্লাস নিয়ে কিছুক্ষণ গা ঘেঁষাঘেঁষি করলে এই ক্ষণস্থায়ী বোধটা বোধহয় তৈরি হয়ে যায়।

পার্টি জুড়ে শুধু ফুরফুরে হাওয়া আর ফুরফুরে মেজাজ। তৃতীয় গ্লাসের শেষের দিকে পৌঁছে মুখার্জিবাবুর হঠাৎ মনে হল—আরে! মুখে আঁচিল, লম্বা বিনুনি সেই সুন্দরী গেল কোথায়?

এমন প্রশ্ন মনে জাগলে উদ্দেশ্যহীন হয়ে আর ইতস্তত হাঁটাচলা করা যায় না। মুখার্জিবাবু মেয়েটিকে খুঁজতে শুরু করে দিলেন। এখন প্রায় সবাই উচ্চকণ্ঠ, কারও কারও কথা সামান্য এলোমেলো, দল বদল করার সময় কেউ কেউ বোধহয় একটু খাপছাড়া ভঙ্গিতে পা ফেলছে। অতিথি-অভ্যাগত, উদ্যোক্তা আর বেয়ারাদের ধরলে জনাষাটেক মানুষ। এর পাশ দিয়ে তার পাশ দিয়ে হাঁটার সময় মুখার্জিবাবুর চোখ ঘুরছিল চারদিকে। কোথায় গেল সেই মেয়েটা?

আরও কিছুটা ঘুরপাক খাওয়ার পরে পাওয়া গেল। ওই তো সেই লম্বা-বিনুনি আঁচিলওলা। একদম কোণের দিকের সোফাটায় বসে আছে। ওর দুপাশে কিশোর আর দিব্য। এদিকের চাইতে ওদিকে অন্ধকার একটু বেশি।

মাথার মধ্যে আবার একটা তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ল মুখার্জিবাবুর। দুজন যখন ওঁর এত পরিচিত, কাছে গেলে নিশ্চয়ই মেয়েটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে। আলাপ-পরিচয় হলে রহস্যময়ীর সম্পর্কে কিছু খোঁজখবর জোগাড় করা যেতে পারে। খবর না পাওয়া গেলেও ক্ষতি নেই, গল্প করা যাবে কিংবা শোনা যাবে। মেয়েটির প্রতি হঠাৎ বাড়তি একটু টান অনুভব করলেন মুখার্জিবাবু।

থমকে থেকে কিছুটা যেন গতি সঞ্চয় করলেন উনি, কিন্তু জোর কদমে দু-পা এগোতে না এগোতেই হঠাৎই একটা বেয়ারা কোত্থেকে এসে সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল। হুইস্কিভর্তি গ্লাসে বেয়ারার ট্রে প্রায় ভর্তি। মুখার্জিবাবু হাতের গ্লাসের বাকিটুকু একচুমুকে শেষ করে আর একটা গ্লাস তুলে নিলেন।

বেয়ারা কিন্তু পথ ছাড়ল না। হঠাৎই চাপা গলায় বলল, 'অনেক খেয়েছেন, এটা আর খাবেন না। খাবার খেয়ে বাড়ি ফিরে যান এবার।'

মুখার্জিবাবু নিজের চোখকে অবিশ্বাস করলেও কানকে পারছিলেন না। বেয়ারাটা ভিড়ের মধ্যে মিশে গেছে, ফিরে দেখার উপায় নেই আর। কিন্তু কথাগুলো যে অবিকল ওঁর তরুণ গোয়েন্দা মালিক কৌশিকের মতো!

তেইশ

কাল শুতে শুতে অনেক রাত্তির হয়ে গিয়েছিল কৌশিকের, কিন্তু প্রতিদিনের নিয়মে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সাতসকালেই। ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে, চারদিকে অবছা অন্ধকার। বাতাসে একটু শীত-শীত ভাব। কৌশিকের খুব ইচ্ছে করছিল—পাতলা একটা চাদর পা থেকে গলা পর্যন্ত টেনে আর এক দফা ঘুম মারে! নেহাতই একটা অলস ইচ্ছে, কিন্তু সেটা মুহূর্তের মধ্যে ভেসে গেল অন্য চিন্তায়।

কাল রাতে বাড়ি ফিরেই ও ক্যাসেটটা চালিয়ে দিয়েছিল। লুকিয়ে-রাখা টেপরেকর্ডারে বেশ কিছু গোপন কথা ধরা পড়েছে। কিছু মানুষের গোপন কথা ধরার জন্যেই ও অ্যান্‌'স ইনের বেয়ারা সেজেছিল। ওর একমাত্র কাজ ছিল ট্রে-ভর্তি হুইস্কির গ্লাস নিয়ে অতিথি-অভ্যাগতদের সামনে গিয়ে দাঁড়ানো।

হাতে গ্লাস নিয়ে ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে গিয়েছিল মানুষগুলো। ওয়েটারের কাজ হল ধাক্কা বাঁচিয়ে সতর্ক পায়ে চলাফেরা করে পানীয়র অবিরাম জোগান দিয়ে যাওয়া। গোটা দুয়েক পাত্তর সাবাড় হলেই বেশির ভাগ মানুষের মেজাজই ফুরফুরে হয়ে যায়, গলার স্বর একটু উঁচু পর্দায় ওঠে। কারও কারও মুখ থেকে আবার এই সময়ই একটু বেফাঁস কথা বেরোতে শুরু করে।

এইসব মানুষের কথা ঈশ্বরের পরেই যে সবচেয়ে বেশি শুনে থাকে সে হল ঘুরে ঘুরে হুইস্কি সার্ভ করার দায়িত্বে থাকা বেয়ারা। সুতরাং বেয়ারার ছদ্মবেশে গোয়েন্দা অনেকের অনেক কথাই শুনে ফেলেছে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেইসব টুকরো টুকরো কথার যোগফল রোমাঞ্চকর। কিন্তু সব উত্তেজনাকে ছাপিয়ে গেছে গোপন কথার ক্যাসেট।

এবার কিছু দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। দ্রুত এবং ত্রুটিহীন। পরিকল্পনাগুলো ভেসে বেড়াচ্ছিল গোয়েন্দার মাথার মধ্যে। এখন ওর কাজ হচ্ছে সেগুলো চটপট এক-দুই করে সাজিয়ে ফেলা। বেশি সময় আর হাতে নেই। এব পরে যা থাকছে তা হল হার কিংবা জিত। হয় অপরাধী জিতবে, নয় ও। যাকে বলে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই।

সরকারি অফিসের ফাইলে 'টপ প্রায়রিটি' কথাটা কী সহজে লেখা হয়। কিন্তু অপরাধের কিনারা করার খাতায় এই শব্দদুটো লেখা কঠিন। কোন্ অনুমান 'টপ প্রায়রিটি' পাবে আর কোন্‌টার স্থান ফাইলের একেবারে নীচে—তার হদিশ পাওয়া বুঝি অসম্ভব ব্যাপার। টুকরো টুকরো নানা সূত্র ও অনুমান তাস শাফল করার ঢঙে মাথার মধ্যে নাড়াচাড়া করছিল গোয়েন্দা।

বাইরে বৃষ্টি, মেঘলা আকাশ, আধো-ঘুমের সকালে মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষ খুব সহজেই শিথিল হয়ে যাওয়ার কথা—কিন্তু গোয়েন্দার মাথায় উলটো হিসেব কাজ করছিল। নানা ধরনের যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ করে যাচ্ছিল নিজের খেয়ালে।

একটু বাদে ও উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে। তারপর মুখেচোখে জলের ঝাপটা দিয়ে চা আর খবরের কাগজ হাতে বেতের চেয়ারে এসে বসল। খবরের কাগজের প্রথম পাতায় চাঞ্চল্যকর খবর বলতে যা বোঝায় তার কিছুই আজ নেই। মেঘলা আকাশ, ঝিরঝিরে বৃষ্টি আর স্যাঁৎসেতে আবহাওয়ার ছাপ পড়েছে যেন খবরের কাগজে। বরং গরম চা-টা ওর খুব ভাল লাগছিল। প্রতিটি চুমুকের সঙ্গে ফিনফিনে সাদা ধোঁয়া আর সুগন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল চোখেমুখে। চায়ের কাপটা শেষ হওয়ার ঠিক পরেই টেলিফোন বেজে উঠল। ওদিকে অ্যান্টনি গোম্‌সের গলা—'গুড মর্নিং স্যার।'

'গুড মর্নিং। খবর কী?'

খুব ঠাণ্ডা গলায় জবাব দিল গোম্‌স, 'তেমন কিছু পাইনি স্যার, এই একটু শুধু—।'

কৌশিক খুব ভালভাবেই জেনে গেছে, অসম্ভব নিস্পৃহ স্বভাবের এই ইনফর্মারটি অসম্ভব ঠাণ্ডা গলায় অসম্ভব সব খবর জোগান দেওয়ার এলেম রাখে। সুতরাং ও বিন্দুমাত্র হতাশ না হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'একটু শুধু—মানে ঠিক কী ধরনের? কাল প্রেমিক-প্রেমিকাকে ফলো করেছিলেন?'

'করেছিলাম স্যার।'

'কী দেখলেন? ওদের কথা শুনতে পেয়েছেন কিছু?'

'পেয়েছি স্যার, অনেক কথাই শুনেছি। আমি তো ওদের সঙ্গে প্রায় সেঁটে ছিলাম।'

'কী ভাবে?'

'সৈকত এক পেন্টারের বাড়ি থেকে ছবি জোগাড় করে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের কাছে এল। একটু বাদে এল ওই মেয়েটা। তরপরেই হেভি বৃষ্টি শুরু হল। ওরা ছুটে গিয়ে একটা শেডের নীচে দাঁড়াল। আমিও সেঁটে ছিলাম ওদের সঙ্গে।'

'কী ছদ্মবেশ ধরেছিলেন?'

'তেমন কিছু না স্যার, হিন্দুস্থানি হকারের—। একবার হিন্দিতে টাইমও জিজ্ঞেস করেছিলাম। আমাকে বিহারি ভেবে ওরা দিল্ খুলে নিজেদের মধ্যে বাংলায় কথা বলেছিল।'

'কথাবার্তা শুনে কিছু জানতে পারলেন?'

'কিছু স্যার—।'

'কী?'

'ডক্টর মৈত্র চোদ্দ তারিখে বিদেশে যাচ্ছেন।'

'চোদ্দ তারিখে! সে কী! পনেরো তারিখে তো মালদার অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠান প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে চান বলে উনি সেদিন কিশোর চৌধুরীকে বলছিলেন ওঁকে প্রথম সারির একটা সিট দিতে। আপনি ঠিক শুনেছেন তো?'

'ঠিক স্যার, পাকা খবর। সৈকতের মুখে অ্যাঞ্জেল ট্রাভেল্‌স-এর নাম শুনেছিলাম—। ওই এজেন্ট আমার খুব চেনাশোনা লোক, আমি পরে ওর কাছ থেকে কনফার্মেশন

নিয়ে নিয়েছি। সেদিন রাতের ফ্লাইটে বম্বে যাচ্ছে, পরদিন সকালে এয়ার-ইন্ডিয়া ধরে হিথ্রো'।

ট্রাভেল এজেন্টের কাছ থেকে যখন খবর পেয়েছেন তখন তো পুরোপুরি পাকা খবর। কিন্তু—।

'আর একটা খবর স্যার—।'

'কী?'

'ডক্টর মৈত্র একা নন, ওঁর সঙ্গে সৈকতও যাচ্ছে।'

'সৈকত! বিলেতে! কেন?'

'ডক্টর মৈত্রের কোম্পানিতে চাকরি পেয়েছে ও। ওর কাজ হবে ছবি কেনাবেচা। অনেক টাকা মাইনে, কিন্তু স্যার—।'

'কিন্তু কী?'

'ছবি কেনাবেচার ব্যাপারে সৈকতের কোনও অভিজ্ঞতা নেই।'

কথাটা শুনে চিন্তার নতুন একটা বলয় ছড়িয়ে পড়েছিল কৌশিকের মাথায়। কয়েক মুহূর্ত বাদে ও বেশ উচ্ছ্বসিত হয়ে ধন্যবাদ জানাল গোম্‌সকে, তারপর বলল, 'গোম্‌স্‌সাহেব, আপনি যে বলছিলেন তেমন কোনও খবরই জোগাড় করতে পারেননি—কিন্তু যা জানালেন তা তো খুবই ইম্পরট্যান্ট। ইনফর্মেশনগুলো আমার খুবই কাজে লাগবে।'

এত প্রশংসা, ধন্যবাদ জানাবার পরেও ওদিকের মানুষটার গলা থেকে কোনও শব্দ ভেসে এল না। টেলিফোনে মুখ দেখা যায় না, কিন্তু গোয়েন্দা পরিষ্কার কল্পনা করতে পারছিল—এত ভাল-ভাল কথা শোনার পরেও পাথরের মতো চোখমুখওয়ালা গোম্‌সের মুখের কোথাও খুশির একটা চিহ্নও ফুটে ওঠেনি।

এরপরে টেলিফোনে কয়েক মুহূর্ত আর কোনও কথা নেই। একটু বাদে গোম্‌স বলল, 'ঠিক আছে স্যার, এখন ছাড়ি তাহলে। দরকার হলে পরে আবার ফোন করব।'

টেলিফোন নামিয়ে রেখেছিল গোম্‌স, কিন্তু গোয়েন্দার হাতে রিসিভার কিছুক্ষণ ধরাই থাকল। ওর মাথার মধ্যে একটার পর একটা ঢেউ ভেঙে পড়ছিল। ওই ঢেউগুলো থামবার পরেই ও কাজের সূচি তৈরি করে নেবে।

আগের মতোই ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল, তবে সেই মেঘলা ভাবটা একটু কমেছে। মেঘের আড়ালে মাঝেমধ্যে রোদের আভাস দেখা যাচ্ছিল অল্পস্বল্প।

গোয়েন্দা এবার খবরের কাগজ সরিয়ে রেখে ওর ছোট ডায়েরিটা টেনে নিয়ে বসল। জটিল রহস্য সমাধানের নানা কঠিন সূত্র এই ডায়েরিতে লিখে রাখে ও। সবই সাঙ্কেতিক ভাষায়। ডায়েরি বেহাত হলেও ভয়ের কোনও কারণ নেই। কেউ কিছুই বুঝতে পারবে না। পুরনো সূত্র আর নতুন তথ্য মিলিয়ে আজ কয়েক পাতা ডায়েরি লিখল গোয়েন্দা। এই মুহূর্তে ওর মুখের দিকে তাকালে যে কেউ বুঝতে পারত—প্রতিটি বাক্য লেখার আগে মনে মনে ওকে বেশ কিছু কঠিন অঙ্ক কষে ফেলতে হচ্ছে।

পৌনে দশটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরোবার মুখে গোয়েন্দা ওর চেম্বারে একটা ফোন করল। ওপাশে মুখার্জিবাবু। কৌশিক রহস্যপূর্ণ ভঙ্গিতে বলল, 'কী, আপনার শরীর ভাল আছে তো?'

কথার ভেতরের অর্থটা ধরে ফেলে লাজুক গলায় মুখার্জিবাবু বললেন, 'না, তারপর আমি আর ওসব খাইনি। স্রেফ খাবার খেয়ে ফিরে এসেছি। আপনার ফিরতে বোধহয় একটু রাত হয়ে গিয়েছিল? না?'

'হবে না? বাবুদের খাওয়াদাওয়া শেষ হলে চাকররা এঁটোকাঁটা পরিষ্কার করে। তারপর নিজেরা খায়। কাল বাড়ি ফিরতে ফিরতে আমার মাঝরাত্তির হয়ে গিয়েছিল।'

'আপনি মেক-আপটা কিন্তু জব্বর নিয়েছিলেন। উটকো একটা বেয়ারার মুখে হঠাৎ আপনার গলা শুনে আমি তো ভীষণ চমকে উঠেছিলাম। কাল কোনও কাজ হল?'

প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে না গিয়ে কৌশিক বলল, 'আজ আপনাকে কী কাজ করতে হবে—সেটা এবার ভাল করে শুনে নিন।'

'আপনি আজ অফিসে আসছেন না?'

'আসব, তবে সন্ধের দিকে। সাতটার মধ্যে না এসে পৌঁছতে পারলে আর অপেক্ষা করার কোনও দরকার নেই। আপনার আজ পুরোটাই আউটডোর ডিউটি।'

'কোথায় যেতে হবে?'

'আমাদের বাড়ির কাছে।'

'অ্যাঁ!'

'হ্যাঁ। আজ কয়েকদিন হল আমাদের বাড়ির সামনে একটা হজমিতলা বসছে। আমার ধারণা ওর কাজ হল আমার ওপর নজর রাখা—কখন বাড়ি থেকে বার হই, কখন ফিরি, আমার কাছে কে কে আসে—এই সবের ওপর নজর রাখাই ওর কাজ।'

জবাবে মুখার্জিবাবু বেশ উত্তেজিত গলায় বললেন, 'কী আশ্চর্য! এত বড় একটা খবর, অথচ আপনি আগে আমাকে কিছুই বলেননি!'

'বলিনি মানে বলব-বলব করেও আর বলা হয়ে ওঠেনি। ঠিক আছে, আজ আপনার কাজ হল গুপ্তচরের ওপর গুপ্তচরগিবি করা। রাইট?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ। একেবারে রাইট।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে কৌশিক একটা ট্যাক্সি ধরে পাম অ্যাভিনিউতে এসে হাজির হল। এখানে ও আর্কেওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার একজন প্রাক্তন ডিরেক্টর বিশ্বজীবন মুখার্জির দর্শনপ্রার্থী। বিশ্বজীবনবাবু মস্ত পণ্ডিত। প্রাচীন ইতিহাসের বাইরে আর কিছু নিয়ে মাথা ঘামান না। পাঁচদিনের জন্যে জুরিখে গিয়েছিলেন একটি কনফারেন্সে পেপার পড়ার জন্যে। ফিরেছেন গতকাল। কৌশিক অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই দেখা করতে এসেছে।

এখানে আসার পথে কৌশিক ভাবছিল—বড় মাপের যে নেতা জাতি গঠন করেন

তাঁর দৃষ্টি থাকে দূর ভবিষ্যতের দিকে, আর যে পুরাতত্ত্ববিদ মাটির নীচে পাওয়া প্রাচীন শিলালিপির পাঠোদ্ধার করেন—তাঁর দৃষ্টি থাকে দূর অতীতের দিকে। এসব কথা মনে হচ্ছিল বলেই বুঝি বিশ্বজীবনবাবু দরজা খুলতেই কৌশিক ওঁর চোখের দিকে খুব ভাল করে তাকিয়েছিল। হাই-পাওয়ারের চাশমাওলা পড়ুয়া লোকের দৃষ্টি যেমন হয়, এই মানুষটির দৃষ্টিও তেমনই। পরনে ইস্তিরিবিহীন পাজামা-পাঞ্জাবি।

বেশ উষ্ণ অভ্যর্থনা পেল কৌশিক। ওদিকের চেয়ারটায় ও বসার সঙ্গে সঙ্গেই কাজের কথা শুরু করে দিলেন বিশ্বজীবনবাবু। 'বাইরে যাওয়ার আগেই আপনার দেওয়া ওই মূর্তিটা আমরা পরীক্ষা করেছি। বার্লিন মিউজিয়ামের কিউরেটর গুহবক্সী এখন কলকাতায়—এ ব্যাপারে ওঁর সাহায্যও পেয়েছি। ওই মূর্তিটায় ছোট্ট একটা ইন্সক্রিপশন ছিল, আমাদের এ এস আই-এর এপিগ্রাফিস্ট মহান্তিকে দিয়ে ওটার ট্রান্সক্রিপ্টও করিয়েছি। আচ্ছা, এবার বলুন তো, ওই মূর্তিটা আপনি ঠিক কোন্ জায়গা থেকে পেয়েছেন?'

জবাবে মৃদু গলায় কৌশিক বলল, 'এক গ্লাস জল হবে?'

'জল, জল, দাঁড়ান—।' কাকে যেন ডাকতে গিয়েও ডাকলেন না প্রত্নতাত্ত্বিক। কৌশিকের মনে হল, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই কাজের লোকের নাম ভুলে গেছেন এই মুহূর্তে। জল আনার জন্যে উনি নিজেই ভেতরের ঘরে ঢুকে গেলেন। একটু বাদে ফিরে এলেন এক গ্লাস জল হাতে নিয়ে।

বিব্রত মুখে কৌশিক বলল, 'আপনি আবার নিজে আনতে গেলেন কেন?'

পণ্ডিত প্রত্নতাত্ত্বিক ওই প্রশ্নের উত্তরের মধ্যে না গিয়ে বললেন, 'আইসবার্গের মাথাটুকু শুধু জলের ওপরে ভাসে, বরফের বিশাল চাঁইয়ের বাকি সবটুকুই থাকে জলের তলায়। আমার কী মনে হয় জানেন, মানুষের সভ্যতার ইতিহাসের শুধু মাথাটুকুর সন্ধান পেয়েছি আমরা। বাকিটা আছে মাটির তলায়! আপনার কি কখনও এরকম মনে হয়েছে?'

কৌশিকের কখনও এরকম মনে হয়নি, আর ও খুব ভালভাবেই জানে—ভবিষ্যতেও হবে না। কিন্তু বিখ্যাত মানুষটির প্রশ্নের জবাবে ও খুব নিচু গলায় বলল, 'আমি তো অত-শত বুঝি না, তবে আপনার কথা শুনে মনে হচ্ছে যে—।'

উলটো দিকের চেয়ারটায় বিশ্বজীবনবাবু বসে পড়ে বললেন, 'আপনি যে স্পেসিমেনটা আমাকে পরীক্ষা করে দেখতে বলেছিলেন সেটাকে হঠাৎ দেখলে অনেকেরই মনে হবে—আজকের পোড়ামাটির কাজ। আসলে ওটা স্যান্ডস্টোনের খুব প্রাচীন একটা শিল্পকর্ম। কবেকার আন্দাজ করতে পারেন? আমিও প্রথমে পারিনি। ওটা নবম শতাব্দীর স্পেসিমেন। ওতে যে কথাগুলো লেখা আছে তার কিছু কিছু ওই তাম্রলিপিতেও আছে। আমি ওটা ধরতে পেরে তো তাজ্জব! আপনি মালদার জগজ্জীবনপুর গ্রামের সেই বৌদ্ধবিহারের কথা জানেন তো?'

কৌশিক শুকনো মুখে মাথা নাড়াল দুদিকে।

বিশ্বজীবনবাবু চেয়ারটাকে সামনের দিকে একটু টেনে এনে বললেন, 'আরে মশাই, এ গল্প তো আপনাদের ওই রহস্য-উপন্যাসের গল্পকেও হার মানায়। জগজ্জীবনপুরে একটা উঁচু এলাকা পড়ে আছে দীর্ঘকাল ধরে। হালে প্রায় আশি ঘর উদ্বাস্তু পরিবার ওই এলাকায় ঘর-টর বেঁধে বাস করছিল। শুধু থাকা নয়, লাগোয়া জমিতে চাষবাসও করছিল। কয়েক বছর আগে চাষ করার সময় এক চাষির লাঙলের ফলায় ধাক্কা লেগে কী যেন একটা উঠে এল। কী? না, বেশ বড় একটা তামার পাত, তাতে কীসব যেন লেখা, ছবিও আঁকা। তা ওই চাষি ঘাবড়ে গিয়ে ওটা নিয়ে ছুটল বিডিও-র কাছে, বিডিও আবার ওটা নিয়ে ছুটলেন প্রত্নতাত্ত্বিক দফতরে। সরকারি ব্যাপার তো, কোনও কাজই চটপট হয় না। সবে সেদিন ওই তাম্রলিপি পড়া হল। পড়ার পরে এক্সপার্টরা তো অবাক। কী লেখা ছিল জানেন ওই লিপিতে?'

কৌশিক ওই গল্পের মধ্যে ঢুকে গিয়েছিল। পুরোপুরি নিপাট কৌতূহলী মানুষের গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কী?'

পণ্ডিত ব্যক্তিটি পৃথিবীর আশ্চর্যতম ঘটনা শোনাবার ভঙ্গিতে বললেন, 'তাম্রলিপির পাঠোদ্ধারের পরে জানা গেল, পাল বংশে মহেন্দ্রপাল নামে এক রাজা ছিলেন। অবাক কাণ্ড, যে ইতিহাস এতকাল ধরে আমাদের হাতে আছে সেখানে মহেন্দ্রপালের কোনও উল্লেখই নেই। পালবংশের ইতিহাসে তিন রাজার নাম ছিল—গোপালদেব, ধর্মপাল এবং দেবপাল। তাম্রলিপিটি পাওয়ার পরেই রাজা মহেন্দ্রপালের কথা জানা গেল প্রথম। কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার বলুন তো? অত বড় রাজ্যের এক রাজা, অথচ তার নামটাই অ্যাদ্দিন ধরে চাপা পড়ে ছিল! ওই তাম্রলিপিটিতে কী খোদাই করা ছিল জানেন?'

'কী?'

'ওটি আসলে একটি দানপত্র। আজকের আইনের ভাষায় যাকে বলে গিফ্‌ট ডিড। কারুকার্য-করা পুরু তামার পাত। মাপ যদ্দূর মনে পড়ছে বাহান্ন সিএম বাই সাঁইত্রিশ সিএম। তাম্রপত্রের মাথায় সারনাথের প্রতীকসমেত গোল সিল। সঙ্গে পালরাজাদের বিখ্যাত ধর্ম-চক্র। দানপত্রের নীচে মহেন্দ্রপালের নাম। বৌদ্ধবিহার বানাবার জন্যে রাজা অনেকটা নিষ্কর জমি দান করেছেন—ওটি হল সেই দানপত্র। ব্যস, তাম্রপত্রের পাঠোদ্ধারের পরেই স্টেট ডিরেক্টরেট অব আর্কেওলজি ওই জায়গাটায় এক্সকেভেশনের কাজ শুরু করে দিল। কিছুটা খোঁড়াখুঁড়ির পরেই বিশাল এক বৌদ্ধবিহারের হদিশ পাওয়া গেল। এটা বিখ্যাত সেই নালন্দা বিহারের মতো। খোঁড়াখুঁড়ির কাজ সামান্যই হয়েছে। কিন্তু যা পাওয়া গেছে তা তো বিস্ময়কর। ব্রোঞ্জের তৈরি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া গেছে, পাওয়া গেছে পাথর আর টেরাকোটার নানান কাজ, বৌদ্ধ স্তূপ। আসলে আজকের মালদা মানে তো সেদিনের গৌড়। কত যে অমূল্য সম্পদ পাওয়া গেছে—কী বলব! লাঙলের ফলায় লেগে চাষের মাঠ থেকেও উঠে এসেছে অনেককিছু।

কতটুকুই বা খোঁড়াখুঁড়ি হয়েছে, কিন্তু যা পাওয়া গেছে তা তো তুলনাহীন। কিছুকাল আগে ওখানকার একটা পুকুর থেকে কষ্টিপাথরের অসামান্য এক বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। টুয়েল্‌ভথ্‌ সেঞ্চুরির মূর্তি, কী দুর্দান্ত কাজ! বিষ্ণু দাঁড়িয়ে আছে পদ্মফুলের ওপর। ওর দু'পাশে লক্ষ্মী আর সরস্বতী। কষ্টিপাথরের তৈরি আরও অনেক মূর্তি পাওয়া গেছে। স্যান্ডস্টোনে তৈরি দুমুখো গরুড়ও পাওয়া গেছে বছর-চারেক আগে। এটা দশম শতাব্দীর এক বিরল মূর্তি। কী বলব আপনাকে, পাল যুগ সেন যুগের শিল্পকর্ম তো তুলনাহীন। মালদা'র হাবিবপুর হরিশচন্দ্রপুর, গঙ্গারামপুর, গৌড় ইত্যাদি জায়গা থেকে যেসব মূর্তি পাওয়া গেছে তা তো অমূল্য সম্পদ।'

এসব কথার খুব সামান্যই জানে কৌশিক, সুতরাং ও প্রায় হাঁ করে সব শুনছিল। পণ্ডিতমানুষটি থামতেই প্রশ্ন করে বসল, 'আচ্ছা এখনকার টাকার হিসেবে এই মূর্তিটুর্তিগুলোর কীরকম দাম হবে?'

'কোটি কোটি টাকা।'

'অ্যাঁ! বলেন কী!'

হঠাৎই একটু বিষণ্ণ দেখাল বিশ্বজীবনবাবুকে, 'হ্যাঁ, এত না হলেই বুঝি ভাল ছিল।'

'কেন, এ কথা বলছেন কেন?'

'এত দাম না হলে বোধহয় এত চুরি হত না।'

কৌশিক এতক্ষণ ধরে প্রাচীন ইতিহাসের মুগ্ধ শ্রোতা ছিল, এবার ওর ভেতরের গোয়েন্দাটি তৎপর হয়ে উঠল। 'চুরি হচ্ছে নাকি?'

'কয়েকদিন আগে শুনলাম, চুরিটা ইদানীং খুব বেড়ে গেছে। কষ্টিপাথর আর ব্রোঞ্জের অমূল্য কয়েকটি মূর্তি চুরি গেছে। বহু পুরনো কিছু মুদ্রাও খোয়া গেছে। এই ভাবে যদি চুরি হতেই থাকে—। আচ্ছা, আপনি ওই মূর্তিটা ঠিক কোত্থেকে পেয়েছেন?'

এই প্রশ্নের উত্তরটা ভাবাই ছিল গোয়েন্দার। চটপট জবাব দিল, 'একজন আর্ট-ডিলারের কাছ থেকে।'

'তিনি ওটা কোত্থেকে পেয়েছেন?'

'মালদার এক চাষির কাছ থেকে।'

কথাটা প্রায় লুফে নিলে-প্রত্নতাত্ত্বিক। 'বললাম না, ওখানে খুঁজলে পরে অনেক কিছু পাওয়া যাবে। তবে একটা কথা, এখনও অবশ্য কনফার্মেশন পাইনি—আপনি যে মূর্তিটি দিয়েছেন ঠিক সেইরকম একটি মূর্তি ওখানকার মিউজিয়ামে ছিল।'

'ছিল? এখন আর নেই?'

বিব্রত মুখে বিশ্বজীবনবাবু বললেন, 'না, মানে....আসলে মিউজিয়ামের মেনটেনান্স খুব একটা ভাল নয়। হয়তো খুঁজে পাচ্ছে না।'

'আপনি এক কাজ করুন না, ওই মিউজিয়ামের কিউরেটরকে বলুন—হারানো বা

চুরি যাওয়া মূর্তির একটা তালিকা বানাতে। আমি ওগুলোর কিছু কিছু উদ্ধারের ব্যাপারে আপনাদের হয়তো সাহায্য করতে পারি।'

কথাটা শুনে ছেলেমানুষের মতো খুশি হয়ে উঠলেন বিশ্বজীবনবাবু। 'তাহলে তো দারুণ হয়! আমি আজকেই ওই কিউরেটরকে ফোন করছি।'

ভদ্রলোকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়ল গোয়েন্দা। ধীর পায়ে ফুটপাথ ধরে হাঁটছিল। ওর মাথার মধ্যে এখন আর এক ধরনের অঙ্ক কষা শুরু হয়ে গেছে।

চব্বিশ

নতুন চশমার ভেতর দিয়ে কৌশিককে বেশ খুঁটিয়ে দেখার পরে মুখার্জিবাবু বললেন, 'আপনাকে আগের চেয়েও বেশি ঝকঝকে দেখাচ্ছে। আমার চোখ সত্যিই বেশ খারাপ হয়েছিল। তবে আপনার বাহাদুরি আছে বলতে হবে, চোখ খারাপ হল আমার; আর আপনি চোখের ডাক্তার না হয়েও সেটা ধরে ফেললেন।'

একচিলতে মজার হাসি ফুটে উঠেছিল গোয়েন্দার ঠোঁটে। 'নতুন চশমা পরে গোয়েন্দাগিরি কী করলেন বলুন এবার?'

ঝলমলে হয়ে উঠেছিল মুখার্জিবাবুর চোখমুখ। 'মানুষের জীবনের আশ্চর্যতম উপলব্ধির কথা লেখা আছে মহাভারতে। কী সেটা বলুন তো?'

'কী?'

'সব মানুষই জানে যে, মানুষ মরণশীল। আশেপাশে কত লোককে মরতে দেখছি অনবরত। কিন্তু আমরা বিশ্বাসই করতে পারি না যে, আমরাও একদিন মারা যাব।'

গোয়েন্দা অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'গোয়েন্দাগিরির মধ্যে আপনি আবার বড় বড় দর্শন টেনে আনছেন কেন?'

অবিকল দার্শনিকের ভঙ্গিতেই মুখার্জিবাবু বললেন, 'দর্শন তো জীবনের বাইরের ব্যাপার নয়। আমার বয়েস পঞ্চাশের ওপারে চলে গেছে তো, এখন মাঝেমধ্যে মৃত্যুটিত্যুর কথা মনে হয়। মহাভারতের ওই আশ্চর্যতম উপলব্ধি কিংবা পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের দিকে চোখ চলে যায়। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মনে হয়, মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় কৌতূহলগুলির একটি হল—নিজের ভবিষ্যৎ জানতে চাওয়া। কুড়ি-বাইশ বছরের ছেলেমেয়েরা নিজেদের ভবিষ্যৎ জানতে চাইবে—এটা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু সত্তর-আশি বছরের বুড়োবুড়ি নিজেদের ভবিষ্যৎ জানবার জন্যে কম উদ্গ্রীব নয়। আপনি লক্ষ করে দেখেছেন কি?'

'না। আপনি কি আজ কাজ ফেলে কোনও ধর্মসভায় গিয়ে বসেছিলেন?'

'না-না, আমি অত্যন্ত ডিউটিফুল। ধরে নিয়েছিলাম, হজমিওয়ালা-সাজা ইনফর্মারটি একজন সাধারণ মানুষ। তার একমাত্র কাজ হল সারাদিন বসে বসে আপনার বাড়ির

ওপর নজর রাখা। আপনি মাফিয়া ডন হলে লোকটা গরম গরম কিছু খবর পেয়ে যেত। কিন্তু আপনি তো আর তা নন। বাড়িতেও খুব কম সময় থাকেন। সুতরাং ছদ্মবেশ ধরে খোলা জায়গায় বসে বসে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট পরিমাণে ক্লান্ত আর হতাশ হয়ে পড়েছে ওই লোকটা। সুতরাং এখন ও যা জানার জন্যে ছটফট করছে তা হল ভবিষ্যৎ—এই কাজটার ভবিষ্যৎ এবং নিজের ভবিষ্যৎ। সুতরাং এখন ওর সবচেয়ে বেশি দরকার একজন জ্যোতিষীর।'

'আপনি জ্যোতিষী সেজেছিলেন?'

'ঠিক তাই।'

'সে কি! কখনও জ্যোতিষচর্চা করেছেন?'

'না, কখনও না, জ্যোতিষের বিন্দুবিসর্গ না।'

'তবে?'

এবার একটা সবজান্তার ভাব ফুটে উঠল মুখার্জিবাবুর মুখে। 'আমি দেখেছি কয়েকটি কথার কোনও মার নেই। জ্যোতিষী সেজে আপনি এগুলো বলে যান—লোকে ঠিক বিশ্বাস করে নেবে।'

'কী রকম?'

'আপনি গম্ভীর মুখে যে কারও হাত টেনে নিয়ে বলুন—এক—আপনি আসলে খুব ভালমানুষ, কিন্তু লোকে আপনাকে ভুল বোঝে। দুই—আপনি অনেকের জন্যে অনেক কিছু করেন, কিন্তু সেই স্বীকৃতি আপনি পান না। তিন—যে ধরনের বিপদের কথা কখনও ভাবেননি, সেই ধরনের বিপদের মধ্যে আপনাকে প্রায়ই পড়তে হয়। চার—আপনার সাংসারিক জীবন কখনওই একটানা সুখের হবে না। পাঁচ—।'

হাত তুলে ওঁকে থামিয়ে দিয়ে গোয়েন্দা বলল, 'আপনি আসল কথায় চলে আসুন তো চটপট। জ্যোতিষী সেজে হজমিওয়ালাকে ধরলেন। তারপর?'

'তারপর আর কী, ওই ধরনের দু-একটা কথা বলতেই হজমিওয়ালা কাত। আচ্ছা, আমার প্রায় প্রতিটি কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হজমিওয়ালা-সাজা গুপ্তচরটা নাকে হাত দিচ্ছিল, কানে হাত দিচ্ছিল, কানের লতি ধরে টানছিল। আপনি তো শরীরের ভাষা জানেন। এগুলোর মানে কী বলুন তো?'

'এসবের নানা ব্যাখ্যা আছে। পরে বলা যাবে। হজমিওয়ালার সঙ্গে আপনার কী কথা হয়েছে সেটা আগে বলুন।'

'বলছি কিন্তু ওগুলোর মানে কী? একটু জাস্ট—।'

কৌশিক হেসে বলল, 'আরে বাবা, চিহ্নের রিপোর্ট শুনে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ ধরা কঠিন। এটা আলাদা ভাবে চর্চার বিষয়। চর্চা ঠিক ভাবে করতে পারলে দেখার চোখ তৈরি হয়। তখনই ধরা যায় আড়ালের আসল অর্থ।'

গোয়েন্দার কথায় মুখার্জিবাবু বোধহয় একটু দুঃখ পেলেন। থম থমে মুখে বললেন, 'চর্চা আমি সেই সেদিন থেকেই করে যাচ্ছি। চর্চা না করলে কি ওই শারীরিক প্রতিক্রিয়াগুলো আলাদা ভাবে লক্ষ করতাম? কী, করতাম?'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে গোয়েন্দা বলল, শরীরের এক ভাষাবিশারদ বলেছেন, অল্পবয়েসি কাউকে কোনও একটি প্রশ্ন করুন—সে যদি সেই প্রশ্নের সঠিক উত্তর না জানে, সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের তর্জনী তার নাকে এসে ঠেকবে। ওই আঙুলটা নাকে ঘষবে কিংবা নাক চুলকোবে। এরকম করলে অনেকেই ধরে ফেলবে যে উত্তরটা ওর জানা নেই। হয় একেবারেই জানে না কিংবা যা জানে সেটা ঠিক কি না তা নিয়ে ওর যথেষ্ট পরিমাণে সংশয় আছে। কিন্তু আমাদের কোনও প্রশ্নের উত্তরে কোনও বয়স্ক মানুষ ওই রকম আচরণ করলে আমরা সেটা নিয়ে একেবারেই মাথা ঘামাই না। রেজাণ্ট কিন্তু এক—হুবহু ওই অল্পবয়সীর মতো।'

কথাটা শুনে সায় দেওয়ার ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন মুখার্জিবাবু।

আবার কথা শুরু করল গোয়েন্দা। 'বিখ্যাত এক অধ্যাপক এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করেছিলেন : তুমি ওই ক্লাসিকটা পড়েছ? কেমন লেগেছে তোমার? ছাত্রটি সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিয়েছিল : খুব ভাল স্যার। তাই শুনে অধ্যাপক বলেছিলেন : না, বইটা তোমার একেবারেই ভাল লাগেনি। ধরা পড়ে গিয়ে ছাত্রটি আমতা-আমতা করে বলেছিল : আপনি ঠিকই বলেছেন স্যার। ক্লাসিকটা আমার এতই খটমট লাগছিল যে, দু-চার পাতার পরে আর এগোতে পারিনি। অধ্যাপক শরীরের ভাষা জানতেন বলে আসল ব্যাপারটা ঠিক ধরে ফেলেছিলেন। ছাত্রটি অধ্যাপকের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় কী করেছিল বলুন তো?'

ভাল ছাত্রের মতো সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন মুখার্জিবাবু—'তর্জনী নাকে ঘষেছিল কিংবা ওটা দিয়ে নাক চুলকেছিল, তাই না?'

'ঠিক তাই, প্রশ্নের উত্তর জানা না থাকলে, মিথ্যে বললে কিংবা উত্তর নিয়ে দ্বিধা-সংশয় থাকলে মানুষের একটা অভ্যাস হল তর্জনী দিয়ে নাক ঘষা। নাক চুলকোনো, ঘাড়ের পেছনে ঘন-ঘন হাত রাখা, কানের লতি ধরে টানা—এইসব।'

হঠাৎই ধাঁধার অর্থ ধরে ফেলার আনন্দ ফুটে উঠেছিল মুখার্জিবাবুর চোখেমুখে। 'ব্যাটা আমাকে যে কথাগুলো বলেছে, সেগুলো নির্ঘাত গুলতাপ্পা। শেষের দিকে তো বেশ ঘন ঘন আর খুব জোরে জোরে নাক চুলকোচ্ছিল।'

গোয়েন্দা রহস্যপূর্ণ একটা হাসি হেসে বলল, 'তর্জনী দিয়ে নাক ঘষা বা নাক চুলকোনো নিয়ে কিন্তু চট করে কোনও সিদ্ধান্ত নেবেন না। কথা বলতে বলতে কারও কারও আঙুল দিয়ে নাক ঘষা বা নাক চুলকোনোর মুদ্রাদোষ থাকে। নাকে ফোঁড়াটোড়া হলেও নাকে আঙুল যায় বারবার। হজমিওয়ালা-সাজা লোকটার নাক একটু বেশি ফোলা-ফোলা বা লালচে দেখাচ্ছিল কি?'

প্রশ্নের উত্তরে মুখার্জিবাবুর তর্জনী ওঁর নাকে গিয়ে ঠেকল।

তাই দেখে কৌশিক হাসতে হাসতে বলে উঠল, 'থাক আপনাকে আর জবাব দিতে হবে না। আপনি যে ওটা লক্ষ করেননি সেটা আপনার নাকে আঙুল ঠেকানো দেখেই বুঝতে পারছি।'

হাতটা অমনি ছিটকে সরে গিয়েছিল মুখার্জিবাবুর নাক থেকে। ওঁর চোখেমুখে একটু অবাক-অবাক ভাব। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'লোকটাকে আমি আমার শেষ ভবিষ্যদ্বাণী কী শুনিয়েছিলাম জানেন? বলেছিলাম, আপনি আপনার এই হজমির ব্যবসা বেশিদিন চালাতে পারবেন না। তার জবাবে ও অদ্ভুত ভাবে বলেছিল—জানি, আমার এই ব্যবসার আয়ু বড়জোর আর দুটো দিন। বলেই লোকটা ওর হজমির বাঁক কাঁধে তুলে নিয়ে হনহন করে হেঁটে বাঁ দিকের গলির মধ্যে হাওয়া হয়ে গিয়েছিল। আমি ভেক নিখুঁত করার জন্যে কোষ্ঠীর কিছু ছক, হাতের ছাপ সাজিয়ে বসেছিলাম রাস্তায়। সেগুলো চটপট ব্যাগে পুরে প্রায় ছুটে গিয়ে ওই গলির মধ্যে ঢুকলাম, গলি থেকে বড় রাস্তা—কিন্তু টিকটিকি ততক্ষণে বেমালুম হাওয়া। অত অল্প সময়ের মধ্যে অত বড় বাঁক নিয়ে কোথায় হাওয়া হয়ে গেল বলুন তো?'

মুখার্জিবাবুর শেষ প্রশ্নটা নিয়ে কৌশিক একেবারেই মাথা ঘামাল না। কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে থাকার পরে বলল, 'লোকটা কী বলেছিল? আমার এই ব্যবসার আয়ু বড়জোর আর দুটো দিন। কেন বলেছিল এ-কথা?'

মুখার্জিবাবু একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বললেন, 'এই প্রশ্নটা আমার মাথাতেও এসেছিল, কিন্তু সেটা আর করার সুযোগই পাইনি। লোকটা তার আগেই বাঁক তুলে নিয়ে ধাঁ—।'

নিজের মনে বিড়বিড় করে বলল গোয়েন্দা—'প্রশ্ন করলেও ঠিক জবাব পেতেন না। আপনি যেমন ওকে বাজাচ্ছিলেন, ও-ও তেমনি আপনাকে বাজাচ্ছিল।'

কথাটা শুনে একটু আহত হলেন গোয়েন্দার সহকারী। মৃদু প্রতিবাদের গলায় বললেন, 'কিন্তু আমি তো বেশ জব্বর মেক-আপ নিয়েছিলাম। তা ছাড়া আমার মুখ থেকে একটাও বেফাঁস কথা বেরিয়েছে বলেও তো মনে হয় না!'

গোয়েন্দা বুঝতে পারল আঘাতটা কোথায় গিয়ে লেগেছে! ওটা সামাল দেওয়ার জন্যে একটু বিব্রত মুখে বলল, 'না, এ ভাবে ভাবাটা আমার বোধহয় ঠিক হয়নি। আপনি শুধু ভাল মেক-আপই নেন না, ভাল অভিনয়ও করেন। আপনাকে ধরে ফেলা নিছক একটা ইনফর্মারের কম্ম নয়।'

কথাটা শুনে মুখার্জিবাবুর ম্লান মুখে হাসি ফুটল আবার। হাসি মুখেই বললেন, 'অভিনয়টা আমার জীবনের সব ছিল একদিন। দিনে মহড়া আর রাতে অভিনয়—এই ভাবে কত দিন কত রাত! কিন্তু কখনও ক্লান্ত হয়েছি বলে মনে পড়ে না। বুড়ো বয়েসে ফের সেই যাত্রা, পালা, অভিনয়ের সঙ্গে পাকেচক্রে কিছুটা জড়িয়ে গিয়েছি। বেশ লাগছে কিন্তু। এবার আবার

মেক-আপ বা অভিনয় নয়— নির্দেশনা। কাজটা যেমন কঠিন তেমনি দায়িত্বপূর্ণ। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওই দুটো ছোট নাটকের কথা মাথায় ঘোরে। গাঁয়ের লোকগুলো অভিনেতা হিসেবে একেবারে আকাট। আসরে কী করবে কে জানে। ওরা তো ডুবিয়েই খালাস, কিন্তু বদনাম হবে আমার ডিরেক্টরের। তা, ওই হজমিওয়ালা কেটে পড়ার পরে ভাবলাম, হাতে একটু সময় আছে—একটা সারপ্রাইজ ভিজিট দিই শোভাবাজারে। দেখি ব্যাটারা নাটকের পার্ট মুখস্থ করছে কি না! বিকেলের দিকে একটা ঢুঁ মেরেছিলাম ওই বাড়িতে। গিয়ে দেখি হুলস্থুল কাণ্ড!'

'হুলস্থুল! কেন?'

'ও বাড়িতে পা দিয়েই শুনি কিশোরের স্ত্রী খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ডাক্তার-নার্স এসেছে। দিব্য, অতনুর সঙ্গে কয়েকজন অচেনা লোকও আছে। ওদের শোবার ঘরে সবার সঙ্গে সঙ্গে আমিও ঢুকেছিলাম। বিছানায় ছটফট করছিল কিশোরের স্ত্রী। দু-তিনজন ওকে চেপে ধরবার পরে নার্স ইনজেকশন দিল। তারপর ওর ছটফটানি কমল। শুধু কমাই নয়, একেবারে নিস্তেজ হয়ে মিশে গিয়েছিল বিছানার সঙ্গে। চোখ আধখোলা, মণি স্থির। জিজ্ঞেস করাতে অতনু বলল—কী অসুখ ডাক্তার এখনও ধরতে পারেনি, তবে পর-পর দু'দিনই একই ধরনের উপসর্গ দেখা গেছে।'

রীতিমত অবাক হয়ে গিয়েছিল গোয়েন্দা। 'এই তো সেদিনই কিশোরবাবু ওঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন—। অল্পবয়েসি, চমৎকার স্বাস্থ্য, দারুণ ব্রাইট।'

'কিছু কিছু বিচ্ছিরি, পাজি অসুখ আছে, সেগুলো এ-ভাবেই অসে, আগে থেকে কিচ্ছু জানান দেয় না।' একজন সমব্যথী মানুষের ভঙ্গিতে জবাব দিলেন মুখার্জিবাবু।

গম্ভীর মুখে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'কোন ডাক্তার এসেছিল? কী নাম?'

'এই রে, ডাক্তারের নামটাই তো জিজ্ঞেস করা হয়নি। আসলে তখন গোটা বাড়িটাই এমন থমথম করছিল—। পরে একদিন জিজ্ঞেস করে জানিয়ে দেব আপনাকে।'

'দেখতে কেমন ডাক্তারকে? লক্ষ করেছেন?'

'বয়েস বেশি নয়, বেশ হ্যান্ডসাম। খুব আস্তে কথা বলে। মনে হয় বিলেতফেরত ডাক্তার।'

'বিলেতফেরত কেন মনে হচ্ছে? এমনও তো হতে পারে—আর. জি. কর থেকে কিছুকাল আগেই পাশ করে বেরিয়েছে।'

'আমতা-আমতা করে জবাব দিলেন মুখার্জিবাবু,—হ্যাঁ, তাও হতে পারে। আসলে ডাক্তারের চেহারাটা এত ঝকঝক করছিল যে—। তবে শুধু ওই ডাক্তার কেন, আপনার চেহারাটাও তো আগের চেয়ে ঝলমলে ঠেকছে। মোদ্দা ব্যাপারটা কী জানেন, কম পাওয়ারের চশমা পরে আমি অ্যাদ্দিন ধরে সবকিছুই একটু কম-কম দেখতে অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম। এখন

চশমা পালটাবার ফলে সবকিছুই আবার একটু বেশি পরিষ্কার আর কেমন যেন অন্যরকম দেখতে শুরু করেছি। নতুন চশমার সঙ্গে চোখদুটোকে খাপ খাওয়াতে কয়েকটা দিন সময় লেগে যাবে। আগে কম দেখছিলাম, এখন বেশি দেখছি। এই দুটো দেখার মধ্যে রফা না হওয়া পর্যন্ত কোনও ব্যাপারে জোর দিয়ে কিছু বলা বোধহয় ঠিক হবে না। এই তো আজকের ওই নার্সকে দেখেই মনে হচ্ছিল—।'

'কী মনে হচ্ছিল?'

'মনে হচ্ছিল মহিলাকে আগে কোথায় যেন দেখেছি—।'

'দেখাটা তো অস্বাভাবিক নয়, দেখতেই পারেন।'

'আচ্ছা, আজকাল কি মেয়েদের মুখে একটু বেশি পরিমাণে আঁচিল হচ্ছে?'

'কেন?'

'নার্সের মুখেও একটা দেখলাম যেন—।'

কথাটা শুনেই কৌশিকের কপালে তিনটে রেখা ফুটে উঠেছিল, কিন্তু সেগুলো মিলিয়েও গেল চটপট। একটু হেসে ও বলল, 'আঁচিল আছে বলেই চেনা-চেনা লাগছে, না থাকলেই অচেনা মনে হত।'

গোয়েন্দার কথায় মুখার্জিবাবুও হাসলেন। 'কথাটা আপনি কিন্তু মন্দ বলেননি। আসলে ওই আঁচিলের সঙ্গে একটি মেয়েকে শনাক্ত করার ব্যাপারটা আমি এমনভাবে জড়িয়ে ফেলেছি যে—আঁচিলওয়ালা মেয়েমাত্রই এক বলে মনে হচ্ছে। নতুন চশমাটা আর দু-চারদিন ব্যবহার করার পরে মনে হয় এই গোলমালটা আর থাকবে না।'

'ভাল, কিন্তু দু-চার দিনের মধ্যে চোখে তেমন কিছু পড়লে উড়িয়ে দেবেন না দয়া করে। খুঁটিয়ে দেখবেন এবং আমাকে জানাবেন।'

'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, তা আর বলতে। তবে কিশোরের স্ত্রী হঠাৎই অসুস্থ হয়ে পড়ায় আমি খুব চিন্তার মধ্যে আছি। রামকেলির পথে আমাদের রওনা হওয়ার কথা দু-তিন দিন বাদে। ভদ্রমহিলা এখন সুস্থ না হয়ে উঠলে ওই অনুষ্ঠান বাতিল হয়ে যাবে না তো!'

'কেন, এই নিয়ে কোনও কথাটথা হয়েছে নাকি?'

'ঠিক সে ভাবে হয়নি, তবে এক সময় কিশোর দিব্যকে বলছিল—এই অবস্থায় ওর পক্ষে রামকেলিতে যাওয়া হয়তো সম্ভব হবে না।'

একজন সহানুভূতিশীল মানুষের ভঙ্গিতে কথাটায় সায় দিয়ে গোয়েন্দা বলল, 'ঠিকই তো, অসুস্থ স্ত্রীকে এ ভাবে ফেলে রেখে তো বাইরে আর সংস্কৃতি করতে যাওয়া যায় না।'

'সে তো একশোবার সত্যি। আমরা অবশ্য সবাই খুব আশা-ভরসা দিয়েছি—ওর স্ত্রী চটপট সুস্থ হয়ে উঠবে। অতনু দত্ত মানুষটা খুব ভাল। বলেছেন, আপনার স্ত্রী সুস্থ হওয়ার পরেও যদি কলকাতায় বাড়তি কারও থাকার দরকার হয়—আমি থেকে যাব। আপনার কিন্তু

রামকেলির অনুষ্ঠানে যাওয়া খুব জরুরি। কত লোকজন আসবে, কত যোগাযোগ। আপনি না থাকলে সামলাবে কে?'

কথাটা শুনে গোয়েন্দার কপালে দুটো রেখা আবার মুহূর্তের জন্যে ফুটে উঠেছিল। 'আচ্ছা, এই অতনু দত্তের সঙ্গে কিশোরের কদ্দিনের পরিচয়?'

'যদ্দুর শুনেছি খুবই অল্প দিনের। তবে দিব্যর সঙ্গে সম্পর্ক নাকি বহু কালের। এই অতনু দত্ত মানুষটাকে আমার কিন্তু খুব ভাল লাগে। আপনার লাগে না?'

কথাটার কোনও জবাব দিল না গোয়েন্দা। ওর দৃষ্টি বোধহয় সামনের দেয়াল ভেদ করে বহু দূরে চলে গিয়েছিল।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে মুখার্জিবাবু নিজের মনে কথা বলার ভঙ্গিতে বললেন,'আসলে এই অসুখবিসুখের কাছে আমরা খুব অসহায়। কাকে যে কখন ধরবে কেউ বলতে পারে না। কিছু কিছু অসুখ আবার সব পরিকল্পনা বানচাল করে দেয়। তবে আমার মনে হয় কিশোরের বউ সব সামলে নেবে চটপট। কম বয়েস তো, কম বয়েসে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাটা অনেক বেশি থাকে। আমার যা বয়েস, এই বয়েসে বেয়াড়া অসুখ ধরলে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠা কঠিন। ত্রিশের পর থেকে মানুষের শরীর প্রতিদিনই ক্ষয় হতে থাকে একটু-একটু করে।'

আলোচনাটা বোধহয় শারীরবিদ্যার দিকে ঠেলতে চেয়েছিলেন মুখার্জিবাবু, কিন্তু তাতে কোনও কাজ হল না। কৌশিক ঠিক আগের ভঙ্গিতেই দেয়ালের দিকে তাকিয়েছিল।

কিছুক্ষণ পরে আবার মুখ খুললেন মুখার্জিবাবু। 'আচ্ছা ঘনঘন সিগারেট খাওয়াটা তো টেনশন কাটাবার লক্ষণ। তাই না?'

'কেন? ঘন ঘন সিগারেট কে আবার খেল?'

'কিশোর। ওকে কিন্তু এমনিতে খুব একটা সিগারেট খেতে দেখিনি। আজ অল্প সময়ের মধ্যে তিনটে সিগারেট খেয়ে ফেলল। আসলে ওর চোখমুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল, অসম্ভব টেন্স্‌ড। মাঝেমধ্যে পায়চারি করছিল। পাঞ্জাবির পকেটে একগাদা খুচরো ছিল কখনও কখনও পকেটে হাত ঢুকিয়ে ওগুলো বাজাচ্ছিল। ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল হঠাৎ-হঠাৎ ভেজানো দরজা খুলছিল বিচ্ছিরি ভাবে পা দিয়ে ধাক্কা মেরে। আপনি তো শরীরের ভাষা কিছুটা শিখিয়ে দিয়েছেন, এখন আমি সুযোগ পেলেই ওগুলোর চর্চা করি। মানুষ উদ্বিগ্ন, শোকার্ত হলে বা অসহায় বোধ করলে ঠিক কী-কী করে, কিশোরের দিকে লক্ষ না রাখলে আমি জানতেই পারতাম না। এটা আমার মনে গাঁথা হয়ে থাকল। ভবিষ্যতে কারও আচার-আচরণে এই লক্ষণগুলো দেখলেই তার মনের অবস্থাটা বুঝে যাব চটপট। সত্যি, বডি ল্যাঙ্গুয়েজের কোনও জবাব নেই।'

মুখার্জিবাবুর কথা শেষ হতে না হতেই ফোন বেজে উঠল। ফোন ধরল কৌশিক। ওপাশ থেকে কীসব শোনার পরে ওর চোখমুখের চেহারা পালটে গিয়েছিল একদম। গম্ভীর

মুখে জিজ্ঞেস করল, 'তাই? কখন!' একটু বাদে বলল, 'ঠিক আছে, আমি আসছি। হ্যাঁ, এখনই।'

টেলিফোন নামাবার পরে গোয়েন্দার চেহারা বোধহয় আরও গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। ও নিচু গলায় মুখার্জিবাবুকে বলল, 'আমি অ্যাডভোকেটের চেম্বারে যাচ্ছি। আজ আর এখানে ফিরছি না, আপনি ঘরটর বন্ধ করে চলে যান; কাল দেখা হবে।'

মুখার্জিবাবু খুব ভালভাবেই জানেন, এখন হাজার প্রশ্ন করলেও গোয়েন্দার মুখ থেকে একটা উত্তরও বার হবে না। সুতরাং উনি তরুণ মালিকের কথায় সায় দিয়ে আরও নিচু গলায় উত্তর দিলেন, 'আচ্ছা।'

পঁচিশ

অ্যাডভোকেট কিরণ সেন প্রতিদিন কোর্ট থেকে ফেরার পরে ঘন্টাদেড়েক বিশ্রাম নেন, তারপর সন্ধের মুখে চেম্বারে ঢোকেন। আজকেও ঠিক সেই নিয়ম। কিন্তু টেবিলের একপাশে জড়ো করে রাখা ব্রিফগুলো ওলটাতে গিয়েই তিনি একটা ধাক্কা খেলেন। কোথায় গেল ওটা?

শুধু উকিলবাবুই নন, ওঁর সঙ্গে মুহুরিও গোটা ঘর তন্ন তন্ন করে খুঁজল। সেক্রেটারিয়েট টেবিল, একগাদা ড্রয়ার, আলমারি—না, কোথাও ওটা নেই। তা হলে কি চুরি হয়ে গেল! গোয়েন্দা তো সেইরকমই আশঙ্কা করেছিল। ওর আশঙ্কাকে একেবারেই পাত্তা দেননি উকিলবাবু। গত চল্লিশ বছরে এ বাড়ি থেকে কিচ্ছু চুরি যায়নি।

অসম্ভব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল কিরণ সেনের। গোয়েন্দার একটা আশঙ্কা যখন সত্যি হয়েছে, বাকিটাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। দ্বিতীয় আশঙ্কা ওঁর ছেলেবেলার বন্ধু অলোক মৈত্রের জীবনহানি নিয়ে। দুর্ভাবনায় অস্থির হয়ে কৌশিককে ফোন করেছিলেন উকিলবাবু।

ইতিমধ্যে দুজন মক্কেল এসে গেছে, কিন্তু উনি একটু ব্যস্ত আছেন জানিয়ে ওদের ওদিকের ঘরে বসিয়ে রেখেছেন। ফোন করার মিনিট-পঁচিশের মধ্যে কৌশিক উকিলবাবুর চেম্বারে এসে হাজির হল।

উকিলবাবু একটু ছটফটে ভঙ্গিতে গোয়েন্দাকে টেবিলের উলটো দিকের চেয়ারে বসালেন, তারপর গলার স্বর খাদে নামিয়ে বললেন, 'আপনাকে ফোন করার পরে আর এক দফা সব কিছু খোঁজাখুঁজি করলাম, কিন্তু গিফ্‌ট ডিড্‌টা পেলাম না। তার মানে কেউ নির্ঘাত ওটা সরিয়েছে, কিন্তু এ-ঘর থেকে কখনও একটুকরো কাগজ পর্যন্ত খোয়া যায়নি।'

গোয়েন্দা উকিলবাবুর দিকে তাকিয়ে খুব স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস করল, 'আপনি আর একবার খুব ভাল ভাবে মনে করে দেখুন তো—ডিড্‌টা টেবিলেই পড়ে ছিল, না ভেতরের ঘরের আলমারিতে রেখেছিলেন।'

রীতিমত বিব্রত দেখাচ্ছিল উকিলবাবুকে, উনি একটু থেমে থেমে বললেন, 'আপনি ওটা ভেতরের ঘরে রাখতে বলেছিলেন, কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি—আমি আপনার কথায় খুব

একটা গুরুত্ব দিইনি। না দেওয়ার পেছনে অন্য কোনও কারণ নেই—। যেহেতু আমার এখান থেকে কখনওই কিছু চুরি-টুরি যায় না, আমার ও নিয়ে কোনও দুশ্চিন্তা ছিল না। তবে ভেবেছিলাম, আপনি চলে যাওয়ার পরে ওটা সামনের কাঠের আলমারিতে তুলে রাখব। এক নম্বর, দু নম্বর—দুটো দানপত্রই না হয় একসঙ্গেই থাকবে। কিন্তু একদম ভুলে মেরে দিয়েছিলাম।'

'লাল ব্যান্ড লাগানো দানপত্রটা সামনের আলমারিতে আছে তো? দেখেছেন?'

'আছে, দেখেছি।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে বসে থাকার পরে গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'অলোকবাবু কি শনিবার সন্ধের ফ্লাইটে কলকাতায় ফিরছেন?'

'হ্যাঁ, আশু তো তাই জানিয়েছে।'

'পাকা খবর?'

'হ্যাঁ, একেবারে পাকা খবর। কালকেই ফিরতে চেয়েছিল, আশু অনেক কায়দা করে ঠেকিয়েছে।'

'ওই ব্যাপারে এখান থেকে আর কোনও ফোন গিয়েছিল?'

'না। তবে আশুর কাছ থেকে মেসেজ পাওয়ার পরে অলোক নিজেই কলকাতা-অফিসের সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে।'

'কথা বলে বাড়তি কিছু জানতে পেরেছে কি?'

'সেই কথাটা আমিও জানতে চেয়েছিলাম আশুর কাছে। না, কলকাতা-অফিস বাড়তি কিছু জানাতে পারেনি। শুধু এটা জানিয়েছে—সুনন্দ মিসিং। ব্যস, এইটুকুই—।'

গোয়েন্দা সেক্রেটারিয়েট টেবিলের কাছে আঙুল দিয়ে কিছুক্ষণ অদৃশ্য আঁকিবুকি কাটার পরে চাপা গলায় বলল, 'কলকাতায় ফেরার পরে অলোকবাবু ভয়ংকর একটা বিপদের মধ্যে পড়তে পারেন।'

'কী ধরনের বিপদ?'

'আপনাকে তো আগেই কিছুটা আন্দাজ দিয়েছি। যদি উনি বেঁচে যান—আমাদের সবারই ভাগ্য বলতে হবে।'

অলোক মৈত্রের ছেলেবেলার বন্ধু কিরণ সেনের মুখের রং মুহূর্তের জন্যে ওঁর মাথার সাদা চুলের মতোই হয়ে উঠেছিল। উদ্বিগ্ন মানুষটি নিচু গলায় বললেন, 'ওকে বাঁচাবার একটা উপায় আপনাকে বার করতেই হবে কৌশিকবাবু।'

গোয়েন্দার চৌকো চোয়ালের হাড় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল কিছুটা। অসম্ভব শান্ত গলায় জবাব দিল, 'আমার চেষ্টার কোনও ত্রুটি থাকবে না, তবে দু-একটা ব্যাপারে আপনার সাহায্য দরকার হবে আমার।'

‘এটা কি বলার মতো কোনও কথা হল! আপনি যা বলবেন আমি সাধ্যমতো তাই করার চেষ্টা করব।’

‘কিছু ব্যাপারে সাধ্যের বাইরে গিয়েও চেষ্টা করতে হবে।’

‘কী রকম?’

‘আপনার বন্ধু অসম্ভব জেদি। দু-একটা বিষয়ে ওঁর মত পালটাতে হবে আপনাকে। আপনি ওঁর ছেলেবেলার বন্ধু, আপনাকে উনি খুব মানেন। পারলে আপনিই পারবেন, আর কেউ ওঁকে ওঁর পথ থেকে টলাতে পারবে না। ’

অদ্ভুত এই প্রস্তাবটা শুনে নড়েচড়ে বসলেন উকিলবাবু। ‘কী ব্যাপারে ওর মত পাল্টাতে হবে?’

‘পরে বলব আপনাকে।’

‘পরে মানে কবে?’

‘খুব সম্ভবত শনিবার। আর রবিবার হাতে কোনও কাজ রাখবেন না, ওই দিনটা আপনাকে আমাদের সঙ্গে থাকতে হতে পারে—আপনার বন্ধুর স্বার্থেই।’

আইন নিয়ে যাঁরা ব্যবসা করেন তাঁদের নানা ধরনের লোকচরিত্রের মুখোমুখি হতে হয়, পাকা চুলের এই উকিলবাবুটি সারা জীবনে নানা প্রকৃতির বহু মানুষজন দেখেছেন। একটু থমকে থাকার পরে আবছা একটা হাসি ঠোঁটে ফুটিয়ে বললেন, ‘আমি এ-নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন করছি না। বুঝতে পেরেছি, আপনি যা বলেছেন তার বেশি আর কিছু ভাঙবেন না এখন। ঠিক আছে, আপনি যা বলবেন তাতেই আমি রাজি।’

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে গোয়েন্দা বলল, ‘ধন্যবাদ, আপনার কথায় ভরসা পেলাম অনেকখানি।’

অবাক হয়ে উকিলবাবু বললেন, ‘কিন্তু আপনি এত তাড়াতাড়ি উঠে পড়লেন কেন? বসুন, চা খাবেন।’

‘অন্য দিন খাওয়া যাবে, এখন হাতে একদম সময় নেই, কয়েকটা জায়গায় ছুটোছুটি করতে হবে। টেলিফোনে কথা বলব চলি।’

বলার পরেই যেন নিঃশব্দ লাফ মেরে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল গোয়েন্দা।

একটা ট্যাক্সি ধরে মিনিট-কুড়ি বাদে গোয়েন্দা গিয়ে হাজির হল গল্ফ ক্লাবের একটি সাদা দোতলা বাড়ির সামনে। দু-দফা সিকিউরিটির বাধা সরিয়ে কৌশিক যে মানুষটির সামনে এসে দাঁড়াল তাঁর নাম রজত গুপ্ত। সি আই ডি-র অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল। গুপ্তসাহেব দক্ষ ও সৎ অফিসার হিসেবে বিস্তর সুনাম পেয়েছেন। চাকরির বাইরে ওঁর দুটি শখ আছে। এক, খুব বড় মাপের ডালিয়া ফোটানো। দুই, মাছ ধরা। এই দুটি ব্যাপারে কৌশিকের আগ্রহও কম নয়। এই আগ্রহ রজতদার বাড়তি স্নেহ-ভালবাসা পাওয়ার ব্যাপারে কৌশিককে সাহায্য করেছে অনেকখানি।

রজত গুপ্ত গদিওয়ালা মস্ত চেয়ারে প্রায় ঢুকে গিয়ে কর্ডলেস টেলিফোনে কথা বলছিলেন। মাত্র কয়েক হাত দূরে মানুষটা, কিন্তু ওঁর বলা কথাগুলোর একটা শব্দও শুনতে পাচ্ছিল না কৌশিক। পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা প্রায় নিঃশব্দে গোপন কথা বলার এই কৌশলটি ভারী চমৎকার আয়ত্ত করে থাকেন।

কৌশিক নিজের সঙ্গে ব্যাপারটা মেলাচ্ছিল। ও যদি ওই ভাবে কথা বলত, এই দূরত্বে দাঁড়িয়ে রজতদা ওর কয়েকটি কথা নির্ঘাত শুনতে পেতেন!

টেলিফোনের কথা শেষ হওয়ার পরে রজত গুপ্ত হাসতে হাসতে বললেন, 'শোনো ইয়াং ডিটেকটিভ, আমি তোমার ফ্যান এখনও হইনি, তবে গুণগ্রাহীদের একজন। ভবিষ্যতে অনেক বড় বড় কাণ্ডকারখানা করবে আমি জানি—কিন্তু এখন, মানে এত কম বয়েসে তুমি ড্রাগলর্ডদের পিছু ধাওয়া করতে যেও না।'

'ওদের ধাওয়া করতে যাচ্ছি কে বলল আপনাকে?'

'টেলিফোনে তোমার দু-চারটে কথা শুনেই ধরতে পেরেছি। তুমি চুরি-ডাকাতি-জোচ্চুরি ধরো, দু-চারটে মার্ডার কেসও হাতে নিতে পারো, কিন্তু খবর্দার মাফিয়াদের ওপর তোমার পলকা জাল ফেলতে যেও না। ড্রাগ নিয়ে মিলিয়ন, বিলিয়ন ডলারের কারবার চলছে প্রতিদিন- গোটা পৃথিবীতে। আমাদের দেশের ডনদের পকেটেও কোটি কোটি টাকা। দেশে দেশে উগ্রপন্থী, বিদ্রোহীদের হাতে এই যে সফিসটিকেটেড আর্মস্, ওয়েপন্স্—এর পেছনেও ড্রাগ বেচার বিস্তর টাকা আছে। মেশিনগান চালিয়ে ঝাঁক ঝাঁক মানুষ মারার পেছনে ড্রাগ, আবার লক্ষ লক্ষ লোককে নেশা ধরিয়ে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার পেছনেও ড্রাগ।'

সামনের চেয়ারটায় ধপ্ করে বসে পড়ে কৌশিক বলল, 'আমি এত বড় বড় ব্যাপারের মধ্যে যেতে চাইনি। আমি শুধু জানতে চেয়েছিলাম—এখন ড্রাগ, মানে হেরোইন, কী ভাবে পাচার হয় বর্ডার এলাকায়।'

রজত গুপ্ত হেসে উঠে বললেন, 'এ কী কথা বলছ গোয়েন্দা! স্মাগলাররা তো বাঁধা রাস্তায় বাঁধা চালে কখনও যায় না। এ ব্যাপারে ওরা নিত্যনতুন ফন্দি বার করে।'

'হালের ওইরকম দু-একটা ফন্দিফিকিরের কথা বলুন না। '

'এ বিষয়ে তুমি লালবাজারের নার্কোটিক সেলের সঙ্গে কথা বলতে পারো, ওরা তোমাকে ড্রাগ পাচারের বিস্তর গপ্পো শুনিয়ে দেবে। এ লাইনে আবার প্রচুর কোড্ ল্যাঙ্গুয়েজের চল্ আছে। পুলিশ ধরো হঠাৎ খবর পেল আজকের দার্জিলিং মেলে মিস এমা আসছে। নির্দোষ খবর। একজন মহিলা যাঁর নাম মিস্ এমা তিনি অমুক ট্রেনে চেপে কলকাতায় আসছেন। ভাল কথা, আসতেই পারেন। তাঁকে রিসিভ করা্র জন্যে কাউকে হয়তো স্টেশনে যেতে বলা হচ্ছে। এর চেয়ে সহজ, স্বাভাবিক খবর আর কী হতে পারে? আসলে কিন্তু তা নয়। মিস এমা সাঙ্কেতিক নাম—যার অর্থ আফিম। ফ্যাক্স, টেলেক্স কিংবা টেলিফোনে খবর

চালাচালি হওয়ার পরে স্মাগলাররা ভাল মানুষ সেজে মিস এমাকে রিসিভ করল স্টেশনে গিয়ে। জানো এ সব?'

দু-দিকে মাথা নাড়িয়ে কৌশিক বলল, 'না। ড্রাগ চালানটালানের ব্যাপারে আমি খুবই কম জানি।'

'একটা জিনিসের তিনটে সাঙ্কেতিক নাম আছে—৯৯৯, ও কে, লাক। জিনিসটা কী বলো তো?'

'কী?'

'মরফিন। এ নামগুলো আবার তোমার, আমার নামের মতো নয় যে সারা জীবনই বয়ে বেড়াতে হবে। চোরাচালানকারীরা হরবখত বিভিন্ন ড্রাগের কোড্ নেম পালটে-পালটে দিচ্ছে। এদের সঙ্গে তাল রাখা ভীষণ কঠিন।'

'আচ্ছা, এরা এ সব স্মাগল করে কী ভাবে?'

'বললাম তো, এদের কায়দার কোনও অভাব নেই। তুমি কি ড্রাগ চালানের পথটা জান? কোত্থেকে আসে, কোথায় যায়—জানো?'

'কিছুটা।'

'ঠিক আছে আমি আরও কিছুটা বলে নিই, তা হলে বিষয়টা তোমার কাছে হয়তো আর একটু পরিষ্কার হবে। আমাদের দেশে বেশ বড় আকারে আফিমের চাষ হয় উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ আর রাজস্থানে। এ চাষ আইনসম্মত চাষ, আশেপাশে বেশ কিছু বেআইনি চাষও হয়। তবে আইনি, বেআইনি যাই হোক না কেন—এর একটা মোটা অংশ চলে আসে ড্রাগ চালানকারীদের হাতে। গোটা পৃথিবীর মধ্যে আফিমের সবচেয়ে বেশি চাষ হয় কুখ্যাত গোল্ডেন ট্রাঙ্গেলে। এই সোনালি ত্রিকোণ তৈরি হয়েছে বর্মা, যার হালের নাম মায়ানমার, এবং থাইল্যান্ড ও লাওসকে নিয়ে। এই ত্রিকোণের সীমান্ত রাজ্যগুলি হল আমাদের নাগাল্যান্ড, মণিপুর আর মিজোরাম। একটা মার্কিন রিপোর্ট বলছে—এখন এই গোল্ডেন ট্রাঙ্গেলে বছরে প্রায় আড়াই হাজার টন আফিমের চাষ হয়। আফিম প্রসেস করেই হেরোইন বানানো হয়। শুধুমাত্র এই গোল্ডেন ট্রাঙ্গেলেই হেরোইন উৎপাদনের পরিমাণ দিনে প্রায় পঁচিশ কেজি। এক কেজি হেরোইনের দাম কত বলো তো?'

'কত?'

'ওই সব হেরোইন আবার উত্তর-পূর্ব ভারত, বাংলাদেশ, নেপালের পথ ধরে লন্ডন, প্যারিস ও ইউরোপের বিভিন্ন শহরে ছড়িয়ে পড়ে। দাম এক-এক জায়গায় এক-এক রকম। সেরা দাম ওঠে নিউ ইয়র্কে। ওখানে এক কেজি হেরোইনের দাম প্রায় এক কোটি টাকা। এই হিসেবটা ধরলে পঁচিশ কেজি হেরোইন বেচে গোল্ডেন ট্রাঙ্গেলের প্রতিদিনের রোজগার হল পঁচিশ কোটি টাকা। তার মানে ওই এলাকার ড্রাগলর্ডরা ওই হেরোইন চোরাচালান থেকে মাসে ৭৫০ কোটি রোজগার করে। সব হেরোইন অবশ্য নিউ ইয়র্কে যায় না। দেশে এবং

অল্প পয়সার দেশেও বিক্রিবাটা হয়। যাই হোক টাকার মোট অঙ্কটা অকল্পনীয়। এ আবার শুধু একটা জায়গার হিসেব। এবার ভেবে দেখ—ড্রাগের পেছনে গোটা পৃথিবীতে কত কোটি টাকার লেনদেন হয়। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় শক্তিগুলোর একটা হল টাকা, এত টাকা যাদের হাতে তাদের মোকাবিলা করা কি চাট্টিখানা কথা! তবে লড়াই চালানো উচিত, আর প্রতিটি লেভেল থেকেই। আমার মতে এরা পৃথিবীর ঘৃণ্যতম অপরাধী। গোটা সমাজটাকে পঙ্গু করে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়ার তাল করেছে। বছর-পাঁচেক আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপার্টমেন্ট অব অ্যাপ্লায়েড সাইকোলজি একটা সেনসাস নিয়েছিল। সেই হিসেবে কলকাতার আটষট্টি হাজার লোক ড্রাগে আসক্ত, কিন্তু সবচেয়ে উদ্বেগের ব্যাপার কী জানো—এই নেশাখোরদের পঞ্চাশ শতাংশের বয়েস হচ্ছে পনেরো থেকে পঁচিশের মধ্যে।'

'সে কী!' উদ্বেগের ছাপ কৌশিকের মধ্যেও ফুটে উঠেছিল।

'তরুণরাই তো দেশের ভবিষ্যৎ। তা, তারাই যদি নেশাগ্রস্ত হয়ে পঙ্গু, অথর্ব হবে যায়, মারা যায়—কী ভয়ংকর ব্যাপার ভাবো তো! মণিপুর তো ছোট্ট একটা জায়গা ওখানে এখন ড্রাগ-অ্যাডিক্টের সংখ্যা প্রায় সত্তর হাজার।'

'ওখানে অত কেন?'

'বর্মা মুলুক থেকে যে-কটা পথে ড্রাগ এ দেশে পাচার হয় তার একটা বড় পথ হল মণিপুর। সীমান্ত এলাকাটা মস্ত বড়—দু-দেশের মধ্যে যাতায়াতের বিস্তর ফাঁকফোকর আছে। ড্রাগলর্ডরা স্থানীয় উপজাতিকেও কাজে লাগায়—ওটা একটা মস্ত সুবিধে। বর্মার সঙ্গে আমাদের চুক্তি হল—বর্মার সীমান্ত-এলাকার উপজাতিরা আন্তর্জাতিক সীমানা পেরিয়ে ভারতের মধ্যে চল্লিশ কিলোমিটার পর্যন্ত ঢুকতে পারবে, ও দিকে ভারতের উপজাতিরাও বর্মার মধ্যে ঢুকতে পারবে আঠারো কিলোমিটার পর্যন্ত। প্রবেশ অবাধ। পাশপোর্ট, ভিসার কোনও দরকার হয় না এদের।'

'কেন?'

'কারণটা মানবিক। নির্জন বর্ডার এলাকা। ওখানকার পাহাড়ি লোকজন খাবে কী? স্রেফ খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার জন্যে দুই সীমান্তের মধ্যে বার্টার ট্রেড চলে। এদিকের লোক ওদিকে গিয়ে এক ডজন ডিম দিয়ে দু কেজি চাল নিল, কিংবা ওদিকের লোক এদিকে এসে কিছু সব্জি বেচে দুধ বা ঘি জোগাড় করল। এই লেনদেন ওদের মধ্যে বহুকাল ধরে চলে আসছে। এটা বন্ধ হয়ে গেলে ওদের পক্ষে বেঁচে থাকাই কঠিন হয়ে পড়বে। মাফিয়া ডনরা উপজাতিদের এই অবাধ যাতায়াতের পুরো ফয়দা লুটছে। ড্রাগ পাচারে নামিয়ে দিয়েছে এদের। এরা হচ্ছে ক্যুরিয়ার। এত সহজে এত টাকা রোজগারের লোভ সামলাতে পারে না। উপজাতি সেজে পাকা স্মাগলাররাও আবার এদের দলে ভিড়ে যায়। দুজন চোরাচালানকারী অনায়াসে তিন কেজি হেরোইন সীমান্তের ওপারে পৌঁছে দেয়। এর জন্যে এদের রোজগারের অঙ্কটা বিরাট।'

'কীরকম?'

'ড্রাগ চালানের জন্যে এক-এক জায়গায় এক-এক ধরনের রেট। একজন পেশাদার চালানকারী বড় শহরে এক কেজি হেরোইন পৌঁছে দেওয়ার জন্যে কম করে এক লাখ টাকা দক্ষিণা নেয়। হালে ট্রাফিকাররা ড্রাগ পাচারে ছাত্র ও অল্পবয়সী বেকারদের কাজে লাগাচ্ছে। কায়দাটা জব্বর। ছাত্র ও বেকারদের ডেকে বলছে—তোমরা ক'টা দিনের জন্যে কিছু রোজগার করে এসো না। রোজগারের কথায় ইয়াংম্যানরা তো লাফাবেই। প্রস্তাবটিও বেশ লোভনীয়। দিল্লি, বোম্বে কিংবা কলকাতার কোনও একটা ফাইভ-স্টার হোটেলে এক সপ্তাহের জন্যে ছুটি কাটিয়ে এসো। সব খরচখরচা আমাদের। এর বাইরে তোমাদের মাথাপিছু দশ হাজার করে টাকা দেওয়া হবে। কিন্তু কাজটা কী? কিচ্ছু আহামরি নয়, জরুরি একটা পার্সেল শহরে এক ভদ্রলোককে পৌঁছে দিতে হবে। প্রস্তাবে সবাই একপায়ে খাড়া। যৎসামান্য এই কাজের বিনিময়ে দশ হাজার টাকা আর সাত রাত্তিরের জন্যে ফাইভ-স্টার হোটেলে বাস। এ তো আজগুবি গল্পের মতো! হেরোইনের ওই সব পার্সেলের অনেকটাই এর পর চলে যায় ইউরোপ, আমেরিকার বাজারে।'

রজত গুপ্তের কথা বলার ভঙ্গিটা ভারী সুন্দর, উনি থামতেই কৌশিক বলল, 'ড্রাগের ব্যাপারে আমি খাপছাড়া ভাবে কিছু কিছু জানতাম, এখন তো দেখছি পৃথিবীজোড়া একটাই চক্র—।'

'আন্ডারওয়ার্ল্ডের সবচেয়ে বড় চক্র। শুধু তাই নয়, পৃথিবীর জঘন্যতম অপরাধ এরাই করে থাকে। ড্রাগ পাচারের কায়দার কথা জিজ্ঞেস করছিলে না—এর তো হাজার-একটা পথ আছে। ট্যুরিস্ট সাজিয়ে ড্রাগ পাচার করার কথা তো বললামই। দেশি কায়দাগুলো হল পোশাকের আড়ালে বা বাক্স-প্যাঁটরায় লুকিয়ে; গাড়ির লুকনো জায়গায় রেখে, কুকুরের বেল্ট বা জুতোর হিলের মধ্যে—কত বলব! ক্যামেরা বা টর্চের ব্যাটারির ভেতরেও ড্রাগ পাচার করা হয়। এগুলোর কথা পুলিশের লোকজন জানে, কিন্তু এদের সঙ্গে এঁটে ওঠা শক্ত। নিত্যনতুন ফন্দি বার করে। গোটা পৃথিবীটাকে ধ্বংস করে দিতে চলেছে এই লোকগুলো। সোনার চোরাচালান মস্ত বড় অপরাধ, কিন্তু সেখানে লেনদেন হয় ছোট একটা সেকশনের মধ্যে। আর ড্রাগ? এর সবচেয়ে বড় শিকার হল ফুলের মতো অল্পবয়সী ছেলেমেয়েরা। পেড্লাররা এদের নেশা ধরাবার জন্যে ঘুরঘুর করছে চারদিকে। দেখিই না একবার কী হয়—এইরকম একটা ধারণা থেকে অল্পবয়সীরা এগোয়। অতিরিক্ত কৌতূহল আর অ্যাডভেঞ্চারের ঝোঁক তো এদের থাকবেই। ড্রাগ-ফেরিওয়ালারা এর সুযোগটা নেয়। চট করে ধরে যায় এদের নেশাটা। একবার ধরলে কিন্তু ফেরা খুব কঠিন। নেশাখোরদের মানসিক বিপর্যয় দেখা দেয় প্রথমেই। আত্মনির্ভরতা নষ্ট হয়ে যায় পুরোপুরি। তারপর ধ্বংস হয় শরীর। শোনো গোয়েন্দা, আমি বুঝতে পেরেছি তুমি ড্রাগ চালানকারীদের পিছু নেওয়ার কথা ভাবছ। খুব কঠিন কাজ! যদি সত্যিই ধাওয়া করো, খুব সাবধানে থাকবে। পথের কাঁটা সরাবার জন্যে

দু-দশটা খুন করা ড্রাগলর্ডদের কাছে মশা মারার মতো তুচ্ছ ব্যাপার। আর ঘুঁটি পেকে উঠলেই আমাকে জানাবে। আমরা তখন ঝাঁপিয়ে পড়ে সবকটাকে ছেঁকে তুলব।'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তা চালাবার পরে উঠে পড়ল কৌশিক। রজত গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার কোথায়?'

'এক ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করব। তিনি ড্রাগ-অ্যাডিক্টদের চিকিৎসা করেন।'

'কে আবার অ্যাডিক্ট হল, বন্ধুর ছোট ভাইটাই নিশ্চয়ই। এই ধরনের খবর শুনলে এখনও উত্তেজিত হয়ে পড়ি আমি। তুমি আমার চেয়ে ঢের বেশি হবে—এটা স্বাভাবিক।'

ডক্টর দেবাশিস সান্যালের সঙ্গে দেখা করার পরে আরও কয়েকটা কাজ সারল কৌশিক, তারপর বাড়ি ফিরে এল অনেক রাতে।

ফিরতেই ফোন। ওপাশে গোম্‌স। গোম্‌সের নিচু গলার কথাগুলো শুনে কঠিন হয়ে উঠল গোয়েন্দার চোখমুখ। হিসহিসে গলায় বলল, 'আমি ঠিক এইরকমই আশঙ্কা করেছিলাম।'

ছাব্বিশ

ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়ের খাসকামরায় পা দিয়েই কৌশিক দেখল সাহেব টেলিফোনে কথা বলছেন। কথা বলতে বলতেই ঘোষরায় হাতের ইঙ্গিতে বসতে বললেন কৌশিককে। বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিলের সামনে তিনটে চেয়ার, আর এক সারি চেয়ার আছে দূরের দেয়াল ঘেঁষে। দূরের একটা চেয়ারেই বসে পড়েছিল কৌশিক।

আরও মিনিট-দুয়েক টেলিফোনে হুঁ-হ্যাঁ করার পরে রিসিভার নামিয়ে রাখলেন ইন্সপেক্টর, তারপর স্নেহের ধমকের গলায় কৌশিককে বললেন, 'দূরে কেন, কাছে এসে বোসো।'

শিষ্ট, মার্জিত তরুণ গোয়েন্দা সামনের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে লাজুক মুখে উত্তর দিয়েছিল, 'আপনি আপনার বসের সঙ্গে গোপন কথাবার্তা বলছিলেন তো, তাই আর সামনে আসিনি।'

হা-হা করে হেসে উঠে ইন্সপেক্টর বললেন, 'ব্রিটিশরা ভারত ছাড়ার অনেক পরে তুমি জন্মেছ, কিন্তু এই ব্রিটিশ-ভদ্রতা শিখলে কোত্থেকে?'

লাজুক ভঙ্গিতে আর একবার হেসে সামনের চেয়ারটায় বসে পড়েছিল কৌশিক।

ঝানু ইন্সপেক্টর ঘোষরায় হঠাৎই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কিন্তু আমি যে বসের সঙ্গে কথা বলছিলাম তুমি বুঝলে কী করে? তুমি আসার পরে আমি হুঁ-হ্যাঁ ছাড়া আর কিছু বলেছি বলে তো মনে পড়ে না।'

'সেটাই তো প্রমাণ করে আপনি আপনার বড় সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিলেন। বড় সাহেব ছোট সাহেবকে নির্দেশ দেবেন, ছোট সাহেব হুঁ-হ্যাঁ বলে শুনে যাবেন—এ লাইনে এটাই তো দস্তুর।'

ঘোষরায়ের ধারালো দৃষ্টি এখনও নরম হয়নি। 'কী ধরনের কথাবার্তা হয়েছে সেটা কিছু আন্দাজ করতে পারো?'

'কিছুটা।'

'কীরকম?'

'আমি এ-ঘরে আসার আগে আপনি বড় সাহেবকে যে কথাটা বলেছিলেন—ধরা যাক আপনার কোনও কাজের প্রোগ্রেস রিপোর্ট—তাতে তিনি প্রথমে খুব একটা সন্তুষ্ট হননি। মানে, আপনি যা বলেছিলেন তা নিয়ে তাঁর কিছুটা সংশয় ছিল। পরে সেটা কেটে গেছে। তিনি আপনার কথা মোটামুটি মেনে নিয়েছেন। তারপর ওঁর কথাবার্তা খুব সহজ হয়ে উঠেছিল। শেষে বেশ কিছু উপদেশ দিয়েছিলেন। এই বয়েসে ওইসব উপদেশ শুনতে আপনার একেবারেই ভাল লাগেনি। কিন্তু বড় সাহেবকে থামিয়ে দেওয়া যায় না বলে আপনি কষ্ট করেও কথাগুলো হজম করে গেছেন। কিন্তু টেলিফোন নামাবার পরে টের পেলাম আপনি কোনও একটা বড় কাজে সফল হয়েছেন।'

ইন্সপেক্টরের ধারালো দৃষ্টি এখনও পুরোপুরি নরম হয়নি। কৌশিকের চোখে চোখ রেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'জ্যোতিষচর্চা কবে থেকে শুরু করলে তুমি?'

'ওই ব্যাপারটা আমি একেবারেই বুঝি না।'

'তবে কী দেখে এই কথাগুলো বললে?'

'এ-ব্যাপারে আমার সম্বল বলতে তো বডি ল্যাঙ্গুয়েজ—শরীরের ভাষা।'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ সেদিনও বলছিলে বটে, তা আজকের ব্যাপারটা ভেঙে বলো তো শুনি।'

একটু রহস্যপূর্ণ ভঙ্গিতে হেসে কৌশিক বলল, 'বেশ, বলছি। ধরা যাক, আপনার কোনও একটা কাজের ব্যাপারে আপনার বস্ আপনার ব্যাখ্যা জানতে চেয়েছিলেন। আপনি দিয়েছেন, কিন্তু উনি তাতে সন্তুষ্ট না হয়ে নানারকম প্রশ্ন তুলেছিলেন। এর পরেই আমি আপনার দফতরে ঢুকেছি—।'

ওকে থামিয়ে দিয়ে ঠাট্টার গলায় ইন্সপেক্টর বলে উঠলেন, 'তুমি তো দেখছি সাঙ্ঘাতিক! এখানে পা দেওয়ার আগেই বুঝে গেলে আমাদের মধ্যে কী-কী কথাবার্তা হয়েছে—অ্যাঁ!'

'আন্দাজে ধরেছি আপনার পরের ভাবভঙ্গি দেখে। আমি দেখলাম টেলিফোনে হুঁ-হ্যাঁ করতে করতে আপনি আপনার সেক্রেটারিয়েট টেবিলের ওপরের ড্রয়ারটা বারবার খুলছেন আর বন্ধ করছেন। টেলিফোন করার সময় জটিল কোনও অবস্থার মধ্যে পড়লে অনেকের আচরণ এইরকম হয়ে থাকে। তারপর এক সময় দেখলাম ড্রয়ারটা বন্ধ করে দিলেন, আর খোলার মধ্যে গেলেন না। সমঝোতায় পৌঁছে গেলে পরের আচরণটিও ওইরকম হয়।'

কৌশিকের ব্যাখ্যা শুনে ইন্সপেক্টরের চোখের সেই ধারালো ভাবটা লোপাট হয়ে গিয়েছিল বেমালুম। উনি গম্ভীর মুখে নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'তারপর?'

'এরপর আপনার বড় সাহেব আপনার কী করা উচিত—তা নিয়ে একটানা উপদেশ দিতে শুরু করেছিলেন। কথাগুলো শুনতে আপনার খুব খারাপ লাগছিল, কিন্তু বড় সাহেবের ফোন তো, তিনি কথা শেষ না করা পর্যন্ত আপনার পক্ষে ফোন নামিয়ে রাখা সম্ভব নয়, তাই—।'

'নামিয়ে রাখাই উচিত ছিল, ঘ্যানঘেনে উপদেশ। আরে বাবা আমি চাকরি থেকে রিটায়ার করার মুখে এসে দাঁড়িয়েছি, আর এখন কী ভাবে আমার এগোনো উচিত তাই নিয়ে লেকচার ঝাড়া!' ঝোঁকের মাথায় কথাগুলো বলেই থমকে গেলেন ইন্সপেক্টর, তারপর ঢোক গিলে প্রশ্ন করলেন, 'কিন্তু তুমি এসব জানলে কী করে?'

একচিলতে হাসি ফুটে উঠেছিল কৌশিকের ঠোঁটে—'কী করে আবার, শরীরের ভাষা পড়ে। শেষের দিকে কথা বলার সময় আপনি সামনের রাইটিং প্যাডটা টেনে নিয়ে বলপেন দিয়ে হিজিবিজি কাটতে শুরু করে দিয়েছিলেন। হিজিবিজি লেখা, উলটোপালটা লাইন টানা, গোল্লা পাকানো, নানা ধরনের সংখ্যা লেখা, ছবি আঁকা—। প্যাডটার দিকে তাকিয়ে দেখুন না—এক-দেড় মিনিটের মধ্যে কী অবস্থা করেছেন এই পাতাটার। টেলিফোনে কথা বলার সময় এরকম করার অর্থই হল—ওপাশের মানুষটার কথা শুনতে আপনার একেবারেই ভাল লাগছে না, অথচ কোনও কারণে টেলিফোন নামিয়ে রাখাও সম্ভব নয়। আপনার চোখমুখের ওপরেও আপনার মনের ছাপ পড়েছিল কিছুটা।'

আর একবার ঢোক গিলে পকেট থেকে রুমাল বার করে কপালের ঘাম মুছলেন ইন্সপেক্টর। ওঁর দৃষ্টির মধ্যেই একই সঙ্গে একটু বিস্ময় আর একটু সংশয় মিশে ছিল। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'বেশ, কিন্তু আমি টেলিফোন নামাবার পরে তুমি কী করে বুঝলে যে, আমি কোনও একটা কাজে সফল হয়েছি।'

'এটা ধরেছি খুব সহজ লক্ষণ দেখে। টেলিফোনে অযথা উপদেশ শুনতে শুনতে আপনি রীতিমত বিরক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এসব ক্ষেত্রে টেলিফোন নামাবার পরেও বিরক্তি কাটাতে একটু সময় লাগে। কিন্তু আপনার বেলায় আজ তা হয়নি। টেলিফোন নামিয়েই আপনি হাসিমুখে আমাকে কাছে ডেকে নিয়েছেন। কোনও কাজে সাফল্য না এলে মনের ভাব এত দ্রুত পালটাতে পারে না কেউ। এমনও হতে পারে, আপনি আপনার এই সাফল্যের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলতে চান—।'

দুঁদে ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়ের এতক্ষণের গাম্ভীর্য, সংশয়, জেরা করার ভঙ্গি সব একসঙ্গে উড়ে গেল এবার। টেবিলের ওপর বাঘের মতো একটা থাবা মেরে বলে উঠলেন, 'এগ্‌জ্যাক্টলি! একটু আগেও আমি তোমার কথা ভাবছিলাম। তোমার কিছুটা সাহায্যের দরকার। কেসটা এমনিতে গোলমেলে নয়, কিন্তু পাকেচক্রে বেশ ক'টা দিন নষ্ট হয়ে গেল তো—। আর্টিস্টের চোখে একবার নয়, দু-বার কনজাংটিভাইটিস! আরে বাবা! আই-উইটনেসের কাছ থেকে বর্ণনা শুনে ছবি আঁকাতে না পারলে খুনিকে ধরব কী করে? অন্যান্য পথে চেষ্টা

যে আমি চালাইনি তা নয়, কিন্তু বড় সাহেবদের বড়-বড় মাথা সেটা বুঝতে চায় না। ওই ড্রাইভারের কাছ থেকে শুনে শুনে আমাদের আর্টিস্ট খুনির একটা ছবি এঁকেছে। ফিনিশিং টাচ দেওয়ার পরে আজ সকালে ওই ড্রাইভার এসে ছবিটা দেখে অ্যাপ্রুভও করে গেছে। বলেছে, হ্যাঁ, এই লোকটাই মাথায় গুলি চালিয়ে খুন করেছে মিলন মাইতিকে। ড্রাইভার সত্যি কথা বলছে কি না—তা নিয়ে গোড়ার দিকে আমার একটা খটকা তৈরি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু পরে নানা ভাবে বাজিয়ে দেখার পরে আমি এখন শ্যিওর—লোকটা সত্যি কথাই বলেছে। তবে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটা দিন কেটে গেছে তো—! এখন প্রশ্ন হল, একটা লোককে একবার মাত্র দেখার স্মৃতি একজন মানুষ কত দিন মাথার মধ্যে ধরে রাখতে পারে! ওভারল্যাপ হয়ে যাওয়া অসম্ভব নয়। একজনের ছবি আঁকাতে গিয়ে আর একজনের ছবি আঁকিয়ে ফেলেনি তো ড্রাইভার!'

কথাগুলো খুব মনোযোগের সঙ্গে শুনছিল কৌশিক, ইন্সপেক্টর থামতেই জিজ্ঞেস করল, 'লোকটাকে কি ট্রেস করতে পেরেছেন?'

'না-না, এখনও পর্যন্ত যতগুলো ছবি দেখা হয়েছে তার মধ্যে ওই লোকটা নেই। আরও রেফারেন্স ঘাঁটতে হবে, দেখি—।'

'ছবিটা কি আছে আপনার কাছে?'

'আছে, দেখাচ্ছি। ইন ফ্যাক্ট আরও কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করার পরে কোনও হদিস না পেলে ছবি নিয়ে আমি তোমার কাছেই ছুটতাম।' কথা বলতে বলতে সামনের স্টিলের আলমারি খুলে একটা ছবি বার করলেন ঘোষরায়। তারপর কাছে এসে ছবিটা বাড়িয়ে দিলেন কৌশিকের দিকে। ছবিটা হাতে নিয়েই চমকে উঠল কৌশিক।

প্রতিক্রিয়া চোখ এড়ায়নি ইন্সপেক্টরের। জিজ্ঞেস করলেন, 'চেনো না কি লোকটাকে?'

কয়েক মুহূর্ত থমকে থাকার পরে কৌশিক বলল, 'আপনার কাছে আজকের টেলিগ্রাফ আছে?'

'আছে, শহরের সব কটা ইংরেজি বাংলা দৈনিকই আমি রাখি।'

পাশের ছোট টেবিলের ওপর আজকের খবরের কাগজগুলোর ছোট একটা স্তূপ। স্তূপের ভেতর থেকে 'দি টেলিগ্রাফ' বার করে কৌশিকের দিকে এগিয়ে দিলেন ইন্সপেক্টর।

কৌশিক কাগজে হাত না দিয়ে বলল, 'বারোর পাতাটা খুলুন তো—মেট্রোপলিটন পেজ।'

তড়বড় করে বারোর পাতা খুললেন ইন্সপেক্টর।

'দেখতে পাচ্ছেন?'

'কী?'

একদম ওপরের দিকে প্রেস কনফারেন্সের একটা ছবি ছাপা হয়েছে। যে লোকটা টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলছে তাকে একটু ভাল করে দেখুন তো?'

'কেন? আরে! তাই তো—!' শিল্পীর আঁকা খুনির ছবির সঙ্গে প্রেস কনফারেন্সের বক্তৃতা-

দেওয়া লোকটাকে বারকয় মিলিয়ে দেখার পরে টেবিলের ওপর ভারী হাতের একটা থাবা বসালেন ইন্সপেক্টর—'এই লোকটাই তো! না, কোনও ভুল নেই।'

উত্তেজনায় ইন্সপেক্টরের মুখে একটা লালচে ছাপ ফুটে উঠেছিল। তীক্ষ্ণ চোখে দুটো ছবি আর একবার মিলিয়ে নিয়ে ঘোষরায় প্রশ্ন করলেন, 'লোকটাকে তুমি চেনো?'

কৌশিকের চোখমুখ কেমন যেন স্থির হয়ে গিয়েছিল, প্রশ্নের উত্তরে ও দুদিকে শুধু মাথা নেড়েছিল আস্তে আস্তে।

ঝলমল করছিল ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের চোখমুখ। 'তোমার অবজার্ভেশন দারুণ তো! অচেনা, উটকো একটা লোকের ছবি খবরের কাগজে একবার মাত্র দেখে ঠিক মনে রেখে দিয়েছ?'

কৌশিক এখন আবার আগের মতো স্বাভাবিক হয়ে উঠেছে। মৃদু গলায় বলল, 'মানুষটা আমার কাছে অচেনা হলেও সবার কাছে নয়। রিপোর্ট পড়ে জানতে পারলাম আমাদের দেশের পুরনো আমলের ঐতিহাসিক বাড়িঘর রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে বেশ একটা উদ্যোগ নিয়েছেন ভদ্রলোক। ইনি পয়সাঅলা প্রবাসী। এ-দেশে বেশ কিছু টাকা বিনিয়োগ করে প্রকল্প গড়বেন। তাতে দেশের সম্পদ বাড়বে, চাকরির সুযোগ তৈরি হবে। রিপোর্টটা পড়ে আমি তো খুব ইম্‌প্রেস্‌ড হয়েছি। ভাবছিলাম—যাক, এরকম ভাল লোকও তাহলে আছে কিছু কিছু।'

অবস্থাবিপাকে নয়—স্রেফ চাকরির সুবাদে শুধু সাত নয়, তিন-সাত্‌তা একুশ ঘাটের জল চেখে দেখেছেন ইন্সপেক্টর ঘোষরায়। বহুদর্শী মানুষের ভঙ্গিতে ঠোঁটের কোণে হাসির একটা আভা ফুটিয়ে বললেন, 'বুঝতে পারছি ইয়াংম্যান, কোথায় আটকাচ্ছে! ভাবছ, যে মানুষটা এত ভাল ভাল কাজ করতে যাচ্ছে, তাকে অকারণে ঝঞ্ঝাটের মধ্যে টেনে আনা হচ্ছে কেন? কিন্তু ভাই, অপরাধের দুনিয়াটা ভারী আজব! এখানে হয় না বলে কিছু নেই। তুমি যে এ সব জানো না, তা নয়। তবে তোমার মস্ত বড় একটা ডিসঅ্যাড্‌ভান্টেজ হল—তোমার বয়েস খুব কম। আমি সারা জীবন ধরে যেসব কুকীর্তি দেখেছি, তার পরেও যে আমার মধ্যে কিছু মায়া-মমতা, মনুষ্যত্ব আছে—সেটাই অবাক হওয়ার মতো ব্যাপার।'

সফল মানুষদের একটা মস্ত দোষ হল—সুযোগ পেলেই উদাহরণ হিসেবে তাঁরা নিজেদের দেখান। আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন ইন্সপেক্টর, তার আগেই ওঁকে থামিয়ে দিয়ে কৌশিক বলল, 'আপনি টেলিগ্রাফের রিপোর্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন, ও মনে হয় আপনাকে ডক্টর মৈত্রের বাড়ির ঠিকানাটাও দিতে পারবে।'

'হ্যাঁ, কাগজের ছবিটা দেখেই এটা আমার মাথায় খেলে গেছে। লোকটাকে খুঁজে বার করা আর কোনও সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু আমার সামনে এখন অন্য একটা প্রশ্ন।'

'কী?'

'মিলন মাইতিকে খুন করার পেছনে এই ডক্টর মৈত্রের মোটিভ কী ছিল? সেটা অবশ্য

ওর ব্যাকগ্রাউন্ড জানার পরে কিছুটা আন্দাজ করা যাবে। বাকিটা টেনে বার করব জেরা করে। তুমি এখন কোথায় যাবে?'

কৌশিক বুঝতে পারল ইন্সপেক্টর আর একটা মুহূর্তও নষ্ট না করে ডক্টর মৈত্রকে ধরার তোড়জোড় শুরু করে দিতে চাইছেন। চেয়ার ছেড়ে ও উঠে পড়ে বলল, 'একটা অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে, যেতে হবে একটা জায়গায়।'

'কিন্তু তুমি হঠাৎ এলে—বিশেষ কোনও দরকার-টরকার ছিল কি—।'

'একটা ধন্যবাদ দিতে এসেছিলাম।'

'ধন্যবাদ! কেন?'

'অ্যান্'স ইন আমার বন্ধুর বিয়েতে দারুণ খাইয়েছে, চার্জও নিয়েছে খুব কম; আপনি না বলে দিলে—।'

ওকে থামিয়ে দিয়ে ইন্সপেক্টর বলল, 'এটা যদি ধন্যবাদ দেওয়ার বিষয় হয়, তাহলে আমি তোমাকে কী দেব?'

অবাক হল কৌশিক। 'কোন্ ব্যাপারে!'

'খড়ের গাদায় আমি ছুঁচ খুঁজতে বসেছিলাম, তুমি এসেই তো সেটা বার করে দিলে—।'

'কীরকম?'

'এই যে খবরের কাগজের ছবি দেখিয়ে ডক্টর মৈত্রকে চিনিয়ে দিলে।'

'এটা কী বলছেন! আপনাদের যে নেটওয়ার্ক—।'

'হ্যাঁ, খুঁজে হয়তো বার করতে পারতাম শেষ পর্যন্ত, কিন্তু মাঝখানে সময় নষ্ট হয়ে যেত অনেকটা। বড় সাহেবরা ধমকেধামকে আমার ব্লাড-শ্যুগার কতয় তুলে দিয়েছে জানো—।'

মৃদু হেসে কৌশিক বলল, 'এবার নেমে যাবে।'

বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল ইন্সপেক্টরকে। ভরাট গলায় সায় দিলেন কথাটার—'আই হোপ সো।'

হাসিমুখে বিদায় নিল কৌশিক, কিন্তু পথে বেরিয়েই ও অসম্ভব গম্ভীর হয়ে গিয়েছিল। মাথার মধ্যে এখন আর এক ধরনের অঙ্ক কষা শুরু হয়ে গেছে। জটিল এই অঙ্কের মূলে আছে ডক্টর জ্যোতি মৈত্র। গোটা ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নতুন একটা কোণ থেকে দেখার চেষ্টা করছিল গোয়েন্দা।

ভাবতে ভাবতে বাস স্টপ। মিনিবাসে বসেও ওই একই বিষয় নিয়ে ডুবে থাকল কৌশিক। চেম্বারে পৌঁছতে আধ ঘন্টা দেরি হয়ে গিয়েছিল ওর।

মুখার্জিবাবু বলার মতো বেশ কিছু কথা মুখের মধ্যে জমিয়ে রেখে বসে ছিলেন চুপ করে, কৌশিক চেম্বারে পা দিতেই হড়বড় করে সেগুলো বলতে শুরু করেদিলেন।

মাথার মধ্যে অন্য চিন্তা থাকার জন্যে কথার খেই ধরতে একটু দেরি হয়েছিল গোয়েন্দার। ধরার পরে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি আজ সকালে কিশোরের বাড়িতে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ, মানে কাল ওর স্ত্রীকে ওইরকম অসুস্থ দেখে এসেছিলাম, ভাবলাম এখানে আসার পথে একবার খবরটা নিয়ে যাই।'

'খুব ভাল করেছেন। কেমন আছে ওর স্ত্রী?'

'আগের চেয়ে ভাল। ডাক্তার বলেছে ভয়ের কোনও কারণ নেই, তবে এখনও বেশ কয়েক দিন ইনজেকশন চালাতে হবে। ও হ্যাঁ, আপনি ডাক্তারের নাম জিজ্ঞেস করছিলেন তো—জেনে এসেছি আজ। ডাক্তারের নাম অর্ণব সেনগুপ্ত, এন. আর. এস-এর সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড। আমি ঠিকই আন্দাজ করেছিলাম—এফ আর সি এস। আপনার পা কেমন আছে জিজ্ঞেস করছিল কিশোর। মিথ্যে কথাটা খেয়াল ছিল না, আমি অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে বলেছি—আগের চেয়ে অনেক ভাল আছে, পা ভাঙেনি। তবে ফোলা আর ব্যথা দুটোই আছে।'

মৃদু হেসে কৌশিক বলল, 'কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে ভাল করেছেন। আমিও আমার পা মচকাবার ব্যাপারটা বেমালুম ভুলে গিয়েছিলাম।'

হঠাৎই একটুকরো ছায়া নেমে এসেছিল মুখার্জিবাবুর মুখে। 'সবই ভাল, কিন্তু একটা খবর শুনে আমার খুব মন খারাপ হয়ে গেছে।'

'কী খবর?'

'আমার ওই ফজল বিবি পালার এক অভিনেতা অসুস্থ হয়ে পড়েছে হঠাৎ। কাঁপুনি দিয়ে যে ভাবে জ্বর আসার কথা শুনলাম, ম্যালেরিয়া-ট্যালেরিয়া হলেই তো কেলেঙ্কারি! রোল্‌টা ছোট, সংলাপ বেশি নেই, কিন্তু চমৎকার একটা কমিক রিলিফ দেওয়ার জন্যে চরিত্রটাকে আনা হয়েছে। ব্যাপারটা কী রকম জানেন? বিশাল মোটা হয়ে যাওয়ার পরে ফজল বিবির বাগানের পেল্লায় সাইজের আমগুলোর নাম দেওয়া হয়েছিল ফজলি আম। শেষের দিকে ফজল বিবি সেটা জানতে পেরে রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তার এক চাকরকে হুকুম দিল, এক্ষুনি একটা কুড়ুল নিয়ে গিয়ে পেল্লায় সাইজের ওই আমের সব ক'টা গাছ কেটে ফেল। সন্ধের মধ্যে যদি তোমার গাছ কাটা শেষ না হয়, নবাবকে বলে তোমার গর্দান নেব। চাকরের নাম জাফর মিঞা, ঘরদোর ঝাঁটপাট দেওয়া তার কাজ, কুড়ুল কখনও হাতেই নেয়নি। কিন্তু নবাবের পেয়ারের নর্তকীর আদেশ অমান্য করার সাধ্য ছিল না। তারপর কুড়ুল নিয়ে আমগাছ কাটতে যাবে জাফর, কিন্তু লিকপিকে চেহারায় লোকটা কুড়ুলের ভারেই কাত হয়ে ছিল। যতবার কুড়ুল মারছে আমগাছের গায় ততবারই ছিটকে পড়ছে মাটিতে। একটু মোটা দাগের ভাঁড়ামো, কিন্তু ওইসব জায়গায় এসব দেখার খদ্দের আছে প্রচুর। আছাড় খেয়ে পড়ার দৃশ্যগুলো লোকটা ভালই করছিল, এখন ওকে ম্যালেরিয়া ধরলেই তো কেলেঙ্কারি। এই রোল্‌টার জন্যে বদলি অভিনেতাও নেই।'

'আচ্ছা ডক্টর মৈত্রকে আপনার কেমন মনে হয়?'

প্রশ্ন শুনে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন মুখার্জিবাবু। 'ডক্টর মৈত্র! না-না, উনি গাঁয়ের এ সব যাত্রাপালায় অভিনয় করবেন না।'

গোয়েন্দার চৌকো চোয়াল কঠিন হয়ে উঠেছিল। গম্ভীর গলায় বলল, 'ডক্টর মৈত্র অভিনেতা হিসেবে কেমন, আপনার পালায় অভিনয় করবেন কি না—সে প্রশ্ন আমি করিনি। আমি জানতে চেয়েছিলাম—মানুষ হিসেবে কেমন? সৎ না অসৎ?'

যাত্রাপালার দুনিয়া থেকে হঠাৎ অন্য একটা জগতে ফিরতে অসুবিধে হচ্ছিল মুখার্জিবাবুর। কয়েক মুহূর্ত থমকে পরে বিড়বিড় করে গোয়েন্দার প্রশ্নটাকেই আবৃত্তি করলেন—'সৎ না অসৎ?'

গলার স্বর একটু নীচে নামিয়ে গোয়েন্দা বলল, 'ডক্টর মৈত্রকে পুলিশ মিলন মাইতির হত্যাকারী হিসেবে সন্দেহ করছে।'

'অ্যাঁ! কী সাঙ্ঘাতিক! অথচ বাইরে থেকে লোকটাকে দেখে কিচ্ছু বোঝাব উপায় নেই।'

'না-না, এখনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে পুলিশ ওঁকেই সন্দেহ করছে।'

'ওহ্! শুধুই সন্দেহ।'

'আচ্ছা, সুনন্দ তরফদার সম্পর্কে আপনার কী ধারণা?'

গোয়েন্দার প্রশ্নের উত্তরে চটপট উত্তর দিলেন মুখার্জিবাবু, 'ভাল নয়। একেবারেই ভাল নয়। লোকটা তো এখন আবার গা ঢাকা দিয়েছে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে গোয়েন্দা বলল, 'চেয়ারটা একটু সামনের দিকে টেনে আনুন তো, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে।'

সাতাশ

উত্তর চব্বিশ পরগণার এস পি সাহেবের অফিসের সামনে হাটুরে লোকটাকে রীতিমত অসহায় দেখাচ্ছিল। এই ধরনের মানুষরা পুলিশকে খুব ভয় পায়। ভগবানের পরেই যাঁকে তারা সবচেয়ে বেশি মানে তিনি থানার বড়বাবু। এই এস পি সাহেব আবার বড়বাবুর বড়বাবু। সশস্ত্র পাহারাদার পেরিয়ে এঁর খাসকামরায় হাটুরে লোকের পক্ষে ঢোকা খুব কঠিন। কিন্তু কঠিন কাজটা সম্পন্ন হল একসময়।

এস পি সাহেব চোখে প্রশ্ন নিয়ে লোকটার দিকে তাকাতেই হাটুরে মিনমিন করে বলল, 'আমি কৌশিক মিত্রের কাছ থেকে—।'

কথাটা শেষ হওয়ার আগে এস পি বেল বাজালেন। সঙ্গে সঙ্গে একজন কনস্টেবল ঢুকল। এস পি তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই লোকটিকে পেছনদিকের সাদা বাড়িটায় নিয়ে যাও।'

পেছন বলতে ওই কামরার পেছন নয়, পেছনদিকের পথ ধরে বেশ কিছুটা হাঁটার পরে একটা সাদা বাড়ির দেখা মিলল। হাটুরে বুঝল সাদা বাড়িটা কোনও কারবারি লোকের ছিল।

দাওয়ায় লম্বাটে একটা তক্তপোশ। সঙ্গের কনস্টেবলটা ধমকে ওঠার গলায় বলল, 'এখানে বসে থাকো।' বলেই ও আবার পেছনের পথ ধরল।

মিনিট কুড়ি বাদে গঁ-গঁ করতে করতে ওখানে একটা টেম্পো এসে হাজির হল। টেম্পোর মধ্যে জনাপাঁচেক লোক উবু হয়ে বসে আছে। প্রত্যেকের সামনেই একটা হাঁড়ি। হাঁড়িতে হাত ঢুকিয়ে লোকগুলো জল খলবল করছিল।

এদিকের অনেকের কাছেই দৃশ্যটি খুব চেনা। জলের মধ্যে চারামাছ আছে। লোকগুলো চারামাছের বিক্রেতা। ক্রেতা কিনে পুকুর বা বিলে ছাড়বে। টেম্পোওলার পাশে বোধহয় একজন ফড়ে বসে আছে, সে হেঁকে উঠে বলল, 'এই যে নীল হাফশার্ট, তুমি টেম্পোয় উঠে পড়োদিকিন চটপট।'

একটু ইতস্তত করার পরে নীল শার্ট হাটুরে টেম্পোর ওই পাঁচ মেছোর পাশে উঠে বসল। তারপরেই টেম্পো গঁ-গঁ করে এঁকেবেঁকে চলতে চলতে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল। পড়ার পরেই জোর ছুট লাগাল সামনের দিকে।

সূর্য মাথার ওপর থেকে পশ্চিমদিকে একটুখানি ঢলে পড়েছে। এদিকটা বেশ খোলামেলা। হু হু করে হাওয়া বইছিল। হাওয়ায় সামান্য ঠাণ্ডা ভাব।

সূর্য আরও কিছুটা ঢলে পড়ার পরে টেম্পো পৌঁছে গেল বসিরহাটে। ছড়ানোছেটানো দোকানঘর। টেম্পো বটগাছের ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াল। কারবারি লোকদের টেম্পো। এগুলো ছাড়ার মুখে কিংবা নির্দিষ্ট জায়গায় থামার পরেই লোকজনের তৎপরতা বেড়ে যায়। এখানেও তাই হল। একটু হাঁকডাক করে টেম্পোর যাত্রীরা হাঁড়িবোঝাই চারামাছ নিয়ে নেমে পড়ল। নেমে পড়ল টেম্পোওয়ালা, পাশের ফড়ে, নীল জামা গায় হাটুরে লোকটা। রাস্তার পাশেই একটা জলা। মাছের ব্যাপারিরা সেখান থেকে কয়েক ঘটি জল তুলে এনে হাঁড়ি বোঝাই করে আবার আগের মতো হাত ঢুকিয়ে জল খলবল করতে লাগল।

হাটুরে লোকটা একটু যেন অবাক হয়ে চারদিক দেখছিল। জায়গাটা ওর বোধহয় অচেনা। কিংবা এই ধরনের মানুষের চোখেমুখে সামান্য বিস্ময় আর ভীতি বুঝি সবসময়ই লেগে থাকে।

কিছুক্ষণ পরে একটু দূরে ঝকঝকে সাদা অ্যাম্বুলেন্সমার্কা একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল। গাড়িতে লাল ক্রস, পাশে বড় বড় ইংরেজি হরফে লেখা ইউ এন মিশন। নীচে ছোট হরফে আরও অনেক কিছু লেখা। গাড়িতে লালমুখো এক সাহেব আর মেম, ওদের পাশে এ-দেশি এক ভদ্রলোক। গাড়ি থামবার পরেই ড্রাইভার নেমে বনেট খুলে ভেতরে উঁকিঝুঁকি মারতে লাগল। কলকব্জার যান, একটু হয়তো বিগড়েছে।

সাইকেলবোঝাই ডাব নিয়ে একটা লোক ওখানে গিয়ে হাজির হয়েছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। সাহেব-মেমরা এ-দেশে তেষ্টা মেটাবার জন্যে মিনারেল ওয়াটারের পরেই নির্দোষ

ডাবের জল পছন্দ করে। বোঝাই যায়, সাইকেলের ডাবওয়ালা এই তথ্যটা খুব ভালমতই জানে। পাঁচগুণ বেশি দামে ডাব বেচা এখানে কোনও সমস্যাই নয়।

ডাব দেখে সাহেব, মেম আর দেশি যাত্রীটি গাড়ি থেকে নেমে পড়েছিল। ডাবওয়ালাও অমনি ধারালো কাটারি দিয়ে ডাব কেটে ধরিয়ে দিয়েছিল ওদের হাতে। কাটা ডাব, কিন্তু স্ট্র নেই। সেই ডাব খেতে গিয়ে কিছুটা জল চলকে পড়ল মেমসাহেবের গলায়, বুকে। ব্যাপারটা আদপেই হাসির নয়, কিন্তু মেমসাহেব তুচ্ছ ওই ঘটনায় শিশুর মতো সরল হাসিতে দুলে দুলে উঠছিল।

এসব এলাকায় নিয়মের বাইরে কিছু-একটা দেখলেই বাচ্চাকাচ্চা জুটে যায়। এখানেও জুটে গেল। নেংটির মতো পোশাক-পরা কালো কালো এক ঝাঁক বাচ্চা সামনে দাঁড়িয়ে ওই দৃশ্য উপভোগ করছিল।

এখানকার বাসিন্দারা মাঝেমধ্যেই সাহেব-মেম সমেত রিলিফের গাড়ি দেখতে অভ্যস্ত। এরা সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার থেকে অনাহার, অপুষ্টি আর রোগে-ভোগা মানুষদের সেবার জন্য হাজির হয়। ওষুধপত্র, খাবারদাবার, পোশাকআশাক বিলি করে। রোগের সংক্রমণ এড়াবার ব্যবস্থা নেয়, সুস্থ ভাবে বেঁচে থাকার উপায় বাতলে দেয়। কখনোসখনো ক্যাম্প খাটিয়ে ছোটখাটো অপারেশন করে।

ডাবওয়ালা এই ফাঁকে আর একটা ডাব কেটে মেমসাহেবের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল। মেমসাহেব আগের ডাবটা ফেলেনি, দুহাতে দুটো ডাব নিয়ে দুলে দুলে আর এক দফা হাসি শুরু করে দিল।

পুতুলের মতো দেখতে মেমসাহেবের ওই হাসি দেখে এ-পাশের নীল জামা হাটুরের মুখে হাসি ফুটে উঠেছিল। আর ঠিক তক্ষুনি একটা মেঠো লোক এসে ওকে জিজ্ঞেস করল, 'দিয়াশলাই আছে নাকি কর্তা?'

দুদিকে মাথা নেড়ে ভাগিয়ে দেওয়ার গলায় নীল জামা জবাব দিল, 'নাহ্।'

কিন্তু জবাব শুনেও মেঠো লোকটা সরল না। বরং আর একটু কাছে এগিয়ে এসে চাপা গলায় বলল, 'সাহেবমেমের সঙ্গের লোকটাকে চেনেন কি না দেখুন তো।'

আচমকা কৌশিকের গলা শুনে চমকে উঠলেন নীল জামা হাটুরের ছদ্মবেশ-ধরা মুখার্জিবাবু।

জব্বর মেক-আপ নিয়েছে তো কৌশিক। আর এক ধরনের চমকের মধ্যে পড়লেন গোয়েন্দার সহকারী। কিন্তু উনি পকেটের দিকে হাত বাড়াতেই হিস-হিস করে উঠল গোয়েন্দা— 'চশমা না পরেই চেনার চেষ্টা করুন। না পারলে তখন চশমা।'

লোকটা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে ছিল। মুখার্জিবাবু চোখ ছোট আর দৃষ্টি ধারালো করে তাকালেন। লোকটা ডাব হাতে নিয়ে সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিল, একটু পরে এদিকে ফিরতেই মুখার্জিবাবুর চোখেমুখে বিস্ময় ছড়িয়ে পড়ল। 'আরে এই তো সেই ডাক্তার!

কিশোরের বাড়িতে দেখেছি, আঁচিলওলা নার্সের সঙ্গে এসেছিল। কী নাম যেন!' বিস্ময়ের চাপে নাম ভুলে গিয়েছিলেন মুখার্জিবাবু।

'ঠিক আছে নাম বলার দরকার নেই। উলটোদিকের রাস্তায় গুড়ের কলসি তোলা হচ্ছে ট্রাকে, আপনি একটু পরে ওটার পেছন দিকে চলে আসুন।'

চারামাছের এক হাঁড়িওয়ালার কাছ থেকে দেশলাই চেয়ে বিড়ি ধরিয়ে ওই ট্রাকের দিকে চলে গেল মেঠো লোকটা।

শান্ত গঞ্জ এলাকা, দূরে কোথাও ঘুঘু ডাকছিল। জলার পাশে গাছের ছায়ায় বেশ একটা ঝিমুনি-ভাব। মুখার্জিবাবুর মনে হচ্ছিল, মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু যেন নিঃশব্দে খানখান হয়ে গেছে।

একটু বাদে পায়ে পায়ে ওপাশের ওই ট্রাকের আড়ালে চলে এল নীল জামা। তারপর ওই মেঠো লোকটার কাছে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, 'ডাক্তারের নাম মনে পড়েছে—অর্ণব সেনগুপ্ত, এন. আর. এস-এর সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড।'

'ডাক্তারকে আইডেনটিফাই করানোর জন্যে আপনাকে এখানে নিয়ে এসেছিলাম। আপনার কাজ শেষ। আপনি ট্রাকে চেপে কলকাতায় ফিরে যান। আজ তো শোভাবাজারে আপনাদের স্টেজ রিহার্সাল। পৌঁছতে একটু হয়তো দেরি হয়ে যাবে। আমার সঙ্গে অফিসে দেখা হবে সন্ধেয়, কিংবা কাল।'

আর গোটাকয়েক গুড়ের কলসি তোলার পরেই ট্রাক বোঝাই হয়ে গিয়েছিল। ড্রাইভারের পাশের সিটে বসে কলকাতার পথে রওনা দিল নীল জামা।

সংখ্যায় বেশি নয়, কিন্তু বাস, ট্রাক আর টেম্পোর যাতায়াত লেগেই ছিল বড় রাস্তা দিয়ে। একটু পরে একটা টেম্পো এসে দাঁড়াল ওই গাছতলায়। কিছু সব্জিওয়ালার সঙ্গে দুই মেছুনি নামল। এদের সঙ্গেও দুটো বড় হাঁড়ি। দুই মেছুনি যোগ দিল ওই মেছোদের সঙ্গে। ঝিমধরা দুপুরে এই প্রথম একটা খুশির হিল্লোল বইল। দুই মেছুনিরই বেশ সুগঠিত দেহ। শরীরের খাঁজ, ভাঁজ ও রেখা বেশ চোখে পড়ার মতো। মাছের চারার হাঁড়ির মধ্যে একটা হাত, ওদিকে মুখে-চোখে খোশগল্প; দপ্‌ করে কেমন জমে উঠেছিল গাছের তলার জমায়েতটা। এরা কোথাও যাবে কিংবা ক্রেতারা হয়তো এখানে এসেই হাজির হবে।

একটু বাদে আর একটা গাড়ি এসে থামল ওখানে। সাদা, লম্বাটে চেহারার গাড়ি। গাড়ির গায়ে লাল ক্রস, নীচে লেখা মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট, ওপরে টনব্যাক্সি। টনব্যাক্সি কোম্পানির এই গাড়িটাকে এ এলাকার অনেকেই চেনে। এদিককার হাসপাতাল, হেল্‌থ-সেন্টারে প্রায়ই মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট সাপ্লাই দিতে আসে গাড়িটা।

ওই গাড়িতে চেপে হালে এক দিদিমণিও আসছেন। এখানকার একটি দোকানে খাতা, কলম, রাইটিং প্যাড, পিনকুশন, স্টেপলার ইত্যাদি স্টেশনারি গুড্‌স দিয়ে যান।

দিদিমণি আজকেও এসেছেন। দিদিমণির চেহারাটি বেশ। ফর্সা রং, গালে বেশ বড় একটা

আঁচিল। দিদিমণি এক কুলির মাথায় স্টেশনারি গুড্সের বোঝা চাপিয়ে হাঁটা দিলেন ওদিকের মাঠ আর পুকুরের দিকে। ওঁর চলা দেখলে যে কেউ বুঝবে পথঘাট দিদিমণির খুবই চেনা। দিদিমণির বেশ কিছুটা পেছনে একজন মেঠো লোকও হেঁটে যাচ্ছিল উদাস ভঙ্গিতে।

দিদিমণি 'লক্ষ্মী ফার্টিলাইজার্স' নামের একটা দোকানে স্টেশনারি গুড্স ডেলিভারি দিয়ে এসে টনব্যাক্সি কোম্পানির গাড়ি চেপে ফেরার পথ ধরলেন।

সূর্য পশ্চিম দিকে আর একটু ঢলে পড়েছে, এ ছাড়া এই মুহূর্তে এখানে আর কোনও পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে না। অদৃশ্য ঘুঘুর ডাক ভেসে আসছিল দূর থেকে।

এইভাবে আরও কিছুক্ষণ। তারপরেই হঠাৎ মেছো-মেছুনির ওই দলের সঙ্গে সেই ফড়ের তর্কাতর্কি বেঁধে গেল। তর্কাতর্কি মাছের দাম নিয়ে। মাছের চারার দাম ওরা যা চাইছে, ফড়ে দর হাঁকছে ঠিক তার অর্ধেক। কথা-কাটাকাটি বেশ চড়া গলার বচসা হয়ে উঠল একসময়। উত্তেজিত দলটা 'এ দরে আমাদের পোষাবে না' বলে হাঁটা দিল সামনের পথে। বুঝিয়ে-সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করার ভঙ্গিতে কথা বলতে বলতে ওদের পিছু-পিছু ছুটল ফড়ে।

সাহেব-মেমদের গাড়ির কাছাকাছি ওরা যখন পৌঁছেছে ঠিক তখনই এক ঝাঁকা বোঝাই স্টেশনারি গুড্স উঠল ওই গাড়িতে। ডাব খেয়ে দাম মেটানো হয়ে গেছে যাত্রীদের। ডাবওয়ালা আর ওই বাচ্চাকাচ্চার ঝাঁকটা কেটে পড়েছে। ড্রাইভার গাড়ির বনেট বন্ধ করে নিজের সিটে গিয়ে বসেছে। এবার রওনা দেবে গাড়ি, কিন্তু যাত্রী তিনজন গাড়িতে ওঠার মুখেই ওই ফড়ে গোছের লোকটা হঠাৎ ওদের সামনে একটা পিস্তল উঁচিয়ে বলল, 'হ্যান্ড্স আপ।'

কয়েকটা মাত্র মুহূর্ত, কিন্তু তার মধ্যেই শান্ত, নিস্তরঙ্গ দৃশ্যপটটি পুরোপুরি পালটে গিয়েছিল। ওই সব মেছো-মেছুনির ঝাঁক ঘিরে ফেলেছিল দলটাকে। কয়েকজনের হাতে পিস্তল।

ফড়েগোছের লোকটা এক মেছুনির দিকে তাকিয়ে বলল, 'মিস গাঙ্গুলি, আপনি এই মেমসাহেবের তল্লাশি নিন তো।'

মেমসাহেব চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছিল : আই সে নো, ইট্স নট ফেয়ার, বিহেভ ইওরসেল্ফ।

কিন্তু জবরদস্ত মিস গাঙ্গুলি সাদা চামড়া, নীল চোখ সুন্দরীর কোনও ওজর-আপত্তিই শুনলেন না। সর্বাঙ্গে হাত লাগিয়ে তল্লাশি নেওয়ার পরে ছোট হ্যান্ডব্যাগের ভেতরের পকেট থেকে ছোট্ট একটা পিস্তল বার করে ফেললেন। ঠিক সেই সময় সাহেবের কোটের পকেট থেকেও বার করা হল একটা রিভলভার। সঙ্গী বাঙালি যাত্রীর কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ থেকে বেরিয়ে এল একটা সেলুলার ফোন আর কয়েক তাড়া ভারতীয় টাকা ও মার্কিন ডলার।

হাঁড়ির মধ্যে মাছের চারার বদলে ছিল কয়েক জোড়া হ্যান্ডকাফ, ওয়াকি টকি আর শক্ত দড়ির বাণ্ডিল। তিনজনকে চোখের পলকে হ্যাণ্ডকাফ পরিয়ে দেওয়া হল, তারপর পাহারাদারসমেত ওই সাদা গাড়িতেই তোলা হল ওদের।

ওয়াকি টকিতে নির্দেশ পাঠাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ওদিকের চালাঘরের আড়াল থেকে পুলিশের একটা জিপ ছুটে এল।

ফড়েগোছের লোকটা একটু সরে এসে নিচু গলায় সেই মেঠো লোকটাকে বলল, 'অপারেশন ওভার। কেমন হল কৌশিকবাবু?'

ঝলমলে মুখে কৌশিক জবাব দিল, 'এক্সেলেন্ট! এত সহজে ব্যাপারটা সারতে পারবেন—ভাবতে পারিনি। তবে আপনাকে একটা অনুরোধ, চোরাই মাল যাই পান না কেন, দুটো দিন চুপচাপ থাকবেন একদম। প্রেস যেন কিছু টের না পায়—দুটো দিন। কেন চুপচাপ থাকতে বলছি, তা তো আপনাকে বলেইছি মিস্টার শিকদার।'

ফড়ের ছদ্মবেশের আড়াল থেকে অভয় দিলেন উত্তর চব্বিশ পরগনার এস পি শুভব্রত শিকদার—'ডোন্ট ওয়ারি। আপনি যা বলেছেন তাই করব, আমার কথার কোনও নড়চড় হয় না।'

তারপরেই ওয়াকি টকিতে আর একটা নির্দেশ গেল—'এবার তোমরা লক্ষ্মী ফার্টিলাইজার্সের মালিককে অ্যারেস্ট করো, আর ওই দোকানে খুব ভাল করে তল্লাশি নাও।'

কৌশিক বলল, 'আপনারা এখন তা হলে বারাসত?'

'হ্যাঁ, প্রথমে তো ওখানেই। এখানকার কাজ শেষ তো?'

'শেষ। এবার এই মেঠো সাজ ছেড়ে শহুরে ভদ্রলোকের পোশাকটা পরে নেব।'

'ঠিক আছে, ধীরেসুস্থে চেঞ্জ করুন। ওই তেঁতুলগাছটার নীচে আপনার গাড়ি রেডি আছে—ফাইভ সিক্স নাইন টু।'

'ধন্যবাদ। আমি তাহলে পরে আপনার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করব। গুড বাই।'

'বাই।'

মাঝখানে সাদা গাড়িটাকে রেখে আগেপিছে পুলিশের দুটো জিপ রওনা দিল বারাসতের দিকে।

দু-তিন মিনিটের মধ্যে এত বড় একটা কাণ্ড ঘটে গেল, কিন্তু এই ঘুঘু-ডাকা এলাকার লোকজন তার কোনও হদিস পেল না। যা যেমন ছিল, সবকিছু ঠিক তেমনই রয়ে গেল।

একটু বাদে ক্লান্ত অথচ আনন্দিত গোয়েন্দা তেঁতুলগাছের নীচে দাঁড় করানো অ্যাম্বাসাডার চেপে রওনা দিল কলকাতার পথে।

গোয়েন্দা যখন ওর চেম্বারে এসে পৌঁছল তখন সাড়ে-ছ'টা। অফিস বন্ধ, তার মানে শোভাবাজার হয়ে মুখার্জিবাবু এখনও এসে পৌঁছতে পারেননি। ডুপ্লিকেট চাবি দিয়ে তালা খুলে অফিসে ঢুকল গোয়েন্দা, তারপরেই পকেট থেকে ডায়েরি বার করে সাঙ্কেতিক ভাষায়

অনেক কিছু লেখালেখি শুরু করে দিল। কাজে ও এমন ভাবে ডুবে গিয়েছিল যে একটি ঘন্টা যেন নিমেষে কেটে গেল।

সাড়ে-সাতটায় মুখার্জিবাবু এসে বললেন, স্টেজ রিহার্সালের ঝঞ্ঝাটের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আমার মন বলছিল, দেরি হলেও অফিসে এসে আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে।'

ডায়েরি থেকে মাথা না তুলেই গোয়েন্দা বলল, 'আপনারা তা হলে কালকেই মালদার পথে রওনা হয়ে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, রাতের ট্রেনে। আপনার কথা ওরা জিজ্ঞেস করছিল, আমি বলেছি পায়ের ব্যথা এখন কমের দিকে। যদি ভাল থাকেন, আপনি পরশু মানে রবিবার সকালে রওনা দেবেন। মালদার অনুষ্ঠান রবিরার সন্ধেয়।'

'কিশোরের স্ত্রী কেমন আছে এখন?'

'ভাল, আগের চেয়ে ভাল। আচ্ছা-ওই ডাক্তারকে চেনবার জন্য আমাকে ছদ্মবেশে বসিরহাট নিয়ে গেলেন কেন ও ভাবে?'

'শুধু চেনানো নয়, আরও অনেক ব্যাপার ছিল।'

'কী সেগুলো?'

প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার সেই অভিনেতার কী খবর?'

'খুব খারাপ। ম্যালেরিয়ায় ধরেছে। চিকিৎসার জন্যেও কলকাতাতেই থেকে যাচ্ছে।'

'ওর এখন অসুস্থ হয়ে পড়াটা আমাদের পক্ষে ভাল। আপনাকে যে ভাবে অভিনয় করতে বলেছি, সেই ভাবেই করবেন কিন্তু।'

কথাটার কোনও উত্তর দিলেন না মুখার্জিবাবু। পরিষ্কার বোঝা গেল, অভিনয়ের ব্যাপারে গোয়েন্দার ওই পরামর্শ ডিরেকটরের একেবারেই ভাল লাগেনি।

সহকারীর প্রতিক্রিয়া আন্দাজ করে ডায়েরি বন্ধ করে ওটা পকেটে ঢোকাল গোয়েন্দা, তারপর বেশ তারিফ করার গলায় বলল, 'আপনি ওই দুটো ছোট নাটক নিয়ে দারুণ ভেবেছেন! দর্শকদের হাততালি দেখবেন আর থামতেই চাইবে না—অমি শ্যিওর।'

প্রশংসায় খুশি হন না—এমন মানুষ পৃথিবীতে বোধহয় একজনও নেই। ঝকঝকে মুখার্জিবাবু বললেন, 'সত্যি, নাটকদুটোকে ভাল ভাবে স্টেজ করানোর চিন্তায় আমি রাত্তিরে ঘুমোতে পর্যন্ত পারছি না। কিছু না, একটু যদি ভাল অ্যাক্টিংয়ের সাপোর্ট পেতাম আমাকে এরকম দুর্ভাবনার মধ্যে পড়তে হত না।'

'না-না, আপনার দুশ্চিন্তার কোনও কারণ নেই, আপনি গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানিয়ে ফেলেছেন।'

মুখার্জিবাবু লাজুক মুখে বললেন, 'কথাটা কিন্তু আপনি মন্দ বলেননি, গোড়ায় যা ছিল আর এখন যা হয়েছে—এ দুয়ের মধ্যে আকাশপাতাল তফাত। তবে শুধু আমি একাই নয়—

কিশোর, দিব্য, অতনুও অসম্ভব খেটেছে। আজ গিয়ে দেখি—দিব্য মল্লিক দুর্দান্ত একটা কাজ করেছেন।'

'কী কাজ?'

'সেদিন উনি বলছিলেন শিল্প-সংস্কৃতির প্রসারে উপহার, স্মারক ইত্যাদি দারুণ কাজ করে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের শেষে ভাল কিছু মেমেন্টো দিতে পারলে দেখবেন আপনার কাজ অর্ধেক এগিয়ে গেছে। উনি বিদেশের মানুষদের উপহার দেওয়ার জন্যে কিছু উপহার যা তৈরি করিয়েছেন না—ভাবা যায় না!'

'কীরকম?'

'উপহারগুলো বানাবার পেছনে বিস্তর কারিগরি আছে, কিন্তু মালপত্তর একেবারেই দামি নয়। কাঠের কাঠামো, তার ওপরে টাইল্‌সের টুকরো কেটে কেটে বসানো হয়েছে। ব্যস।'

কৌতূহলী গোয়েন্দা জিজ্ঞেস করল, 'কী বানিয়েছেন ভদ্রলোক?'

'পুরনো কলকাতার নানা দ্রষ্টব্য। যেমন—এশিয়াটিক সোসাইটি, জোব চার্নকের স্মৃতিসৌধ, জি পি ও, হাইকোর্ট, সেন্ট পল্‌স ক্যাথিড্রাল—এই সব। প্রতিটি বিল্ডিং নিখুঁত। দেখলে আর চোখ ফেরানো যায় না। শুধু তাই নয়, প্রতিটির সঙ্গে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আছে। যেমন—এশিয়াটিক সোসাইটি প্রাচ্যের সবচেয়ে পুরনো সাংস্কৃতিক সংস্থা। দুশো বছর আগে এটি তৈরি হয়েছে। বানিয়েছেন স্যার উইলিয়ম জোন্‌স। জোব চার্নকের স্মৃতিসৌধের বয়েস তিনশো বছর। কলকাতার এটাই সবচেয়ে পুরনো স্মৃতিস্তম্ভ। আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে তৈরি হয়েছিল কলকাতার বিখ্যাত মেডিক্যাল কলেজ। হাসপাতালের জন্যে বিশাল জমি দান করেছিলেন সে-আমলের বিখ্যাত ব্যবসায়ী মতিলাল শীল। তখন অত বড় ওই জমির দাম ছিল মাত্র বারো হাজার টাকা। বিল্ডিং বানানো হয়েছিল কোরিন্থিয়ান নক্‌শায়। এই ধরনের কিছু কিছু ইন্টারেস্টিং নোট আছে উপহারগুলোর সঙ্গে। প্রতিটি উপহারই কাচ দিয়ে ঢাকা। ঘরে সাজিয়ে রাখলে আলাদা করে চোখে পড়বেই।'

'অতনু দত্ত যাচ্ছেন তো আপনাদের সঙ্গে?'

'না।'

'কেন?'

'কিশোরের স্ত্রীর দেখভাল করার জন্যে যাচ্ছেন না। যদি ডাক্তারটাক্তার ডাকতে হয়। এটা বেশি-বেশি, এই জন্যে কলকাতায় থাকার কোনও দরকার ছিল না। ভদ্রমহিলা তো এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল আছেন। চব্বিশ ঘন্টা দেখাশোনা করার জন্য ট্রেন্ড নার্স আছে। বাড়িতে কাজের লোক আছে, ড্রাইভার আছে। কোনও দরকার ছিল না বাড়তি কারও থাকার। কিশোর, দিব্যও ওঁকে যাওয়ার জন্যে বলেছিল। কিন্তু অতনুর এক কথা—আপনারা যান, আপনাদের যাওয়াটা জরুরি; আমি এখানে থাকলে আপনারা বরং আর একটু নিশ্চিন্ত

হয়ে নিজেদের কাজকর্ম সারতে পারবেন। এই ব্যাপারটা আমার কাছে কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি বলেই মনে হচ্ছে।'

মুখার্জিবাবুর কথা শুনতে শুনতে গোয়েন্দা একটু বুঝি অবাকই হয়ে গিয়েছিল। তারপর ওর চোখেমুখে চিন্তার একটা ছাপ ফুটে উঠল ধীরে ধীরে।

আটাশ

'অ্যাডভোকেট কিরণ সেনের চেম্বার থেকে ওঠার মুখে কৌশিক বলল, 'ওই কথাই তাহলে রইল। আজ বিকেলের ফ্লাইটে অলোকবাবু মাদ্রাজ থেকে ফিরছেন, আপনি সন্ধেবেলাতেই ওঁর বাড়িতে চলে যান। ওই দুটো ব্যাপারে ওঁর মত আপনাকে করাতেই হবে। প্রথমটা ওঁর প্রাণ বাঁচাতে, দ্বিতীয়টা আর একজনের সুস্থ হয়ে বেঁচে থাকার জন্যে।'

গোয়েন্দার কথা শুনে প্রবীণ মানুষটির মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। মৃদু গলায় বললেন, 'কী কাণ্ড বলুন তো! অমন ঋষিতুল্য মানুষ, তার কপালে কি না...। ওর মত আমাকে করাতেই হবে—।'

বিদায় নিয়ে বেরিয়ে পড়ার আগে গোয়েন্দা বলল, 'আমি তাহলে রাত সাড়ে-আটটা নাগাদ আপনাকে ফোন করছি।'

কালীঘাটের গলি থেকে বেরিয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরে এল গোয়েন্দা। তারপরে ছোট ডায়েরিটা নিয়ে টেলিফোনের সামনে এসে বসল, কয়েকটা ফোন করতে হবে এবার।

প্রথমেই ফোন করল ডক্টর সান্যালকে। ডাক্তারবাবু বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না। আমি ঠিক সময়েই পৌঁছে যাব।'

দ্বিতীয় ফোন বারাসতে, এস পি শিকদারের কাছে। শিকদারকে একটু পরে পাওয়া গেলে। উনি উচ্ছ্বসিত হয়ে বললেন, 'আপনি যে কাণ্ড ঘটিয়েছেন, সে তো সাঙ্ঘাতিক। এত বড় রেড এদিকে কয়েক বছরের মধ্যে হয়নি। নৌকোটৌকো সব ঠিকঠাক করা ছিল। ছবির মতো নেটওয়ার্ক, আর একটু দেরি হলেই ওরা বর্ডার পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢুকে যেত! আমি অপারেটরকে বলে রেখেছিলাম টেলিফোনে আপনাকে ধরার জন্যে।'

'কী করে ধরবে, আমি তো এখন সারা দিনরাত এখানে-সেখানে টো-টো করে বেড়াচ্ছি। সঙ্গে পেজার রাখি না, কখন ওটা আবার বেয়াড়া জায়গায় বেজে উঠবে!'

'কেন, এখন কি আপনি অন্য কোনও কেসের তদন্ত চালাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ, ওই একটা—। কদ্দুর কী করে উঠতে পারব জানি না। তবে এই ব্যাপারে আপনার একটু সাহায্য চাই।'

'কী আশ্চর্য! আপনি এত সঙ্কোচ করছেন কেন? কী করতে হবে শুধু বলুন।'

'আপনার সাব-ইন্সপেক্টর মিস গাঙ্গুলির একটু সাহায্য দরকার হবে এই কেসটার ব্যাপারে।'

'কীরকম?'

'অন্য এক মহিলার ছদ্মবেশ ধরতে হবে। সেই মহিলার সঙ্গে ওঁর চেহারার বেশ মিল আছে। এই কাজটায় অভিনয়-ক্ষমতাও থাকা দরকার। সেটাও আছে মিস গাঙ্গুলির। মেছুনির যে পার্ট করতে দেখলাম, সে তো দুর্দান্ত!'

'ঠিক আছে, কোনও প্রবলেম হবে না। কবে, কোথায় ওকে যেতে হবে বলুন?'

'কাল সকাল ঠিক সাতটার সময় ইন্সপেকটর অবনী ঘোষরায়ের অফিসে ওঁকে পাঠিয়ে দিন। ইন্সপেকটরকে সবকিছু বলা আছে আমার।'

'ঠিক আছে ও যাবে—শার্প অ্যাট সেভেন। আর কিছু?'

'আর কিছু বলতে পুরনো সেই অনুরোধ—দুটো দিন প্রেসকে আপনার এই রেডের কথা জানাবেন না দয়া করে।'

'কী আশ্চর্য! এ নিয়ে আপনি ভাবছেন কেন? আমি তো আগেই আপনাকে কথা দিয়েছি। আপনার কাছ থেকে গ্রিন সিগন্যাল পাওয়ার আগে মুখ খুলছি না।'

পরের ফোন এন. আর. এস-এর সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার অফিসার সুবোধ ভট্টাচার্যকে। এই মানুষটি অত্যন্ত পরোপকারী। কেউ কোনো সাহায্য চাইলে সেটা না করা পর্যন্ত থামতে পারেন না। ফোন করার সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'না কৌশিকবাবু, ওই নামের কোনও ডাক্তার এই হাসপাতালের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড নন। আমি একজন ডক্টর এ সেনগুপ্ত, এফ আর সি এসকে চিনি, তবে তিনি অর্ণব কি না জানি না। একটা নার্সিংহোমের সঙ্গে আছেন, বয়স্ক ডাক্তার। যদি বলেন তাহলে তাঁর পুরো নামটা জানার জন্যে খোঁজ নিতে পারি।'

বিনয়ের সঙ্গে ওঁকে থামাল গোয়েন্দা। 'না-না, তার দরকার হবে না। ধন্যবাদ।'

শেষ ফোন সি আই ডি-র অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর জেনারেল রজত গুপ্তকে। লাইনে একটুখানি অপেক্ষা করার পরে পাওয়া গেল ব্যস্ত মানুষটিকে। নবীন গোয়েন্দাকে অভয় দিয়ে ওর রজতদা বললেন, 'শোনো তোমার সব হুকুমই আমি তামিল করেছি। এস পি মুখার্জিকে যা বলতে বলেছিলে বলে দিয়েছি। কাল সকালে যথাসময়ে ট্যুরিস্টশ্বেত লাক্সারি বাস যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। এনি মোর হুকুম?'

স্নেহভাজন গোয়েন্দা বিব্রত মানুষের গলায় বলল, 'ছি-ছি এ কী বলছেন! আমি আপনাকে শুধু একটা রিমাইন্ডার দেওয়ার জন্যে এখন ফোন করেছিলাম।'

হাসতে হাসতে গোয়েন্দা দফতরের বড়কর্তা বললেন, 'কোনওরকম প্রয়োজন পড়লেই জানাবে। অলওয়েজ অ্যাট ইওর সার্ভিস। ঠিক আছে, ছাড়ছি এখন।'

রিসিভার নামাবার পরে অবাক চোখে কয়েক মুহূর্ত ফোনটার দিকে তাকিয়ে রইল কৌশিক। সামনের ক্যালেণ্ডারে আজকের তারিখের ওপর লাল কালি বোলাতে ইচ্ছে করছিল ওর। একবারের চেষ্টায় পর পর চার-চারটে লাইন পেয়ে যাওয়া কি চাট্টিখানি কথা! শুধু লাইন পাওয়াই নয়, যাদের চেয়েছিল তাদেরও পেয়েছে। অবিশ্বাস্য ঘটনা আজও তাহলে ঘটে থাকে কলকাতায়!

এক কাপ কালো কফি নিয়ে কালো ডায়েরির ওপর ঝুঁকে পড়েছিল গোয়েন্দা। জটিল অঙ্ক শেষের দিকে এখন জটিলতর হয়ে উঠেছে। উত্তর শেষ পর্যন্ত মিলবে কি না কে জানে।

অঙ্কের উত্তরের সন্ধান করতে গিয়ে কালো কফির শেষের দিকটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিল একদম, কিন্তু সেটা একচুমুকে শেষ করে ডায়েরির পাতা বন্ধ করল কৌশিক। আর ঠিক তক্ষুনি ডোর বেল-বেজে উঠল লম্বা করে।

'আসছি অবনীদা' বলে চেঁচিয়ে উঠল ও। তারপর দরজা খুলে দেখে দুঁদে ইন্সপেকটর মুখ কালো করে একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

'আসুন আসুন।' অকৃত্রিম আপ্যায়নের সুর কৌশিকের গলায়।

ভেতরে ঢুকে সামনের সোফার ওপর ধপ্ করে বসে পড়েছিলেন ইন্সপেক্টর, তারপর পকেট থেকে ছোটোখাটো একটা তোয়ালের সাইজের রুমাল বার করে মুখ চোখ ঘাড়ের ঘাম মুছতে লাগলেন ঘষে ঘষে।

বেল বাজাবার শব্দ শুনে কৌশিক প্রায়ই 'আসছি অবনীদা' বলে চেঁচিয়ে ওঠে, আর ঘরে পা দিয়েই ওর অবনীদার সবিস্ময় প্রশ্ন হয়—'কী করে বুঝলে যে আমি এসেছি?'

এই রহস্য ভেদ করার কৌশলের ব্যাখ্যা শোনানো এসব ক্ষেত্রে একটা নিয়মিত ঘটনা। কিন্তু আজ আর সেই ব্যাপারের মধ্যে ঢুকলেন না ইন্সপেক্টর। রুমাল পকেটে ঢুকিয়ে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে হতাশ মানুষের গলায় বললেন, 'আমি সত্যি এবার ভাগ্যে বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছি। রাহু বলো, কেতু বলো, শনি বলো—আমি এদের নিয়ে তো কখনও ঠাট্টা-মন্দ করিনি, কিন্তু এরা কেন আমার ওপর এত চটে আছে কে জানে।'

কথাটা শুনে আর একটু হলেই হেসে ফেলছিল কৌশিক, কোনওমতে সামলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কেন, কী হয়েছে?'

'যা বরাবর হয়ে থাকে তাই। অকারণ ঘোরপ্যাঁচের মধ্যে পড়ে যাই। এই কেসটা তো একটা সাদামাটা কেস। খুনিকে পাকড়াও করে কবে আমার হাত ধুয়ে বসে থাকার কথা, তা না—।'

এবার সত্যি একটু অবাক হল কৌশিক। 'আপনি কি এখনও ডক্টর মৈত্রকে ট্রেস করতে পারেননি?'

'কপালের দোহাই তাহলে পাড়ছি কেন বলো? অথচ চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখিনি আমি। টেলিগ্রাফের রিপোর্টারকে ধরে লোকটার ঠিকানা জোগাড় করলাম, প্রেস ফোটোগ্রাফারকে ধরে ওই প্রেস কনফারেন্সের বেশ কয়েকটা ছবি জোগাড় করলাম, কিন্তু রেজাল্ট এখনও পর্যন্ত গোল্লা।'

'রিপোর্টার তো বাড়ির ঠিকানা দিয়েছিল, ওখানে গিয়ে কী দেখলেন?'

'ওটা বাড়ি নয়, গেস্টহাউস। গিয়ে দেখি একগাদা গেস্ট আছে, শুধু আমি যাঁর খোঁজে

গিয়েছি তিনি নেই। বিস্তর খোঁজখবর নিয়ে আরও দুটো ঠিকানা জোগাড় করলাম। দুটো আস্তানাই রেন্টেড—একটা ফ্ল্যাট অন্যটা বাড়ি। দুটো জায়গাতেই তিনি ছিলেন কিন্তু এখন আর নেই। শেষ ঠিকানায় লণ্ডন থেকে পাঠানো একটা টেলিফ্যাক্স পেয়েছি টেবিলের ড্রয়ারে। তাতে লেখা আছে—এমা উইল বি ওয়েটিং ফর ইউ অ্যাট হিথ। লাভ। এই মেসেজটারও মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারলাম না। মেসেজের ওপর নীচের অংশ দুটো ছেঁড়া।'

'মেসেজটা আছে এখন আপনার কাছে?'

'এই কেসটার যাবতীয় কাগজপত্তর তো সঙ্গে নিয়েই ঘুরছি।' কথাটা বলেই মস্ত ফাইল খুলে মেসেজটা কৌশিকের হাতে ধরিয়ে দিলেন ইন্সপেক্টর।

চোখ ধারালো করে মেসেজের দিকে তাকিয়েই রইল কৌশিক।

কয়েক মুহূর্ত বাদে গম্ভীর গলায় ইন্সপেক্টর বললেন, 'এমা শব্দটা আণ্ডারওয়ার্ল্ডের একটা কোড্।'

চমকে উঠে কৌশিক বলল, 'মনে পড়েছে সেদিন রজতদা বলছিলেন। ড্রাগ-পেড্‌লারদের কাছে এমা শব্দের অর্থ আফিম।'

'কারেক্ট। ব্যাপারটা এখন আমি এই লাইনেই ভাবছি। কিন্তু হিথ্ মানে কী আফিম হিথ্-এ অপেক্ষা করবে—মানে?'

কৌশিকের দৃষ্টি আর একবার ধারালো হল। তারপর মেসেজের দিকে চোখ রেখে গম্ভীর গলায় বলল, 'আপনি এক্ষুনি সাদা পোশাকের কয়েকজন পুলিশম্যান সঙ্গে নিয়ে দমদম এয়ারপোর্টে চলে যান। নিজেও ছদ্মবেশ ধরবেন।'

'বাট, কেন?' বেশ উত্তেজিত দেখাচ্ছিল ইন্সপেক্টরকে।

'আমার মনে হয় হিথ্ স্ট্যাণ্ডস ফর হিথ্‌রো, লণ্ডনের হিথ্‌রো এয়ারপোর্ট। কলকাতা থেকে লন্ডন যাওয়ার একটা পপুলার রুট হল—দমদম থেকে বোম্বে, তারপর ওখান থেকে সকালের ফ্লাইটে ভায়া কায়রো লন্ডন।'

কথাটা শুনেই লাফিয়ে উঠলেন ইন্সপেক্টর। কোমরের নেমে-যাওয়া বেল্ট ওপর দিকে টেনে তুলে বললেন, 'আমি যাচ্ছি, পরে যোগাযোগ করব তোমার সঙ্গে।'

প্রকাণ্ড চেহারার ইন্সপেক্টর ঘোষরায় দুদ্দাড় শব্দ তুলে সিঁড়ি ভেঙে নেমে গেলেন নীচে।

'এমা' শব্দটা বিড়বিড় করে উচ্চারণ করতে করতে অস্থির ভঙ্গিতে ঘরের মধ্যে বেশ কয়েকবার পায়চারি করল গোয়েন্দা, তারপর গায়ে একটা পাঞ্জাবি গলিয়ে বেরিয়ে পড়ল রাস্তায়। কাছের একটা অফিস থেকে মাঝেমধ্যে এখানে-সেখানে ফ্যাক্স, টেলেক্স পাঠায় ওখান থেকেই লন্ডনের অমল সিন্‌হাকে একটা টেলেক্স মেসেজ পাঠিয়ে দিল ও।

তারপর ফ্ল্যাটে ফিরে এসে আরও দুটো ফোন। প্রথম ফোন টি এম মেননের অফিসে। ওঁর সেক্রেটারি নিটা জৈন জানালেন, মিস্টার মেনন এখন কলকাতার বাইরে। একটু দোনামনা করে কৌশিক বলল, 'আমার কথা আপনার মনে আছে কি না জানি না। আমি

সেনের বন্ধুস্থানীয়। কিছুদিন আগে আপনাদের অফিসে গিয়ে আপনার কাছ থেকে লণ্ডনের একটা ফ্যাক্স মেসেজ নিয়ে এসেছিলাম।'

নিটা জৈনের স্মৃতিশক্তি বেশ প্রখর, সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, মনে পড়েছে, আপনি তো কৌশিক মিট্রা। বলুন, আপনার জন্যে কী করতে পারি?'

'লন্ডন থেকে আর একটা ইম্পরট্যান্ট মেসেজ আসার কথা আছে কাল-পরশুর মধ্যে। এলে আমাকে দয়া করে জানাবেন। আমার কনট্যাক্ট নাম্বার তো আছে আপনার কাছে। আছে না?'

'আছে। নো প্রবলেম। মেসেজ এলেই আমি আপনাকে খবর দিয়ে দেব।'

পরের ফোন আর্কেওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার প্রাক্তন ডিরেক্টর বিশ্বজীবন মুখার্জির কাছে। পণ্ডিত মানুষটি কৌশিকের প্রশ্ন শেষ হওয়ার আগেই তড়বড় করে উত্তর দিলেন, 'আমি মিউজিয়ামের কিউরেটরকে অনুরোধ করেছি চোরাই মূর্তির একটা তালিকা বানাতে। মনে হয় আজকালের মধ্যেই পেয়ে যাব। পেলেই আপনাকে জানাব। আপনার ফোন নাম্বার তো আছে আমার কাছে।'

সৌজন্যমূলক আরও দু-চারটে কথা চালাবার পরে টেলিফোন নামিয়ে রাখল কৌশিক। তারপর একটু অস্থির ভঙ্গিতে ঘরের মধ্যে কিছুক্ষণ পায়চারি করার পরে পোশাক পালটে ওর ছোট্ট সেই অফিসঘরের পথে রওনা হয়ে গেল।

মাথার মধ্যে গভীর কোনও চিন্তা থাকলে বোধহয় পথের দূরত্ব কমে যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই পৌঁছে গেল ওর অফিসে। আজ রাতের ট্রেনে কিশোরদের দলের সঙ্গে মুখার্জিবাবুর মালদা রওনা হওয়ার কথা। উনি আগেই জানিয়ে গেছেন, বাক্সপ্যাঁটরা গুছিয়ে একবার শোভাবাজার যাবেন, তারপর নাটকের অভিনেতাদের শেষ পরামর্শ দিয়ে একটু দেরিতে অফিসে আসবেন।

একটু দেরি মানে অনেকটাই দেরি। সাড়ে-তিনটে নাগাদ অফিসে এসে কাঁচুমাচু মুখে মুখার্জিবাবু বললেন, 'একটু বোধহয় দেরি হয়ে গেল। আসলে আমার কপালে যে অভিনেতাগুলো জুটেছে সেগুলো একেবারে নিরেট। বলি এক, বোঝে আর এক। একটা লোকও এর আগে অভিনয় করেছে বলে মনে হয় না। কিশোর যদি অভিনেতা বাছাইয়ের ব্যাপারে আমাকে একবার সুযোগ দিত। আমি ওই গ্রাম থেকেই ভাল অভিনেতা খুঁজে বার করতাম। শেষ সময়ে অভিনেতাদের ধমকাতেও পারছি না। মনের রাগ মনে পুষে বাবা-বাছা বলে পিঠ চাপড়ে যাচ্ছি। কোনওমতে এখন উতরে যেতে পারলে বাঁচি!'

ভরসা দেওয়ার গলায় কৌশিক বলল, 'কিচ্ছু ভাববেন না, দেখবেন আপনার নাটক দারুণ প্রশংসা পাবে।'

'আপনার আশীর্বাদ—।'

'আরে, আমি আশীর্বাদ করার কে? আপনি আমার চাইতে বয়েসে অনেক বড়—।'

ঘাবড়ে যাওয়ার পাত্তর নন মুখার্জিবাবু, তরুণ মালিককে খুশি করার গলায় বললেন, 'বয়েসে বড় হলেই কি শুধু আশীর্বাদ করার অধিকারী হয়, আপনি আসলে, ইয়ে—।'

'ঠিক অছে, ঠিক আছে—আপনাকে যে দুটো জিনিস জোগাড় করতে বলেছিলাম, করেছেন?'

লজ্জা পেয়ে একপাশে ঘাড় কাত করে বললেন, 'হ্যাঁ, এই নিন। আমরা মালদার যে বাড়িতে উঠব, সেই বাড়ির ফোন নাম্বার। কিশোর ওর স্ত্রীর ব্যাপারে খুব উদ্বিগ্ন। কেমন থাকে জানাবার জন্যে অতনুবাবুকে বারবার বলে দিয়েছে। আর এই অতনু দত্তের কলকাতার ঠিকানা, কায়দা করে জেনে নিয়েছি।'

কাগজের টুকরোটা হাতে নিয়ে চোখ বুলিয়ে গোয়েন্দা বলল, বাহ্! ভেরি গুড। আপনাদের ট্রেন কটায়?'

'রাত দশটা নাগাদ—গৌড় এক্সপ্রেস, শিয়ালদা থেকে। শুনেছি, আমাদের দলের জন্যে আস্ত একটা বগি নেওয়া হয়েছে। আমি রাত আটটা নাগাদ শোভাবাজারে যাচ্ছি, ওখান থেকে সবাই মিলে একসঙ্গে স্টেশনে যাব।'

'খুব ভাল। আপনার যাত্রা শুভ হোক। ঠিক আছে, আপনি তাহলে এখন বাড়ি চলে যান। এখানে আপনার আজ আর কোনও কাজ নেই। ফিরে বরং একটু বিশ্রাম নিন।'

এত তাড়াতাড়ি ছুটি পেয়ে মুখার্জিবাবু বেশ খুশি হয়েছিলেন। কিন্তু সামান্য আপত্তির ভাব মুখে ফুটিয়ে তুলে বললেন, 'না না, বিশ্রাম নেওয়ার কিছু নেই। তবে কি না—।'

'তবে কী?'

'আর একটু সময় পেলে নাটকের স্ক্রিপ্টদুটো নিয়ে বসতাম। মিনিমাম সংলাপ রেখেছি। পারলে আর একটু কমিয়ে দেব। অভিনেতাদের মুখের আড় ভাঙেনি এখনও। সংলাপ একটু বড় হলেই আর সামাল দিতে পারে না। দেখি আর একটু যদি ছাঁটতে পারি!'

'বেশ তো, তাই করুন তাহলে। আর একটা কথা—। আপনার ওই ম্যালেরিয়া রোগীর বদলি অভিনেতা হিসেবে আপনি যখন অভিনয় করবেন তখন আমি যা বলেছি সেটা কিন্তু অবশ্যই করবেন।'

পরিচালকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করার এই নির্দেশটি মুখার্জিবাবু আগেও ভালভাবে মেনে নিতে পারেননি, এখনও পারলেন না। কিন্তু মানুষটি বাধ্য প্রকৃতির, শুকনো মুখে বললেন, 'ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন, তাই করব—।'

মুখার্জিবাবু চলে যাওয়ার পরে কালো সেই ডায়েরিটায় আবার ডুব দিল গোয়েন্দা। অঙ্কের আকার এবং জটিলতা—দুই-ই বেড়েছে আরও। উত্তর শেষ পর্যন্ত মিলবে কি না—তা নিয়ে ওর সংশয় রয়ে গিয়েছে এখনও। আসলে এ এক অদ্ভুত অঙ্ক, হাতেনাতে ফল পাওয়ার আগে পর্যন্ত সংশয় এড়াবার কোনও উপায় নেই।

রাত ঠিক সাড়ে-আটটার সময় অ্যাডভোকেট কিরণ সেনের বাড়িতে ফোন করল গোয়েন্দা।

ফোন ধরলেন কিরণবাবুই। ওপাশের মানুষটির পরিচয় পেয়েই কথা শুরু করলেন অ্যাডভোকেট। 'আমি তো একটু আগেই অলোকের বাড়ি থেকে ফিরলাম। মাদ্রাজের ফ্লাইট ঠিক সময়েই পৌঁছেছে। তাই অনেকক্ষণ ধরেই ওর সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। তবে অসম্ভব গোঁয়ার তো, কিছুতেই মত করাতে পারছিলাম না। শেষে প্রথম ব্যাপারটায় মত করাতে পেরেছি। বাড়ির লোকজনকে বলে রাখা হয়েছে। গেলে আপনাকে হেল্প করবে। দ্বিতীয় প্রস্তাবে রাজি করাতে পারিনি। শেষে নিমরাজি হয়ে বলেছে—তেমন কিছু দেখলে বা শুনলে করা যেতে পারে, তার আগে কিছুতেই নয়।'

উত্তরে খুব খুশি হয়ে কৌশিক বলল, 'যা করেছেন যথেষ্ট করেছেন। দেখি কোথাকার জল এখন কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। আর মাত্র দু'একটা দিন আপনাদের কষ্ট দেব, তার বেশি নয়—।'

অভয় দিয়ে অ্যাডভোকেট বললেন, 'এ ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমি সব সময়ই আছি। আর, এটা কোনও কষ্টের কাজ নয়—।'

আরও দু-চারটে কথা বলার পরে টেলিফোন ছাড়ল গোয়েন্দা, তারপর হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফিয়ে উঠল তড়াক করে। মিনিট-পনেরোর মধ্যে ভোল পালটে অন্য মানুষ হয়ে গেল ও।

পেটমোটা একটা ব্যাগ হাতে কৌশিক যখন পথে বার হল তখন ওর চেহারা অনেকটা মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভের মতো। মনে হবে, হাতের ব্যাগে নির্ঘাত ওষুধপত্তরের স্যাম্পল ফাইল আর লিটারেচার আছে।

একটা মিনিবাসে চেপে শিয়ালদার কাছে এসে নামল গোয়েন্দা। তারপর লম্বা পায়ে হেঁটে রেল স্টেশনের কাউন্টার থেকে প্লাটফর্ম টিকিট কেটে একটা প্লাটফর্মে এসে ঢুকল।

গৌড় এক্সপ্রেস ছাড়ার সময় হয়ে গিয়েছে। শেষ সময়ে এসে পৌঁছনো যাত্রীদের মধ্যে সামান্য ছোটাছুটি। প্লাটফর্মে বেশ ভিড়। মেডিক্যাল রিপ্রেজেন্টেটিভ-মার্কা যুবকটি তীক্ষ্ণ চোখে প্রতিটি বগি দেখতে দেখতে এগোচ্ছিল। শেষে পাওয়া গেল সেই বগিটা। পুরোটাই রিজার্ভ করে নিয়েছে নাটকের দল। ওই তো কিশোর, দিব্য। কিন্তু মুখার্জিবাবু কোথায়?

ভিড়ের মধ্যে মিশে আরও দু-চারবার এদিক-ওদিক করার পরে ভদ্রলোককে দেখতে পাওয়া গেল। গেঁয়ো চেহারার জনাচারেক লোকের মধ্যে বসে হাত নেড়ে কী যেন বোঝাচ্ছেন। গোয়েন্দা আন্দাজ করল, কথাগুলো নির্দেশকরে শেষ মুহূর্তের সাজেশন। কুশীলবরা খুব যে একটা আগ্রহের সঙ্গে শুনছে—তা কিন্তু নয়। নাটকের সেট-সেটিং বিস্তর। কামরার সর্বত্রই কিছু-না-কিছু গুছিয়ে রাখা হয়েছে। মধ্যিখানের কুপেতে পিচবোর্ডের বেশ কয়েকটা বাক্স, ওগুলোর মধ্যেই বোধহয় সেই সব উপহার। ম্যানেজার-গোছের দুটো লোক ছোটাছুটি করছিল গোটা কামরায়। সবকিছু ঠিকঠাকভাবে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব বোধহয় এদের ওপরেই পড়েছে।

নির্দিষ্ট সময়ের পাঁচ মিনিট বাদে ট্রেন ছাড়ল। ছদ্মবেশী গোয়েন্দার মধ্যে এবার একটু

খোলামেলা ভাব। সি-অফ করতে আসা মানুষদের ভিড়ে ভাসতে ভাসতে ও গেটের দিকে এগোচ্ছিল। কিন্তু গেট পেরুবার পরেই ওর মধ্যে তৎপরতা বেড়ে গেল আবার। পা চালিয়ে ট্যাক্সির লাইনে এসে দাঁড়াল। লাইনটা ছোটই ছিল, ট্যাক্সি পেতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না।

ট্যাক্সির মধ্যে গোয়েন্দা ওর নকল গোঁফ আর চশমা খুলে হাতের ব্যাগে ঢুকিয়ে রাখল। বাকি মেক-আপ বলতে অন্য কায়দায় চুল আঁচড়ানো। চিরুনি চালিয়ে সেটাও ঠিক করে নিল একসময়।

ট্যাক্সি ছাড়ল বাড়ির কাছে এসে। কিন্তু সিঁড়িতে পা দেওয়ার মুখেই ওপর থেকে দুদ্দাড় শব্দে যে প্রকাণ্ড মানুষটি নেমে এলেন তিনি দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়।

ইন্সপেক্টরের চোখমুখ ঝলমলে, কিন্তু একটু যেন নকল রাগের ভঙ্গিতে বললেন, 'তোমার চলাফেরাও দেখছি খুব সন্দেহজনক হয়ে উঠেছে, কোথায় থাকো বলো তো সারাদিন? সন্ধে থেকে বহুবার টেলিফোন করা হয়েছে, নেই। এখন এসেও দেখি সব ভোঁ-ভাঁ।'

কাঁচুমাচু মুখে কৌশিক বলল, 'অন্যান্যবার আমার রহস্যের একটা মাত্র ঠিকানা থাকে, এবার পাঁচ-পাঁচটা। তাল বুঝতে পারছি না। এখন যদি দেখি পাঁচটা ঠিকানাই ভুয়ো, তাহলে তো গেলাম। যাক আপনাকে দেখে বুঝতে পারছি আপনার মিশন সাকসেসফুল। চলুন, ঘরে গিয়ে কথা বলি।'

দুজনে ফ্ল্যাটে ঢোকার পরে দরজা বন্ধ করে দিল কৌশিক। সঙ্গে সঙ্গে ইন্সপেক্টর খুশির গলায় বললেন, 'তোমার টিপ্স একেবারে নিখুঁত। এয়ারপোর্টে গিয়ে দুটোকেই পেয়ে গেলাম। জোড় বেঁধে ছিল ওই ডক্টর মৈত্র আর ওর হালের স্যাঙাত সৈকত। কিন্তু ডক্টর মৈত্রের কী তম্বি! ঝড়ের বেগে কুইক অ্যাকসেন্ট ইংরিজিতে কী বুকনিটাই না ঝাড়ল। খামোখা ওকে অ্যারেস্ট করার জন্যে আমার বিরুদ্ধে মামলা আনবে, ক্ষতিপূরণ দাবি করবে। সত্যি কথা বলতে কি, আমি প্রথম দিকে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু জয় মা বলে তুলে নিয়ে এলাম। তারপর থানায় তুলে ব্যাগেজ সার্চ করতেই দেখি কোটি কোটি টাকার মাল—।'

অবাক হয়ে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'কী সেটা?'

'ছবি। একগাদা পেন্টিং।'

কৌশিকের অবাক ভাবটা এখনও কাটেনি। থতমত খেয়ে যাওয়ার পরে জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু ওগুলোর দাম যে কোটি কোটি টাকা, সেটা বুঝলেন কী করে?'

প্রশ্নের উত্তরে সবজান্তার ভাব ফুটে উঠেছিল ইন্সপেক্টরের মুখে। বললেন, 'ভাই, যে গুণী—সে তোমাকে হাজার অপমান করলেও তার গুণ তোমাকে স্বীকার করতেই হবে। ওই যে ইয়াং শিল্পী, খুনির ছবি আঁকাতে ডেকে এনে যার কাছে থাপ্পড় খেয়েছিলাম, তারই শরণাপন্ন হলাম আবার। ছোকরা এসে ছবিগুলো সব পরীক্ষা করে বলল—ওগুলো সব মহামূল্যবান ওরিজিনাল পেন্টিং। লন্ডনে এখন ভারতীয় ছবির খুব কদর। কিছুদিন আগেই লন্ডনের ক্রিস্টি'জ অকশান হাউসে কোটি টাকার ভারতীয় ছবি বিক্রি হয়েছে। চড়া লাভ

দেখে আর একটা হাউসও নাকি এখন ভারতীয় ছবি নিলাম করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছে— তার নাম কী জানো? এমা'জ অকশান হাউস। ব্যস। পুরো ব্যাপারটা আমার কাছে জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেল। ওই যে ফ্যাক্সের টুকরোটা পেয়েছি না—। ওখানে কী লেখা আছে? লেখা আছে—এমা উইল বি ওয়েটিং ফর ইউ অ্যাট হিথ্। তার মানে এমা'জ অকশান হাউসের এজেন্ট চোরাই ছবির ডেলিভারি নেওয়ার জন্যে লন্ডনের হিথ্রো এয়ারপোর্টে হাজির হবে। কী, ঠিক বলেছি না?'

বিস্ময়ের ঘোর কৌশিকের এখনও কাটেনি। একটু থেমে বলল, 'মনে হয় ঠিকই বলছেন। কিন্তু ওইসব ছবি কার আঁকা? আর্টিস্ট কে?'

'সব নোট করে নিয়েছি ওই ইয়ং পেন্টারের কাছ থেকে। আমার কাজে কোনও গলদ পাবে না।' বলতে বলতে হাতের ফাইল খুলে লম্বা একটা খাতা টেনে বার করলেন ইন্সপেক্টর। তারপর চোখে চশমা এঁটে ঝুঁকে পড়ে বললেন, 'দুশো বছর আগের কলকাতার সাহেব-পেন্টারদের আঁকা ছবি। একজনের নাম টমাস, একজনের নাম ড্যানিয়েল, একজনের নাম জেমস হান্টার আর একজন বেলজিয়ান আর্টিস্ট—সল্‌ভিন্স।'

চোখ কপালে তুলে কৌশিক বলল, 'বলেন কী! যদ্দুর শুনেছি এইসব পেন্টারের আঁকা কিছু ওরিজিন্যাল ছবি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের গ্যালারিতে আছে। আচ্ছা, আপনি কি এখনও মর্নিং-ওয়াক করেন?'

'হ্যাঁ। ব্লাড শুগারের পেশেন্ট তো, শরীর ঠিক রাখার জন্যে সকালে একটু হাঁটাহাঁটি করতেই হয়।'

'আমি তাহলে কাল সকাল সাড়ে-ছটা নাগাদ আপনার কোয়ার্টার্সে যাচ্ছি। ছবিগুলো একবার দেখব।'

সাফল্যের হাই তুলে ইন্সপেক্টর বললেন, 'সেই ভাল, আজ বড় ধকল গেছে।'

ঊনত্রিশ

হঠাৎই একটু ঠাণ্ডা পড়ে গিয়েছে কলকাতায়। ঘড়ির নিয়ম আর আকাশের নিয়মের মধ্যে বেশ বড় রকমের তফাত দেখা যাচ্ছে এখন। দিনের মাপ ছোট হয়ে গেছে বেশ। দিনের শুরু দেরিতে, ঠাণ্ডার ভাব, কখনও কখনও হাওয়া কনকনে হয়ে ওঠে। এখন যেমন। ঘড়িতে সকাল পাঁচটা, কিন্তু বাইরের চেহারা দেখে মনে হবে মাঝরাত। আকাশে বেশ কিছু তারা, রাস্তার আলোগুলো জ্বলছে। কিন্তু ভ্রমণার্থীরা জানেন, যে কোনও মুহূর্তে এবার দিনের প্রথম আলো ফুটবে। অভিজাত পাড়ার সুন্দর একটা বাড়ি থেকে যে মানুষটি এইমাত্র মর্নিং-ওয়াকে বার হলেন তিনিও নিশ্চয়ই এই তথ্য জানেন।

বৃদ্ধ মানুষটির চেহারা এমনিতে বেশ টান-টান, কিন্তু মাঝেমাঝে তিনি ঝুঁকে পড়ছিলেন সামনের দিকে। একেই বলে বোধহয় বয়েসের ভার। ভোরের বাতাসে বেশ শীত এখন।

এই শীতের ধার ভোঁতা করার জন্যে মানুষটির গায়ে যথেষ্ট পরিমাণে শীতবস্ত্র। মাথায় টুপি, গলায় মাফলার।

ছোট রাস্তা ছেড়ে যখন বড় রাস্তায় এসে পড়লেন ভদ্রলোক, তখনও চারদিক আশ্চর্য রকমের নির্জন। দিনের আলো একটু বোধহয় ফুটেছে, কিন্তু সেটা তেমন বোঝার উপায় ছিল না। চারপাশে চাপ-চাপ কুয়াশা। কুয়াশা কখনও ঘন কখনও হালকা। পরিচ্ছন্ন, চওড়া রাস্তার দু'পাশে লম্বা-লম্বা গাছ। গাছের ডালে পাখিদের ডানা ঝাপটানোর মৃদু শব্দ উঠছিল। খবর পৌঁছে গেছে ওদের কাছেও। ভোরের প্রথম আলো ফুটলেই ওরা কলরব করে ছিটকে যাবে আকাশের দিকে।

যাঁরা ঈশ্বরের ভজনা করেন তাঁরা এই সময়টা বেছে নেন। চারদিকে শান্ত, সমাহিত ভাব ; মনঃসংযোগ করার আদর্শ সময়। কিন্তু কিছু কুচক্রীও আবার এই সময় মতলব কাজে লাগাবার তাল করে। নির্জন এই পথটায় ঠিক সেই রকমের একটা ঘটনা ঘটে গেল হঠাৎ। হেডলাইট জ্বালিয়ে রাস্তার মধ্যিখান দিয়ে গাঁক-গাঁক করে ছুটে আসছিল একটি ট্রাক। রাস্তার ধার দিয়ে হাঁটছিলেন বৃদ্ধ মানুষটি। আচমকা সেই ট্রাক ঘুরে গেল ওঁর দিকে। কয়েকটা মাত্র মুহূর্ত, কিংবা তারও ভগ্নাংশ—মানুষটি বিদ্যুদ্‌গতিতে ঝাঁপ মারলেন ফুটপাথের ওপর জমে-থাকা শুকনো পাতার স্তূপের ওপর। একটুর জন্যে ট্রাকের নীচে চাপা পড়লেন না।

একটু দূরে গিয়ে বিকট শব্দে ব্রেক কষল ট্রাকটা। তারপরেই দুজন লাফিয়ে নামল গাড়ি থেকে। একজনের বিশাল লম্বাচওড়া চেহারা, হাতে পিস্তল। আর একজন মাঝারি আকৃতির। দুজনেই দৌড়ে এল ফুটপাথে ছিটকে-পড়া বৃদ্ধ ওই মানুষটির দিকে।

ভোরের আলো ফুটব-ফুটব করছিল। কুয়াশা একটুখানি হালকা হয়েছে। লম্বাচওড়া লোকটা ছুটে এসে পিস্তল তুলল চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকা মানুষটির দিকে। তারপরেই ভোরের নিস্তব্ধতা খান খান করে গুলির শব্দ উঠল—গুড়ুম। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ। এই দুটো শব্দ ওঠার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দুদিক থেকে দুটো জিপ ছুটে এল। পুলিশের বাঁশির শব্দ। জিপ থেকে লাফিয়ে পড়ে ভারী বুটের আওয়াজে নির্জন রাস্তা তোলপাড় করে ছুটে এল আট-দশজন পুলিশের লোক। কয়েকজনের হাতে পাঁচসেলের টর্চ। টর্চের তীব্র আলোয় ভোরের পাতলা কুয়াশা উড়ে গিয়েছিল একদম।

সুস্থ দুজনকে ধরা হল প্রথমে, তারপর জখম মানুষটিকে। এক মিনিটও সময় লাগল না পুরো কাজটা শেষ করতে। তারপর তিনজনকে তুলে নিয়ে জিপদুটো ছুটে গেল সামনের দিকে। শুধু দুজন সশস্ত্র পুলিশ রয়ে গেল ট্রাকের পাহারায়।

গুলিতে জখম মানুষটিকে নিয়ে যাওয়া হল হাসপাতালে। বাকি দুজনকে থানায়। জিপ থানার দরজায় পৌঁছবার মুখেই দিনের প্রথম আলোয় ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে।

অন্ধকার ভোরে বেড়াতে বেরুনো একটি মানুষকে চাপা দিয়ে মেরে ফেলার জন্যে দৈত্যের

মতো একটা ট্রাকের ছুটে আসা, গুলি চালানো, পরমুহূর্তেই পুলিশের দুটো জিপের ওখানে পৌঁছে যাওয়ার মধ্যে সময়ের খুব একটা ব্যবধান ছিল না।

একটু দূরে আরও দু-চারজন শ্রমণার্থী ছিলেন, তাঁদের কাছে পুরো ব্যাপারটাই ভোরের কুয়াশার মতোই ঝাপসা রয়ে গিয়েছিল। তাঁরা শুধু এটুকু বুঝেছিলেন, কাছাকাছি কোথাও বড় মাপের কোনও একটা অঘটন ঘটে গেছে। কিন্তু সেটা কী তার বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারলেন না তাঁরা।

ভোরের লালচে আলো দেখতে দেখতে গাঢ় হলুদ হয়ে গিয়েছিল। কোথাও আর এককুচিও কুয়াশা নেই। রাস্তায় লোকের সংখ্যা একটু একটু করে বেড়ে উঠেছিল। স্বাস্থ্যচর্চার জন্যে যাঁরা বেরিয়েছিলেন তাঁরা এখন সংখ্যালঘিষ্ঠ। কাজের লোকের সংখ্যাই বেশি।

সাইকেলের ঘন্টি বাজিয়ে ছুটে যাচ্ছিল খবরের কাগজের হকাররা। মর্নিং ডিউটির লোকজনও বেরিয়ে পড়েছে রাস্তায়। বাসের সংখ্যা কম, যাত্রীসংখ্যা নামমাত্র ; কিন্তু বাসগুলো ফাঁকা রাস্তায় মনের সুখে ছুটছিল।

আর একটু বাদেই সদ্য 'মা বাবা' বলতে শেখা বাচ্চাদের লাল-নীল-হলুদ পশমে মুড়ে তরুণ বাবা-মা এ বি সি ডি শেখাবার স্কুলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে ঝাঁক বেঁধে পথে বেরুবে। কোনও কোনও বুথের সামনে দু-একটা দুধের গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে। অত্যন্ত সহজ স্বাভাবিক একটা সকাল বেশ জাঁকিয়ে বসেছে এবার। থানা এবং হাসপাতালের রাতের কাজের পরে দিনের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছিল পুরোমাত্রায়।

বেলা দেখতে দেখতে আরও কিছুটা গড়িয়ে গেল। ঘড়িতে এখন সাতটা বাজতে দশ। থানার লাগোয়া ইন্সপেক্টরের কোয়ার্টার্সের বসার ঘরে অবনী ঘোষরায় এবং তরুণ গোয়েন্দা কৌশিক মিত্রকে দেখা যাচ্ছিল। ওদের সামনে সেন্টার টেবিলের ওপর শূন্য দুটো চায়ের কাপ। পাশে পোর্সিলিনের ফাঁকা প্লেটে কাঁটাচামচ। অর্থাৎ ব্রেকফাস্ট শেষ। খাওয়ার মাঝখানে এদের দরকারি কথাগুলোও শেষ হয়ে গিয়েছিল।

এবার লম্বা একটা ফিল্টার টিপ্ড সিগারেট ধরিয়ে কৌশিকের অবনীদা বললেন, 'আর এক রাউন্ড চা বলা যাক। শীতটা ফাইনালি পড়ল তাহলে?'

ঘাড় কাত করে চায়ের প্রস্তাবে সায় দিয়েছিল কৌশিক। সেটা দেখেই ভেতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে হাঁক পেড়েছিলেন প্রতাপশালী গৃহকর্তা—'আরও দু-কাপ চা।'

সেন্টার টেবিলের একধারে ব্রাউন রংয়ের একটা প্যাকেট পড়ে ছিল, তার মধ্যে ডক্টর মৈত্রের সেদিনের প্রেস কনফারেন্সের বেশ কয়েকটা ছবি। প্যাকেটটা হাতে তুলে একটা ছবি বেছে নিয়ে কৌশিক বলল, 'অবনীদা, এই মেয়েটির গালে একটা আঁচিল আছে। মিস গাঙ্গুলি যখন ছদ্মবেশ ধরবে তখন এটা অবশ্যই ওকে মনে রাখতে বলবেন। এই ছবিটা মেক-আপ ম্যানকে দিয়ে দেবেন, ও ঠিক সাজিয়ে দেবে। আর ওকে যা করতে হবে একটু ভাল করে বুঝিয়ে দেবেন আপনি। ডক্টর সান্যালও ঠিক সময় হাজির হবে। আপনার

রোলটাও মনে রাখবেন কিন্তু। আজ রাত আটটায় সময় অতনু দত্তের কাছে একজন সার্জেন্ট পাঠিয়ে ওই মেসেজটা পাঠাতে ভুলবেন না।'

হা-হা করে হেসে উঠে ওর অবনীদা বললেন, 'এবার দেখছি তোমারও একটু বয়েস বাড়ার লক্ষণ দেখা দিচ্ছে। এই এক কথা আধঘন্টার মধ্যে কতবার বললে বলো তো। শোনো, আমার ব্রেনটা একেবারে কম্পিউটার-ব্রেন। ওখানে একবার যা ঢোকে তা আর বার হয় না। যা বলেছ তাই হবে। ধরেই নাও—ডান্।'

কৌশিকও হাসল। 'এবারের কেসটা খুব বেয়াড়া তো। জট ছাড়াতে গিয়ে টেনশনে ভুগছি বলেই এক কথা বারবার বলা। আরও একটা বলা-কথা আর একবার বলছি—প্রেসকে এখন কিচ্ছু বলবেন না। আরও একটা দিন অন্তত যাক।'

'তুমি এ নিয়ে একদম ভাববে না। প্রেসকে আমি কাছেই ঘেঁষতে দিই না পারতপক্ষে। আমি শুধু কর্তব্যকর্মটুকু করি. ব্যস, ওখানেই আমার সব দায়িত্ব শেষ। প্রেস অবশ্য মাঝেমধ্যে কোত্থেকে কী সব জেনেটেনে আমার একগাদা প্রশংসা করে বসে। সব প্রশংসা আমার প্রাপ্য নয়। কিন্তু আমি কোনও আপত্তি তোলাতুলির মধ্যে যাই না। আপত্তি মানেই তো বিতর্ক। কী দরকার বাবা বিতর্ক তোলার। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো—এ নিয়ে প্রেসকে আমি একটা কথাও বলতে যাচ্ছি না। তোমার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ওই যে মেসেজের হিথ্ মানে হিথ্‌রো—ওটাই তো এই রহস্য সমাধানের চাবিকাঠি। ওটা তুমি ধরিয়ে না দিলে আমি দমদম এয়ারপোর্টে ছুটতাম না। ওখানে না গেলে দুই অপরাধী দেশ ছেড়ে পালিয়ে যেত। ওদের সঙ্গে যেত আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকার সম্পদ। উফ্! ভাবা যায় না!'

এবার একটু বিব্রত দেখাল কৌশিককে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বলল, 'ওই মেসেজের ভেতরের অর্থ ধরার ব্যাপারে আমার কিন্তু খুব একটা ক্রেডিট নেই। এই কেসের ব্যাপারে আমি একজন ইনফর্মারের সাহায্য নিচ্ছি। ওই সেদিন আমাকে একটা টিপ্‌স দিয়েছিল। সেটা জানা ছিল বলেই হিথ্-এর আসল মানে হিথ্‌রো ধরতে পেরেছি। তবে ওই টিপ্‌স অনুসারে আগেই আমার কিছু একটা স্টেপ নেওয়া উচিত ছিল—।'

ওকে ভরসা দেওয়ার গলায় ইন্সপেক্টর বললেন, 'কী উচিত ছিল আর কী অনুচিত ছিল—সে কথা বাদ দাও তো এখন। বামাল অপারাধী ধরা পড়েছে—এটাই তো যথেষ্ট। কোটি কোটি টাকার ছবি আর একটু হলেই পাচার হয়ে যাচ্ছিল, ভাবা যায়! শুধু টাকার অঙ্কে ভাবলেই হবে না, ওইসব ছবি তো আমাদের জাতীয় সম্পদ। দেখ, প্রেস নিয়ে আমার বিন্দুমাত্র মাথাব্যথা নেই, কিন্তু ওরা যখন ঘটনাটার কথা জানতে পারবে তখন ঠিক এই লাইনেই হেডিং করবে—কয়েক কলমজোড়া হেডিংটা আমি চোখের সামনে পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।'

রীতিমত উত্তেজিত দেখাচ্ছিল ইন্সপেক্টরকে। উনি কথা থামিয়ে পাশে পড়ে থাকা ফাইলের ভেতর থেকে মোটা বাঁধানো খাতাটা বার করে দ্রুত কয়েকটা পাতা উলটে নিয়ে বললেন, 'ওই আর্টিস্ট ছোকরা কিন্তু ভুলভাল কিছু বলেনি। আমি কাল রাত্তিরে তোমার ওখান থেকে

ফেরার পরে ছবির ব্যাপারে কিছু খোঁজখবর নিয়েছিলাম। তা দেখি, ব্যাপারটা ঠিকই। হালের ইন্ডিয়ান পেন্টিং নিয়ে লন্ডনে বেশ হই চই হচ্ছে। ক্রিস্টিজ অকশান হাউসে এই তো সেদিন মকবুল ফিদা হুসেনের তিনটে মাত্র ছবি বিক্রি হয়ে গেল প্রায় ৪১ লক্ষ টাকায়। মাধুরী অ্যান্ড মেনকা ছবিটা বিক্রি হয়েছে প্রায় তেরো লাখে। মেনকা বোধহয় আমাদের সেই অপ্সরা মেনকা। আর মাধুরী বুঝি হালের হিন্দি ফিল্মের গ্ল্যামার গার্ল। ওর হাম আপকে হ্যায় কৌন বইটা তো ইন্ডিয়ান ফিল্মে বিক্রির দিক থেকে রেকর্ড করেছে।'

কৌশিক অবাক হয়ে বলল, 'অ্যাঁ! অবনীদা আপনি সিনেমার গল্প করছেন!'

'আর বলো কেন, তোমার বৌদি সেদিন জোর করে নিয়ে গেল। মন্দ লাগেনি কিন্তু। ভাল ভাল নাচ-গান আছে। পারিবারিক গপ্পো। একটু কমিক ব্যাপার-স্যাপারও আছে। তা, হুসেন তো মাধুরীকে বিখ্যাত করে দিল।'

'হুসেনের কোনও ছবি আছে না কি এর মধ্যে?'

'না না, তুমি তো দেখলে। একজনমাত্র হালের বাঙালি আর্টিস্ট। বাকি সব ছবি দুশো বছর আগের কলকাতার সাহেব পেন্টারদের আঁকা। বেলজিয়ান শিল্পী সল্‌ভিন্সের আঁকা ছবিগুলো তো আমার দুর্ধর্ষ লেগেছে। ওগুলো তো শুধু ছবি নয়, আমাদের ইতিহাসের মস্ত বড় একটা অংশ—কালীঘাট মন্দির, রথযাত্রা, সতীদাহ, হুঁকাবরদার—সাঙ্ঘাতিক সব ছবি!'

ইন্সপেক্টরের এইসব টগবগে কথার কোনও ছাপ পড়ছিল না কৌশিকের মধ্যে। উনি সেটা লক্ষ করে বললেন, 'ছবির ব্যাপারটা তুমি বোধহয় ঠিক—।'

দুদিকে মাথা নেড়ে ম্লান মুখে কথার বাকি অংশটা শেষ করল কৌশিক, 'না, আমি ঠিক বুঝি না।'

'বেশ, এটুকু শুধু এখন বুঝে রাখো, বাজেয়াপ্ত ওই ছবিগুলোর দাম কোটি কোটি টাকা। হিথ্‌রোতে চোরাই ছবিগুলো ডেলিভারি নিতে আসার কথা ছিল এমা'জ অকশান হাউসের এজেন্টের। বেচারাকে খালি হাতে ফিরতে হবে এবার।'

'এমা'জ অকশান হাউসের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করেছেন ডক্টর মৈত্রকে?'

'করব না আবার, করেছি। তবে ঘুঘু লোক, এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন ও-ব্যাপারে কিছুই জানে না। এয়ারপোর্টের সেই তড়পানির মাত্রা অবশ্য কিছুটা কমেছে। তবে আমাকে চেনে না তো। সোজা আঙুলে ঘি না উঠলে বাঁকা আঙুল। এখন শুধু রুটিন জিজ্ঞাসাবাদ, এরপর থার্ড ডিগ্রি মেথডে যাব।'

কথাটা শুনে কেমন যেন আঁতকে ওঠার ভঙ্গিতে কৌশিক বলল, 'না না, মারধোরের মধ্যে যাবেন না কিন্তু এক্ষুনি।'

'তবে কি জামাই আদর করব! একটা পাক্কা ক্রিমিনাল—।'

'ক্রিমিনাল! ওঁর বিরুদ্ধে চার্জটার্জগুলো ঠিক করা হয়েছে?'

'ই-য়ে-স। এখন শুধু একটু এভিডেন্স দরকার, আশা করছি তাও চটপট পেয়ে যাব!

'চার্জ কী?'

'পরষ্কার চার্জ। ছবির স্মাগলিং র‍্যাকেটে মিলন মাইতিকে জড়াতে চেয়েছিল। কিন্তু লোকটা বেগড়বাঁই করার জন্যে ওকে বারাসাতের কাছে গুলি করে মেরেছে। দ্বিতীয় দফায় জড়াতে চেয়েছিল সুনন্দ তরফদারকে। কিন্তু ও কোনও একটা ঝামেলা পাকানোয় ওকে গুমখুন করেছে। ওর তৃতীয় শাগরেদ সুনন্দর ভাই সৈকত। এই কেসটায় আশা করছি ওকে সাক্ষী হিসেবে পেয়ে যাব। সাক্ষী রেডি, এবার প্রমাণ। প্রমাণ হবে সুনন্দর মৃতদেহ। মাটির তলায় পচছে। হদিশ করে মাটি খুঁড়লেই বেরিয়ে আসবে প্রমাণ।'

তোড়ের মাথায় আরও কী-সব বলতে যাচ্ছিলেন ইন্সপেক্টর, ঠিক তখনই একটা চিরকুট হাতে করে ঢুকল একজন কনস্টেবল। চিরকুট পড়ার পরে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'এসে গেছে তোমার মিস গাঙ্গুলি। যাবে না কি একবার অফিসে?'

'না-না, আপনি যান। যা যা বলেছি, প্লিজ বলবেন। আমি চললাম এখন। ঠিক জায়গায় ঠিক সময় দেখা হবে আপনাদের সঙ্গে।'

কোয়ার্টার্সের পেছন দিকের পথ ধরে রাস্তায় বেরিয়ে এল কৌশিক। ঘড়িতে সাতটা পনেরো। তার মানে মিস গাঙ্গুলি আসতে পনেরো মিনিট দেরি করেছেন। এখন অবশ্য এইটুকু দেরিতে কিছু এসে যায় না। ভদ্রমহিলাকে কী করতে হবে অবনীদা সে ব্যাপারে ভালই ব্রিফিং দিতে পারবেন। নিয়মনিষ্ঠ এই অফিসারটি কোনও ব্যাপারেই কোনও ত্রুটি রাখেন না।

সকালের রোদ এর মধ্যেই বেশ চড়া হয়ে গেছে। ঋতু পরিবর্তনের এই সময়টায় প্রকৃতি বোধহয় মনঃস্থির করতে পারে না। ভোরের দিকে বেশ শীত ছিল, এখন রোদের মধ্যে একটু যেন গা-জ্বলুনি ভাব। এই গরম আর ঠাণ্ডার লড়াই বেয়াড়াভাবে দু-চারটে দিন চলার পরে শীত নেমে যাবে জাঁকিয়ে।

একটা প্রাইভেট বাসের দিকে হাত তুলল কৌশিক। এটা বাসস্টপ নয়, কিন্তু যাত্রী তোলার ব্যাপারে বেসরকারি বাসের চালকরা অত্যন্ত উদার। যেখানে সেখানে থেমে গিয়ে যাত্রী তোলে। তবে ঠিক জায়গায় নামাবার ব্যাপারে উদাসীন। এটা দোষ নয়, ওরা হয়তো পথচলতি যাত্রীদের একটু বেশি মাত্রায় আপন করে নিতে চায়। কৌশিক অবশ্য একটু হাঁকডাঁক করে ঠিক জায়গাতেই নেমে গেল মিনিট-দশেক বাদে।

ফ্ল্যাটে পৌঁছবার পরেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল গোয়েন্দা। আলমারি থেকে শার্ট-প্যান্ট বার করে ব্যাগে ঢোকাল, তারপর মেক-আপ কিট নিয়ে আয়নার সামনে এসে বসল। ভোল পাল্টানোর ব্যাপারে গোয়েন্দার বেশ একটা স্বাভাবিক দক্ষতা আছে। তা ছাড়া রং তুলি, নকল গোঁফ জুলফি, নতুন ধরনের চশমা ইত্যাদির সাহায্য নিয়ে নিজের চেহারা বদলে ফেলার খেলাটাও ও বেশ উপভোগ করে।

মিনিট-চল্লিশ বাদে কৌশিকের আড়াল থেকে যে মানুষটি বেরিয়ে এল তার চেহারা একজন শৌখিন ট্যুরিস্টের মতো। পরনে চকরাবকরা শার্ট আর ব্যাগি ট্রাউজার্স। এক কাঁধে

ব্যাগ, অন্য কাঁধে ক্যামেরা। লম্বা জুলফি, দুদিকে সামান্য ঝুলে-পড়া সরু গোঁফ। চোখে হাল ফ্যাশানের গগ্‌লস। ছদ্মবেশী গোয়েন্দা পৌনে ন'টার সময় এসপ্ল্যানেড বাসগুমটির কাছে একটা লাক্সারি বাসের পাশে এসে দাঁড়াল।

বাসের মধ্যে ঝকঝকে পোশাক পরা বেশ কয়েকজন পুরুষ ও মহিলা। কিছু বাচ্চাকাচ্চাও আছে। এদের দেখলেই বোঝা যায় বেড়াতে যাচ্ছে কোথাও। কোথায় যাচ্ছে সে হদিশ আছে বাসের ওদিকের গায়ে ঝোলানো রঙিন কাপড়ের টুকরোয়। কাপড়ের ওপরে বড় বড় করে লেখা গৌড় ভ্রমণ, নীচে লেখা টালিগঞ্জ পর্যটক পরিষদ।

ঠিক ন'টায় সময় বাস রওনা হল গৌড়ের পথে।

এই লাক্সারি বাসটি যখন গৌড়ের পথ ধরেছিল তখন গৌড়ের রামকেলিতে বিশাল এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যে সাজ-সাজ রব পড়ে গিয়েছিল। খোলা মাঠে গোল মঞ্চ। মঞ্চের উচ্চতা মাটি থেকে মাত্র আড়াই ফুট। এই এলাকায় মাঝেমধ্যে সারা রাত ধরে পালাগান বসে, যাত্রায় দল আসর বসায়, কখনও বা নাম-সংকীর্তন চলে। কিন্তু এবারের আয়োজন সবকিছুকেই ছাপিয়ে গিয়েছিল।

অনুষ্ঠানে হাজাররকম মজা। নাচ হবে, গান হবে, যাত্রা হবে, নাটক হবে—কলকাতা থেকে মস্ত এক দল এসেছে। বাবুদের সঙ্গে আশেপাশের গাঁয়ের লোকরাও নাচবে, গাইবে, খোলা তরোয়াল নিয়ে যুদ্ধ করবে মঞ্চে।

লোকেদের মুখে মুখে দূর-দুরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল কত কথা! পালা গানটান করার জন্যে বাবুরা একটা পয়সাও নেবে না। বরং অনুষ্ঠান শেষ হলে ঠাকুরের ভোগ খাওয়াবে, প্যাঁড়া বিলোবে। এইসব নাচগানে নাকি লোকশিক্ষা হয়। গাঁয়ের লেখাপড়া না-জানা লোকজন এই পালাগান দেখলে ভোরবেলায় একুটখানি পণ্ডিত হয়ে বাড়ি ফিরবে। বারে! এ তা রামকেলির রামমজা!

দুপুর থেকেই পিলপিল করে লোকজন আসতে শুরু করেছিল রামকেলির মাঠে। গাঁ-গঞ্জে রগুড়ে লোকের অভাব নেই। তাদের কে যেন রটিয়ে দিয়েছিল—সারা রাত ধরে পালাগান দেখলে আসরে-আসা সবাইকে দশটা করে টাকা আর একটা করে চাদর দেওয়া হবে। সে কি! কেন? তার জবাবে আর এক রগুড়ে লোক রটিয়েছিল : এ এক মস্ত বড়মানুষের খেয়াল। গত কার্তিকে মারা যাওয়া তার মায়ের স্বর্গে যাওয়া পাকা করার জন্যেই এই ব্যবস্থা। গুজবের পালে জোর হাওয়া লাগলে তার যা চেহারা হয়—তা আর কহতব্য নয়।

আজগুবি কিছু শোনার ইচ্ছে লোকের যত বাড়ছিল, আজগুবি কথা রটনা করার লোকের সংখ্যাও তত বড় হচ্ছিল। মাঠের কাজ ফেলে মনের আনন্দে গপ্পের গরু গাছের মগডালে তুলতে শুরু করে দিয়েছিল গাঁয়ের সাদাসিধে লোকগুলো।

মুখার্জিবাবুর পোশাকআশাক, চালচলন এখন লোকেশন শ্যুটিংয়ে আসা মার্কামারা

চিত্রপরিচালকদের মতো। মাথায় টুপি, চোখে সানগ্লাস, নানান কায়দায় সিগারেট টানছিলেন। যা দেখার নয় তেমন জিনিসের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকছিলেম মাঝেমধ্যে। একবার একটা অতিমাত্রায় নিরীহ পাটকিলে রঙের গরুকে নানা কোণ থেকে পাক্কা দশ মিনিট ধরে দেখলেন। ওঁর রকমসকম দেখে ওঁর প্রতি গাঁয়ের লোকদের ভক্তিশ্রদ্ধা অসম্ভব রকমের বেড়ে উঠেছিল।

শীতের শুরু থেকেই এদিকে ট্যুরিস্টদের ঝাঁক আসতে শুরু করে। কিছু কিছু এখনও আসছিল। প্রাইভেট কার, ট্যাক্সি বা ভাড়া-করা বাস মাঝেমধ্যে কৌতূহলী পর্যটকের দল নিয়ে আসছিল ওখানে। ট্যুরিস্টরা দু-চোখ খুলে চারদিক দেখছিল, ক্যামেরায় ছবি তুলছিল পটাপট, তারপর রওনা হয়ে যাচ্ছিল অন্য কোনও দ্রষ্টব্য স্থানের দিকে।

দু-চারজন অনুগত অভিনেতা সঙ্গে নিয়ে মুখার্জিবাবু হাঁটতে হাঁটতে এক সময় হাজির হয়ে গেলেন পিয়াস বারির কাছে। কেউ কেউ পিয়াজবাড়িও বলে। আদত নাম যাই হোক না কেন, এখানকার গল্পটা ভারী গা-ছমছমে। সেদিনের সেই বাড়ি আজ আর নেই, মুখে মুখে ফেরে শুধু ভয়ংকর গল্পটা।

তখন নসরৎ শাহের আমল। নিষ্ঠুর বাদশা অপরাধীদের মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার জঘন্য এক কৌশল বার করেছিল। অপরাধীকে পেট ভরে মিষ্টি খাইয়ে দিঘির পাশের একটা ঘরে আটকে রাখা হত। তেষ্টায় ছাতি ফাটত অপরাধীর, কিন্তু তাকে এক ফোঁটাও জল খেতে দেওয়া হত না। গরাদ আঁটা জানলা দিয়ে লোকটি ভরাট দিঘির টলটলে জল দেখত। দেখে তার তেষ্টা শতগুণ বেড়ে যেত। তারপর দু-হাত দূরের অকূল দিঘির দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে একসময় বুক ফেটে মারা যেত। নিষ্ঠুর বাদশার তাতেই ছিল আনন্দ।

ইতিহাসের ভয়ংকর ওই কাহিনী শুনে হাত মুঠো করে মুখার্জিবাবু বললেন, 'ওফ্! দিঘির গল্পের মধ্যে যা হাই ড্রামা আছে না—পরের বার এটা নিয়ে কিছু একটা নামাতে হবে।'

জবাবে গাঁয়ের সরল সাদাসিধে অভিনেতা বলল, 'না-না, জলে কিছু নামাবেন না, সে আমলে দিঘির জলে এত বিষ ছড়ানো হয়েছিল যে সে বিষ নাকি আজও আছে।'

বেলা বোধহয় কালকের তুলনায় আজ আরও একটু ছোট হয়েছে। পাঁচটা নাগাদ সূর্য হেলে পড়েছিল একধারে। বাতাসে মৃদু শীতের ভাব। দূরের আমবাগান থেকে মাঝেমধ্যে শনশন করে হাওয়া ছুটে আসছিল।

আসরে হাজার মজা দেখার জন্যে ইতিমধ্যেই আশেপাশের পাঁচটা গাঁয়ের লোকজন ভেঙে পড়েছিল ওখানে। কারও হাতে খড়ের আঁটি, ওটা পেতে মাটিতে বসবে। কারও কাঁধে নোংরা কাপড়ের টুকরো, রাত বাড়লে কানে-মাথায় জড়াবে।

মঞ্চের ওপরে মস্ত একটা চাঁদোয়া টাঙানো হয়েছে, তার একটা অংশ টেনে আনা হয়েছে মঞ্চের বাইরেও। ওখানে কিছু টিনের চেয়ার পাতা। কয়েকজন গণ্যমান্য অতিথি বসবেন।

ওইসব অতিথির তালিকায় আছেন জেলার এস পি, জেলার সভাধিপতি, স্থানীয় সাংসদ। বাংলাদেশ ও আমেরিকার কয়েকজন অতিথিরও আসার কথা।

একগাড়ি পুলিশ এসে গেছে ইতিমধ্যেই। কয়েকজন মঞ্চের কাছে। বাকি সবাই ছড়িয়ে আছে ভিড়ের মধ্যে। আজকাল এই ধরনের যে-কোনও অনুষ্ঠানে নিরাপত্তার একটু জোরদার ব্যবস্থা থাকে। ব্যবস্থাটা সাধারণ লোকের গা-সওয়া হয়ে গিয়েছে। কিশোর আর দিব্য একটু ছোটাছুটি করছে, কখনও এখানে কখনও সেখানে। শুধুমাত্র ওদের ব্যবহারের জন্যে কাছেই একটা অ্যাম্বাসাডর গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে।

ওরা উঠেছে একটু দূরের সম্পন্ন এক জোতদারের বাড়িতে। আধুনিক জীবনযাত্রার সব ব্যবস্থাই আছে সেখানে, এমনকি টেলিফোনও। মাঝেমধ্যেই ওরা হুশ করে গাড়ি ছুটিয়ে চলে যাচ্ছিল সেখানে, আবার ফিরে আসছিল একটু পরেই।

কিছুক্ষণ বাদে আসরে এলেন পঞ্চায়েত প্রধান। এই মানুষটির এখানে দারুণ দাপট। উনি আসতেই স্থানীয় থানার বড়বাবু ওঁর কুশল সংবাদ নিলেন।

একটু পরেই ওখানে এসে হাজির হল কলকাতার একটা লাক্সারি ট্যুরিস্ট বাস। বাসের গায়ে শালু ঝোলানো—তাতে লেখা টালিগঞ্জ পর্যটক পরিষদ।

বাস থামতেই পর্যটকরা নেমে পড়ল হুড়মুড় করে। কলকাতার মানুষদের কাছে গাঁয়ের এই আসরটি বাড়তি লাভের মতো। এই দলের ম্যানেজারগোছের মানুষটির নাম গণেশ ভট্টাচার্য। ওঁকে দেখেই পঞ্চায়েত প্রধান দুহাত বাড়িয়ে দিয়ে আপ্যায়নের ভঙ্গিতে বললেন, 'আরে গণেশবাবু আপনি!'

গণেশবাবুও দু-হাত বাড়ালেন। সবাই জানল এঁরা দুজন বন্ধুমানুষ। দু-চার কথার পরেই গণেশবাবু বললেন, 'খুব ভাল কথা, আমরা তাহলে দু-তিন ঘন্টা পালাগান দেখার পরেই টাউনে ফিরব।'

পঞ্চায়েত প্রধান পবিত্র মণ্ডল পুরনো বন্ধু গণেশ ভট্টাচার্যের সঙ্গে কিশোর আর দিব্যরও আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন। কিশোর খুব আন্তরিক ভঙ্গিতে বললেন, 'ভাল দর্শকের সংখ্যা যত বাড়ে ততই ভাল। আপনারা রাত্তিরে আমাদের সঙ্গেই খাবেন।'

ওঁদের মধ্যে যখন এইসব কথাবার্তা চলছিল তখন এক যুবক ওদিকে গিয়ে মুখার্জিবাবুর পিঠে খুব আস্তে একটা টোকা মারল। মুখ ফিরিয়ে নির্দেশক ছোকরাকে দেখে বিরক্ত হলেন, তারপর গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কী?'

'কী আবার, আপনার নাটক দেখার লোভ সামলাতে পারলাম না—চলে এলাম।'

গলার স্বর শুনে ছদ্মবেশী কৌশিককে চিনতে পারলেন মুখার্জিবাবু। চমকে উঠে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন উনি, কিন্তু চোখের ইঙ্গিতে গোয়েন্দা ওঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমি কিন্তু এখন এখানে একেবারেই অচেনা একজন ট্যুরিস্ট।'

ত্রিশ

আসরের মানীগুণী অতিথিদের অনেকেই এসে গেছেন এক-এক করে। এসেছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি, এস পি সাহেব, ব্লক সম্পাদক এবং আরও কেউ কেউ। স্থানীয় থানার ওসি খোলা মাঠের ভি আই পি এনক্লোজারে দাঁড়িয়ে সবকিছু তদারকি করছেন।

আলাদা করে প্রত্যেক অতিথির সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন কিশোর আর দিব্য। বাংলাদেশ ডেপুটি হাই কমিশনের পক্ষ থেকে দু'জন এসেছেন, কিন্তু অন্য বিদেশি অতিথিদের কেউ এখনও এসে পৌঁছননি। এদেশ ওদেশের সাংস্কৃতিক দল বিনিময়ের ব্যাপারে ওই সব অতিথির বেশ বড় একটা ভূমিকা আছে। সুতরাং এই অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা ওঁদের সম্পর্কে একটু বেশি মাত্রায় আগ্রহী হবেন—এ তো অত্যন্ত স্বাভাবিক ঘটনা। নিশ্চয়ই কোথাও আটকে গেছেন। হয়তো একটু দেরিতে এসে হাজির হবেন। দিব্য আর কিশোর এইরকমই একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল।

মস্ত-বড় মাঠটা এখন জোয়ারের নদীর মতো ফুলেফেঁপে উঠেছে। মাঠ ভেঙে পড়েছে দর্শকে। চারদিকে শুধু মাথা আর মাথা। অন্ধকার আর একটু গাঢ় হতেই বেশ কয়েকটা হ্যাজাক জ্বলে উঠেছিল। সামনে ঝকঝকে আলো, দূরে আলো-আঁধারি। দমকা হাওয়া মাঝেমধ্যে আশেপাশের ঝুপসি গাছের পাতা কাঁপিয়ে বয়ে যাচ্ছিল।

ঠিক সাড়ে-পাঁচটার সময় বেজে উঠল ঝমঝমে বাজনা। আসরের একধারে বাজনদাররা। খোলা মাঠে, হ্যাজাকের আলোয়, নির্জন গাঁয়ের আসরে যখন এই বাজনা বেজে ওঠে—তখন তার আবেদনই আলাদা। বাজনার জোর ধাক্কা লেগেছিল একঘেয়ে জীবনযাপনে ক্লান্ত গাঁয়ের মানুষদের রক্তে। মাথা নাড়িয়ে বাজনার তালে তাল দিচ্ছিল অনেকেই। সামনের দিকে বসা বাচ্চাগুলোর চোখ থেকে বিস্ময় যেন ঠিকরে পড়ছিল।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই আসর মাত করল ঝুমুরের দল। ওরা নামতেই মঞ্চে উঠল বাউলরা। নাচ আর গান। তারপর ভাটিয়ালি। গম্ভীরা আর কীর্তন দিয়ে শেষ হল অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব। ছোট ছোট অনুষ্ঠান। ঘন্টা-দেড়েকের মধ্যে শেষ হয়ে গেল।

পরের অনুষ্ঠান ছোট মাপের যাত্রাপালা—সীতার পাতালপ্রবেশ। আসর যে কতখানি জমেছিল তার প্রমাণ কান্নার আওয়াজ। সীতার পাতালপ্রবেশের সময় দর্শকদের চোখ ভরে গিয়েছিল জলে। মেয়ে-বউদের বেশ কয়েকজন কেঁদে উঠেছিল ফুঁপিয়ে-ফুঁপিয়ে।

তৃতীয় এবং শেষ পর্বে আছে নির্দেশক মুখার্জিবাবুর দু'টি মজার নক্শা—কণ্ঠীবদল ও ফজলবিবির ফজলি আম।

প্রথম নক্শা কণ্ঠীবদল বা পাঁচ সিকের বিয়ে। ঘটনাস্থল এই রামকেলিই। এখানেই নাকি গণবিবাহ প্রথা চালু করেছিলেন মহাপ্রভু। মেলায় জড়ো হত অল্পবয়সী বোষ্টম-বোষ্টমীরা। নিজেরাই বেছে নিত বর-কনে। বিয়ের অনুষ্ঠান বলতে কণ্ঠীবদল। পরে খরচা দাঁড়িয়েছিল মাত্র পাঁচ সিকেয়। পাঁচ সিকেতেই বিয়ে শেষ। কন্যাদায়গ্রস্ত বাপ-মায়ের মুখে হাসি ফুটিয়েছিলেন

শ্রীচৈতন্য। মেয়ে পার করার জন্যে আর জমি-গরু বেচার দরকার নেই। পণপ্রথা উধাও। নানা রকম মজার দৃশ্য দিয়ে চমৎকার একটা বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে নক্‌শায়। তবে অভিনেতারা আড়ষ্ট ছিল বলে নক্‌শা তেমন জমল না।

পরের নক্‌শাও এই মালদারই ঘটনা নিয়ে। এখানকার পুরনো দিনের সুলতান ইউসুফের পেয়ারের নর্তকী ফজলবিবির কাহিনী। গল্পটা এখানকার লোকজনেরা জানে। কিন্তু সে তো দু-কথার গল্প। এখানে তাই নিয়ে মজার নক্‌শা।

ছিপছিপে সুন্দরী ফজলবিবি পেল্লায় মোটা হয়ে যাওয়ার পরে তার বাগানের মস্ত মস্ত আমের নাম হয়ে গিয়েছিল ফজলি আম। ফজলবিবির নামে ফজলি আম।

গাঁয়ের লোকের মুখে মুখে সেই নামটা চালু হয়ে যাওয়ার অনেক পরে কথাটা বিবির কানে পৌঁছল। বিবি তখন রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে তার চাকর জাফর মিঞাকে আদেশ দিল : এক্ষুনি একটা কুড়ুল নিয়ে গিয়ে বাগানের পেল্লায় সাইজের আমের সব ক'টা গাছ কেটে ফেল।

চাকরের কাজ ছিল শুধুমাত্র বিবির ঘরদোর ঝাঁট দেওয়া। রোগাপটকা চেহারা, কুড়ুল ধরেনি কখনও। কিন্তু বিবির আদেশে নিরুপায় হয়ে বিশাল এক কুড়ুল হাতে আম গাছ কাটার জন্যে মঞ্চে উঠল।

মঞ্চে প্লাইউড দিয়ে তৈরি বড়সড় কয়েকটা আম গাছ, তাতে ঝুলে আছে মস্ত সব ফজলি আম। কিন্তু জাফর গাছ কাটবে কী, কুড়ুলের ভারে নড়তেই পারে না। ওদিকে আবার সুলতানের পেয়ারের বিবির আদেশ অমান্য করার সাধ্য নেই। এ পার্ট যার করার কথা ছিল তাকে ম্যালেরিয়ায় ধরেছে। সুতরাং নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে জাফর সেজে মঞ্চে নামলেন স্বয়ং নির্দেশক মুখার্জিবাবু।

নেমেই মাত করলেন আসর। মুখে কোনও কথা নেই, কিন্তু মস্ত বড় কুড়ুল কাঁধে টলমল করে হাঁটার মজাদার ভঙ্গি দেখে দর্শকদের মধ্যে অট্টহাসির ঝড় উঠেছিল। পরিশ্রান্ত জাফরের কপালের ঘাম ঝেড়ে ফেলার সে কী কায়দা! কুড়ুলের ভারে সামনে যাওয়ার বদলে পেছনে ছিটকে যাওয়ার রকমসকমই আলাদা। হাঁচি, কাশি, হেঁচকির শব্দগুলোরও জবাব নেই। এই ভাবে মঞ্চে তিন পাক ঘুরে 'হেঁইও' বলে কুড়ুল চালাল আম গাছের মোটা গুঁড়িতে। তারপরেই চিৎপাত হয়ে আছড়ে পড়ল মাটিতে। তাই দেখে দর্শকদের সে কী হাসি! হাসির সঙ্গে হাততালি।

মনপ্রাণ ঢেলে অভিনয় করছিলেন মুখার্জিবাবু। একটু অবশ্য মোটা দাগের ভাঁড়ামো। নির্দেশকের হিসেব নির্ভুল ছিল। গাঁয়ের এই গরিব, প্রায়-নিরক্ষর মানুষজন মনের মতো ভাঁড়ামো পেলে আর কিছুই চায় না। সুতরাং ওদের অট্টহাসি জিইয়ে রাখার জন্যে চেষ্টার কোনও ত্রুটি ছিল না নির্দেশক-অভিনেতার।

মঞ্চের একজন অভিনেতার সেরা পাওনা দর্শকদের হাততালি। সেই হাততালি আত্মবিশ্বাস

ফিরিয়ে এনেছিল মুখার্জিবাবুর। কদ্দিন বাদে আসরে নেমেছেন, কিন্তু আজও রক্তের মধ্যে অভিনয়ের প্রতি সেই প্রগাঢ় ভালবাসা। এখানে আবার মস্ত একটা ঝক্কিও আছে কাঁধের ওপর। সেটা হল নাট্য-পরিচালকের গুরু দায়িত্ব।

নক্‌শাদুটো তেমন জমেনি, সেই খামতি পুষিয়ে নেওয়ার জন্যে মুখার্জিবাবুর চেষ্টার অন্ত ছিল না। টলমল করতে করতে মস্ত কুড়ুলের কোপ বসাচ্ছিলেন আম গাছের গুঁড়িতে, তারপর সেই ধাক্কায় চিৎপাত হয়ে পড়ছিলেন মঞ্চের ওপর। এক-একবার এক-এক ধরনের আছাড় খাওয়া, সেই সঙ্গে এক-এক ধরনের আর্তনাদ। হাসিতে ফেটে পড়ছিল দর্শকরা।

জাফরের অভিনয় তুঙ্গে উঠল এবার। চোখমুখের ঘাম মুছে উবু হয়ে বসে গামছা ঘুরিয়ে হাওয়া খেতে খেতে বিশ্রাম নিল কিছুক্ষণ, তারপর আল্লার দোয়া ভিক্ষা করে মস্ত কুড়ুল তুলল মাথার ওপর। এইভাবে বীরপুরুষের মতো একটুখানি পায়চারি, তার পরে 'হেঁইও' বলে আবার কুড়ুল চালাল আমগাছের গুঁড়ির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে দুনিয়ার সেরা উদ্ভট কাণ্ডগুলোর একটা ঘটে গেল। গাছের প্লাইউডের গুঁড়ি ফেটে ঝন ঝন করে নীচে পড়ল একগাদা খুচরো টাকাপয়সা।

গাছের গুঁড়ি থেকে টাকাপয়সা! ওফ্! দমফাটা হাসি হাসতে হাসতে দর্শকরা এ ওর গায়ের ওপর ঢলে পড়ল। ভাবা যায় না এমন দৃশ্য! কুড়ুল চালানো হল গাছে, আর গাছ থেকে পড়ল টাকাপয়সা। এ কি টাকার গাছ! হা-হা-হা। সমুদ্রের ঢেউ তীরে আছড়ে পড়লে যেমন শব্দ ওঠে—হাসির শব্দও ঠিক তেমন।

গাছের গুঁড়ি থেকে টাকাপয়সা পড়তে দেখে বিস্ময়ের চাপে জাফরের চোখ যেন ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল! কুড়ুল কাঁধে স্থির হয়ে ছিল পাথরের মতো। দর্শকদের অত যে হাসি, হাততালি—সে সবের যেন বিন্দুমাত্র ছাপ পড়েনি অভিনেতাটির ওপর।

এটাই ছিল নক্‌শার শেষ দৃশ্য। নক্‌শা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনুষ্ঠানও শেষ। মঞ্চে উঠে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করল দিব্য। তারপর গাছের গুঁড়ি থেকে পড়া টাকাপয়সাগুলো দ্রুত কুড়িয়ে নিয়ে ছোট একটা থলিতে ভরে ফেলল। আর এক দফা হাততালি দিয়ে যে যার বাড়ির পথ ধরল গাঁয়ের লোকরা।

অভিনেতাদের খুব কাছ থেকে দেখার জন্যে উৎসাহী দর্শকদের ছোট্ট একটা ভিড় জমেছিল মঞ্চের কাছে। এস পি মুখার্জিসাহেব আর জেলা পরিষদের সভাধিপতি রবীনবাবু এসে হাত মেলালেন মুখার্জিবাবুর সঙ্গে। দুজনেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন অভিনেতা-পরিচালকের। আহ্! কী ডিরেকশন! আর অভিনয়ের তো জবাব নেই। আপনার ওই জাফরের পার্টে সংলাপ তো মোটে দু-চারটে, কিন্তু অ্যাকশন দিয়ে আপনি মাত করে দিয়েছেন আসর। দুর্ধর্ষ! গাছের গুঁড়ি থেকে ঝনঝন করে টাকাপয়সা পড়ার দৃশ্যটা তো ফ্যান্টাস্টিক! বিশ্বাস করুন, ওই রকম একটা ঘটনা যে ঘটা সম্ভব—আমরা কল্পনাও করতে পারিনি!

রবীনবাবু পড়াশুনো করা লোক, নাটকের প্রতি বাড়তি একটা উৎসাহও আছে। উনি

বললেন, 'আচ্ছা, গাছের গুঁড়ি থেকে টাকাপয়সা পড়া—এই ধরনের উদ্ভট একটা দৃশ্য তৈরির পেছনে কি আপনার বিশেষ কোনও বক্তব্য আছে? মানে আমি বলতে চাইছি, প্রতীক-ট্রতিকের কোনও ব্যবহার—।'

অভিনয়ের শেষ দৃশ্যের সেই বিমূঢ় ভাব মুখার্জিবাবুর বোধহয় এখনও কাটেনি। আমতা-আমতা করে বললেন, 'না, মানে—আসলে আমি ঠিক—।'

এইটুকু বলেই মুখার্জিবাবু থেমে গেলেন। শ্রোতাদের সবাই বুঝল মানুষটি অত্যন্ত বিনয়ী এবং প্রচারবিমুখ। ইনি আর যাই করুন না কেন, নিজের ঢাক নিজে পেটান না।

'আপনারা তো কাল বাংলাদেশে যাচ্ছেন, আপনাদের অনুষ্ঠান দেখবেন দারুণ জমবে। কাল কি সকালেই রওনা হচ্ছেন?'

'আমি তো যাচ্ছি না, এঁরা—।'

মুখার্জিবাবুর কথাটা কেড়ে নিয়ে দিব্য রবীনবাবুকে বললেন, 'আসলে এত বড় একটা দল নিয়ে যাওয়ার অসুবিধে আছে এখন। আমরা উপস্থিত অল্প কয়েকজন যাচ্ছি, পরে একটা বড় দল নিয়ে যাব। আমাদের কয়েকজন বিদেশি অতিথির আসার কথা ছিল—ওঁরাও আমাদের সঙ্গী হবেন। মনে হয় কাল সকালেই এসে যাবেন। কিশোর গেছে টেলিফোনে খবর নিতে, ও এলে ব্যাপারটা জানা যাবে—।'

বলতে না বলতেই অ্যাম্বাসাডর ছুটিয়ে কিশোর ওখানে হাজির হল। ওর চোখমুখ ফ্যাকাশে। দিব্যকে বলল, 'একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। আজ সকালে বেড়াতে বেরিয়ে ট্রাক চাপা পড়েছেন তুলির মামা। হসপিটালাইজ্‌ড হয়েছিলেন, তারপর সন্ধেবেলায়—।'

'সন্ধেবেলায় কী?' আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করল দিব্য।

'ও-বাড়িতে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অতনুবাবুর ফোন পেলাম। তুলি অসুস্থ, ও কেমন থাকে জানার জন্যে এখানকার ফোন নাম্বারটা দিয়ে এসেছিলাম। অতনুবাবু ফোন করে ওই খবরটা দিলেন। ভেঙে কিছু বলেননি, তবে কথার ধরনে বুঝলাম—তুলির মামার অবস্থা ভাল নয়—।'

'আপনার স্ত্রীর মামা মানে কি অলোক মৈত্র?'

মুখার্জিবাবুর প্রশ্নের উত্তরে শুকনো মুখ করে একপাশে মাথা কাত করলেন কিশোর।

এস পি সাহেব চটপট সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। সব শুনে বললেন, 'আপনি তা হলে এখুনি কলকাতায় ফিরে যান। ক'জন যাবেন বলুন, আমি ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। দুশ্চিন্তা করবেন না, আমার মন বলছে সব ঠিক হয়ে যাবে।'

জেলা পরিষদের সভাধিপতি রবীনবাবু মানুষটিও খুব ভাল। কিশোরের পিঠে হাত রেখে বললেন, 'আপনার স্ত্রী কেমন আছেন এখন?'

'অসুস্থ ছিল, স্লাইটলি ইমপ্রুভ্‌ড দেখে এসেছিলাম—ওই রকমই আছে শুনলাম।'

মিনিট-পাঁচেকের আলোচনা, তার মধ্যেই ঠিক হয়ে গেল—সাংস্কৃতিক দল নিয়ে দিব্য

এখানে থেকে যাচ্ছেন। প্রোগ্রাম নষ্ট করার কোনও দরকার নেই। কাল সকালে দল নিয়ে বাংলাদেশে চলে যাবেন। এদিকে কিশোর মুখার্জিবাবুকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার পথে রওনা হয়ে যাবেন এক্ষুনি। পেছনে আর একটা গাড়িতে এখানকার কয়েকজন যাবে—কখন কী দরকার হয় সাহায্য করার জন্যে। পুলিশের একটা গাড়ি ওদের এসকর্ট করবে কলকাতা পর্যন্ত।

অ্যাম্বাসাডর ছুটল ওদের আস্তানায়, একটু বাদেই ফিরে এল কিশোরের স্যুটকেস নিয়ে। কিশোর গাড়িতে ওঠার মুখে নেপালি গোছের একটা লোক ওর হাতে ছোট্ট একটা কিটব্যাগ ধরিয়ে দিয়েছিল।

প্রথমে পুলিশের জিপ, মধ্যিখানে কিশোরের গাড়ি, শেষের গাড়িতে জনাচারেক। ওই চারজনের মধ্যে টালিগঞ্জ পর্যটক পরিষদের তরুণ সেই ট্যুরিস্টও ছিল। তিনটে গাড়ি ছুটল কলকাতার পথে।

ভোর সাড়ে-তিনটে নাগাদ কিশোরদের বাড়ির সামনে পৌঁছে গেল গাড়িগুলো। কিশোরদের বিশাল বসার ঘরে আলো জ্বলছিল। বাড়ির সামনে গাড়ি দাঁড়াতেই ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন অতনু দত্ত।

অতনু কিছু বললেন না, কিশোরও কোনও প্রশ্ন করলেন না ; শুধু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে কী যেন বোঝার চেষ্টা করে পাশ কাটিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেলেন দ্রুত।

শোবার ঘরে হালকা একটা নীল আলো জ্বলছিল। খাটে শুয়ে আছে তুলি। চেয়ারে ইউনিফর্ম-পরা নার্স। নার্স গৃহকর্তাকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছিল। চাপা গলায় কিশোর জিজ্ঞেস করলেন, 'কেমন আছে এখন?'

প্রশ্নের উত্তরে নার্স রোগীকে ভাল করে দেখার সুযোগ দিয়ে সরে দাঁড়িয়েছিল কিছুটা। কিশোর এগিয়ে গেলেন খাটের দিকে। তুলি অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। 'ডাক্তার যা বলেছে সেই ভাবে সব চলছে তো?'

একদিকে মাথা কাত করল নার্স।

উদ্বিগ্ন মানুষের গলায় কিশোর বললেন, 'ওই ওষুধটা পেয়ে গিয়েছি, এই যে। ইঞ্জেকশনটা এক্ষুনি দিতে হবে।'

নার্স কিশোরের হাতের ছোট্ট কিট্‌ব্যাগটা নিয়ে নিল। কিশোর আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু তার আগেই ঘরের পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন তুলির মা। শাশুড়িকে দেখে চমকে উঠে কিশোর জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি কখন এলেন?'

কেঁদে কেঁদে গলা ভেঙে গেছে বিধবা মহিলার। কোনওমতে বললেন, 'খবর পেয়েই ছুটে এসেছি কাশী থেকে।'

আর একবার চমকালেন কিশোর। 'কোন্‌ খবর?'

'কোন্ খবর আবার! মেয়ের খবর! ইশ্! কী চেহারা হয়ে গেছে ওর।' বলেই চোখে আঁচল চাপা দিলেন অসুস্থ মেয়ের মা।

কিশোর একটু আশ্বস্ত হলেন। যাক, ওই মারাত্মক খবরটা উনি তাহলে এখনও পাননি! ইতস্তত করে বললেন, 'আপনি চিন্তা করবেন না, আপনার মেয়ে শিগ্‌গিরই ভাল হয়ে উঠবে। চিকিৎসা চলছে।'

'ছাই চিকিৎসা। আসার পর থেকে কত ডেকেছি, একবারও চোখ খুলে তাকায়নি পর্যন্ত। আমি ভাল ডাক্তার ডাকতে পাঠিয়েছি।'

অবাক হয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ ডাক্তার?'

ঝাঁজিয়ে উঠে শাশুড়ি জবাব দিলেন, 'এলেই দেখতে পাবে।'

কাঁচুমাচু হয়ে কী যেন বলতে গিয়ে কিছুই বলতে পারলেন না কিশোর। তারপর থেমে থেমে বললেন, 'এই সময় তুলিকে ছেড়ে আমার যাওয়া উচিত হয়নি। যেতে আমি চাইছিলামও না, কিন্তু পাকেচক্রে—।'

কথাটার কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না ভদ্রমহিলার মধ্যে। অপ্রস্তুত হয়ে আরও কয়েক মুহূর্ত ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার পরে বসার ঘরে ফিরে এলেন কিশোর।

পুরনো আমলের বিশাল বসার ঘর। একধারে পর্দার পার্টিশন, ওপাশে ডাইনিং-স্পেস। পর্দার কাছে মস্ত বড় সোফার একধারে বসেছিলেন অতনু দত্ত। ওখানে গিয়ে অপরাধীর মতো মুখ করে কিশোর বললেন, 'ডাক্তাররা এখানে চিকিৎসা করবে কী করে! দরকারি একটা ওষুধ সারা শহর ঘুরে পেলাম না, শেষকালে মালদায় গিয়ে—।'

কথাটা যেন কানেই নিলেন না অতনু দত্ত। থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'টেলিফোনে সব কথা আপনাকে আমি খুলে বলতে পারিনি, আসলে ব্যাপারটা এতই শকিং যে—। চোখের সামনে অলোকবাবুর চেহারাটা ভাসছে এখনও। সুস্থ, সবল, কর্মঠ মানুষ। অত যে বয়েস হয়েছিল বোঝার কোনও উপায় ছিল না।'

দুহাতে মাথা চেপে চুপ করে বসে ছিলেন কিশোর। সরল ভাসা-ভাসা চোখে রাজ্যের উদ্বেগ। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরে ওঁর আর জ্ঞান ফেরেনি?'

'না। মারা গেছেন সন্ধে সাতটা পঁয়তাল্লিশে।'

'আপনাকে কে খবর দিল?'

'থানা থেকে! এ বাড়িতে এসেছিল আগে। ড্রাইভার জানিয়েছে আপনার কনট্যাক্ট নম্বর আমার কাছে। তারপর আমার কাছে—। পোস্ট-মর্টেম হবে। অ্যাকসিডেন্ট কেস। সব দেখাশোনা করছেন ওঁর অ্যাডভোকেট বন্ধু কিরণ সেন। উনি আপনাকে বাড়িতেই থাকতে বলেছেন। সকালে আসবেন।'

একটু যেন শিউরে উঠলেন কিশোর। 'এটা মন্দের ভাল—তুলি জানতে পারেনি এখনও।'

তুলির একটা নাম নিশা। মামা নিশা বলতে অজ্ঞান, নিশাও তাই। নিজের মেয়ের মতো ভালবাসতেন।

মুখার্জিবাবু বারান্দায় পায়চারি করছিলেন, একটু বাদে উনিও এসে বসলেন ওখানে। কারও মুখে কোনও কথা নেই।

কিছুক্ষণ পরে বাড়ির কাজের লোকের সঙ্গে ডাক্তার এলেন। মাঝবয়সী গম্ভীর মুখের ডাক্তার। ডাক্তারকে দেখে তিনজনেই উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। ডাক্তার ঘরে ঢুকে রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন, 'এক্ষুনি একে নার্সিংহোমে ভর্তি করা দরকার। আমি অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়ে দিচ্ছি, আপনারা নিয়ে আসুন।'

অতনু দত্ত নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন্ নার্সিংহোমে?'

'আমার নার্সিংহোমে, কাছেই। পেশেন্টের সঙ্গে ওর মাকেও পাঠাবেন।'

ডাক্তার আর একটাও কথা না বলে বেরিয়ে গিয়ে নিজের গাড়িতে উঠে পড়েছিলেন।

অতনু তুলির মা'র দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মাসিমা, আপনি তাহলে চটপট তৈরি হয়ে নিন।'

কেঁদে কেঁদে চোখমুখ ফুলিয়ে ফেলেছেন ভদ্রমহিলা। কাঁদতে কাঁদতেই বললেন, 'আমার আবার তৈার হওয়ার কী আছে!'

ডাক্তার চলে যাওয়ার একটু পরেই অ্যাম্বুলেন্স এসে গেল। নার্সিংহোমের দু'জন স্টাফ স্ট্রেচারে করে রোগীকে তুলল। সঙ্গে কিশোররা। কাছেই নতুন একটা নার্সিংহোম হয়েছে—নাম—ডক্টর সান্যাল্'স ক্লিনিক।

সব ব্যবস্থা করাই ছিল। একটা কেবিনে রোগী আর তার মাকে ঢুকিয়ে ডক্টর সান্যাল অন্যদের বললেন, 'আপনারা এখন যান, সকাল আটটায় আসবেন।'

বাড়িতে ফিরে আসার পরে অতনু কিশোরকে বললেন, 'এখন তো আর কিছু করার নেই। আপনার প্রচণ্ড ধকল গেছে, একটু বিশ্রাম নিয়ে নিন। আমরা আটটার মধ্যে চলে আসছি এখানে।'

প্রচণ্ড মুষড়ে পড়েছিলেন কিশোর। কথাটা শুনে হঠাৎই ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'আপনাদেরও তো স্ট্রেন কম হল না। বিশ্রাম নিয়ে একটু দেরিতেই বরং আসুন। ড্রাইভার আপনাদের পৌঁছে দেবে।'

সকাল সাড়ে-চারটে, কিন্তু আকাশের দিকে তাকালে মনে হবে গভীর রাত। অতনু আর মুখার্জিবাবু রওনা দিলেন ওঁদের বাড়ির পথে।

ঘুম জিনিসটা ভারী অদ্ভুত। রাত্তিরে একেবারে না-ঘুমনো আর মাত্র ঘন্টাদুয়েক ঘুমনোর মধ্যে তফাত অনেকখানি। তিনজনে ঘন্টা দু-আড়াই ঘুমিয়ে বেশ কিছুটা চাঙ্গা হয়ে গিয়েছিলেন।

আটটা দশ নাগাদ মুখার্জিবাবু আর অতনু দত্ত প্রায় একই সঙ্গে কিশোরদের বাড়িতে এসে শুনলেন—তুলি এখন অনেকটা ভাল। তবে ডক্টর সান্যাল কেবিনে 'নো ভিজিটর্স' ঝুলিয়ে

দিয়েছেন। তুলির স্যালাইন চলছে। কেবিনে রোগীর মা আর নার্স।

ডাক্তারবাবু কম কথার কড়া মানুষ। কিশোরকে বলেছেন, 'রোগীর অবস্থা আগের চেয়ে ভাল। তবে এখন আমি কোনও ভিজিটর অ্যালাউ করব না, আপনারা ফোন করে খবর নিতে পারেন।'

কিশোরের চোখমুখের চেহারা এখন অনেকটা স্বাভাবিক। আগের সেই উদ্বেগের ছাপ আর নেই। একটু বাদেই পায়ে ক্রেপ ব্যাণ্ডেজ জড়িয়ে কৌশিক এসে হাজির হল ওখানে। তারপর একাধিক প্রশ্নের উত্তরে খুব সংক্ষেপে জানিয়ে দিল, ওর পায়ের অবস্থা আগের চেয়ে ঢের ভাল। তার পরেই দ্রুত প্রসঙ্গ পালটে চলে এল কিশোরের স্ত্রী আর অলোকবাবুর কথায়।

কথার মাঝখানেই কাজের লোক এসে চা দিয়ে গিয়েছিল। প্রায় নিঃশব্দে চা খেল চারজন। তারপর কেশে গলা পরিষ্কার করে কৌশিক বলল, 'অলোকবাবুর মৃত্যুর ঘটনাকে পুলিশ নিছক দুর্ঘটনা বলতে চাইছে না।'

'সে কি! কেন?' প্রায় এক সঙ্গে চমকে উঠলেন তিনজন শ্রোতা।

'কারণটা আমি শুনিনি। আজ সকালে সি আই ডি-র অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর রজত গুপ্তকে অন্য একটা দরকারে ফোন করেছিলাম। উনি কথায়-কথায় এই কথাটা বললেন। আপনার কাছ থেকে কিছু খোঁজখবর নেওয়ার জন্যে এখানে আসবেন একটু বাদেই।'

'এখানে! কেন?'

'সেটা ঠিক জানি না। মনে হয় মিলন মাইতির খুনের ব্যাপারে তদন্ত কিছুটা এগিয়েছে। সেই ব্যাপারে কোনও খবরাখবর নেওয়ার জন্যই—।'

অবাক হয়ে কিশোর বললেন, 'কিন্তু মিলন মাইতিকে আমি তো ধরতে গেলে চিনিই না।'

সায় দিয়ে কৌশিক বলল, 'ঠিক বলেছেন। কথাটা শোনার পরে আমারও তাই মনে হয়েছিল। পরে মনে হল, অলোকবাবুর কাছে ওঁদের কিছু জিজ্ঞাসা ছিল, কিন্তু উনি আর নেই বলেই আপনার সাহায্য নিতে চাইছেন।'

খুবই বিশ্বাসযোগ্য অনুমান। অতনু দত্ত ঘাড় নেড়ে বললেন, 'ঠিক। এ ছাড়া আর কী-ই বা হতে পারে।'

এ বাড়িতে দুজন কাজের লোক। একজনের ভূমিকা প্রায় কেয়ার-টেকারের। নাম অনন্ত। অনন্ত এসে বলল, 'দুটো ফোন এসেছিল। একটা মালদা থেকে। দিব্যবাবু দল নিয়ে বাংলাদেশে চলে গেছেন। পরের ফোন অ্যাডভোকেট কিরণ সেনের। উনি আর কিছুক্ষণের মধ্যেই এ বাড়িতে আসছেন।'

কিন্তু যাঁর আসার কথা ছিল না, সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায় হঠাৎই প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে দুদ্দাড় শব্দ তুলে ঘরে ঢুকে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই

যে ইয়াংম্যান, আমার কাজ শেষ। খুনি-কাম-স্মাগলার ধরা পড়েছে। সাক্ষী মজুত। প্রমাণের কিছুটা এখনও হাতে আসেনি, তবে পেয়ে যাব ঠিক। ক্রিমিনাল আর তার স্যাঙাতকে আজকেই কোর্টে প্রোডিউস করব।'

অবাক হবে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'কিন্তু আমি যে এখানে আছি সেটা আপনি টের পেলেন কী করে?'

'হুঁ-হুব্ বাবা।'

'কী হুঁ-হুব্ বাবা?'

'রজত গুপ্ত সাহেব জানিয়েছেন। আমার এক সাক্ষী পালাতে গিয়ে ওঁর জালে ধরা পড়েছে। সেইসব কথা বলার সময় শুনলাম তুমি এখন এখানে।'

'কোন সাক্ষী পালাতে গিয়ে ধরা পড়েছে?'

'অপেক্ষা করো, উনি তো আসছেনই। এলেই সব বলা যাবে।' কথাটা বলেই একজন অত্যন্ত সফল এবং সুখী মানুষের ভঙ্গিতে বড় একটা সোফার ওপর আয়েশ করে বসে পড়লেন ইন্সপেক্টর ঘোষরায়।

একত্রিশ

কিশোর চৌধুরীর বিশাল বসার ঘরে এখন প্রভাবশালী অতিথির সংখ্যা তিন। সি আই ডি-র অ্যাডিশনাল ডিরেক্টর রজত গুপ্ত, উত্তর চব্বিশ পরগনার এস পি শুভব্রত শিকদার এবং ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়। একটু আগে মালদার এস পি মুখার্জিসাহেবের অফিস থেকে ফোন এসেছে—একটা তদন্তের কাজে সাহেব কলকাতার পথে রওনা হয়ে গেছেন শেষ রাতে, উনি সকালের দিকে এখানে আসবেন একবার।

এক ধাক্কায় বাড়িতে এতজন ক্ষমতাশালী মানুষ এলে বেশির ভাগ গৃহস্বামীই খুশি হয়ে থাকেন। কিশোরও খুশি হয়েছিল, কিন্তু খুশির প্রকাশ খুব একটা দেখাতে পারছিল না। তার কারণ, আকস্মিক দুর্ঘটনায় আলোক মৈত্রের মৃত্যু। তবে কথার ফাঁকে ফাঁকে এ ঘরের সবাই ওঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন—দুর্ঘটনাকে মেনে নেওয়া ছাড়া আমাদের আর কী-ই বা করার থাকতে পারে। এখন উত্তরপুরুষের প্রধান কর্তব্য হল—পরলোকগত ওই মানুষটির অসম্পূর্ণ কাজগুলো ভাল ভাবে সম্পন্ন করা। বড় এবং চালু ব্যবসা শুধু টিঁকিয়ে রাখাই নয়, তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোও তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

এ বাড়িতে গভীর এই শোকের মধ্যেই ছোট একটি আনন্দের খবর আছে। সেটি হল—কিশোরের স্ত্রীর অবস্থা এখন ভালোর দিকে। সুতরাং কথাবার্তা বেশ স্বাভাবিক চালেই এগোচ্ছিল। অনন্ত কারও আপ্যায়নের বিন্দুমাত্র ত্রুটি রাখেনি। বড় ধরনের ব্রেকফাস্ট খাওয়ানোর পরে চা দেওয়া হয়েছে সবাইকে। সকাল থেকেই মেঘলা হয়ে ছিল, হঠাৎই বৃষ্টি শুরু হল ঝিরঝির করে।

সফল তদন্তকারী ইন্সপেক্টর ঘোষরায়কে বেশ খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল। উনি আগের কথার জের টেনে বললেন, 'গুপ্তসাহেবকে ধন্যবাদ। উনি ওই জালটা না পেতে রাখলে ড্রাইভার গৌরাঙ্গ কর্মকার গা ঢাকা দিত আবার। ব্যাটাকে কত করে বুঝিয়েছিলাম—তোমার কোনও ভয় নেই। তুমি কী ভাবে মিলন মাইতিকে খুন হতে দেখেছ, সেটা শুধু আদালতকে বলবে। ব্যস, তোমার ছুটি। আসলে লোকটা অসম্ভব ভয় পেয়ে গিয়েছিল। যাক, গুপ্তসাহেবের দয়ায় বাড়তি খাটনির হাত থেকে বেঁচে গিয়েছি। খুনি হাজির, দুই সাক্ষী হাজির। কোটি কোটি টাকার চোরাই ছবিও হাতে এসে গিয়েছে। এখন আমার একমাত্র কাজ, সুনন্দ তরফদারের ডেডবডিটা মাটি খুঁড়ে উদ্ধার করা—।'

কৌশিক অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার এই শেষ ব্যাপারটা আমি কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছি না। কোনও অসুবিধে না থাকলে একটু ভেঙে বলবেন?'

ইন্সপেক্টরের গোঁফের ফাঁকে সবজান্তার হাসি ফুটে উঠেছিল। 'না-না, অসুবিধের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। আমার তদন্তের কাজ শেষ। এখন সবকিছু ভেঙে বলব না তো কখন বলব!'

'বেশ তাহলে বলুন!'

কোমরের নেমে-যাওয়া বেল্ট ওপর দিকে একটু টেনে তুলে ইন্সপেক্টর বললেন, 'ভাই, আমি একটু পুরনো স্কুলের মানুষ। আমাদের শাস্ত্রে লাঠ্যৌষধি বলে একটা কথা আছে। খাঁটি কথা। কথাটা আমি খুব মানি। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লাঠির চেয়ে ভাল ওষুধ আর হয় না। ওই ওষুধটা কাজে লাগাও, দেখবে সন্দেহভাজন লোকের মুখ থেকে সত্যি কথা হুড়হুড় করে বেরিয়ে আসছে।'

আঁতকে উঠে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'আপনি কি ডক্টর মৈত্রকে মারধোর করেছেন?'

'না-না, ওকে না। ওর স্যাঙাত সৈকতকে দু'ঘা দিতে না দিতেই সব বলে ফেলেছে। ছোকরা সবে তো আণ্ডারওয়ার্ল্ডের খাতায় নাম লিখিয়েছে, ওর চামড়া এখনও মোটা হয়নি। কথা বার করতে দু'মিনিটও সময় লাগেনি আমার।'

অসহিষ্ণু মানুষের ভঙ্গিতে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'কী বলেছে ও?'

'যা জানতে চেয়েছিলাম—তাই। ডক্টর মৈত্রের তিন নম্বর ডেরা ছিল নিউ আলিপুরের একটা ভাড়া বাড়ি। সেই বাড়িতে একদিন সুনন্দ গিয়ে হাজির। গিয়েই হম্বিতম্বি—আমার ভাইকে আপনি নষ্ট করছেন লোভ দেখিয়ে। ওকে ছেড়ে দিন শিগ্গির। ও বাঙ্গালোরে ফিরে গিয়ে যেমন চাকরিবাকরি করছিল—করুক। আপনার অনেক ব্যাপার আমি জানি। সেটা ফাঁস করে দিলে আপনি গাড্ডায় পড়ে যাবেন। সৈকত ছিল পাশের ঘরে, এই পর্যন্ত শোনার পরেই ওখান থেকে সরে পড়েছিল। ব্যস, ওই ঘটনার পরেই সুনন্দ হাওয়া। ওর আর কোনও খোঁজখবর পাওয়া যায়নি। একেবারে উধাও। সৈকতের মুখে এটা শোনার পরেই আমি সেই বাড়িতে যাই। বাড়ির মালিক বাইরে থাকে। গেস্টহাউস হিসেবে বাড়িটা দেখাশোনা করে

একজন কেয়ারটেকার। তাকে একটু কড়কাতেই সে বলল—হ্যাঁ, এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ডক্টর মৈত্রের একদিন খুব বচসা হয়েছিল। আমি হিসেব করে দেখলাম, টনব্যাক্সিতে সুনন্দ বেনামে গাড়ি ভাড়া খাটায়, গাড়ি চালায় ওই ড্রাইভার— এই খবরটা তখন আমি সদ্য-সদ্য পেয়েছি। নিউ আলিপুরের সেই বাড়িতে বেশ বড় একটা কম্পাউণ্ড আছে। সেই কম্পাউণ্ডের পুরোটাই তখন খোঁড়া হয়েছে। কী ব্যাপার? না, ডক্টর মৈত্র বাগান করবে বলে খুঁড়িয়েছে। বাগান করবে বলে যে কম্পাউন্ড খোঁড়ায় সে দু'তিনদিনের মধ্যে দেশ ছেড়ে পালাবার তাল করে কেন? বহুদিন পুলিশ লাইনে থেকে বহু রকমের অপরাধ দেখেছি আমি। ওই ব্যাপারটা তখন জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল আমার কাছে। ডক্টর মৈত্র নির্ঘাত সুনন্দকে খুন করে ওই বাড়ির কম্পাউণ্ডে পুঁতে ফেলেছে। কিন্তু এক জায়গায় একটুখানি মাটি খোঁড়া দেখলে লোকের সন্দেহ হতে পারে। সুতরাং মালি ডেকে পুরো মাঠের মাটি উলটে দাও। লোকে বুঝবে বাগান বানানো হবে। কী বুঝলে?'

শিউরে উঠে কিশোর চৌধুরী বললেন, 'কী সাঙ্ঘাতিক! কিন্তু ভদ্রলোককে দেখে তো কিছুই বোঝা যায় না। কী অমায়িক ব্যবহার!'

আর একবার সবজান্তার হাসি হাসলেন ইন্সপেক্টর। আপনি গানবাজনা, থিয়েটার-করা মানুষ। ভদ্রলোক সেজে-থাকা অপরাধীদের কাণ্ডকারখানা আপনার পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়। কৌশিক তো অপরাধ জগতের কিছু খবরাখবর রাখে—ও কীরকম ঘাবড়ে গেছে দেখুন না! আমি ওই বাড়িতে পুলিশ পোস্টিং করে এসেছি। ডগ-স্কোয়াডে খবরও পাঠিয়েছি। স্নিফার ডগ এলে দেখবেন এক মিনিটের মধ্যে ডেডবডি পুঁতে রাখার জায়গাটা বার করে দিয়েছে।'

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে কৌশিক বলল, 'ডক্টর মৈত্রের বিরুদ্ধে আপনি তাহলে দু'দুটো খুনের অভিযোগ আনছেন?'

'ই-য়ে-স।'

'কিন্তু খুনের অভিযোগ আপনি প্রমাণ করতে পারবেন?'

হা-হা করে হেসে উঠে ইন্সপেক্টর বললেন, 'সাতকাণ্ড রামায়ণ পড়ার পরে জিজ্ঞেস করছ—সীতা কার বাপ?'

'আচ্ছা, মিলন মাইতির খুনের ব্যাপারে আপনার সাক্ষী কে?'

'কে আবার, ওই গাড়ির ড্রাইভার গৌরাঙ্গ কর্মকার। আই-উইটনেস। নিজের চোখে খুন করতে দেখেছে। খুনির বর্ণনা দিয়েছিল, সেই শুনে আর্টিস্ট ডক্টর মৈত্রের ছবি এঁকেছে। পরে ড্রাইভারকে লক-আপে এনে আমি ডক্টর মৈত্রকে দেখিয়েছি। ও সঙ্গে সঙ্গে শনাক্ত করেছে—হ্যাঁ, এই সেই লোক।'

'কিন্তু—।'

'কিন্তু কী?'

'ড্রাইভার বলেছে খুনের দিন ডক্টর মৈত্র সন্ধেবেলায় লেকটাউনের কাছে মিলন মাইতির গাড়িতে উঠেছিল।'

'হ্যাঁ।'

'ড্রাইভার সেই প্রথম ডক্টর মৈত্রকে দেখল। একবার মাত্র দেখেই তার চেহারার হুবহু বর্ণনা, এমনকি তার হাইট পর্যন্ত বলে দেওয়া কি সম্ভব?'

'তুমি ভুল করছ। সন্ধে মানেই অন্ধকার নয়, রাস্তার আলো ছিল। তা ছাড়া কিছু-কিছু লোক খুব ভাল অবজারভ্যান্ট। একবার মাত্র দেখেই একটা লোকের নিখুঁত বর্ণনা দিতে পারে।'

'বেশ। মেনে নিলাম এই ড্রাইভার গৌরাঙ্গ কর্মকারের সাঙ্ঘাতিক দেখার চোখ। ড্রাইভার বলেছে মিলন মাইতির মাথার ওপর, মানে ব্রহ্মতালুতে পিস্তল ঠেকিয়ে গুলি ছোড়া হয়েছে। তাই তো?'

'হ্যাঁ, পোস্ট-মর্টেম রিপোর্টও সেই কথাই বলছে।'

'বেশ, আপনি কি খুনের জায়গাটা দেখেছেন?'

'কী আশ্চর্য, দেখব না? স্পট ভিজিট করেছি সাত-সাতবার। জায়গাটার বেশ কয়েকটা ছবিও তোলা হয়েছে।'

'যেখানে খুন হয়েছে সেখানে কি উঁচু-নিচু কোনও জায়গা আছে?'

'না, একেবারে সমতল জমি।'

'আচ্ছা, ডক্টর মৈত্রের উচ্চতা কত?'

'পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। সব লেখা আছে আমার।'

'মিলন মাইতির উচ্চতা কত?'

'পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি।'

'বেশ, এবার বলুন—দাঁড়ানো অবস্থায় পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লোকের পক্ষে কি পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি লোকের ব্রহ্মতালুতে গুলি চালানো স্বাভাবিক ব্যাপার?'

প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের আত্মবিশ্বাসে সামান্য ফাটল ধরল। কিন্তু উনি সামলে নিয়ে বললেন, 'কেন নয়, হাত উঁচু করে এইভাবে গুলি চালাবে।' বলার সঙ্গে সঙ্গে গুলি ছোড়ার ভঙ্গিটাও দেখালেন ইন্সপেক্টর।

'কিন্তু খুনি কেন অত কষ্ট করে গুলি ছুড়তে যাবে? খুন করাই যখন উদ্দেশ্য—মাথার পেছনে, কপালে কিংবা বুকে গুলি চালাতে পারত।'

রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছে, কেশে গলা পরিষ্কার করে ইন্সপেক্টর বললেন, 'অনেক খুনির খুন করার বিশেষ একটা ভঙ্গি থাকে। এটা হয়তো সেইরকম কিছু।'

মৃদু হেসে কৌশিক বলল, 'বেশ, আপনার এ কথাটাও আমি মেনে নিলাম। এবার বলুন—যে জায়গাটায় খুন হয়েছে সেখানে কি কোনও লোকালয় আছে?'

'না, আশেপাশে কিচ্ছু নেই। শুধু একটা পোড়ো শিবমন্দির আছে। পেছনে মাঠ, সামনে জলা। খুন করার পক্ষে আদর্শ জায়গা।'

'ড্রাইভার কত দূরে দাঁড়িয়ে খুন করতে দেখেছে?'

'ঠিক ত্রিশ গজ, একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখেছে।'

'আশেপাশে কোনও আলোটালো ছিল?'

'না-না, তাহলে ওখানে দাঁড়িয়ে খুন করার সাহস পেত না।'

'কটায় খুন করেছে?'

'সাতটা নাগাদ।'

'শীতের বেলা। তার মানে তখন তো বেশ অন্ধকার।'

'ঠিকই। কিন্তু আকাশে আলো ছিল। চাঁদের আলোয় পষ্ট খুন করতে দেখেছে।'

'এটা সম্ভব নয়।'

'কী আশ্চর্য! কেন সম্ভব নয়? মাত্র ত্রিশ গজ দূর থেকে চাঁদের আলোয় ওই ঘটনাটা দেখা সম্ভব নয়?'

'না, সম্ভব নয়। সেদিন ছিল অমাবস্যা। আপনি ক্যালেন্ডারটা দেখে নেবেন। এই, এখানে বাংলা ক্যালেন্ডার আছে?'

অনন্ত ছুটে গিয়ে একটা ক্যালেন্ডার নিয়ে এল। ইন্সপেক্টর ক্যালেন্ডারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লেন, তারপর মুখ চুন করে বললেন, 'হ্যাঁ, সেদিন তো অমাবস্যাই ছিল।'

ঘরের মধ্যে এতগুলো মানুষ, কারও মুখে একটা কথাও নেই। বাইরেটা আগের মতোই মেঘলা, বৃষ্টি বেশ জাঁকিয়ে নেমেছে।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে কৌশিক বলল, 'স্নিফার ডগ নিউ আলিপুরের ওই বাড়িতে পাঠাবেন না। কুকুর বেকার কাদামাটি শুঁকবে। ওই মাঠের কোথাও সুনন্দ তরফদারের ডেডবডি নেই। আসলে ডেড হলে তো বডি খোঁজার প্রশ্ন ওঠে।'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের ঝলমলে মুখের ওপর কে যেন তিন বোতল কালি ঢেলে দিয়েছে। হতাশ মানুষের গলায় বললেন, 'সুনন্দই যে অপরাধী, গোড়ায় আমার এইরকম একটা সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটা এমনভাবে ঘুরে গেল যে—। তবে একেবারে ব্যর্থ হইনি, ডক্টর মৈত্রের হেফাজত থেকে কোটি কোটি টাকার চোরাই পেন্টিং উদ্ধার করেছি। নাকি তুমি এর ভেতরেও আবার কোনও খুঁত বার করবে?'

কৌশিক যত দুর্ধর্ষ গোয়েন্দাই হোক না কেন, ওর ভেতর থেকে মাঝেমধ্যে একটা লাজুক ছেলে উঁকি মারে। বিব্রত মুখে বলল, 'আপনারা সব সময় কত ভাবে আমাকে সাহায্য করেন, আপনাদের কাজের খুঁত বার করা কি আমার কাজ! তবে কি না—।'

'তবে কি না—কী?'

'দুশো বছর আগের কলকাতার সাহেব পেন্টারদের আঁকা যে ছবিগুলো আপনি ধরেছেন,

সেগুলো ওরিজিনাল পেন্টিং নয়, মামুলি কপি। কলকাতার তিনশো বছর পূর্তি উপলক্ষে কয়েকজন ইয়াং আর্টিস্ট ওইসব ছবির কয়েক সেট কপি করেছিল। ডক্টর মৈত্র নামমাত্র টাকায় তারই একটা সেট কিনেছেন। হালের একজন আর্টিস্টের তিনটে ওরিজিনাল পেন্টিং আছে ওই লটের মধ্যে। ওগুলো ডক্টর মৈত্রের কেনা। আর্টিস্টের ছেলেকে অ্যাকাউন্ট-পেয়ি চেকে পেমেন্ট করেছেন।'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায় হঠাৎই চটে উঠে বললেন, 'বেশ—তাহলে ওই ফ্যাক্স মেসেজের—এমা তোমার জন্যে হিথ্রোতে অপেক্ষা করবে—এটা তুমি কী ভাবে ব্যাখ্যা করবে। এমা বলতে কি এমা'জ অকশান হাউসের এজেন্টকে বোঝানো হচ্ছে না?'

ইন্সপেক্টরের চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ে কৌশিকের চোখমুখের সেই বিব্রত ভাবটা ফিরে এল আর একবার। একটু থেমে-থেমে ও বলল, 'লন্ডনে এমা'জ অকশান হাউস বলে কিছু আছে কি না আমার জানা নেই। তবে ক্রিস্টি'জ অকশান হাউসের কথা জানি, ওখানে হালে ভারতীয় ছবির বেশ কিছু বিক্রিবাটা হয়েছে।'

যেন বাগে পেয়েছেন ঠিক এমন ভঙ্গিতে ইন্সপেক্টর বললেন, 'মেসেজের ওই এমা শব্দটা তুমি তাহলে কী ভাবে ব্যাখ্যা করবে? এমা কী বা কে?'

পকেট থেকে বেশ বড় একটা ফ্যাক্স-মেসেজ বার করে কৌশিক বলল, 'উত্তরটা এর মধ্যে আছে। আজ সকালেই পেয়েছি। আমার এক বন্ধুর কাকা অমল সিন্‌হা দীর্ঘদিন ধরে লন্ডনে আছেন। বেশ প্রভাবশালী মানুষ, ওখানকার অনেকের সঙ্গেই ওঁর খুব জানাশোনা। আপনার মেসেজের ওই এমা নিয়ে আমার মনে একটা খটকা তৈরি হয়েছিল। আমার একটা ব্যাখ্যা দিয়ে খবরাখবর নেওয়ার জন্যে ওঁর কাছে একটা ফ্যাক্স পাঠিয়েছিলাম। তা, উনি আজ সকালেই জানিয়েছেন—আমার অনুমানটা সত্যি।'

'কী সেই অনুমান?'

'অলোকবাবুর অনুরোধে কিছুদিন আগে ডক্টর মৈত্রের ব্যাকগ্রাউণ্ড জানার জন্যে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলাম অমল সিন্‌হার কাছে। তা, তার উত্তরে উনি ওঁর সম্পর্কে অনেক কথা জানিয়েছিলেন। একটা তথ্য হল—এমিলি নামের এক ইংরেজ মহিলার সঙ্গে ডক্টর মৈত্রের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু বিয়েটা বেশি দিন টেকেনি। ডিভোর্স হয়ে গিয়েছিল বছর-দশ আগে। এমিলির ডাক নাম এমা। এমা যাওয়ার আগে বলে গিয়েছিল ডক্টর মৈত্রের স্বভাবের বদল হলে সে আবার কখনও ফিরতে পারে। অমল সিন্‌হার আগের মেসেজে জেনেছিলাম। তা, সিন্‌হার এই মেসেজটা পেয়ে জানলাম আমার অনুমান ঠিক। এমিলির দ্বিতীয় বিয়ে বিশাল ধনী এক শিপ-ওনারের সঙ্গে। ভদ্রলোকের বয়েস ছিল এমিলির দ্বিগুণ। কিছুদিন আগে বৃদ্ধ স্বামীটি মারা গিয়েছেন। এখন ধনী বিধবা এমা তার প্রাক্তন স্বামীর কাছে ফিরতে চাইছে। ডক্টর মৈত্রের সঙ্গে ওর যোগাযোগ হয়েছে সবে। ডক্টর মৈত্র ফিরছেন জেনে এমা ফ্যাক্স

পাঠিয়ে জানিয়েছে, হিথ্‌রো এয়ারপোর্টে ওঁকে নিতে আসবে। মেসেজটা ছিল—এমা উইল বি ওয়েটিং ফর ইউ অ্যাট হিথ্‌। তাই না?'

কৌশিকের এই ব্যাখ্যা শুনে ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায় একেবারে ঝিমিয়ে পড়লেন। ওঁর কালো মুখ আরও কালচে মেরে গিয়েছিল।

রজত গুপ্ত কৌশিকের হাত থেকে অমল সিন্‌হার পাঠানো মেসেজটা পড়লেন, তারপর ওটা এগিয়ে দিলেন এস পি শিকদারের দিকে। এস পি পড়ার পরে কিশোর চৌধুরী পড়লেন। পড়তে পড়তে বার-দুই চমকালেন, তারপর ওটা এগিয়ে দিলেন ইন্সপেক্টর ঘোষরায়ের দিকে।

ইন্সপেক্টর বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমার পড়ার দরকার নেই। যার মেসেজ তাকেই দিয়ে দিন আর তাকে জিজ্ঞেস করুন—আসল অপরাধীর কোনও হদিস যদি জানা থাকে এবার সেটা দয়া করে জানাক।'

ইন্সপেক্টরের ঠেস-মারা কথায় কৌশিক আর একবার বিব্রত হল। ওকে বাঁচাবার জন্যেই এবার বোধহয় এগিয়ে এলেন এস পি শিকদার। গমগমে গলায় বললেন, 'মিলন মাইতির খুনি কে এখনও আমি জানতে পারিনি। তবে আমি ড্রাগ ট্রাফিকারদের কয়েকজনকে ধরেছি। তাদের কাছ থেকে প্রায় পাঁচশো গ্রাম হেরোইন উদ্ধার করা হয়েছে। মাল চোরাপথে বাংলাদেশে ঢুকছিল। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এর পেছনে মস্ত বড় একটা চক্র কাজ করছে। ওই হেরোইন একটু-একটু করে অনেকদিন ধরে ওখানে জমা হয়েছে। দলের মধ্যে একটা বাঙালি মেয়েও আছে। মেয়েটা সুন্দরী, শিক্ষিত, নানা ধরনের কাজ জানে। নার্সের ট্রেনিংও নেওয়া আছে। অনেক কষ্ট করে কাল রাত্তিরে তাকে ধরেছি। এখন লালবাজারের লক-আপে আছে। এখনও কিছু ভাঙছে না। খবর পেয়েছি, ওই মেয়েটা নার্স হিসেবে আপনার এখানে কাজ করছিল।'

'আমার এখানে?' একই সঙ্গে বিস্মিত ও আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলেন কিশোর চৌধুরী।

'হ্যাঁ, আপনার এখানে। আপনি কি আপনার স্ত্রীর দেখাশোনা করার জন্যে একজন নার্স রেখেছিলেন?'

ঢোক গিলে শুকনো মুখে কোনওমতে জবাব দিলেন কিশোর, 'হ্যাঁ, কিন্তু—।'

অভয় দিয়ে এস পি সাহেব বললেন, 'আপনার ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনার স্ত্রী অসুস্থ, নার্স রাখা স্বাভাবিক। কিন্তু সেই নার্স কী প্রকৃতির, সেটা আপনার পক্ষে জানা সম্ভব নয়; ইন ফ্যাক্ট, কারও পক্ষেই নয়।'

এবার কেশে গলা পরিষ্কার করে কিশোর চৌধুরী বললেন, 'কিন্তু আপনি যে নার্সের কথা বলছেন—সে কিন্তু এ নয়।'

'কী আশ্চর্য! আপনি এত শ্যিওর হচ্ছেন কী করে?'

'আপনি তো বললেন সেই নার্স এখন লালবাজারের লক-আপে।'

'হ্যাঁ।'

'আর আমি যে নার্সকে রেখেছি সে এখনও এখানেই আছে। আজ ভোরে তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। আমার স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ডক্টর সান্যালের নার্সিং হোমে গেছে এখন। আপনি ইচ্ছে করলে ওর সঙ্গে একবার কথাও বলতে পারেন। অনন্ত, তুমি নার্সিংহোমে ফোন করে মিস সেনকে একটা খবর দিয়ে দাও তো। বলো, একটু ফ্রি হলে উনি যেন একবার এখানে আসেন—দু'মিনিটের জন্যে।'

কাছেই ফোন, অনন্ত ফোন করে খবরটা জানিয়ে দিল নার্সকে।

একটু পরে অ্যাডভোকেট কিরণ সেন এসে ঢুকলেন ওখানে। এসেই বললেন, 'ওহ্! দুর্যোগও শুরু হয়েছে সেইরকম। ডিপ্রেশন। কখন কাটবে কে জানে!'

কিশোর উঠে গিয়ে বলল, 'আপনি বসুন। একটু গরম কফি খান, এই বৃষ্টির মধ্যে এখন না বেরুলেই পারতেন!'

গাড়িতেই এসেছেন ভদ্রলোক, কিন্তু গেট থেকে এইটুকু পথ আসতে গিয়ে একটু ভিজে গিয়েছেন। রুমাল দিয়ে হাত-মুখ-মাথার জল মুছে বললেন, 'না বেরিয়ে কি উপায় আছে!' তারপর সি আই ডি-র বড় সাহেবের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মিস্টার গুপ্ত, পোস্ট-মর্টেম কখন শেষ হবে? অলোকের বডি কটার সময় পাওয়া যেতে পারে?'

'আশা করছি তিনটের মধ্যেই পেয়ে যাব।'

বাল্যবন্ধু উকিলবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'কী মর্মান্তিক মৃত্যু! জলজ্যান্ত মানুষটা চোখের সামনে শেষ হয়ে গেল। ড্রাইভার কি মদ খেয়ে গাড়ি চালাচ্ছিল?'

'না। অ্যারেস্ট করার পরে আমরা হাসপাতালে পাঠিয়েছিলাম। হি ওয়াজ নট ড্রাঙ্ক।'

'তাহলে কি রেকলেস ড্রাইভিং?'

অ্যাডভোকেটের প্রশ্নের উত্তর দিল এবার কৌশিক, 'না, খুবই ঠাণ্ডা মাথায় গাড়ি চালিয়েছিল। ওরা গিয়েছিল অলোক মৈত্রকে খুন করতে।'

'খুন!' কথাটা শুনে ঘরের সবাই চমকে উঠল।

কঠিন চোখে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু মোটিভ কী? কেন খুন করতে যাবে?'

'কারণ, ড্রাইভার আর তার সঙ্গী—দুজনেই দাগী অপরাধী। ড্রাইভারের সঙ্গের লোকটা ভাড়াটে খুনি। অলোকবাবুকে খুন করার জন্যে মোটা টাকা দেওয়া হয়েছে ওদের।'

'কে দিয়েছে?'

'এমন কেউ, অলোক মৈত্র খুন হলে যার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়।'

'কে সে?'

'মনে হয়, শিগ্‌গিরই সেটা আমরা জানতে পারব।'

কৌশিকের উত্তর শুনে বিরক্ত হয়ে কাঁধ ঝাঁকালেন ইন্সপেক্টর—যার অর্থ এসব হেঁয়ালি-

মার্কা কথায় কাজের কাজ কিছু হয় না। তারপরেই উঠে দাঁড়িয়ে ভারী গলায় বললেন, 'ঠিক আছে, আমি একটু আসছি।'

অবাক হয়ে কৌশিক জিজ্ঞেস করল, 'আসছি মানে কি চললেন?'

'না, আসছি মানে ঘুরে আসছি একটু বাদে।'

'কোত্থেকে?'

'থানা থেকে। তুমি যখন কথার প্যাঁচে প্রমাণই করে দিলে—আমি যে দুজনকে লক-আপে পুরে রেখেছি তারা অপরাধী নয়—তাদের তাহলে খালাশ করে দেওয়া এখন আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ে।'

'এর মধ্যেই! ঠিক আছে, আপনি অত্যন্ত বিচক্ষণ পুলিশ অফিসার—যা ভাল বোঝেন তাই করবেন। তবে থানায় যাওয়ার আগে আপনি যদি আর এক জায়গায় যান—।'

বিষণ্ণ একটুকরো হাসি ফুটে উঠেছিল দুঁদে অফিসারের মুখে। 'বেশ, আদেশ করো। তোমার কথায় স্বর্গ-মর্ত্যের নানান জায়গায় তো ছোটাছুটি করেছি—।'

'এবার একবার পাতালে যেতে হবে।'

'পাতালে!'

'চলুন, যেতে যেতে বলছি।' দ্রুত পায়ে দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কথা সেরে একটু পরে ঘরে ফিরে এল কৌশিক।

তারপরেই লঘু পায়ে দরজার সামনে এসে দাঁড়াল একজন। এবং তাকে দেখেই এস পি শিকদারসাহেব চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে বললেন, 'স্ট্রেঞ্জ!'

কিশোর চৌধুরী এস পি-র চমক উপভোগ করে দরজার সামনে দাঁড়ানো নার্সের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অনন্ত ভুল করে আপনাকে এখানে ডেকে এনেছে। তুলি কেমন আছে জানার জন্যে আপনাকে ফোন করতে বলেছিলাম। ও ভাল আছে তো?'

একদিকে মাথা সামান্য কাত করল নার্স।

'বুঝতে পারছি আপনি খুব ব্যস্ত। আমি পরে আবার ফোন করব। আপনি এখন আসুন।'

লঘু এবং ক্ষিপ্র পায়ে নার্স ওখান থেকে চলে যেতেই এস-পি সাহেব বিমূঢ় মানুষের ভঙ্গিতে বললেন, 'আমি লালবাজারের জেলে যে নার্সকে রেখেছি, তাকে তো অবিকল এইরকমই দেখতে!'

বত্রিশ

অ্যাডভোকেট কিরণ সেন চোখ থেকে চশমা খুলে কাচ মুছলেন, তারপর চশমাটা আবার পরে নিয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমার সঙ্গে কয়েকটা দরকারি কথা সেরে নিতে চাই।'

একটু অবাক হয়ে কিশোর জিজ্ঞেস করলেন, 'কী কথা?'

ইতস্তত করে উকিলবাবু বললেন, 'আইন আমাদের পেশা। আইন মানেই কিছু নিয়মকানুন, কিছু ঝঞ্ঝাটঝামেলা, কিছু অপ্রিয় প্রসঙ্গ। কিন্তু এড়াবার তো কোনও উপায় নেই। এগুলো নিয়েই আমাদের বাঁচতে হবে।'

এসব কথা শ্রোতাদের মনোযোগ টানার পক্ষে যথেষ্ট। ছোট্ট ভূমিকাটুকু করার পরে উনি কথা শুরু করলেন আবার। 'এ কথাগুলো যাদের জানানো দরকার তাদের মধ্যে এখানে শুধু তুমিই আছ। তবে ঘরে সম্মানিত কিছু মানুষজন আছেন, এঁদের সামনে এসব কথা হওয়ার একটা বাড়তি সুবিধা আছে। অলোক বিচক্ষণ মানুষ। ও ওর বিষয়আশয়, ব্যবসাপত্তর দানপত্র তৈরি করে কয়েকজনকে দিয়ে গেছে। দানপত্র আমার চেম্বারে আছে। তাড়াহুড়ো থাকায় আনতে পারিনি এখন। তোমাকে ব্যাপারটা জানাবার জন্যে আমি আমার নোটবইটা সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এতে দানপত্রের মূল বিষয় লেখা আছে।'

কথা থামিয়ে উকিলবাবু কোটের ভেতর-পকেটে হাত ঢোকালেন। হাতে বিস্তর কাগজপত্তর উঠে এল, কিন্তু যা খুঁজছেন তা ওই সবের মধ্যে নেই। নোটবই শেষে পাওয়া গেল ফোলিও-ব্যাগের মধ্যে।

নোটবইয়ের সামনের-পেছনের অনেকগুলো পাতা ওলটাবার পরে আসল জায়গাটা পেলেন। তারপর একটু কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, 'অলোকের সম্পত্তির সমান মালিকানা তিনজনের—তার মধ্যে আছে ওর ভাগ্নি নিশা, ছোট বোন অর্থাৎ নিশার মা সুরমা এবং ছোট ভাই জ্যোতি। ওদিকে, ব্যবসার বড় শেয়ার সমান অংশে পাবে এই তিনজন এবং টনব্যাক্সির কর্মচারি-ম্যানেজার সুনন্দ তরফদার। ছোট শেয়ারের লাভের এক অংশ যাবে এক সেবা-প্রতিষ্ঠানে। বাকিটা জমা পড়বে অলোকের সেভিংস-অ্যাকাউন্টে। ওর মৃত্যুর পরে সেটার দাবিদার হবে একটা দাতব্য-চিকিৎসালয়। সবকিছু বিস্তারিতভাবে লেখা আছে দানপত্রে। এখন তোমরা বেশ সংকটের মধ্যে আছ, কিন্তু ব্যবসার লেনদেন যাতে আটকে না যায়—তার জন্যে কাউকে যদি পাওয়ার অব অ্যাটর্নি দিয়ে দাও—। এ ব্যাপারে তোমার কি কোনও সাজেশান আছে?'

অসম্ভব নিস্পৃহ ভঙ্গিতে অ্যাডভোকেট কিরণ সেনের কথাগুলো শুনলেন কিশোর চৌধুরী, কিন্তু কোনও উত্তর দিলেন না।

উত্তর শোনার জন্যে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে কিরণবাবু বললেন, 'আমি বোধহয় ব্যাপারটা ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারিনি।'

'না-না, পেরেছেন। আমি বুঝতে পেরেছি।' শুকনো মুখে নিচু গলায় জবাব দিলেন কিশোর।

কিন্তু উকিলবাবু এবং মাস্টারমশাইরা, বিশেষ করে তাঁদের যদি বয়েস হয়ে গিয়ে থাকে, একই কথা ঘুরিয়েফিরিয়ে বারবার বলতে ভালবাসেন। এখানেও তাই হল। উকিলবাবু বললেন, 'না, এখানে হল গিয়ে—।'

হাত তুলে ওঁকে থামিয়ে দিলেন কিশোর।

'তোমার কি কোনও সাজেশান নেই?'

'না, নেই।'

'কিন্তু—।'

আর একবার ওঁকে থামিয়ে দিয়ে কিশোর বললেন, 'বিষয়আশয়ের ব্যাপার নিয়ে জীবনে কখনো ভাবিনি। সত্যি কথা বলতে কি, ওটা আমার একেবারেই আসে না। এই তো এবার দিল্লি-মাদ্রাজ যাওয়ার আগে নিশার মামা আমার হাতে গিফ্‌ট ডিড তুলে দিয়েছিলেন, বিশ্বাস করুন আমি তার একটা লাইনও পড়ে দেখিনি।'

অবাক হয়ে উকিলবাবু বললেন, 'গিফ্‌ট ডিড! তোমাকে দিয়েছেন! কবে?'

'এই তো সেদিন। দিন-সাতেক হবে। এবার বাইরে যাওয়ার আগে।'

বিমূঢ় মানুষের গলায় উকিলবাবু বললেন, 'লাস্ট গিফ্‌ট ডিড তো আমার কাছে আছে। ও অবশ্য এর আগেও কয়েকটা বানিয়েছিল, কিন্তু পরে শেয়ারের ব্যাপারে মত পালটে যাওয়ার দরুন সেগুলো নষ্ট করে ফেলেছে। আচ্ছা, তোমার দানপত্রটা কি একবার দেখতে পারি?'

প্রশ্নের উত্তরে কিশোর এমন ভাবে তাকালেন, যার একটাই অর্থ—বিষয়আশয়ের ব্যাপারটা কি এই মুহূর্তে বাদ দেওয়া যায় না!

অর্থটা বিচক্ষণ উকিলবাবুর কাছে পরিষ্কার না হওয়ার কোনও কারণ নেই, কিন্তু উনি বোধহয় সেই অর্থের ওপর কোনও গুরুত্ব দিতে চাইলেন না। একটু থেমে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি ধারেকাছে নেই এখন?'

'আছে, বাড়িতেই আছে।' বলার পরে অনন্তকে ডেকে কিশোর বললেন, 'ওপরের দক্ষিণের ঘরে টেবিলের ওপর আমার অ্যাটাচিটা আছে, তার মধ্যে আছে ব্রাউন রঙের একটা প্যাকেট—ওটা নিয়ে এসো তো।'

অনন্ত প্রায় ছুটে গিয়ে ওটা নিয়ে এল। কিশোর হাতে না নিয়ে ইঙ্গিতে জানালেনঃ : প্যাকেটটা ওঁকে দাও।

নাকের ওপর চশমা একটু নেমে এসেছিল, সেটা ঠিক করে ব্রাউন প্যাকেট খুলে দানপত্র টেবিলের ওপর বিছিয়ে ধরলেন উকিলবাবু। তারপর কিছুটা পড়ার পরে অবাক হয়ে বললেন, 'কী আশ্চর্য ! এ ডিড তো আমার কাছে নেই। বয়ান একই, শেয়ারের ব্যাপারে শুধু মস্ত হেরফের!'

ঘরের মধ্যে কারও মুখে কোনও কথা নেই। একটু বাদে রজত গুপ্ত বললেন, 'হেরফের থাকা তো অস্বাভাবিক কিছু নয়। আপনি নিজেই তো বললেন, মনঃস্থির করতে পারেননি বলে অলোকবাবু এর আগে নিজের তৈরি কয়েকটা ডিড নষ্ট করে ফেলেছেন।'

'তা ঠিক, কিন্তু পুরো ব্যাপারটাই আমি গোড়া থেকে জানি। সব জানি, অথচ
কথাটার কোনও প্রতিক্রিয়া দেখা গেল না কিশোরের মধ্যে। ওর চোখমুখের ভঙ্গি
সেই আগের মতোই নিস্পৃহ।

লোকচরিত্র সম্পর্কে পুলিশের বড়কর্তাদের অভিজ্ঞতার পুঁজি আর পাঁচজনের
অনেক বেশি। রজত গুপ্ত কিশোরের দিকে তাকিয়ে অভয় দেওয়ার গলায় বললেন,
স্ত্রী তো এখন আগের চেয়ে অনেক ভাল। দেখবেন চটপট ভাল হয়ে যাবেন। অ
করবেন না।'

কথাটায় সায় দিলেন এস পি সাহেব এবং কৌশিক।

সায় দেওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের গেটের সামনে জোরালো শব্দ তুলে
একটা জিপ। একটু বাদে ঘরে ঢুকলেন মালদার এস পি মুখার্জি। কিশোর উঠে
বললেন, 'আসুন আসুন।'

মাথার টুপি খুলতে খুলতে মুখার্জি বললেন, 'এত তাড়াতাড়ি আবার আপনা
দেখা হয়ে যাবে—ভাবতে পারিনি। ভাল কথা, আপনার স্ত্রী কেমন আছেন এখ

কিশোর মুখ খোলার আগেই উত্তর দিলেন উত্তরচব্বিশ পরগনার এস পি,
চেয়ে অনেক ভাল।'

শিকদারের দিকে তাকিয়ে মুখার্জি বললেন, 'আরে তুই এখানে!'

মুচকি হেসে শিকদার জবাব দিলেন, 'গুপ্তসাহেবও আছেন।'

রজত গুপ্ত হাত তুলে বললেন, 'তুমি তো সোজা মালদা থেকে।'

'আর বলেন কেন!'

শিকদার অ্যাডভোকেট কিরণ সেনের সঙ্গে মুখার্জির আলাপ করিয়ে দিয়ে
'আমার ব্যাচমেট, অনেক দিন পরে দেখা হল।'

কিরণবাবু বললেন, 'আপনাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হওয়া তো সৌভাগ্যের ব
আপনাদের সবাইকে এ-ভাবে একসঙ্গে পেলে যে-মানুষটি সবচেয়ে বেশি খুশি হত
আর আমাদের মধ্যে নেই।'

মালদার এস পি নিচু গলায় বললেন, 'ওখানে ওই সময় ফোন...তখনই মনে
বড় একটা অঘটন ঘটে গেছে—।'

কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপচাপ। এতগুলো মানুষ, কিন্তু কারও মুখে কোনও ক
এইরকম একটা পরিবেশের মধ্যে হঠাৎ এসে পড়লে যে-কেউ ঘাবড়ে যাবে। এইম
যে অতিথি ঘরে ঢুকলেন তিনিও বুঝি গিয়েছিলেন, কিন্তু কৌশিক উঠে গিয়ে ওঁকে
সঙ্গে ভেতরে নিয়ে এসে বসাল। তারপর বলল, 'এঁর নাম বিশ্বজীবন মুখার্জি
পণ্ডিত মানুষ, দিনরাত্তির শুধু পড়াশুনো আর গবেষণা নিয়ে থাকেন।'

অন্য কেউ হলে নিশ্চয়ই এ-কথা শুনে বিব্রত হয়ে আপত্তি তুলতেন, কিন্তু বিশ্ব

কোনরকম প্রতিবাদের মধ্যে না গিয়ে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আমি সেই লিস্টটা পেয়ে গিয়েছি, আপনি কি নেবেন এখন?'

'না-না, এখন দরকার নেই, আপনি ভাল করে বসুন। বাড়ি চিনে আসতে কোনও অসুবিধে হয়নি তো?'

উত্তরে দুদিকে মাথা নাড়ালেন পণ্ডিত মানুষটি।

আবার সবাই চুপচাপ। অস্বাভাবিক নিস্তব্ধতা ভাঙার জন্যেই বুঝি শিকদার মালদার এস পি-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিশোরবাবুদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কেমন লাগল তোর?'

ঝকঝকে মুখে মুখার্জিসাহেব বললেন, 'চমৎকার! এত ভাল অনুষ্ঠান হবে ভাবতে পারিনি। ওখানকার লোকজনেরও ভাল লেগেছে। আমার অবশ্য সবচেয়ে ভাল লেগেছে ডিরেক্টরের অভিনয়। ছোট্ট রোল, কিন্তু ভদ্রলোক এসেই আসর মাত করে দিয়েছেন।'

কিশোর একটু হেসে বলল, 'ডিরেক্টরকে আপনি চিনতে পারছেন না? ওই তো আপনার পাশে বসে আছেন। ওঁর নাম সনাতন মুখার্জি।'

মুখার্জিবাবু দেড় দিনে বুঝি দেড় ঘন্টার বেশি ঘুমোননি, তার ওপর অসম্ভব ধকল গেছে; ঝিমোচ্ছিলেন চেয়ারে হেলান দিয়ে। কিশোরের কথায় নড়েচড়ে উঠে হাত তুলে নমস্কার করলেন মালদার এস পি-কে।

আর এক দফা প্রশংসা করে এস পি বললেন, 'গাছের গুঁড়ি থেকে টাকাপয়সা পড়ার আইডিয়াটা ফ্যান্টাস্টিক!'

উত্তরে বিব্রত মুখে নির্দেশক মুখার্জিবাবু একটু হাসার চেষ্টা করলেন।

এস পি সাহেব বললেন, 'পুরনো দিনের পালা। এটা মনে রেখেই আপনি গাছের গুঁড়ির মধ্যে পুরনো দিনের কয়েন ভরে রেখেছিলেন—এই পরিকল্পনাটাও দারুণ!'

উত্তরে বিব্রত মুখে মুখার্জিবাবু বিড়বিড় করে যা বললেন তার একটি শব্দও পরিষ্কার হল না কারও কাছে।

'কিছু কয়েন স্টেজ থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ে গিয়েছিল। আমি পরে পেয়েছি। আচ্ছা, এগুলো কি সত্যিই পুরনো দিনের মুদ্রা, নাকি আপনারা অর্ডার দিয়ে বানিয়েছেন?' কথাগুলো বলার সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে প্রাচীনকালের কিছু তামার টাকা বার করলেন এস পি।

উত্তরে মুখার্জিবাবু কেমন যেন ধাক্কা-দেওয়া গলায় বলে উঠলেন, 'আমি এসবের কিছুই জানি না।'

বিশ্বজীবনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে ঝুঁকে পড়েছিলেন মুদ্রাগুলোর ওপর, তারপর একটা হাতে তুলে নিয়ে ঘুরিয়েফিরিয়ে দেখে বললেন, 'আরে! এ তো মনে হচ্ছে আসল কয়েন! অন্ততপক্ষে পাঁচশো বছরের পুরনো। পেলেন কোথায়?'

কিশোরও একটা মুদ্রা হাতে নিয়ে বিস্ময় প্রকাশ করল, 'তাই! সত্যিই আমাদের আর্ট

ডিরেক্টরটি এক নম্বরের খ্যাপা লোক। সেট-সেটিং বানাবার দায়িত্ব ওর ওপরেই ছিল। কোনও একদিন হয়তো কথায় কথায় কেউ একটা সাজেশন দিয়েছিল—ব্যস, ওটা ওর মাথায় গেঁথে গেছে। পার্সোনাল কালেকশন ঢুকিয়ে দিয়েছে গাছের গুঁড়ির মধ্যে।'

বিশ্বজীবনবাবুর চোখ এঁটে ছিল হাতে-ধরা মুদ্রার গায়ে। কিশোর থামতেই উনি মালদার এস পি-কে বললেন, 'এরকম আর কিছু নেই আপনার কাছে?'

'আছে—জিপের ড্যাশ্‌বোর্ডে।'

'একবার দেখতে পারি?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ কেন নয়?' এস পি দরজার সামনে দাঁড়ানো একজন গার্ডকে বললেন, 'তুমি এঁকে নিয়ে যাও তো জিপে। একটু হয়তো খুঁজতে হবে।'

বিশ্বজীবনবাবু কথার কোনও উত্তর না দিয়ে গার্ডের সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন।

অ্যাডভোকেট কিরণ সেন কেমন যেন হতভম্বের মতো বসে ছিলেন। একটু বাদে সামনে পড়ে-থাকা দানপত্রটা তুলে নিয়ে পড়তে শুরু করে দিলেন, তারপর নিজের মনে বললেন, 'আশ্চর্য!'

রজত গুপ্ত ওঁর চেয়ারটা সামনের দিকে টেনে এনে জিজ্ঞেস করলেন, 'আশ্চর্য বলছেন কেন?'

'না, ডিডে কোনও গোলমাল নেই। কিন্তু আমি নোট্‌ বইয়ে ভুল টুকলাম! এখানে দেখছি ব্যবসা আর বিষয়সম্পত্তির পনেরো আনা মালিকানা নিশার। এক আনা ওর মায়ের আর অলোকের। ওদের মৃত্যুর পরে ওই এক আনারও উত্তরাধিকারিনী হবে নিশা।'

দুঃখী মানুষের মতো মুখ করে বসে ছিলেন কিশোর, উকিলবাবুর শেষ কথাটা শুনে বিরক্ত হয়ে চাপা গলায় বললেন, 'বিষয়আশয়ের কথা এই মুহূর্তে না তুললেই কি নয়? নিশা তো আপনার মেয়ের মতো, ও সুস্থ হওয়ার পরে আপনি ওর সঙ্গে এই বিষয়ে যত খুশি কথা বলবেন। আমি আগেও এর মধ্যে ছিলাম না, পরেও থাকব না।'

লজ্জিত হয়ে কিরণবাবু বললেন, 'তুমি আমাকে ভুল বুঝো না ভাই। অলোক আর নেই বলেই কথাগুলো বলছি। ফর্মালিটিজ কমপ্লিট না হলে ব্যবসার লেনদেন আটকে যাবে। চেকটেক সই করার ব্যাপার আছে।'

মধ্যস্থতা করার গলায় রজত গুপ্ত বললেন, 'ঠিক আছে, এই দানপত্র অনুসারে আপনি আইনগত ব্যবস্থাগুলো নিন।'

'তা তো নেব, কিন্তু আমার কাছে যে ডিড আছে তাতে ব্যবসার বড় অংশের সমান মালিকানা তো চারজনের। এদের মধ্যে আছে নিশা, নিশার মা সুরমা, অলোকের ছোট ভাই জ্যোতি আর টনব্যাক্সির কর্মচারি-ম্যানেজার সুনন্দ তরফদার।'

এবার একটু জেরা করার ভঙ্গিতে রজত গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কাছে যে দানপত্রটা আছে সেটা নিয়ে এলেই তো ঝামেলা মিটে যায়। দানপত্রে তারিখ দেওয়া আছে।

এমনও তো হতে পারে ওই দানপত্রটা অলোকবাবুর পুরনো বাতিল-করা দানপত্রের একটা। গাড়ি আছে, আপনি আপনার বাড়ি থেকে ওটা নিয়ে আসুন না চট করে।'

উত্তরে মুখ কালো করে উকিলবাবু বললেন, 'আসলে ওটা আমি এখন খুঁজে পাচ্ছি না।'

একচিলতে হাসি ফুটে উঠেছিল রজত গুপ্তের ঠোঁটে। 'তাহলে বাতিল বলেই হয়তো অলোকবাবু ওটা ছিঁড়ে ফেলেছেন। আপনি একটু কষ্ট করে মনে করুন তো দেখি। তাছাড়া, অলোকবাবু দিন-সাতেক আগে নিজে এসে ওঁর শেষ দানপত্র তুলে দিয়ে গিয়েছেন ওঁর ভাগ্নি-জামাইয়ের হাতে। এর মধ্যে কোনও ভুল নেই। প্রমাণ তো আমাদের হাতের মধ্যেই।'

কিরণবাবুর চোখমুখ দেখে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, দেওয়ার মতো কোনও জবাব এই মুহূর্তে খুঁজে পাচ্ছেন না উনি। একটুখানি থমকে থাকার পরে কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন, তার আগেই হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন বিশ্বজীবনবাবু। ওঁর চোখমুখ ঝকঝক করছিল, হাতের কিছু মুদ্রা মালদার এস পি-র দিকে এগিয়ে ধরে বললেন, 'এসব তো আসল মুদ্রা—আর্লি সিক্সটিন্‌থ সেঞ্চুরির। এর মধ্যে কয়েকটা আছে কোচবিহারের নারায়ণী মুদ্রা, বাকি সব গৌড়ের সুলতান হুসেন শাহের আমলের। যে লোক এগুলো ওই যাত্রার গুঁড়ির মধ্যে ঢুকিয়েছিল তাকে এক্ষুনি খুঁজে বার করুন। আমার মনে হয়, তার কাছে এই ধরনের আরও অনেক প্রাচীন মুদ্রা আছে। শুধুমাত্র টাকার অঙ্কে এসবের মূল্য বিচার করা যায় না। এমনও হতে পারে, পুরনো ওইসব মুদ্রার কোনও একটায় অজানা কোনও ঐতিহাসিক তথ্য লেখা আছে।'

কথাগুলো বলতে বলতে বিশ্বজীবনবাবু রীতিমত উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলেন।

উত্তেজনার ছাপ কিছুটা বোধহয় কিশোর চৌধুরীর ওপরেও পড়েছিল। উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! ইতিহাসে পড়েছি, পুরনো ইতিহাসের কিছু কথা এইরকম উটকো ঘটনার ভেতর দিয়ে জানা গেছে। খ্যাপা আর্টিস্টকে আমি চিনি না, দিব্য চেনে। ও তো এখন বাংলাদেশে। ফিরে এলেই ওকে নিয়ে ওই আর্টিস্টকে খুঁজে বার করতে হবে।'

ষোড়শ শতকের মুদ্রা নিয়ে সবাই যখন অল্পবিস্তর কৌতূহলী, ঠিক সেই সময়েই সম্পূর্ণ উলটো দিক থেকে অকল্পনীয় একটা ধাক্কা এল। রাগে প্রায় কাঁপতে-কাঁপতে ঘরে ঢুকলেন ডক্টর দেবাশিস সান্যাল, হাতে ইনজেকশনের সিরিঞ্জ। বললেন, 'ইট্'স এ গ্রেভ ক্রিমিনাল অফেন্স। আমি শুনেছি পুলিশের বড়সাহেবদের কয়েকজন এখানে আছেন। আপনারা এই জঘন্য অপরাধীকে ধরার ব্যবস্থা নিন এই মুহূর্তে।'

কে অপরাধী, কী অপরাধ—কিছুই বুঝতে না পেরে ঘরের দুই এস পি উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। রজত গুপ্ত চেয়ার ছেড়ে ওঠার ভঙ্গি করে জিজ্ঞেস করলেন, 'ডাক্তারবাবু, ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করে বলুন।'

ডক্টর সান্যালের চোখ থেকে যেন আগুন ঠিকরে বার হচ্ছিল। 'বেশ বলছি। আর একটু হলেই মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হত নিশাকে। তিলে তিলে মৃত্যু। সেই মৃত্যু তাকিয়ে তাকিয়ে

তখন দেখা ছাড়া আর কিছুই আমাদের করার থাকত না। এই সিরিঞ্জে প্রাণ বাঁচানোর ওষুধের বদলে আছে নেশা করার ড্রাগ। এই সুঁচ ফোটালে আমার পেশেন্ট এড্‌সের শিকার হত।'

ডাক্তারবাবুর কথা শুনে শ্রোতাদের সবাই প্রায় হতবুদ্ধি হয়ে পড়েছিল। 'কেন?'

'এই যে সিরিঞ্জ আর নিড্‌ল দেখছেন, এটা ইন্ট্রাভেনাস ড্রাগ-ইউজারদের। আমাদের দেশে ড্রাগ-ইনজেকটরদের মধ্যে অদ্ভুত একটা অভ্যাস আছে। অ্যাডিক্ট নিজের শরীর থেকে কিছুটা রক্ত টেনে নেয় সিরিঞ্জে। তার মধ্যে কোকেন মেশায়। তারপর সেটা আবার শরীরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। সেই সিরিঞ্জ, সুঁচ আর একজন অ্যাডিক্ট একই পদ্ধতিতে ব্যবহার করে। তারপর একই ভাবে আরও অনেকে। এদের মধ্যে কোনও-একজন এইচ আই ভি-ইনফেক্‌টেড হলেই সর্বনাশ। সিরিঞ্জে তার রক্তের কয়েক ফোঁটা থেকে যায়। সেটা তখন ঢোকে আর একজনের শরীরে। যার শরীরে ঢোকে সে তখন এড্‌সের শিকার হয়। এড্‌স-রোগীর সংখ্যা এ-ভাবেও বেড়ে যাচ্ছে। সিরিঞ্জ দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছিল, ল্যাবে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম—ঠিক তাই। এই সুঁচ ফোটালে আমার পেশেন্ট এড্‌সের কবলে পড়ত।'

কথাগুলো শুনে থরথর করে কেঁপে উঠলেন কিশোর চৌধুরী, তারপর দুহাতে নিজের মাথা চেপে ধরলেন।

শোনা যায়, বিপদ নাকি একা আসে না। একটা বিপদের পিছু-পিছু আরও কয়েকটা বিপদ আসে। অসম্ভব ঘটনার ব্যাপারেও বুঝি এই নিয়মটা খাটে। একটা অসম্ভব ঘটনা বোধহয় পিছু-পিছু আরও কিছু অসম্ভব ঘটনা নিয়ে আসে।

ঠিক সেইরকম একটা ঘটনা ঘটল। সিঁড়িতে দুদ্দাড় শব্দ। প্রকাণ্ড চেহারার অবনী ঘোষরায় যে লোকটাকে টানতে টানতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন তার গালে একগাদা খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, মাথার চুল উসকে-খুসকো, হাতে হ্যাণ্ডকাফ। একটু খুঁটিয়ে দেখতেই ঘরের কয়েকজন তাকে চিনে ফেলল—সুনন্দ তরফদার। চেনার পরেই চমক। এ কী! হঠাৎ উধাও হয়ে যাওয়া লোকটাকে কোত্থেকে পাওয়া গেল এখন! সুনন্দ রীতিমত ধুঁকছিল।

হঠাৎই চেঁচিয়ে উঠলেন অসম্ভব ঠাণ্ডা এবং ভদ্র মানুষ কিশোর চৌধুরী। 'এই লোকটা, এই সুনন্দই পাক্কা ক্রিমিনাল। তোমার ওই ইনজেকশনে নিশার যদি কিছু একটা হয়ে যেত তোমাকে আমি শেষ করে দিতাম। তুমি...তুমি...।'

রাগে, উত্তেজনায় কথা আটকে গিয়েছিল কিশোরের। ইন্সপেক্টর ঘোষরায় কৌশিকের কাছ থেকে চট করে পুরো ব্যাপারটা জেনে নিলেন, তারপরেই ওঁর চেহারাটা অবিকল শিকারি বেড়ালের মতো হয়ে উঠল। থাবার মধ্যে শিকার। চোখমুখের চেহারা আবার সেই আগের মতো ঝলমলে হয়ে উঠেছিল। 'এই সুনন্দই তাহলে এড্‌সের জীবাণুভর্তি ওই ইনজেকশন সিরিঞ্জটা সাপ্লাই দিয়েছে। ওফ্‌! ডেঞ্জারাস! লোকটাকে গোড়াতেই আমার সন্দেহ হয়েছিল। নিজেদের কোম্পানিতে কেউ কি আর এমনি-এমনি বেনামে গাড়ি ভাড়া খাটায়। তারপর

সেটা আমরা জানতে পারার পরেই হাওয়া। এর গাড়ির ড্রাইভারই আবার মিলন মাইতিকে খুন হতে দেখেছে।'

কিশোরের মুখে বোধহয় ওর শরীরের অর্ধেক রক্ত এসে জমা হয়েছিল। চড়া গলায় বললেন, 'ঠিক দেখেছে, এই সুনন্দই টনব্যাক্সির শেয়ার পাওয়ার লোভে মিলনকে খুন করেছে। নিশার মামা মিলনকে ব্যবসার একটা অংশ দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন একবার। লোকটা কী ভয়ংকর দেখুন—সেই কথা কানে আসতেই খুন করে ফেলল জলজ্যান্ত একটা মানুষকে । নিশার মামার মৃত্যুর কারণ যদি দুর্ঘটনা না হয়, তাহলে তাকেও খুন করেছে এই লোকটা। ডক্টর মৈত্রকে খুনি সাজানোর চক্রান্তও এর। এমনকী, এমনকী আমাদের নাটকের সেট ওই আমগাছের গুঁড়ির মধ্যে পুরনো আমলের মুদ্রা ঢুকিয়ে দেওয়ার কারসাজির পেছনেও হয়তো এই লোকটা—।'

উত্তেজিত ভঙ্গিতে কথা বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন কিশোর। ইন্সপেক্টর ঘোষরায় ওঁর পিঠে হাত রেখে বললেন, 'আপনি বসুন। আর ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অপরাধী ধরা পড়েছে শেষ পর্যন্ত।'

কোণের দিকের বেতের চেয়ারটায় বসে পড়েছিল অভিযুক্ত আসামী। সেদিকে তাকিয়ে গর্জন করে উঠলেন ইন্সপেক্টর—'যা বলা হল সব সত্যি তো? আর চালাকি করতে যেও না। মিথ্যে বললেই থার্ড ডিগ্রি চালাব। কী, কথা বলছ না কেন?'

সুনন্দর মুখ বুকের ওপর ঝুলে পড়েছিল। দেখে মনে হয়, 'এ-ঘরে ঢোকার পরে কোনও কথাই ওর কানে ঢোকেনি।

বেশ খুঁটিয়ে সুনন্দকে আর একবার দেখে নেওয়ার পরে নিজের মনে কথা বলার ভঙ্গিতে ইন্সপেকটর বললেন, 'বাব্ বাবা! এও কি ড্রাগ-অ্যাডিক্ট!'

ঘরের মধ্যে আবার অস্বস্তিকর নীরবতা।

হঠাৎ কেমন যেন চমকে উঠে নিজের হাতের দিকে তাকিয়ে অ্যাডভোকেট কিরণ সেন বলে উঠলেন, 'এ কী! এ কী!'

তেত্রিশ

উকিলবাবু রীতিমত বিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। উনি একবার নিজের হাতের দিকে তাকাচ্ছিলেন, একবার দানপত্রের দিকে। আরও বারদুয়েক 'এ কী!' বললেন, কিন্তু মুখ দিয়ে আর কোনও কথা সরল না।

উকিলবাবুর এই অদ্ভুত ব্যবহারে ঘরের সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিল। রজত গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'কী হল কিরণবাবু, আপনার হাতে কী হয়েছে?'

নিজের হাতের দিকে আরও কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থাকার পরে উনি বললেন, 'রং'।

'রং! কিসের রং?'

'স্ট্যাম্পের, সিলমোহরের—। এরকম তো আগে কখনও দেখিনি!'

ব্যাপারটা কী দেখার জন্য উঠে এলেন গোয়েন্দা বিভাগের বড়কর্তা, তারপর উকিলবাবুর হাতের তালু তীক্ষ্ণ চোখে একবার দেখে নিয়ে দানপত্রটা তুলে নিলেন। ওঁর দৃষ্টি আরও ধারালো হয়ে উঠেছিল। কয়েক মুহূর্ত দানপত্রের দিকে তাকিয়ে থাকার পরে উনি রায় দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'দানপত্রের নীচের স্ট্যাম্প, সিলের রং হাতের ঘামে মুছে গেছে অনেকখানি। এটা জলরংয়ে আঁকা। জাল দানপত্র।'

কথাটা উনি শেষ করতে না করতেই ছিটকে উঠে এসেছিলেন কিশোর চৌধুরী, তারপর দানপত্রে একবার চোখ বুলিয়েই চিৎকার করে উঠলেন—'কী জঘন্য ষড়যন্ত্র! এ সব ওই সুনন্দর কাজ। এ-ব্যাপারে ওর সঙ্গে অন্য লোকও হাত মিলিয়েছে। নাহলে তখন থেকে শুধুমাত্র একটা নোটবইয়ের ওপর নির্ভর করে উকিলবাবু ব্যবসার শেয়ারের মধ্যে সুনন্দর নাম ঢোকাতে চাইবেন কেন? আসল দানপত্র, যেটা মাত্র সাতদিন আগে অলোক মৈত্র নিজে আমার হাতে তুলে দিয়েছেন, সেটা এরা চুরি করে জাল দানপত্র রেখে গেছে। ছি-ছি-ছি, মানুষ এত নীচে নামতে পারে! কিন্তু আমি ছাড়ব না। রজতবাবু আপনাকে আমার অনুরোধ, আপনি নিজের হাতে এই কেসটা নিন।'

কিশোরকে আশ্বস্ত করে রজত গুপ্ত বললেন, 'জালিয়াতি যখন ধরা পড়ে গিয়েছে, আপনার দুর্ভাবনার কোনও কারণ নেই, আপনি শান্ত হয়ে বসুন তো।'

অ্যাডভোকেট কিরণ সেনের চোখেমুখে এখন আর এক ধরনের বিস্ময়। উনি থতমত খেয়ে গিয়ে কিশোরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি এই ব্যাপারের সঙ্গে আমাকে জড়াতে চাইছ?'

'কী চাইছি সেটা আপনার মক্কেল সুনন্দ তরফদারকে জিজ্ঞেস করে দেখুন।'

সুনন্দর মুখ আগের মতোই ওর বুকের ওপর ঝুলে আছে। অসাড় ভঙ্গি। ওদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে থমথমে মুখে উকিলবাবু বললেন, 'আমার মক্কেল! কী যা-তা বলছ তুমি!'

'যা-তা কে বলছে সেটা এঁদের তদন্তই বলে দেবে।'

চোখমুখ লাল হয়ে গিয়েছিল উকিলবাবুর, কী যেন উনি বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু হাত তুলে ওঁকে থামিয়ে দিয়ে কৌশিক বলল, 'এবার আমি কয়েকটা কথা বলি। কিশোরবাবু, আপনি আজ ভোরে মালদা থেকে ফিরে ঘরে ঢুকে নার্সের হাতে ছোট একটা কিটব্যাগ দিয়েছিলেন।'

'কিটব্যাগ! '

'হ্যাঁ, দিয়েছিলেন আপনি।

কী যেন ভেবে নিয়ে কিশোর বললেন, 'ও, হ্যাঁ। অসুস্থ স্ত্রীকে দেখার জন্যে ঘরে ঢুকেছিলাম। ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলাম। নার্সই তখন ওটা আমার হাত থেকে নিয়ে কোথাও রেখে দিয়েছিল।'

কী ছিল ওটার মধ্যে?'

রাগ-বিরক্তিতে কপালে ভাঁজ পড়েছিল কিশোরের। 'অদ্ভুত প্রশ্ন। কেন?'

'নার্স ব্যাগ খুলেছিল।'

'বেশ তো, ওর মধ্যে হাতিঘোড়া কী ছিল, নার্সকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেই তো জানতে পারবেন।'

'ভাল কথা, তাই করি তাহলে। মিস সেন—।'

ডক্টর সান্যালের পেছনদিকে দরজার আড়ালে ছিলেন ইউনিফর্ম-পরা নার্স, ডাক শুনে দরজার পাল্লার পাশের আলো-আঁধারিতে এসে দাঁড়ালেন। কৌশিক সরাসরি জিজ্ঞেস করল, 'ড্রাগভর্তি এই সিরিঞ্জটা কি ওই ব্যাগের মধ্যে ছিল মিস সেন?

উত্তরে একপাশে মাথা কাত হল নার্সের।

উত্তেজিত হয়ে কিশোর বললেন, 'কী বলছ লিপি—মিস সেন?'

কৌশিকের গলা এবার আর এক পর্দা ওপরে উঠল। 'কিশোরবাবু কি তক্ষুনি ওই ইনজেকশনটা ওঁর স্ত্রীর গায়ে পুশ্ করতে বলেননি?'

আবার একপাশে মাথা কাত হল নার্সের।

এবার পরিষ্কার আর্তনাদের মতো শোনাল কিশোরের গলা। 'কী তখন থেকে ঘাড় কাত করে যাচ্ছ লিপি ! তুমি কি এর কথাগুলো বুঝতে পারছ না?'

'খুব পারছি, কেন পারব না।'

'কে! কে তুমি? তুমি তো লিপি নও।'

দরজার পাল্লার আলো-আঁধারি থেকে বেরিয়ে এসে এক টানে মাথা থেকে সাদা কাপড়ের টুকরো সরিয়ে গালের আঁচিল খুঁটে ফেলে দিয়ে নার্স বলল, 'আমি লিপি নই, লিপি সেজেছিলাম।'

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর-চব্বিশ পরগণার এস পি শিকদার অবাক-হওয়া গলায় বলে উঠলেন, 'আরে ! মিস গাঙ্গুলি আপনি! দুর্ধর্ষ মেক-আপ নিয়েছিলেন তো! আমিই চিনতে পারিনি। আর অভিনয়ও তো জব্বর করেন। পুলিশের চাকরি না নিয়ে আপনার অভিনেত্রী হওয়া

একটুও না হেসে কৌশিক বলল, 'মিস গাঙ্গুলি সত্যিই ভাল অভিনয় করেন। তবে ওঁর চাইতে হাজার গুণ বড় অভিনেতা কিশোর চৌধুরী।'

কিশোর সোফার ওপর বসে পড়ে হাত দিয়ে কপালের দু-পাশ চেপে ধরে কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে স্পষ্ট গলায় জিজ্ঞেস কর[illegible]লেন, 'আমার বিরুদ্ধে আপনার অভিযোগটা কী জানতে পারি?'

'নিশ্চয়ই। সভ্য সমাজের প্রত্যেক অভিযুক্ত আসামীরই তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ শোনার এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের অধিকার আছে। তবে দয়া করে আর নাটক করবেন না।

আপনি একজন জঘন্যতম অপরাধী। এড্‌স রোগীর ব্যবহার করা নিড্‌ল স্ত্রীর গায়ে ফুটিয়ে তাকে মারতে চেয়েছিলেন।'

'অদ্ভুত কথা শোনালেন আপনি! আমার স্ত্রীকে মেরে আমার কী লাভ?'

'লাভ তো ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা। স্ত্রী মারা গেলে বিশাল ব্যবসা আর সম্পত্তির মালিক হতেন আপনি। দানপত্রের শেষের দিকে একটা লাইন আছে—স্ত্রী আপনার আগে মারা ফেলে বিষয়-ব্যবসার মালিকানা আপনি পাবেন। কিন্তু যেটাকে সত্যি ভেবে এতটা নীচে নেমেছেন সেই দানপত্রটাই জাল।'

'কে জাল করেছে? আপনি?'

'বাহ্! ধরা পড়ার পরেও আপনার মাথা কাজ করছে তো চমৎকার। হ্যাঁ, আমিই করিয়েছি। আপনি চুরি করবেন জেনে ওই দানপত্র জাল করিয়ে আমি উকিলবাবুর কাছে রেখে এসেছিলাম। উকিলবাবু সেটা অবশ্য জানতেন না।'

অদ্ভুত একটা হাসি খেলে গেল কিশোর চৌধুরীর ঠোঁটে। অসম্ভব ঠাণ্ডা গলায় বললেন, 'ভাল আষাঢ়ে গল্প ফেঁদেছেন তো! আমার বিরুদ্ধে আনা বাকি অভিযোগগুলো কী?'

'প্রথম অভিযোগ, মিলন মাইতিকে লোক দিয়ে খুন করিয়েছেন আপনি।'

দপ্ করে জ্বলে উঠলেন কিশোর চৌধুরী। 'আপনার, আপনার বিরুদ্ধে আমি মানহানির মামলা আনব।'

'আনবেন। দ্বিতীয় অভিযোগ সুনন্দ তরফদারকে অপহরণের।'

'আপনার সত্যিই মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

'তৃতীয় অভিযোগ একটা বেআইনি ব্রথেল চালাবার।'

'আপনি—আপনি—।'

হাত তুলে উত্তেজিত কিশোরকে থামিয়ে দিয়ে কৌশিক বলল, 'চতুর্থ অভিযোগ, ড্রাগ্‌সের চোরাকারবার চালানো।'

আবার সেই রহস্যময় বাঁকা হাসিটা ফুটে উঠল কিশোরের ঠোঁটে। 'আপনার গল্প দেখছি থামছে না। আর? আর কোনও অভিযোগ?'

'হ্যাঁ, আরও আছে। দেশের অমূল্য প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদ—মূর্তি, মুদ্রা ইত্যাদি আপনি বিদেশে পাচার করার কাজে নেমেছিলেন—।'

আর একবার সেই বাঁকা হাসিটা খেলে গেল কিশোরের ঠোঁটে। 'ওহ্! কয়েকটা মামুলি পুরনো কয়েন দেখেই এটা আপনার মাথায় খেলে গেছে। চমৎকার!'

'না, মালদায় নিয়ে-যাওয়া আপনার যাত্রাপালার সেট-সেটিংগুলোই তার প্রমাণ। প্লাই-উডের তৈরি প্রতিটি থামের মধ্যেই অষ্টধাতু, ব্রোঞ্জ আর কষ্টিপাথরের চোরাই মূর্তি আছে। ওগুলো বাংলাদেশ হয়ে বিদেশে পাচার করার কথা।'

চেয়ারে টান হয়ে বসেছিলেন কিশোর চৌধুরী, কপালে একগাদা ভাঁজ। 'দিব্য সাংস্কৃতিক

দল নিয়ে বাংলাদেশে গেছে। উদ্দেশ্য অত্যন্ত মহৎ, কিন্তু আপনি এর মধ্যেও একটা মতলব খুঁজে বার করেছেন!'

'মতলব নয়, মূর্তি। সেট-সেটিং সিজ করা হয়েছে।'

'কারা করেছে? বাংলাদেশ পুলিশ?'

'না, আমার কাছ থেকে টিপ্‌স পেয়ে মালদার এস পি মিস্টার মুখার্জি ওগুলো উদ্ধার করেছেন। আপনার সেট-সেটিং আর দলবল এখন লালবাজারে।'

চেয়ার ছেড়ে ছিটকে উঠলেন কিশোর চৌধুরী। 'বাজে কথা, আমি খবর পেয়েছি দিব্যরা বাংলাদেশে চলে গেছে।'

'আপনাকে ভুল খবর দেওয়া হয়েছে।' তারপরেই মালদার এস্ পি-র দিকে তাকিয়ে কৌশিক বলল, 'মিস্টার মুখার্জি, আপনি বিশ্বজীবনবাবুকে এবার লালবাজারে পাঠিয়ে দিন। ওঁর পকেটে চোরাই মূর্তির লিস্ট আছে, মালদা মিউজিয়ামের কিউরেটারের কাছ থেকে জোগাড় করেছেন, উনি সব মিলিয়ে দেখে নেবেন।'

এস পি সাহেব সঙ্গে সঙ্গে একজন সাব-ইন্সপেকটরকে নির্দেশ দিলেন। ওঁর সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন বিশ্বজীবনবাবু।

খাঁচার বাঘের মতো ঘরের মধ্যে একটুখানি পায়চারি করে কিশোর চৌধুরী ভাঙা-ভাঙা গলায় বলে উঠলেন, 'আমার বিরুদ্ধে মস্ত বড় একটা ষড়যন্ত্র করা হয়েছে। সবকিছুর পেছনে আছে এই সুনন্দ। ওকে আমি নাকি অপহরণ করেছি! অপহরণই যদি করব, অত বড় একটা লোককে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিলাম। টেবিলের ড্রয়ারে?'

'শুধু একটা লোক নয়, যাত্রাপালার সেট-সেটিংসমেত অনেককিছু লুকিয়ে রাখার মতো একটা চোরাকুঠুরি আছে এ-বাড়িতে। সেই ঘরটা মাটির তলায়। আমার সন্দেহ হওয়ায় একজন আরকিটেক্টের সাহায্য নিয়েছিলাম। তিনি আর্কাইভ থেকে এ-বাড়ির প্ল্যানের একটা কপি বার করে দিয়েছিলেন। সেই নক্‌শা দেখে রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে সে ঘর দেখে এসেছি আমি। একটু আগে ইন্সপেক্টর ঘোষরায়কে সেখানেই পাঠিয়েছিলাম। বাগানের মালির ঘরের নীচে আছে সেই ঘরটা, ওখান থেকেই সুনন্দকে উদ্ধার করেছেন ইন্সপেক্টর।'

কথাগুলো শুনতে শুনতে চোখ প্রায় ঠিকরে বেরিয়ে এসেছিল কিশোর চৌধুরীর, কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'বাজে কথা! মাথা খাটিয়ে এতকিছু আবিষ্কার করার দরকার ছিল না। চোরাই জিনিস সত্যিই যদি কিছু পেয়ে থাকেন, তার সঙ্গে আমাকে জড়াচ্ছেন কেন? দলে আমি একা নই, আরও অনেকে আছে। আমার ব্যাপারটা তো পরিষ্কার। আমি চক্রান্তের মধ্যে যাব কেন? এই দানপত্রটা জাল, কিন্তু আসলটা ঠিকই পাওয়া যাবে। দিনসাতেক আগে বাইরে যাওয়ার আগে নিশার মামা অলোক মৈত্র সেটা আমার হাতে দিয়ে গিয়েছিলেন।'

'না, উনি ওটা আপনাকে দেননি।'

কপালে চোখ তুললেন কিশোর চৌধুরী। 'দেননি মানে?'

'দেননি মানে দেননি।'

আর একবার উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কিশোর। 'উনি আজ আর নেই বলেই আপনি এ-কথা বলার সাহস পাচ্ছেন!'

'না, আছেন বলেই সাহস পাচ্ছি।' বলার সঙ্গে সঙ্গেই কৌশিক পিছিয়ে গিয়ে বিশাল ঘরের শেষ প্রান্তে দাঁড়াল। ওদিকে ডাইনিং-স্পেস। জায়গাটা আড়াল করা আছে মস্ত একটা পর্দা দিয়ে। পেছন ফিরে ঘরভর্তি মানুষজনের দিকে একবার তাকিয়ে একটানে পর্দাটা সরিয়ে দিল কৌশিক। অমনি সবাই চমকে উঠে দেখল ওখানে পাথরের মতো মুখ করে বসে আছেন অলোক মৈত্র।

শুধু মুখ নয়, শরীরটাও বোধহয় পাথরের তৈরি। ওই ভাবে কয়েক মুহূর্ত বসে থাকার পরে উনি উঠে দাঁড়ালেন, তারপর কিশোরের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তুমি যে এত বড় একটা শয়তান, আমি কল্পনাও করতে পারিনি!'

ওই একটা কথাতেই যেন জোঁকের মুখে নুন পড়েছিল। কুঁকড়ে ছোট হয়ে গিয়েছিলেন কিশোর।

কয়েক পা হেঁটে রজত গুপ্তের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন অলোক মৈত্র, তারপর ওঁর দিকে তাকিয়ে স্পষ্ট গলায় বললেন, 'আমি জানি অপরাধীর বিরুদ্ধে সমস্ত আইনগত ব্যবস্থা আপনি নেবেন। একটাই অনুরোধ, ওই কাজটা যত তাড়তাড়ি সম্ভব শুরু করে দিন। আমার শরীরটা খারাপ লাগছে, আমি বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম নেব এখন। তবে কোনও ব্যাপারে সাহায্যের দরকার হলে জানাবেন, আমি সব সময় আপনার পাশে আছি।'

অলোক মৈত্র চলে যাওয়ার পরেই তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছিল ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়ের। উনি প্রায় লাফ মেরে উঠে গিয়ে সুনন্দর হাতকড়া খুললেন, তারপর ওটা নিয়ে এসে পরিয়ে দিলেন কিশোরের হাতে। পরিয়ে চোখ মটকে কৌশিকের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'কী, এবার নিশ্চয়ই আর ভুল করিনি।'

উত্তরে লাজুক মুখে কৌশিক একটুখানি হাসল।

মালদার এস পি মুখার্জি তরুণ গোয়েন্দার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে এখনও ধোঁয়া। রজতদা শুধু ফোন করে বলেছিলেন—যাত্রাপালা করার জন্যে মালদায় একটা দল যাচ্ছে, ওদের ওপর কড়া নজর রাখবে। আর ট্যুরিস্ট সেজে কৌশিকও যাবে, ও যা বলে তাই শুনবে। পরে পুরো ব্যাপারটা জানাব। তো, সেটা কী? রজতদাও আর মুখ খোলেননি।'

রজতদা হেসে বললেন, 'জানলে তো খুলব! আমি নিজেই তো অন্ধকারে।'

সামান্য আগে-পরে এ-ঘরের প্রায় সবাই ওই এক কথাই বলল।

উত্তরচব্বিশ পরগনার এস পি শিকদার বললেন, 'তরুণ গোয়েন্দার কাছে আমাদের সবার তাহলে একটাই অনুরোধ—পুরো ব্যাপারটা খুব সংক্ষেপে একবার শুনিয়ে দিন।'

প্রস্তাবে সায় দিল একসঙ্গে অনেকেই।

ইন্সপেক্টর ঘোষরায় দু-হাতের তালু ঘসে বললেন, 'আবার ঝেঁপে বৃষ্টি নামল। শীতও নেমেছে বেশ। একটু গরম কফি পেলে কিন্তু মন্দ হত না!'

কথাটা ওঁর মুখ থেকে খসামাত্তর অনন্ত ছিটকে ভেতরের ঘরের দিকে চলে গেল। সবাই বুঝল ওর যাওয়ার সঙ্গে কফি আসার সম্পর্ক আছে।

তরুণ গোয়েন্দা কৌশিকের চেহারা ছিপছিপে, কিন্তু গায়ে প্রচণ্ড শক্তি ধরে; আর বুদ্ধিতে ক্ষুরের ধার। সমস্যা যতই জটিল হোক না কেন, সমাধানের পথ ঠিক খুঁজে বার করে। অপরাধের ওপর বিস্তর মাটি চাপালেও ওর এক্স-রে আই ঠিক সময় ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবেই। কিন্তু এত গুণ থাকা সত্ত্বেও গোয়েন্দাটি একটু বেশি পরিমাণে লাজুক প্রকৃতির। ওকে কেউ বাহবা দিলে ও মুখ লুকোবার জায়গা খুঁজতে শুরু করে দেয়। বিব্রত মুখে গোয়েন্দা বলল, 'আমি কেস-রিপোর্ট লিখে দেব, আপনারা পরে দেখে নেবেন—।'

কথাটা বলতেই ধমকে উঠে ওর রজতদা বললেন, 'লেখালেখি পরে কোরো, এখন মুখে বলো, ছোট করেই বলো। আমাদেরও তো কৌতূহল বলে একটা পদার্থ আছে—। নাও, শুরু করো চটপট।'

তরুণ গোয়েন্দা কৌশিক খুক-খুক করে কেশে গলা পরিষ্কার করে বলল, 'এই কেসটায় মক্কেল কিন্তু সাহায্য নেওয়ার জন্যে আমাদের কাছে আসেনি। আমরাই, মানে আমি আর মুখার্জিবাবু আগ বাড়িয়ে গিয়েছিলাম—বডি ল্যাঙ্গুয়েজ দেখে।'

'কী ল্যাঙ্গুয়েজ?'

'বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, মানে শরীরের ভাষা। তদন্তের ব্যাপারে এই ভা[illegible]টার ওপরেই আমি এখন একটু বেশি করে জোর দিতে চাইছি। তা, একদিন দেখলাম, পাবলিক বুথে ফোন করতে এসে এক ভদ্রলোক খুব ইতস্তত করছেন। পুরো ব্যাখ্যা এখন আর দিচ্ছি না, বুঝলাম এই ভদ্রলোক খুব বিপদে পড়েছেন। এটা আন্দাজ করে আমরাই গেলাম ওঁর কাছে। তা, দেখলাম ব্যাপারটা সত্যি। পরে ওঁর সূত্র ধরেই গেলাম টনব্যাক্সির বিপত্নীক ও নিঃসন্তান মালিক অলোক মৈত্রের কাছে। ওখানেও ওই শরীরের ভাষার সাহায্যেই জানলাম ওঁর সম্পত্তি ভাগাভাগির ব্যাপারটা বেশ জটিল হয়ে উঠেছে। জটিল হয়েছে বছর-পঁচিশ বাদে ওঁর ছোট ভাই ডক্টর জ্যোতি মৈত্র বিলেত থেকে হঠাৎ এসে হাজির হওয়ার জন্যে। লালাবাবুর কায়দায় বিষয়-ব্যবসা ত্যাগ করে ধম্মকম্ম করবেন বলে ঠিক করেছিলেন অলোকবাবু। একটা দানপত্রও তৈরি হয়ে গিয়েছিল। প্রধান ভাগ ভাগ্নি নিশার—এই কিশোর চৌধুরীর স্ত্রীর। বাকি ভাগ পাবে নিশার মা সুরমা এবং টনব্যাক্সি কোম্পানির দুই কর্মচারি সুনন্দ তরফদার

বা মিলন মাইতির একজন এবং আরও কেউ-কেউ। কিন্তু ছোট ভাই জ্যোতি আসতেই সব ওলটপালট হয়ে গিয়েছিল।

'বিষয় বা ব্যবসার দাবিদার নয় জ্যোতি, কিন্তু ধর্মপ্রাণ দাদা ওঁকে একেবারে বঞ্চিত করতে চাইলেন না। সুতরাং আগের দানপত্র বাতিল হল। তারপরেই গোলমালের শুরু। শেষে চক্রান্ত। মিলন আর সুনন্দর মধ্যে মুখের সম্পর্ক ভাল হলেও ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড রেষারেষি ছিল। তার কারণ, দুজনেই জেনে গেছেন—ব্যবসার শেয়ার দুজনের একজন পাবেন। অলোকবাবু আমাকে দিয়ে ভাইয়ের লন্ডন ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ালেন। দেখা গেল ভাইটি ধোয়া তুলসিপাতা নন। ডক্টর জ্যোতি মৈত্রের সঙ্গে ইতিমধ্যে কিশোর চৌধুরীর আলাপ-পরিচয় হয়ে গিয়েছিল। দুজনেই কলকাতা-প্রেমিক। দুজনেই চান পুরনো সেই প্রাসাদনগরী কলকাতা আবার আগের চেহারায় ফিরে আসুক। ভাঙাচোরা ঐতিহাসিক বাড়িঘর, সৌধ সারানো হোক। পুরনো জিনিস রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে সবার সচেতনতা তৈরি হোক। অত্যন্ত সাধু উদ্দেশ্য। আমার মনে হয়, দুজনের এই উদ্দেশ্যর মধ্যে কোনও গলদ ছিল না। কিন্তু গোলমাল পাকাল বিষয়আশয় আর ব্যবসার ভাগ।

'কিশোর চৌধুরী মিলন মাইতিকে হাত করলেন। হাত করে বিপদে ফেলতে চাইলেন সুনন্দ আর ডক্টর মৈত্রকে। এঁদের বিরুদ্ধে উড়ো চিঠি গেল অলোক মৈত্রের কাছে। হাতের লেখা যে কিশোর চৌধুরীর বাঁ হাতের, সেটা আমি পরে কায়দা করে জেনেছি। উড়ো চিঠির পরে গেল উড়ো ফোন। অলোক মৈত্রের মনে সন্দেহের বীজ ঢুকল। উনি দানপত্র আরও দু-তিনবার পালটালেন।

'কিশোর চৌধুরী অত্যন্ত বুদ্ধিমান। উনি টের পেয়ে গিয়েছিলেন আমি এসে গিয়েছি এর মধ্যে। সুতরাং একটা লিকার-লঞ্চিং পার্টির আয়োজন করলেন কুখ্যাত পাঁচ নম্বর বাড়িতে। কিশোরের ধারণা হয়েছিল দানপত্রের একটা ড্রাফ্ট আছে সুনন্দর ফ্ল্যাটে। সুতরাং সেই রাতেই চোর ঢুকল সুনন্দর ফ্ল্যাটে। সাধারণ চোর নয়, সুতরাং ড্রাফ্ট না পেয়ে আর কিছু চুরি করল না। টাকাপয়সা, দামি জিনিস—কোনও কিছুই চুরি না যাওয়ায় বুঝলাম এর মধ্যে অন্য খেলা আছে। সুনন্দ লঞ্চিং পার্টির কথা শুনিয়েছিলেন। আমি মুখার্জিবাবুকে পাঠালাম। উনি জেনে এলেন ওখানে বেশ কিছুদিন ওই ধরনের কোনও পার্টি হয়নি। এটা জানার পরে সুনন্দকেই আমার সন্দেহ করা উচিত, কিন্তু বুঝলাম—সুনন্দকে আমার সন্দেহভাজনদের তালিকায় আনাই অপরাধীর উদ্দেশ্য।

'ইতিমধ্যে মিলন মাইতি খুন হলেন। বুঝলাম, চক্রান্তকারীর তাকে আর দরকার নেই। বারাসতের ফেলে-যাওয়া ওই গাড়িতে ছোট্ট একটা মূর্তি আর পিনকুশন পেয়েছিলাম। পিনকুশনের মধ্যে ছিল ব্রাউন শ্যুগারের গুঁড়ো। প্রত্নতাত্ত্বিক বিশ্বজীবনবাবুকে দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে জানলাম, ওই মূর্তিটা নবম শতাব্দীর তৈরি। এইরকম একটা মূর্তি দেখেছি কিশোর চৌধুরীর শো-কেসে। ব্যস, আমার নজর ঘুরে গেল কিশোরের দিকে।

'কিন্তু পিনকুশনের মধ্যে ব্রাউন শ্যুগার কেন? সুনন্দর কাছে শুনেছিলাম, এক মহিলা টনব্যাক্সিতে স্টেশনারি গুড্‌স সাপ্লাই দেয়, কিন্তু তার বেশির ভাগ মালই বাতিল হয়। অথচ এস্টেট ডিপার্টমেন্টের ভারপ্রাপ্ত 'অ্যাসিসট্যান্ট ম্যানেজার মিলন মাইতির সঙ্গে মহিলার খুব ভাব। ভাব থাকলে তো বাজে জিনিসও চলে যায়। এখানে চলেনি। শুধু তাই নয়, তাই নিয়ে সাপ্লায়ার মহিলার কোনও অভিযোগও নেই। মাল বাতিল হলে তিনি কী করেন? না, টনব্যাক্সির গাড়িতে চাপিয়ে সেই মাল বসিরহাটের দোকানে সাপ্লাই দেন।

'পিছু নিলাম। বুঝলাম, মহিলা টনব্যাক্সির গুড উইল ভাঙাচ্ছে। বহু পুরনো কোম্পানি টনব্যাক্সির নিজেদের গাড়িতে কোম্পানির তৈরি মেডিক্যাল ইকুইপমেন্ট চালান যায় বসিরহাটের বিভিন্ন হেল্‌থ-সেন্টারে। পুলিশের নজর এ-গাড়ির ওপরে নেই। সুতরাং এই গাড়িতে হেরোইন স্মাগল করা সবচাইতে নিরাপদ। সাপ্লায়ার গালে-আঁচিল সুন্দরী লিপি সেন। মাল চালান যায় লক্ষ্মী ফার্টিলাইজার্সে। তারপর সেখান থেকে চোরাপথে বাংলাদেশে।

'বসিরহাট এলাকায় আন্তর্জাতিক চোরাচালানকারীদের একটা চক্রও কাজ করে। সেদিন ইউ এন মিশনের ছাপমারা এক গাড়িতে করে হেরোইন চালান করছিল এক সাহেব, মেম। সঙ্গে এখানকার এক স্মাগলারও ছিল। নিখুঁত এক অপারেশনে বামাল সবকটাকে ধরেছেন এস পি শিকদার।'

সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি তুললেন শিকদার—'কী বলছেন আপনি! ধরার সব ক্রেডিট তো আপনারই। খবর আপনার, ধরার পরিকল্পনা আপনার; হুকুম মানার কাজটুকু শুধু আমি করেছি।'

লাজুক গোয়েন্দা আর একবার লজ্জা পেল। সেই ফাঁকে রজত গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'কিন্তু মিলন মাইতির খুনি কে?'

'কাল ভোরে যখন অলোক মৈত্রের ছদ্মবেশ ধরে অলোকবাবুর বাড়ি থেকে মর্নিং-ওয়াকে বেরিয়েছিলাম তখন একজোড়া খুনি আমাকে মারতে গিয়েছিল, অবশ্য অলোকবাবু ভেবে। প্রথমে ট্রাক চাপা দিতে চেয়েছিল, আমি ছিটকে সরে গিয়েছিলাম বলে পারেনি। তখন গুলি করে মারতে গিয়েছিল। কিন্তু অপরাধী গুলি চালাবার আগেই আমি ওর হাতে গুলি ছুড়ে ওকে জখম করেছিলাম। এই লোকটা প্রফেশনাল কিলার, লম্বায় ছ'ফুটের ওপর। এই ভাড়াটে খুনিকে দিয়েই কিশোর চৌধুরী মিলনকে খুন করিয়েছে। আর, মিলনের গাড়ির সেই ড্রাইভারই ছিল কালকের ট্রাকচালক। দুটোই যে কুখ্যাত অপরাধী—সে খবর অনেক আগেই আমি আমার ইনফর্মার গোম্‌সের কাছ থেকে পেয়ে গিয়েছিলাম। খুনির নাম মাধব। যে পিস্তল দিয়ে আমাকে মারতে এসেছিল সেই পিস্তলের গুলিতেই মিলনকে মেরেছে। ড্রাইভারের আসল নাম পিন্টো। ড্রাগ-পেড্‌লার, মেয়ে পাচারও করে। এই লোকটা কিশোরের নির্দেশে গৌরাঙ্গ কর্মকার নাম নিয়ে সুনন্দর বেনামী গাড়ির ড্রাইভার হয়ে ছিল। তারপর মিলন খুন হওয়ার পরে কিশোরের নির্দেশে ডক্টর মৈত্রকে ফাঁসাতে চেয়েছিল মিলনের খুনি হিসেব।

কিন্তু অবনীদা পিন্টোকে জেরা করার সময় বুঝতে পারলাম, লোকটা ডাহা মিথ্যে কথা বলছে।'

'কী করে?'

'শরীরের ভাষা পড়ে। ওর মুখ বলছে এক, শরীর বলছে আর এক। কিশোর চৌধুরীর চক্রান্তটা দারুণ ছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা কোনও কাজে এল না। মিলনকে খুন করা হল। খুনি হিসেবে ডক্টর মৈত্রকে দাঁড় করানো হল। ইন্সপেক্টর ঘোষরায় যেদিন বেনামী গাড়ির আসল মালিকের কথা জানতে পারলেন, ঠিক সেদিনই অপহরণ করা হল সুনন্দকে। সবাই ভাবল, সুনন্দ পালিয়েছে। কায়দা করে পুলিশের সন্দেহর মধ্যে ফেলা হল সুনন্দকে। রইল বাকি এক। সেই অলোক মৈত্রকে মর্নিং-ওয়াকের সময় ট্রাক-চাপা দিয়ে মেরে ফেললেই কেল্লা ফতে। সুনন্দ উপস্থিত গুম, পরে খুন হত। শরীরে এড্‌সের জীবাণু ঢোকালে নিশাও বেশিদিন বাঁচত না। ব্যস, অলোকবাবুর যাবতীয় বিষয়সম্পত্তি আর ব্যবসার মালিক হয়ে যেত একজন—ওই কিশোর চৌধুরী।'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায় অবাক হয়ে কৌশিকের কথাগুলো শুনছিলেন, কিন্তু ও থামতেই চোখ ধারালো করে প্রশ্ন করলেন, 'অলোক মৈত্রকে ট্রাক চাপা দিয়ে মারার মতলব আঁটা হয়েছে—এটা তুমি আগে থেকে জানলে কী করে?'

'আপনার দয়ায়।'

'অ্যাঁ! আমার দয়ায়! মানে?'

চৌত্রিশ

রহস্যপূর্ণ একটা হাসি ফুটে উঠেছিল কৌশিকের মুখে। 'হ্যাঁ অবনীদা, আপনার দয়াতেই। কেটারার অ্যান্'স ইনের মালিককে আপনি না বলে দিলে উনি কিছুতেই আমার ওই আজগুবি প্রস্তাবে রাজি হতেন না।'

'কী আজগুবি প্রস্তাব?'

'আপনাকে বলেছিলাম না আমার এক বন্ধুর বিয়েতে অ্যান্'স ইন্‌কে বলব, আপনি কেটারারকে আমার কথা একটু বলে দিন। আপনি সঙ্গে সঙ্গে কেটারারকে ফোন করেছিলেন। কিন্তু আমি গিয়ে অ্যান্স ইনের মালিক প্রবোধবাবুকে বললাম—আপনি তো ডক্টর মৈত্রের প্রেস কনফারেন্সে ডিনার আর ককটেল সার্ভ করার দায়িত্ব নিয়েছেন। তা, আমি আপনার একজন ওয়েটার সাজতে চাই। উনি একটু গাঁইগুঁই করে রাজি হয়ে গিয়েছিলেন। ককটেল পার্টিতে ওয়েটারের ছদ্মবেশে আমি কিশোরের চক্রান্তের অনেক কথা জেনে গিয়েছিলাম। নেশা বেশ জমে ওঠার পরে কিশোর, দিব্য আর লিপি যখন এককোণে বসে ষড়যন্ত্র আঁটছিল তখন আমি কায়দা করে ছোট একটা টেপ-রেকর্ডার ফুলের তোড়ার মধ্যে ঢুকিয়ে রেখেছিলাম। পরে সেই লুকনো ক্যাসেট থেকেই অলোক মৈত্রকে ট্রাক চাপা দিয়ে মারা, বসিরহাটের

চোরাচালানকারীদের হাতে হেরোইন তুলে দেওয়া ইত্যাদি মতলবের কথা জানতে পারি। অতনু দত্ত কিশোরের ওই দলের লোক নন। মানুষটি কলকাতা এবং সংস্কৃতিপ্রেমী। কিশোর মালদার কনট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে গিয়েছিলেন। একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল অলোক মৈত্রের মৃত্যুর খবর ফোনে শোনা। আমি একজন পুলিশ সার্জেন্টকে দিয়ে সেই খবরই অতনুবাবুর কাছে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছিলাম। অতনুবাবুর ফোন পেয়ে কিশোর তখন পরিকল্পনামাফিক এড্‌স্-রোগীর ব্যবহার করা ইনজেকশনের সিরিঞ্জ আর নিড্‌ল নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছিলেন কলকাতায়। কিন্তু যে দানপত্রের ওপর নির্ভর করে উনি এতটা এগিয়েছিলেন, সেটা ছিল আমারই তৈরি করানো জাল দানপত্র।'

'কিন্তু দানপত্র তুমি জাল করতে গেলে কেন? আর সেটা কিশোরের হাতেই বা এল কী করে?'

'জাল করার একটাই কারণ— কিশোরকে ওর আসল চেহারায় প্রকাশ্যে ধরা। কিশোরের চক্রান্তে অলোক মৈত্রের মন বিষিয়ে আছে অনেকের ওপর। তার মধ্যে সুনন্দ আছেন, ডক্টর মৈত্র আছেন, ভাগ্নি নিশার ওপরেও শেষের দিকে উনি কিছুটা চটে গিয়েছিলেন। তার ফলে বেশ কয়েকটা দানপত্র তৈরি করার পরেও নষ্ট করে ফেলেন। শেষ দানপত্রটা ছিল বাল্যবন্ধু অ্যাডভোকেট কিরণ সেনের কাছে। সে খবর সুনন্দই আমাকে দেন। কিরণবাবুর বাড়ির ঠিকানাও মেলে ওঁর কাছ থেকে। ভাগে শেষ পর্যন্ত কিছু জুটল কি না সুনন্দর সেটা জানার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক। সুনন্দ এবং অলোকবাবু দুজনেই আমার ক্লায়েন্ট। ঘটনাচক্রে একসঙ্গে দুজনের কেস হাতে নিতে হয়েছিল। গেলাম কিরণবাবুর কাছে। তারপর নানা কথার পরে বললাম, আপনার বন্ধু অলোকবাবুর সামনে মস্ত বিপদ। মাদ্রাজ থেকে কলকাতায় ফিরলেই ওঁর জীবনহানির আশঙ্কা। এদিকে আবার আপনার কাছে যে দানপত্রটা আছে সেটা চুরি হয়ে যেতে পারে। উনি অবশ্য সে-কথা তখন বিশ্বাস করেননি।'

আপত্তি করার ভঙ্গিতে কিরণবাবু বললেন, 'আমি আবার অবিশ্বাস করলাম কোথায়?'

'আপনি মুখে কিছু বলেননি কিন্তু শরীরের ভাষা পড়ে আপনার মনের কথা আমি ধরতে পেরেছিলাম। আপনাকে বলেছিলাম, চোরকে বোকা বানাবার জন্যে দানপত্রের একটা নকল রেখে দেওয়া যাক। আপনি রাজি হয়েছিলেন। তখন আমি ড্রাফ্‌ট কপি করার ব্যাপারে অসম্ভব ওস্তাদ একজনকে নিয়ে আপনার বাড়িতে গিয়েছিলাম। দানপত্র কপি করা হল অন্য ঘরে। সিল, স্ট্যাম্প সব জলরংয়ে। বয়ান এক, শুধু শেয়ারের অংশটা বদলে দিয়েছিলাম। আর আসল ও নকল বলে দুটো নকল দানপত্র আপনার চেম্বারে রেখে আসলটা হাতিয়ে নিয়েছিলাম। সেটা এখন আমার কাছেই আছে।'

'অ্যাঁ! আপনি তো ডেঞ্জারাস! আমাকেও বোকা বানিয়েছেন!'

'না-না, আপনাকে বোকা বানাবার জন্যে নয়। কিশোরকে স্বমূর্তিতে ধরার জন্যেই এত মাথা খাটাতে হয়েছে। আসল-নকলের ব্যাপারটা জানা থাকলে আপনি কিশোরের সামনে

এখন যা বলেছেন তা এত সহজে বলতে পারতেন না। আপনার বিস্ময় আর চমক দেখে কিশোরের ভেতরের ব্যাপারটা বেরিয়ে পড়েছে চট করে।'

মালদার এস পি মুখার্জি জিজ্ঞেস করলেন, 'যাত্রার সেট-সেটিংয়ের মধ্যে মূর্তি পোরার ব্যাপারটা ধরলেন কী ভাবে?'

'একদিন এ-বাড়িতেই শুনলাম সেট-সেটিং বানানো হচ্ছে দিব্যর কাগজের গোডাউনে। সন্দেহ হল আমার। আমার একজন প্রকাশক বন্ধু কাগজ কিনতে চায় বলে দিব্যর দোকানের ঠিকানা নিলাম। দোকানের পাশেই গোডাউন। সেখান থেকে সেট-সেটিং কিশোরের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছিল ওই দুই দাগী আপরাধী—মাধব আর পিন্টো। আমি ফাঁক বুঝে গোডাউনে হানা দিয়ে রহস্যটা ধরতে পারলাম। তখনও কিছু সেট-সেটিং পড়ে ছিল ওখানে। কিশোরদের এই বাড়িটা প্রাচীন আমলের বাড়ি। কিশোরকে একদিন বললাম—বাড়িটা দারুণ, দেখব একদিন। কিশোর দেখালেন, কিন্তু সেট-সেটিংয়ের কোনও হদিস পেলাম না কোথাও। বুঝলাম, এ-বাড়িতে নির্ঘাত কোনও চোরাকুঠুরি আছে। আমি তখন আমার চেনা আরকিটেক্ট অরুণ মজুমদারের সাহায্য নিলাম। তিনি আর্কাইভ থেকে এ বাড়ির প্ল্যানের একটা কপি বার করে দিলেন। সেই প্ল্যানে চোরাকুঠুরির নক্‌শা আছে। নক্‌শা দেখে এক রাতে সেই চোরাকুঠুরিতে হানা দিয়ে ওইসব সেট-সেটিং দেখলাম। পরে সুনন্দ উধাও হওয়ার পরে আর একবার ঢুকেছিলাম ওখানে। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই—দেখি, সুনন্দ তরফদার হাত-পা-মুখ বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছেন।'

রজত গুপ্ত একটু মুচকি হেসে বললেন, 'এই কিশোর চৌধুরী লোকটা তো দেখছি অত্যন্ত ধুরন্ধর, তা ও কি তোমাকে কখনও সন্দেহ করেনি?'

'হ্যাঁ, একেবারে গোড়া থেকেই করছে। কয়েকবার আমার পিছু নিয়েছে ওই মাধব নামের খুনিটা। ও নিশাকেও নজরে রেখেছিল। কিশোর শৌখিন এক ডিটেকটিভ এজেন্সিকেও লাগিয়েছিলেন আমার পেছনে। ওই এজেন্সির একজন হজমিওয়ালা সেজে আমার বাড়ির সামনে পাহারায় বসেছিল। সুনন্দকে কিড্‌ন্যাপ করার পরে ওর উধাও হওয়ার খবর ওই হজমিওয়ালা-সাজা গোয়েন্দাকে দিয়েই মাদ্রাজে পাঠিয়েছিলেন কিশোর। আসল উদ্দেশ্য অবশ্য ওই গোয়েন্দার পক্ষে আঁচ করা সম্ভব ছিল না। কিশোর চেয়েছিল ওর কলকাতার বাইরে থাকার সময়ই অলোকবাবুর খুনটা হয়ে যাক।

'কিশোর আমাকে সন্দেহ করছে টের পেয়ে আমি পা মচকানোর অজুহাতে ওর সঙ্গে দেখা করা বন্ধ করে দিই। কিছু খবর পেয়ে যেতাম মুখার্জিবাবুর কাছ থেকে। এই ভাবেই সেদিন জানতে পারলাম, বিদেশিদের উপহার দেওয়ার জন্য পুরনো কলকাতার কিছু স্মারক তৈরির কথা। শুনেই বুঝতে পেরেছিলাম ওগুলোর মধ্যে চোরাই জিনিস যাচ্ছে। কিন্তু নিশার অসুস্থতার কথা শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম আমি।

'মুখার্জিবাবুর কাছ থেকে অসুখের লক্ষণগুলোর কথা জেনে খটকা লেগেছিল। আমি

কিছু ড্রাগ-অ্যাডিক্ট দেখেছি, তাদের অসুস্থতার সঙ্গে বেশ মিল ছিল নিশার অসুখের। রোগের লক্ষণ, উপসর্গ একই ধরনের—মুখার্জিবাবু কথায় তাই অন্তত মনে হয়েছিল আমার। সন্দেহ আরও দানা বেঁধে উঠেছিল যখন শুনলাম নার্সের মুখে আঁচিল। ও যে লিপি সেন—সে ব্যাপারে কোনও সংশয় ছিল না আমার। নার্স-ইনজেকশন দেওয়ার পরে ঝিমিয়ে পড়েছিল নিশা। অল্পবয়সী, ঝকঝকে, চমৎকার স্বাস্থ্যের মেয়েটির ওই দশা হল কেন? মুখার্জিবাবু, অতনুবাবু এবং আরও কেউ-কেউ তখন ঘরে ছিলেন।

'মুখার্জিবাবু দেখলেন কিশোর অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। অসুস্থ স্ত্রীকে ওই অবস্থায় ফেলে রেখে রামকেলিতে যেতে চাইছেন না। খুব স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু উদ্বিগ্ন মানুষের প্রতিক্রিয়ার কথা আর ভাবভঙ্গির বর্ণনা শুনে বুঝলাম—লোকটা মনে মনে অন্য মতলব ভাঁজছে। মুখে যা বলছে ওর শরীরের ভাষা বলছে ঠিক তার উলটো কথা।'

কৌতূহলী হয়ে রজত গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'কী রকম?'

'বলছি। তার আগে মুখার্জিবাবুর কাছ থেকে কিশোরের প্রতিক্রিয়ার কথা শুনে নিন। মুখার্জিবাবু, বলুন তো অসুস্থ স্ত্রীকে দেখে কিশোর চৌধুরী কী করেছিলেন?'

মুখার্জিবাবু এতক্ষণ হাঁ করে রহস্যকাহিনী শুনছিলেন। তরুণ গোয়েন্দা-মালিকের নির্দেশ শুনে ওঁর হাঁ বন্ধ হল, তারপর মুখ খুললেন আবার। 'সেদিন ওই ঘটনায় কিশোরবাবুকে খুব ছটফটে হয়ে উঠতে দেখেছিলাম। উনি এমনিতে খুব একটা সিগারেট খান না, কিন্তু সেদিন খুব অল্প সময়ের মধ্যে বেশ কয়েকটা সিগারেট খেয়েছিলেন। চোখমুখ দেখে মনে হয়েছিল, অসম্ভব উদ্বিগ্ন। মাঝেমধ্যে পায়চারি করছিলেন। পাঞ্জাবির পকেটে একগাদা খুচরো ছিল, কখনও-কখনও পকেটে হাত ঢুকিয়ে সেগুলো বাজাচ্ছিলেন। ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন হঠাৎ-হঠাৎ, ভেজানো দরজা খুলছিলেন বিচ্ছিরিভাবে পা দিয়ে ধাক্কা মেরে।'

'বাহ্! আপনার তো বেশ মনে আছে দেখছি। আসলে আমার সঙ্গে থেকে থেকে এই মুখার্জিবাবুও এখন শরীরের ভাষার দিকে নজর দিতে শুরু করেছেন। তা, সেদিন কিশোর চৌধুরীর ওই ভাবভঙ্গি দেখে মুখার্জিবাবুর মনে হয়েছিল, মানুষটি স্ত্রীর অসুস্থতায় বেশ উদ্বিগ্ন আর অসহায় হয়ে পড়েছেন। কিন্তু আমার রিডিং সম্পূর্ণ উলটো কথা বলে।'

'কী সেটা?'

'সিগারেট-স্মোকারদের সম্পর্কে আমাদের অনেকের মধ্যে মস্ত বড় একটা ভুল ধারণা আছে। সেটা হল—একজন উদ্বিগ্ন মানুষ ঘন-ঘন সিগারেট টানে। আসল ব্যাপারটা কিন্তু ঠিক তার বিপরীত। খুব উদ্বিগ্ন হলে একজন স্মোকার সিগারেট টানতে পারে না। আস্ত সিগারেটটা হয় তার আঙুলের ফাঁকে পোড়ে, কিম্বা সে ওটা অ্যাশ্‌ট্রেতে রেখে দেয়। অ্যাশ্‌ট্রেতে পুড়ে পুড়েই শেষ হয়ে যায় গোটা সিগারেট। এটা আমার ধারণা নয়। গবেষকরা গবেষণা করে বার করেছেন। বুঝলাম সেদিন অসুস্থ স্ত্রীকে দেখে কিশোরের ঘন-ঘন সিগারেট টানা আর যাই হোক উদ্বিগ্ন হওয়ার লক্ষণ নয়। খুব উদ্বিগ্ন হলে কেউ অত পায়চারিও করতে

পারে না। পাথরের মতো দাঁড়িয়ে কিংবা বসে থাকে। পাঞ্জাবি, শার্ট বা প্যান্টের পকেটে হাত ঢুকিয়ে খুচরো পয়সা বাজানো কিসের লক্ষণ বলুন তো?'

প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারল না।

একটু থেমে কৌশিক বলল, 'কোনও জুয়ার আড্ডায় গেলে পয়সা বাজানোর শব্দ প্রায়ই শোনা যায়। তার মানে পয়সাই জুয়াড়িদের ধ্যানজ্ঞান। রাস্তাঘাটে ভিখারিরা দেখবেন টিনের কৌটোয় পয়সা বাজিয়ে ভিক্ষে করে। অর্থাৎ তাদের চিন্তা তখন পয়সা ছাড়া আর কিছুতেই থাকে না। হোটেলে-রেস্টুরেন্টে বিল আর পয়সা ফেরত দেওয়ার সময় ওয়েটাররাও প্লেটের ওপর একটু পয়সা বাজিয়ে দেয়। তার মানে তাদের ধ্যানজ্ঞান তখন টিপ্‌স পাওয়া। কিশোর চৌধুরী সেদিন থেকে-থেকেই পাঞ্জাবির পকেটে হাত ঢুকিয়ে পয়সা বাজাচ্ছিলেন। বুঝলাম, টাকাপয়সা হাতানোর মতলবটা ওঁর মাথায় একটু বেশি করেই ঘুরছে। ঘর থেকে হঠাৎ-হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়া কিংবা পা দিয়ে বিচ্ছিরিভাবে ধাক্কা মেরে দরজা খোলা অস্থিরতার লক্ষণ। সে অস্থিরতা চটপট মতলব হাসিল করে টাকাপয়সা বাগাবার জন্যে। কিশোর চৌধুরী আদপেই সেদিন উদ্বিগ্ন হননি। কিন্তু আমি উদ্বিগ্ন হয়েছিলাম নিশার কথা ভেবে। ড্রাগ-চোরাচালানকারী ড্রাগ দিয়েই স্ত্রীকে মৃত্যুর দিকে ঠেলবে—এই চিন্তাটা আসা স্বাভাবিক। সুতরাং আমি ছুটেছিলাম ড্রাগ-অ্যাডিক্টদের চিকিৎসক ডক্টর দেবাশিস সান্যালের কাছে। ওঁকে আজ ভোরে এখানে আসতে বলে দেখছি এখন ঠিক কাজই করেছি।'

সুনন্দ আগের মতোই ঝিমোচ্ছিল। কিশোর চৌধুরী মাথা নিচু করে গুম হয়ে বসে আছেন। এই দুজন ছাড়া এ-ঘরের আর সবার মুখে তরুণ গোয়েন্দাকে তারিফ করার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল

ঠিক এই সময় মস্ত এক ট্রেতে করে কফি নিয়ে এল অনন্ত। এসেই কৈফিয়ত দেওয়ার গলায় বলল, 'দুধ কম পড়ে গিয়েছিল, আনতে পাঠিয়েছিলাম। সেই জন্যে একটু দেরি হয়ে গেল।'

দুজন বাদে ঘরের আর সবাই ট্রে থেকে গরম কফির কাপ তুলে নিল। বৃষ্টি এখন কমেছে, কিন্তু মাঝেমধ্যে দমকা ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছিল ঘরের মধ্যে।

ঠান্ডায় গরম কফির কাপে সবাই বেশ তৃপ্তি করে চুমুক দিচ্ছিল। মুখার্জিবাবুর তৃপ্তির আওয়াজ একটু উঁচু পর্দার। গরম কফির কাপে দুহাত চেপে ঠান্ডা হাত গরমও করে নিচ্ছিলেন উনি। একই সঙ্গে হাত আর শরীর গরম হওয়ায় ওঁর হঠাৎই বেশ মেজাজ এসে গিয়েছিল। উনি গলা তুলে কৌশিককে বললেন, 'প্লাইউডের গাছের গুঁড়িতে কুড়ুল মেরে চোরাই মুদ্রা বার করে দেওয়ার প্ল্যানটা কিন্তু দারুণ! সত্যি কথা বলতে কি, আপনি অমন একটা কাণ্ড করতে বলায় আমি মনে মনে একটু চটে গিয়েছিলাম। ভেবেছিলাম পরিচালকের স্বাধীনতায় অযথা হস্তক্ষেপ করছেন। আসলে ওই নাটকদুটো নিয়ে খুব দুশ্চিন্তায় ছিলাম—। গাঁয়ের

ওই অভিনেতাগুলোর অভিনয়ের বহর দেখেছেন তো? নিজের নাম, বাপের নাম জিজ্ঞেস করলে পরিষ্কার করে বলতে পারে না—ওরা করবে অভিনয়!'

কৌশিকের মুখে আবার একটা রহস্যপূর্ণ হাসি ফুটে উঠল। 'ওরা তো অভিনয় করতে আসেনি।'

'তবে?'

'যাদের অভিনেতা সাজানো হয়েছিল তাদের সবক'টাই পাকা স্মাগলার। অভিনেতা সেজে বাংলাদেশে ঢুকতে চেয়েছিল।'

'অ্যাঁ! বলেন কী!'

'কিশোর চৌধুরীর দলের লোক। সবক'টাকে লক-আপে ঢোকানো হয়েছে। পুলিশ ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই ওদের আসল নাম-ধামও বার করে ফেলেছে।'

রজত গুপ্ত জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, ওই পাঁচ নম্বর বাড়ির গেস্টহাউসের মালিক কে?'

'আমাদের এই কিশোর চৌধুরী। বেনামে ওখানে একটি মধুচক্র চালাতেন। মক্ষিরাণী ওই লিপি সেন, কিশোরবাবুর গুণবতী উপপত্নী।'

এমন সময় আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল সুনন্দ তরফদারের। উনি পিটপিট করে চারদিকে চেয়ে ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করছিলেন। মালদার এস পি ওঁর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এঁকেও বোধহয় ড্রাগ দেওয়া হয়েছিল। নেশা কেটেছে এতক্ষণে।'

মুচকি হেসে জবাব দিল কৌশিক, 'না, ওর পেছনে অকারণে দামী ড্রাগ নষ্ট করেননি কিশোর চৌধুরী। হাত-পা-মুখ বেঁধে ফেলে রেখেছিলেন চোরাকুঠুরিতে। এদিকের ঝামেলা মিটে গেলে খতম করে দিতেন। ওঁর ওই আচ্ছন্ন থাকার পেছনে একটাই কারণ। চোরাকুঠুরির হদিস দিয়ে ওঁকে উদ্ধার করে আনতে বলেছিলাম অবনীদাকে। উনি উদ্ধার করার পরে ওঁর ওই প্রকাণ্ড হাতের ছোট্ট একটা রদ্দা মেরেছিলেন সুনন্দবাবুর ঘাড়ে।

ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায় অবাক হয়ে বললেন, 'আরে! তুমি এটা আবার জানলে কী করে?'

আর এক ঝলক রহস্যপূর্ণ হাসি ফুটে উঠল তরুণ গোয়েন্দার ঠোঁটে। 'আপনার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ পড়ে। আপনি উদ্ধার করতে যাওয়ার মুখে যে ভাবে হাত মুঠো করে ঘুষি পাকাচ্ছিলেন তাতেই বুঝেছিলাম সুনন্দবাবুর কপালে কিঞ্চিৎ দুঃখ আছে। এই অনন্ত, ভদ্রলোককে এক কাপ কফি দাও।'

কফি তৈরিই ছিল, অনন্ত সঙ্গে সঙ্গে এক কাপ কফি দিল সুনন্দ তরফদারের হাতে। কাহিল মানুষটির হাত কাঁপছিল। কাঁপা-কাঁপা হাতে কফির কাপ ধরে চুমুক দিলেন, ভঙ্গি ঠিক জল খাওয়ার মতো।

অ্যাডভোকেট কিরণ সেন লম্বা একটা নিশ্বাস বাতাসে ভাসিয়ে দিয়ে বললেন, 'আমরা আইনের মারপ্যাঁচ বুঝি, কিন্তু গোয়েন্দার কায়দাকানুন কিছুই জানি না। কৌশিকবাবু এই যে কত কিছু করলেন—। শেষ ব্যাপারটায় সত্যি কথা বলতে কি আমি একেবারেই উলটো বুঝেছিলাম—আমার মনে হয়েছিল অলোক আর নেই। দুর্ঘটনার মধ্যেও কী সাঙ্ঘাতিক মারপ্যাঁচ! কৌশিকবাবু আমাকে শুধু বলেছিলেন, আপনি অলোকের মত করান। ওই রাতটা উনি অলোকের বাড়িতে থাকতে চান, আর অলোক যেন কোনও অবস্থাতেই পরদিন ভোরে বেড়াতে বার না হয়। তা, আমি ভেবেছিলাম এটা বুঝি তরুণ গোয়েন্দার আজগুবি কোনও খেয়াল। অলোকের বাড়িতে তিনটে গেস্ট-রুম আছে, থাকাটা তো কোনও প্রবলেম নয়। কিন্তু গোয়েন্দার দ্বিতীয় প্রস্তাবটাই ছিল সাঙ্ঘাতিক। অলোক শুনেই চটে উঠেছিল। শেষে আমি অনেক করে বোঝাবার পরে বলেছিল : তেমন কিছু দেখলে বা শুনলে তবেই মত পালটাবার প্রশ্ন ওঠে, না হলে কিছুতেই নয়।'

উকিলবাবু থামতেই ঘরের তিনটে কোণ থেকে একই প্রশ্ন উঠল : 'গোয়েন্দার দ্বিতীয় প্রস্তাবটা কী ছিল?'

রহস্যপূর্ণ হাসি আর একবার ফুটে উঠেছিল তরুণ গোয়েন্দার ঠোঁটে। একটু থেমে থেমে ও জবাব দিল, 'বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত!'

'বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত! সেটা আবার কী?' বিস্ময় এবং প্রশ্ন একই সঙ্গে ঘরের তিনটে কোণ থেকে ভেসে এল।

গোয়েন্দা একটু যেন উদাস হয়ে জানলার বাইরের বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকল কয়েক মুহূর্ত, তারপর শুরু করল তদন্তের দ্বিতীয় ভাগ। 'এই কেসটার সঙ্গে বাল্যপ্রণয়ের অভিসম্পাত জড়িয়ে না থাকলে রহস্যের সমাধান আমি অনেক আগেই করতে পারতাম। আমি চেয়েছিলাম খুনি আর চোরাকারবার ধরার সঙ্গে সঙ্গে মধুর এক বাল্যপ্রণয়ের ওপর থেকে বিচ্ছিরি অভিসম্পাতটাও উঠিয়ে দিতে। মনে হয়, সে কাজটা আমি করতে পেয়েছি। আপনার কী মনে হয় কিরণবাবু?'

চমৎকার একটা হাসি ফুটে উঠেছিল উকিলবাবুর মুখে। 'আমি আপনার সঙ্গে একমত। মনে হয় না, অলোক এখন আর ওর সেই পুরনো জেদ ধরে বসে থাকবে। তাছাড়া সেদিন তো আপনার ওই দ্বিতীয় প্রস্তাবের জবাবে শেষ দিকে নিমরাজি হয়ে বলেছিল : তেমন কিছু দেখলে বা শুনলে ও ওর মত পালটাবার কথা ভাববে। তা, ও এখন যা দেখল বা শুনল তাতে মনে হয় না আর আপত্তি তুলবে। কিন্তু আপনি ওদের বাল্যপ্রণয়ের এত খোঁজখবর পেলেন কোত্থেকে? সেদিন কিছু ভাঙেননি, আজ একটু পরিষ্কার করবেন কি?'

জবাবে লাজুক মুখে গোয়েন্দা বলল, 'নিশ্চয়ই। তদন্তের কাজ শেষ। এখন আর অকারণে লুকোছাপার মধ্যে যাব কেন?

রজত গুপ্ত ধমকে উঠে বললেন, 'শোনো ইয়াং ডিটেকটিভ, আমাদের আর হেঁয়ালির মধ্যে রেখো না। এই মধুর রহস্যের ব্যাপারটাও গোড়া থেকে বলো।'

ওঁর কথায় গলা মেলালেন দুই এস পি : 'হ্যাঁ-হ্যাঁ, একেবারে গোড়া থেকে বলুন।'

বৃষ্টি কিছুটা ধরেছিল, সেটা আবার ঝেঁপে নামল। কৌশিক গলা সামান্য ওপরে তুলে বলল, 'সুনন্দ তরফদারের ফ্ল্যাটে রাত্তিরে চোর ঢোকার পরে সকালে তদন্তে গিয়েছিলাম আমি। সুনন্দবাবুই নিয়ে গিয়েছিলেন। চোর ঢুকেছিল কিন্তু কিছুই চুরি হয়নি। তদন্ত করতে করতে সুনন্দবাবুর টেবিলে ভাইকে সাবধান-করে-দেওয়া কাটাকুটি-করা একটা চিঠি পেলাম। মনে হয়েছিল, চিঠির মধ্যে রহস্য আছে। সেটা ভেদ করার জন্যে এক রাত্তিরে সুনন্দবাবুর আড়িয়াদহের বাড়িতে হানা দিলাম। ফিরে এসেছিলাম একতাড়া চিঠি সঙ্গে নিয়ে। ওই তাড়াটি পুরনো প্রেমপত্রের। এক বালিকা আর এক কিশোর পরস্পরের কাছে হৃদয়ের সব কথা উজাড় করে দিয়েছিল চিঠির মধ্যে। বালিকার প্রেমপত্রের সঙ্গে ছিল সেই কিশোরের প্রেমপত্রের ড্রাফ্‌ট। কয়েক বছর আগেকার চিঠি। ইতিমধ্যে যা হয়ে থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে, এখানেও ঠিক তাই হয়েছিল। মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল অন্য জায়গায়। ছেলেটি আরও বড় হয়ে চাকরি করতে গেল অন্য রাজ্যে। কিন্তু বাল্যপ্রণয় মুছে গেল না। পরে সেটা ফিরে এসেছিল প্রবল হয়ে।'

এস পি শিকদার চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'এবার কি তাহলে অবৈধ প্রণয়?'

ঢোক গিলে জবাব দিল কৌশিক, 'নীতির দিক থেকে দেখতে পেলে তাই। কিন্তু আমি সে-কথা বলতে রাজি নই। স্বামী এক নম্বরের ভিলেন। মেয়েটির আশঙ্কা হত, যে-কোনও দিন যে-কোনও মুহূর্তে ও খুন হয়ে যেতে পারে। আমি এটা অনুমান থেকে বলছি না। একদিন ট্যাক্সিওয়ালা সেজে ওদের সেই ট্যাক্সিতে চাপিয়ে সব কথা নিজের কানে শুনেছি। মেয়েটির আশঙ্কা ঠিক। ওর স্বামী ওকে মেরে ফেলার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু পারেনি। তবে সেই ভিলেন স্বামীর কারসাজিতে প্রেমিকটি এখন ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়ের লক-আপে।'

ইন্সপেক্টর অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'মানে?'

'মানে আপনি ঠিকই ধরেছেন। সৈকতকে আপনি লক-আপে পুরে রেখেছেন ডক্টর মৈত্রের সঙ্গে।'

'কী আশ্চর্য! আমি তো—।'

'না-না, আপনি যা করেছেন আপনার হিসেবে তা ঠিকই। সৈকত নিশার প্রেমকাহিনী গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত জানতেন কিশোর চৌধুরী। কিন্তু উনি সেটাকে অন্য ভাবে ব্যবহার করার চেষ্টা করেছিলেন। তার ফলে নীতিনিষ্ঠ, আদর্শবাদী অলোক মৈত্র প্রিয় ভাগ্নির ওপর চটেও গিয়েছিলেন। ভাগ্নির জায়গায় আর একটু হলেই চলে আসত ভাগ্নি-জামাই। কিন্তু ইতিমধ্যে খেলা অন্যদিকে ঘুরে যায়। সঙ্গে সঙ্গে নতুন ছক কষে ফেলেছিলেন কিশোর চৌধুরী। কিন্তু ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত ধোপে টিকল না।'

'সে তো দেখতেই পেলাম। কিন্তু বাল্যপ্রণয়ে অভিসম্পাত বলতে কি বিশেষ কিছু—।'

'হ্যাঁ, বিশেষ কিছু তো বটেই। অলোক মৈত্র বঙ্কিমচন্দ্রের অসম্ভব ভক্ত। ছেলেবেলায় বঙ্কিম পড়ে একটা অবসেশানের জগতে ঢুকে পড়েছিলেন। বঙ্কিমের চন্দ্রশেখরে প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়ের কাহিনী আছে। আছে বাল্যপ্রণয়ের অভিসম্পাতের কথা। কিশোর-প্রেমিক আর বালিকা-প্রেমিকা শেষ পর্যন্ত দুদিকে ছিটকে যায়। প্রেম বিয়ে পর্যন্ত পৌঁছয় না, তার কারণ বাল্যপ্রণয়ের অভিসম্পাত। আমি সাহিত্যটাহিত্য বিশেষ পড়ি না। কিন্তু চিঠির মধ্যে ওই অভিসম্পাতের কথা বেশ কয়েকবার দেখে অধ্যাপক অজেয় মজুমদারের কাছে ছুটেছিলাম। তিনি বলে দিলেন লাইনটা কোথায় আছে। পরে একদিন অলোকবাবুর সঙ্গে কথায়-কথায় বঙ্কিমের কথা তুলতেই জানতে পারলাম যে, উনি সত্যিই খুব বঙ্কিম-ভক্ত। সেদিন আবার ওঁর ছেলেবেলার বন্ধু কিরণবাবুর কাছ থেকে জানতে পারলাম—অলোকবাবুর ব্যক্তিগত জীবনেও বাল্যপ্রণয়ের ফল সুখের হয়নি। সংস্কার সত্যি হয়েছিল ওঁর জীবনে। তার ফলে সৈকত আর নিশার বিয়েতে মত দেননি কিছুতেই। এসব খবরের অনেকটাই আমি আবার অলোকবাবুর বাড়ির কাজের লোক কালিন্দীচরণের কাছ থেকে জেনেছি। কালিন্দচরণ বেশ কিছুদিন ধরে ও-বাড়িতে আছে। নিশাকে ভালবাসে নিজের মেয়ের মতো।'

ইন্সপেক্টর ঘোষরায় টেবিলের ওপর ওঁর মস্ত বড় থাবাটা বসিয়ে দিয়ে বললেন, 'কী কাণ্ড দেখ! পুলিশের চাকরি করে করে জীবনের এই মিষ্টি-মধুর দিকটাই ভুলতে বসেছি প্রায়!'

পঁয়ত্রিশ

সকালে চমৎকার রোদ উঠেছিল। কালকের ওই বিচ্ছিরি দুর্যোগের চিহ্ন কোথাও আর নেই। আকাশ নীল। প্রকৃতি যেন ধুয়েমুছে নিজেকে সাফ করে নিয়েছে। পথের দুধারের গাছগাছালির ধোঁয়াধুলো-ভরা পাতাগুলোয় এখন কী সুন্দর সবুজ রং। ঝড়বৃষ্টি, এলোমেলো হাওয়া, স্যাঁতসেঁতে একটা দিন শেষ হওয়ার পরে এমন একটা সকাল পেলে মনে হয়, আচমকা একটা ভাল উপহার এসে গেছে হাতে। কলকাতার মানুষজনের অনেকের মধ্যেই এইরকম একটা অনুভূতি বুঝি তৈরি হয়েছিল। মিঠেকড়া পরিবেশ, বাতাসে আরামপ্রদ শীত।

অনেকদিন পরে গত রাতে বেশ একটা আরামের ঘুম ঘুমিয়েছিলেন ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়। ওঁর শোবার ঘরের জানলা দিয়ে মেঝের ওপর সকালের ঝকঝকে রোদের মস্ত একটা ফালি এসে পড়েছিল। ওই রোদের ফালিতে বেতের চেয়ারে বসে দু-কাপ সুগন্ধী চা বেশ তারিয়ে তারিয়ে খেলেন ইন্সপেক্টর। ওঁর শরীরের মধ্যে মৃদু একটা উত্তেজনাও খেলা করছিল। সেটা তুঙ্গে উঠল সকালের খবরের কাগজগুলো আসার পরেই।

প্রতিটি কাগজের প্রথম পাতার বড় খবর : কোট কোটি টাকার প্রাচীন মূর্তি, মুদ্রা এবং হেরোইন উদ্ধার। চোরাই মালসমেত আন্তর্জাতিক চোরাচালান চক্র ধৃত। রহস্যজনকভাবে খুন-হওয়া মিলন মাইতির হত্যাকারীও ধরা পড়েছে। যে মানুষটির ক্ষুরধার বুদ্ধি আর নিরলস পরিশ্রমে এই কাণ্ডটি সম্ভব হয়েছে, তাঁর নাম অবনী ঘোষরায়। কলকাতা পুলিশের কতর্ব্যনিষ্ঠ এই ইন্সপেক্টর অতীতেও বেশ কয়েকটি রহস্যজনক খুনের কিনারা করেছেন।

খুনের খবর পেলে খবরের কাগজের বেশির ভাগ রিপোর্টাররা গোয়েন্দা-কাহিনীর লেখকের ভঙ্গিতে কলম ধরে থাকে। সেসব খবর পড়তে পড়তে কেমন যেন গা-ছমছম করে ওঠে। অবনী ঘোষরায়েরও হচ্ছিল। তবে অন্য কারণে। তিনি যা বলেননি, সে-সব কথাও কিছু-কিছু রিপোর্টার তাঁর মুখে কী অক্লেশে বসিয়ে দিয়েছে! একজন লিখেছে—অপরাধীকে ধরার জন্যে ইন্সপেক্টর একটা পচা ডোবার ধারে ঘন ঝোপের মধ্যে পর-পর দু-রাত বসে ম্যালিগন্যান্ট ম্যালেরিয়ার ভয় উপেক্ষা করে কয়েক-শো মশার কামড় খেয়েছেন। চড়চাপড় দিয়ে গায়ের মশা মারলে সেই শব্দে অপরাধী পালাতে পারে ভেবে তিনি পাথরের মতো বসে থেকে আমানুষিক এক সহ্যশক্তির পরিচয় দিয়েছেন।

বামাল অপরাধী ধরার রোমাঞ্চকর কাহিনী শোনাবার শেষে সব রিপোর্টারই ইন্সপেক্টরের জবানিতে যে ক'টি কথা বসিয়েছে তার সারার্থ হল : প্রচারবিমুখ অবনী ঘোষরায় চোরাই জাতীয় সম্পদ উদ্ধার এবং মিলন মাইতির খুনের কিনারা করার কৃতিত্ব একা নিতে চাননি। তিনি বলেছেন—এ-ব্যাপারে তিনি আরও কয়েকজন পুলিশ অফিসার, এমনকী শৌখিন গোয়েন্দা কৌশিক মিত্রের কাছ থেকেও অল্পবিস্তর সাহায্য পেয়েছেন।

শহরের পাঁচটি দৈনিক আসে ইন্সপেক্টরের কোয়ার্টার্সে। পাঁচটি কাগজের পাঁচটি রিপোর্টের প্রতিটিই তিনি পাঁচবার করে পড়লেন। পড়ে খুশি হলেন। বিব্রতও কম হলেন না। নিজের মনে বিড়বিড় করে বললেন—নাহ্! এরা দেখছি আমাকে নিয়ে বড্ড বাড়াবাড়ি করে ফেলেছে! আমিই যে সবকিছু করেছি এটা তো আমি কখনোই স্পষ্ট করে বলিনি। তবে কি না দু-দুটো এত বড় রহস্যের কিনারার কথা বলতে গেলে একটু হয়তো বেশি পরিমাণে 'আমি আমি' এসে যায়, তার মানে কি সত্যিই আমি? এ-ভাবে ভাবতে পেরে ইন্সপেক্টর কিছুটা স্বস্তি বোধ করলেন। কারণ, আজ সন্ধেয় অলোক মৈত্রের বাড়িতে সবার সঙ্গে তাঁর দেখা হওয়ার কথা। ঠিক করলেন, সেখানে তিনি তাঁর এই ক্ষোভের কথা জানাবেনই।

ইন্সপেক্টরের মনে একটুখানি ক্ষোভ দানা বাঁধলেও খবরের কাগজের সাধারণ পড়ুয়ারা বেজায় খুশি। কোটি কোটি টাকার অমূল্য জাতীয় সম্পদ আর একটু হলেই বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছিল। প্রথমে যেত বাংলাদেশে, তারপর সেখান থেকে ইউরোপ, আমেরিকায়। কী সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড!

স্যাণ্ড স্টোন, ব্ল্যাক স্টোন আর ব্রোঞ্জের তৈরি প্রাচীন যুগের মূর্তিগুলো হচ্ছে সূর্য, বিষ্ণু, বাসুকি বিষ্ণু, হংসবাহন ব্রহ্মা, সদাশিব, নর্তক, বিদ্যাধর ও গরুড়ের। সঙ্গে আছে পালরাজাদের অমূল্য তাম্রলিপি আর বেশ কিছু দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা। পাওয়া গেছে এক কেজি হেরোইনও। ধরা পড়েছে কুখ্যাত এক ড্রাগলর্ড আর আন্তর্জাতিক চোরাচালান চক্রের দুই বিদেশি।

স্মাগলারদের দিয়ে তৈরি নাটকের দল এবং মূর্তি, মুদ্রাবোঝাই যাত্রাপালার সেট-সেটিং আর স্মারক-উপহার নিয়ে যে 'সংস্কৃতিপ্রেমী' বিদেশে ঢুকে পড়েছিল প্রায়, তার নাম কিশোর চৌধুরী। এরই নিযুক্ত পেশাদার খুনি মাধব খুন করেছে মিলন মাইতিকে। অপরাধীদের প্রত্যেকেই অপরাধ স্বীকার করেছে।

ট্রাম, বাস, মেট্রো ও অফিসে একটাই আলোচনা—তা হল রোমাঞ্চকর এই চোরাচালানের বৃত্তান্ত। একই ঘটনার পাঁচরকম বিবরণ পাঁচটি কাগজে। বহু পাঠকের মুখে ঘুরতে ঘুরতে সে কাহিনী আবার বিকেলের দিকে বিস্তর ডালপালা ছড়িয়ে দিয়েছিল। কিছু-কিছু মানুষের নিজস্ব সোর্স আছে, সেই সোর্স খবরের কাগজ আর দূরদর্শনের বাইরের খবরও যোগান দিয়ে যায় অক্লেশে।

অফিসবাবুরা বিকেলে বাড়ি ফেরার মুখে সকালের তাজা খবর বাসি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই সন্ধেয় আলোক মৈত্রের মস্ত বসার ঘর উজ্জ্বল আলো আর হাসিখুশি মানুষের কথাবার্তায় ঝলমল করছিল সমানে।

ঘরের কোণের দিকের বেতের চেয়ারে গায়ে হলুদ ফুল-তোলা সাদা শাল জড়িয়ে বসে ছিল নিশা। ম্লান চেহারা, কিন্তু মুখে স্বস্তির হাসি। ডক্টর সান্যাল একটু আগেই ওকে দেখে গেছেন। বলেছেন, ভয়ের আর কোনও কারণ নেই। এখন নিশার একমাত্র কাজ হল—খুব দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠা। আশা করছেন, দু-চার দিনের মধ্যেই ও আবার আগের সেই সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যাবে। ওর পাশেই ওর মা বসে আছেন, উদ্বেগশূন্য চোখমুখ। এ-পাশে প্রশান্ত চেহারার গৃহকর্তা অলোক মৈত্র। ওঁর পাশে ছোট ভাই জ্যোতি। একটু দূরে সুনন্দ আর সৈকত। ওঁদের মুখোমুখি কৌশিক, মুখার্জিবাবু আর অ্যাডভোকেট কিরণ সেন।

গল্প, কথাবার্তা চলেছে ঘন্টাদুয়েক ধরে। কালিন্দীচরণ মনের মতো অতিথি পেয়ে তিন প্রস্ত খাবার খাইয়ে দিয়েছে সবাইকে। এ-ঘরে এখন আরও একজনমাত্র অতিথি আসার কথা—তিনি ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়। ইন্সপেক্টর ফোন করে জানিয়েছেন, থানার কাজে বিচ্ছিরিভাবে আটকে যাওয়ার জন্যে এখানে আসতে ওঁর সাড়ে-সাতটা বেজে যাবে। এখন সাড়ে-সাতটা বাজে, তার মানে যে-কোনও মুহূর্তে উনি হাজির হয়ে যাবেন।

সবার গায়েই অল্পবিস্তর শীতের পোশাক, শুধু শীতের দেশের মানুষ ডক্টর জ্যোতি মৈত্রের গায়ে ধবধবে সাদা একটা সুতির শার্ট। ডক্টর মৈত্র হাসতে হাসতে বললেন, 'ওহ্! জব্বর

একটা অভিজ্ঞতা হয়ে গেল। কৌশিকবাবু, আপনি না থাকলে কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াত কে জানে!'

ওঁর কথায় সায় দিলেন সুনন্দ তরফদার। 'আপনার দুর্ভোগ কেটে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু আমি নির্ঘাত এতক্ষণ শেষ হয়ে যেতাম! এই যে বেঁচে আছি, এ কৌশিকের দয়ায়।'

উনি থামতে না থামতেই কথার খেই ধরলেন অলোকবাবু, 'আমিও থাকতাম না। লোকে জানত বুড়ো ভোরবেলায় বেড়াতে বেরিয়ে ট্রাক চাপা পড়ে মরেছে।'

তিন দফা প্রশংসার ধাক্কায় লাজুক গোয়েন্দা কৌশিক প্রায় মাটিতে মিশে গিয়ে বলল, 'থাক-থাক. এসব কথা তো আগেও হয়েছে।'

অ্যাডভোকেট সেন মুচকি হেসে বললেন, 'ঠিক আছে—এখন না হয় থাকল। কিন্তু এই কথাগুলো পরেও আমরা বহুবার বলব, না হলে অকৃতজ্ঞের কাজ হবে। কি বলো নিশা?'

পাণ্ডুর মুখে ম্লান একটা হাসি ফুটে উঠেছিল নিশার। 'ঠিকই তো। ওইসব ঘটনার কথা ভাবলে এখনও আমার গা কেঁপে ওঠে।'

ছোট্ট একটা স্নেহের ধমক মেরে উকিলবাবু বললেন, 'গা এবার মা তোমার অন্য কারণে কাঁপুক। ওই যে যাকে বলে আনন্দের শিহরন। কৌশিক শুধু বিচ্ছিরি একটা রহস্যের সমাধানই করেনি, একই সঙ্গে বাল্যপ্রণয়ের অভিসম্পাতও দূর করেছে। কিশোর সাজা পেলে আইনগত সমস্যা মেটাতে বেশি দেরি হবে না! তারপর চার হাত এক। সৈকত কী বলো?'

উত্তরে সৈকত আর নিশা প্রায় একইসঙ্গে মুখ নিচু করল। তার আগে এ-ঘরের সবাই দেখে নিয়েছিল ওদের দুজনের মুখে একই ধরনের লজ্জা আর আনন্দের ছাপ ফুটে উঠেছে।

উকিলবাবু এবার কেমন যেন সাক্ষী মানার গলায় বাল্যবন্ধুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'অলোক, ছেলেবেলার প্রেম মানেই অভিশাপ—এই বিদঘুটে ধারণাটা এবার তাহলে তোমার গেছে নিশ্চয়ই।'

'না।'

অলোকবাবুর গম্ভীর মুখের সংক্ষিপ্ত উত্তর শুনে একটু হকচকিয়ে গেলেন বাল্যবন্ধু। 'না!'

'না। তবে এটা মানি—প্রতিটি নিয়মের মধ্যেই এক-আধটা ব্যতিক্রম আছে। এটা সেইরকম একটা। ওরা আর একবার সংসার পেতে দেখুক—। সুখী হলে আমরাও সুখী হব।'

কিরণবাবু হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, 'ওহ্! তুমি তো আমাকে বেজায় ঘাবড়ে দিয়েছিলে! যাক, অল্'স ওয়েল দ্যাট এণ্ড্স ওয়েল।'

ওঁর কথায় ঘরের সবাই হেসে উঠেছিল, আর ঠিক তক্ষুনি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলেন ইন্সপেক্টর অবনী ঘোষরায়।

এক ঘর লোকের হাসির মধ্যে হঠাৎ কেউ এসে পড়লে সে একটু ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাবেই। ঘরে পা দিয়ে থমকে গিয়েছিলেন ইন্সপেক্টর। কিন্তু হাসি থামিয়ে সমাদরের সঙ্গে ওঁকে অভ্যর্থনা জানালেন সবাই। কালিন্দীচরণ বড় মাপের একটা চেয়ার এগিয়ে দিল ওঁর দিকে। উনি বসতে না বসতেই একটু হেঁ-হেঁ-করা গলায় কৌশিক বলল, 'অবনীদা, আর একবার আপনাকে কেটারার অ্যান্'স ইন্‌কে বলে দিতে হবে। শুভ কাজ। সেদিন বেয়ারাগিরি করতে গিয়ে ভালমন্দ খাবারের গন্ধই শুধু শুঁকেছি—কিচ্ছু খেতে পারিনি। এবার কব্জি ডুবিয়ে খাব।'

ইন্সপেক্টরের প্রকাণ্ড শরীরে মস্ত চেয়ারটা ভরাট হয়ে গিয়েছিল প্রায়। 'শুভ কাজ মানে বিয়ে? কার?'

'আপনি তো জেনেই গেছেন, আঁচ করে নিন।'

সৈকত আর নিশাকে এক ঝলক দেখে নিয়ে কৌশিকের অবনীদা বললেন, 'মনে হয় আঁচ করতে পারছি। তবে—।'

'তবে কী?'

এবার অলোক মৈত্রের দিকে তাকিয়ে ইন্সপেক্টর বললেন, 'আপনি নিশ্চয়ই আপনার বিষয়সম্পত্তি, ব্যবসাপত্তরের আর একটা দানপত্র করছেন?'

একদিকে মাথা সামান্য কাত করে অলোকবাবু জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, এবার একেবারে ফাইনাল দানপত্র। কাকে কী দেব, সব ঠিক করা হয়ে গিয়েছে—এই সপ্তাহের মধ্যেই করে ফেলব।'

'খুব ভাল কথা। বিষয় মানেই বিষ। চটপট কাজ সেরে ফেলাই ভাল। তারপরেই তো আপনার হরিদ্বার যাত্রা?'

'না, হরিদ্বার যাব না।'

'তবে কোথায়?'

এবার ঘরের সবাইকে চমকে দিয়ে আলোক মৈত্র বললেন, 'এদের মুখে এ ক'দিন ধরে পুরনো কলকাতার এত গল্প শুনেছি যে, ভাবছি বাকি জীবনটা কলকাতার উন্নয়ন নিয়েই মেতে থাকব। সেই আমলের কলকাতার ভাঙাচোরা বাড়িঘর যদ্দূর পারি সারাবার চেষ্টা করব। তবে একার দ্বারা তো সব হবে না। বিরাট কাজ। পাঁচজনের সঙ্গে মিলেমিশে এগোবার চেষ্টা করব খানিকটা।'

দাদার কথা শুনে ছোট ভাই উত্তেজিত হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। 'দারুণ ব্যাপার! আমিও তোমার সঙ্গে আছি। শুধু কলকাতা নয়, পশ্চিমবঙ্গের যেখানে যত ঐতিহাসিক বাড়ি, মন্দির, সৌধ আছে—সবকিছুর দিকেই নজর দিতে হবে। ভাল কাজে লোকের অভাব হয় না। ঠিক জুটে যাবে। এই তো, আজকেই এমিলির সঙ্গে আমার টেলিফোনে কথা হল। ও

এ-ব্যাপারে খুব উৎসাহী। ও তো এখন প্রচুর টাকার মালকিন। মনে হয় কাজে নেমে পড়ার মতো একটা ফাণ্ড তৈরি করতে পারব আমরা।'

ডক্টর মৈত্রের উৎসাহের কিছুটা আলো বোধহয় পুলিশ ইন্সপেক্টরের মুখে এসেও পড়েছিল। একটু থেমে থেমে উনি বললেন, 'ডক্টর মৈত্র, আপনার কাছে সাহেব-পেন্টারদের আঁকা পুরনো কলকাতার ছবি, মানে ছবির কপিগুলো দেখে কলকাতার ওপর আমারও কিছুটা টান বেড়ে গেছে। শুনেছি অমূল্য ওই সব ছবির কিছু-কিছু নষ্ট হয়ে গেছে। তা, ওগুলো উদ্ধারের ব্যাপারে আপনারা যদি কোনও উদ্যোগ নেন—।'

'নিশ্চয়ই নেব। ওই কাজটাও তো আমাদের প্রোগ্রামের মধ্যে থাকছে। আপনিও চলে আসুন না আমাদের দলে।'

'আমি! আমার সাধ থাকলেও সাধ্য এত কম—।'

'সাধটাই আসল।'

ডক্টর মৈত্রের জবাব শুনে কৌশিক হাসতে হাসতে বলল, 'সাধটাই যদি আসল হয়, তাহলে আমিও আপনাদের সঙ্গে আছি।'

ব্লাড শ্যুগারের বিন্দুমাত্র পরোয়া না করে কালিন্দীচরণের আনা মস্ত এক থালা সুস্বাদু খাবার সাবাড় করার কাজে মনোযোগ দিলেন ইন্সপেক্টর ঘোষরায়। সেই ফাঁকে মুখার্জিবাবু তরুণ গোয়েন্দা-মালিক কৌশিকের ঠিক পাশে নিজের চেয়ারটাকে টেনে নিয়ে এলেন। তাই দেখে গোয়েন্দা বলল, 'আপনি অনেকক্ষণ থেকে আমাকে কী যেন একটা কথা বলতে চাইছেন। কথাটা বোধহয় আপনার হাতের ওই প্যাকেটটা নিয়ে।'

অবাক হয়ে মুখার্জিবাবু বললেন, 'কী করে বুঝতে পারলেন? ও, বুঝেছি। আসলে এই বডি ল্যাঙ্গুয়েজটাই আমি ভাল ভাবে শিখতে চাই। এ-ব্যাপারে আপনি একেবারে গোড়ার দিকে কালিদাসের রঘুবংশের কথা বলেছিলেন—। তা, ওই বইটা আমি কিনে এনেছি। সংস্কৃত শ্লোকের পাশাপাশি বাংলা অনুবাদ দেওয়া আছে। একটু বলে দেবেন কোন্ জায়গাটা পড়ব?'

মৃদু হেসে কৌশিক জবাব দিল, 'রঘুবংশ অসাধারণ বই। মনের আনন্দে ওটা শেষ করুন আগে। তারপর বলে দেব শরীরের ভাষা শেখার জন্যে কোন্ জায়গাগুলো দ্বিতীয়বার পড়তে হবে।'

ঘরের আড্ডা ভাঙল সাড়ে-আটটায়।

জিপে ওঠার আগে ইন্সপেকটর কৌশিকের কাঁধে হাত রেখে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'আমি ভাই ভীষণ লজ্জার মধ্যে আছি। প্রেসের লোকগুলো কী কাণ্ড করেছে দেখেছ! আমি বলেছি এক, লিখেছে আর এক। বারবার বলেছি রহস্যের কিনারা করার ব্যাপারে যা করার কৌশিকই করেছে, আমি কিচ্ছু করিনি। কিন্তু লেখার বেলায় ঠিক উলটো কথাই

লিখেছে। ওগুলো পড়লে যে-কারও মনে হবে সব কৃতিত্ব আমার একার। আমি ভাবছি কাগজের অফিসগুলোয় একটা করে প্রতিবাদ-পত্র পাঠিয়ে দেব।'

আঁতকে উঠে জবাব দিল কৌশিক, 'কক্ষনো ওই কাণ্ডটা করবেন না। প্রতিবাদ-পত্র মানে একটার জবাবে আর একটা প্রতিবাদ-পত্র। তারপর তার জবাবে আরও একটা, এই চিঠি চালাচালির কোনও শেষ নেই।'

তরুণ গোয়েন্দার কথা শুনে কিছুটা আশ্বস্ত হলেন ইন্সপেক্টর, কিন্তু ওঁর কিন্তু-কিন্তু ভাবটা দূর করতে পারলেন না চট করে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থাকার পরে বললেন, 'কথাটা তুমি মন্দ বলোনি। আসলে এই বিতর্ক জিনিসটাকে আমি খুব ভয় পাই। তাহলে বলছ চেপে যাব?'

'অবশ্যই। এই তদন্তের ব্যাপারে আপনার তো কম ধকল গেল না। এখন মগজটাকে দুটো দিন বিশ্রাম দিন। আজেবাজে কিচ্ছু ভাববেন না।'

গোয়েন্দোর কথায় ইন্সপেক্টরের মুখ থেকে আবছা মেঘের ছায়াটা সরে গেল। প্রকাণ্ড মানুষটা শিশুর মতো সরল একটা হাসি হেসে বললেন, 'আমার পাঁচ গুণ বেশি ধকল গেছে তোমার। তোমারও বিশ্রাম দরকার। এখন আর আড্ডাটাড্ডা নয়, চলো, যাওয়ার পথে তোমাকে তোমার বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাব।'

বাধ্য ছেলের মতো জিপে উঠে পড়ল কৌশিক। মনের সুখে সামনের দিকে জিপ ছোটালেন ইন্সপেক্টর।